দ্বিতীয় খণ্ড

হুগলী জেলার

ইতিহাস

ও

বঙ্গসমাজ

সুধীর কুমার মিত্র

মিত্রাণী প্রকাশন
২ কালী লেন ॥ কলিকাতা ২৬

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় মিত্রালী সংস্করণ
১৫ আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
পলাশ মিত্র
মিত্রালী প্রকাশন
২ কালী লেন
কলিকাতা ২৬

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ
সমীর ঘোষ

নামপত্র ও বর্ণলিপি
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা ১৪

ব্লক
টাওয়ার হাফটোন
ব্লক এ্যান্ড ব্লক কনসার্ণ

বাঁধাই
জনাব তৈফুর মিঞা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে সরকারী সাহায্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সুলভ মূল্যে পুনঃমুদ্রিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গের নব-সংস্কৃত রূপের স্বপ্নদ্রষ্টা

সুমিত-বলিষ্ঠ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাভাজনেষু

চিত্রসূচী

গুলিটা, সপ্তরথ মন্দির—বৈঁচি, রাধাবল্লভের মন্দির—বৈঁচি

৭১ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঠ—সপ্তগ্রাম, মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয়—বড়া

৭২ বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল মুখোপাধ্যায়

৭৩ দয়ালচন্দ্র সোম, বিপিনকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

৭৪ রাধাগোবিন্দজীউর রাসমঞ্চ—হরিপাল, ষণ্ডেশ্বরজীউ—চুঁচুড়া, কাজীমন ফকিরের সমাধি—মহানাদ

৭৫ শিবচন্দ্র সোম, কেদারনাথ সোম, রজনীকান্ত রায়, স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ

৭৬ ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর দৃশ্য, রঘুনাথ দাসগোস্বামীর শ্রীপাঠ—কৃষ্ণপুর

৭৭ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়—বড়া

৭৮ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা নৃসিংহ দেবরায়, রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায়

৭৯ জাফর খাঁ গাজির দরগায় আরবী শিলালিপি, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ বসু, সপ্তগ্রামের রূপান্তরিত হিন্দু-মন্দির

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২	৪	সুবিধার্থে বর্ধমান জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং উত্তরাংশ বর্ধমান ও দক্ষিণাংশ	নামক রাজকর্মচারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং ইহারা প্রত্যেকেই রাজাকে সর্ববিষয়ে সহায়তা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮৯	১৯	হুগলী* বাংলার প্রথম রেলস্টেশন হইলেও একদিকে চুঁচুড়া আর এক দিকে ব্যাণ্ডেল	হুগলী কলেজ প্রসঙ্গে ৩৫৬ পৃষ্ঠায় হুগলীর স্বনামধন্য জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার

বিষয়সূচী
২য় খণ্ড

চুঁচুড়া থানার সার্ভে-ম্যাপ

সেকালের চুঁচুড়া

ভারতবর্ষে ব্যবসা করিবার জন্য ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাটাভিয়ায় ওলন্দাজগণ "ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠন করেন। এবং উক্ত বৎসরেই তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ মোগলদের হাতে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং ওলন্দাজদের সহিত সংশ্রবের জন্যই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। দিল্লীর বাদসাহ সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রদত্ত ফরমানের সর্তানুযায়ী তাহারা চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই অখ্যাত স্থান তখন ভারতবর্ষে নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ওলন্দাজগণ প্রথমে বণিকরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন কিন্তু ইংরাজদের শাসন ক্ষমতা অর্জন করিতে দেখিয়া তাহারাও সেই দিকে মনোযোগ দেন। একবার মীরজাফর গোপনে বাংলা দেশ হইতে ইংরাজের প্রধান্য নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন। চুঁচুড়া কিছুকাল ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্যাটাভিয়া হইতে এদেশে আসে। ইংরাজগণ তাহাদের বাধা প্রদান করিলে ওলন্দাজগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং তাহাদের রণতরীগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহার পর হইতে ওলন্দাজগণ শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাদের উন্নতির সময়ে তাহারা 'ফোর্ট গ্যাসটোভাস' নামে চুঁচুড়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। চুঁচুড়া অধিকার করিবার পর ইংরাজগণ ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ ভাঙিয়া ফেলেন এবং তথায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্য রাখিবার জন্য তাহারা একটি ব্যারাক নির্মাণ করেন। এখন এই ব্যারাকে কাছারী কালেক্টরি ও অন্যান্য অফিস অবস্থিত। প্রত্যেক তলায় ৬৫টি বৃহৎ খিলানযুক্ত এরূপ দীর্ঘ অট্টালিকা বঙ্গদেশে আর নাই। এই বৃহত্তম অট্টালিকা সেই আমলের স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইবার পরও ওলন্দাজগণ বাণিজ্যসূত্রে বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়েও খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। ওলন্দাজদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইলেও 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র [illegible] অসাধুতায় লাভের সমস্ত অর্থ তাহাদের নিকট পোঁছাইত না। সেই জন্য তাহারা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে সুমাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপের পরিবর্তে চুঁচুড়া ইংরাজদের ছাড়িয়া দেয়।

ওলন্দাজদের সময়ে অনেক আর্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত চুঁচুড়ার আর্মেনীয় গির্জা বঙ্গের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই গীর্জা 'জন দি ব্যাপটিষ্ট'এর নামে উৎসগীকৃত বলিয়া প্রতিবৎসর ২৭শে জানুয়ারী এখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ ও আর্মেনীয়দের পুরাতন গোরস্থানে তখনকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে। ব্যাণ্ডেলের গির্জা বাংলার প্রাচীনতম গির্জা। এখানকার আর্মেনিটোলা, মোগলটুলি, ফিরিঙ্গিটোলা প্রভৃতি পাড়ার নাম চুঁচুড়ার পূর্ব সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে।

ওলন্দাজ শাসনকর্তাগণ সকলেই প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন এবং বাঙ্গালীদের সহিত তাহারা খুব মেলামেশা ও বাঙ্গালীদের রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝখানে গঙ্গার ধারে গোস্বামীঘাটে "কনে বৌয়ের মন্দির" নামে একটি প্রকাণ্ড

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। পূর্বে ইহা একটি কালীমন্দির ছিল এবং দেবীচরণ সরকার নামে এক ধনী ব্যক্তি তাহার বাড়ির কনিষ্ঠা বধূর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ইহা "কনে বৌয়ের মন্দির" বলিয়া প্রখ্যাত হয়। ইহা ছাড়া চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর জীউর জাগ্রত দেবতা হিসাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চলে খ্যাতি আছে। এই মন্দিরের দুইটি পিতলের ঢাক তৎকালীন ওলন্দাজ গভর্ণর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

চুঁচুড়া বহু প্রাচীনকাল হইতে কেবল জেলার সদর নয় ইহা সমগ্র বর্ধমান বিভাগের হেড কোয়ার্টার ও কমিশনারের আবাসস্থান। বর্তমানে সদর মহকুমার চুঁচুড়া থানায় দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি হুগলী-চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া এবং কোদালিয়া-দেবানন্দপুর নামে একটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। কোদালিয়া গ্রামের সার্বিক বিবরণ (মনোগ্রাফ) ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির তালিকায় বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ সার্বিক কোন গ্রামের বিবরণ পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া উহার সংক্ষিপ্তসার শেষে প্রদত্ত হইল।

মগরা থানার সার্ভে-ম্যাপ

পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবী

শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন

উইলিয়াম কেরী

সেন্ট ওলাফস্ চার্চ (শ্রীরামপুর)

শ্রীরামপুর মিশন চার্চ
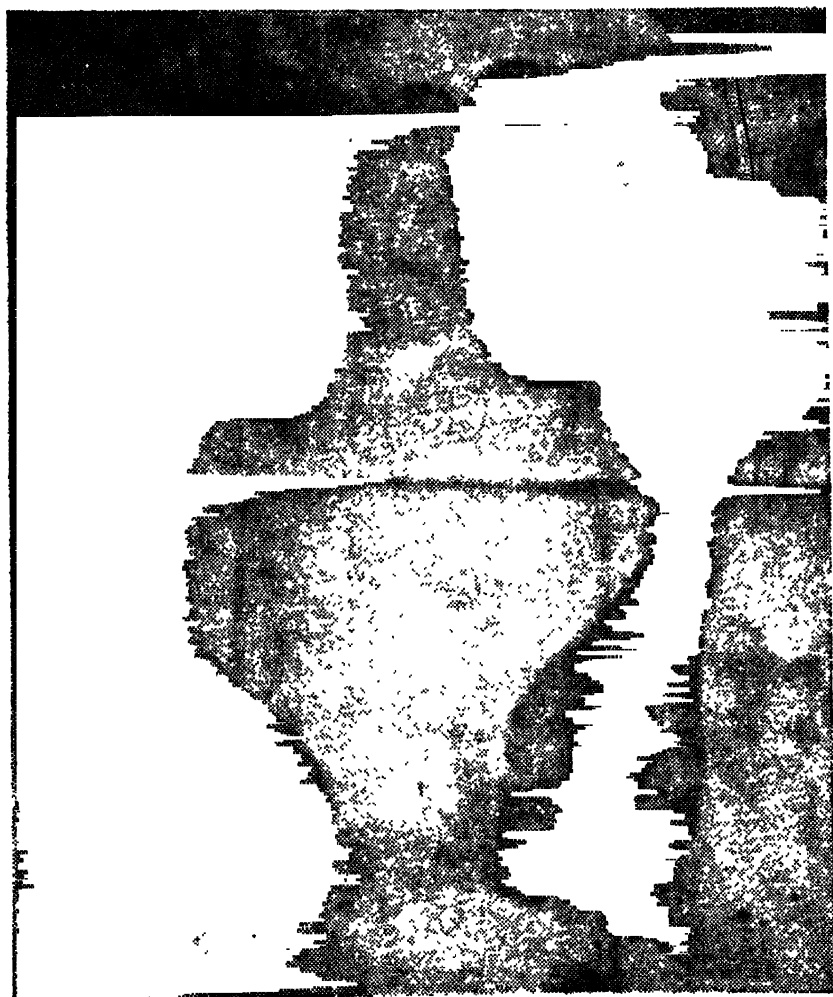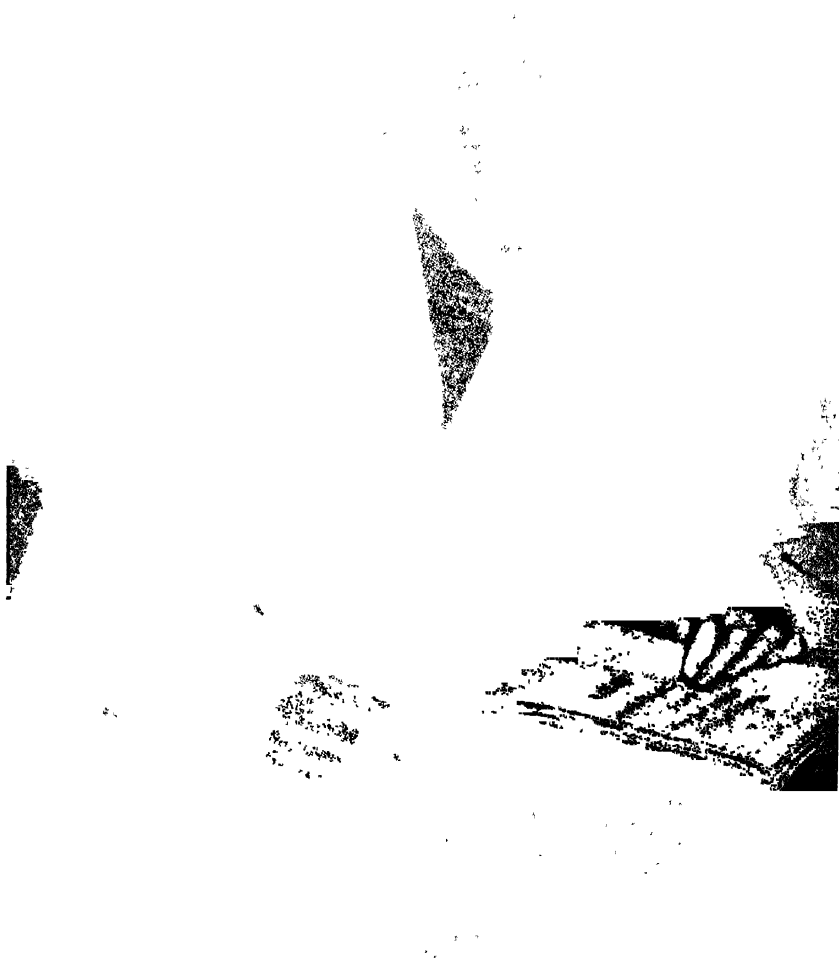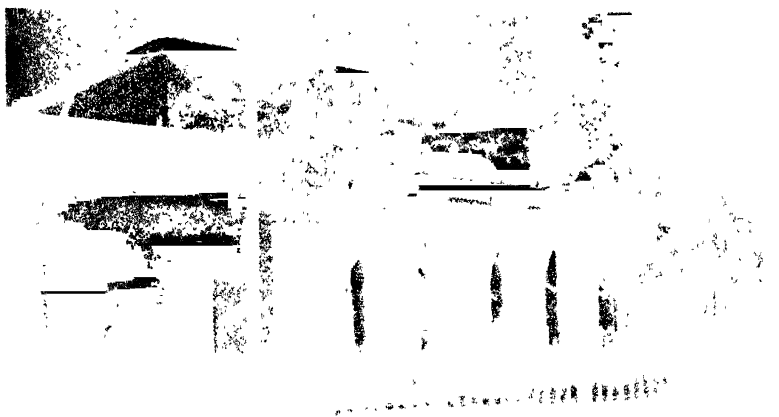
চুঁচুড়া ও হুগলী

চুঁচুড়া হুগলী জেলার সদর শহর কলিকাতা হইতে দূরত্ব তেইশ মাইল। ওলন্দাজগণের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যাটেভিয়ায় ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে 'ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' গঠিত হয় এবং উক্ত বৎসরেই তাঁহারা ব্যবসা করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নামক সরকারী গ্রন্থের লেখক মিঃ এল, এস, এস, ওম্যালী ও মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিয়াছেনঃ The earliest record of the arrival of Dutch ships in the north of the Bay was in 1615 দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ওলন্দাজদিগকে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে একখানি 'ফরমান' দেন এবং উক্ত 'ফরমানের' সর্তানুযায়ী চুঁচুড়া তাঁহাদের অধিকারে আসে। ব্যবসায়াদির জন্য তাহারা চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতে এই স্থানটি বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে **হুগলী-চুঁচুড়া** মিলিত শহর। এই দুইটি পুরাতন শহর বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

হান্টার সাহেব লিখিয়াছেনঃ Hugli and Chinsurah lie, in fact, so close to each other as to form in reality only one town.

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে চুঁচুড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ

"চন্দ্রমা-মাধুরী ধরি চুঁচুড়া নগরী,
জল-কেলি-আশে যেন উপকূলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্বকালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য নিকেতন।
অপূর্ব উদ্যান-রাজি নয়ন রঞ্জন
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরুপল্লব শ্যামল,
নগর-নগরী শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।"

আধুনিক চুঁচুড়া সহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই স্থান একটি সামান্য পল্লী ছিল এবং এতদ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজকার্যাদি সপ্তগ্রাম হইতেই নির্বাহ হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট্ আকবরের রাজস্বসচিব তোডরমল্ল বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব নির্ধারণকল্পে সুবা বাঙ্গলাকে কয়েকটী সরকারে এবং উক্ত সরকারগুলিকে আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করেন। সেই বিভক্ত পরগণা বা মহালের বিবরণ ১৫৮ পৃষ্ঠায় এবং রাজা তোডরমল্লের জীবনী ১৬৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই স্থান তৎকালে 'সরকার সাতগাঁও'এর অন্তর্গত 'আরসা' * পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'কুলিহাণ্ডা' বলিয়া এই স্থানটি পরিচিত ছিল। বহু প্রাচীন দলিলাদিতে 'কুলিহাণ্ডা' নামটি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়; পরবর্তী কালে কুলিহাণ্ডা 'ধরমপুরে' পরিণত হয় এবং হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চার নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে 'ধর্মপুর' বলিয়া একটি পল্লী এখনও বর্তমান আছে। এই পল্লীর মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় বিশ হাত উচ্চ একটি প্রাচীন সমাধি আছে এবং 'বিবির-গোর' বলিয়া উহা বর্তমানে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই এই স্থানের প্রাচীনতম স্মৃতিচিহ্ন।

চুঁচুড়ার ঘণ্টাঘাটও ওলন্দাজ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ১৭২৫ খৃঃ নৃসিংহ দাস এই ঘাটটি তৈরী করিয়াছিলেন। এই ঘাটের একপাশে হুগলী মহসীন কলেজ আর অন্য পাশে ওলন্দাজ চ্যাপেল বর্তমানে যাহা হুগলী কলেজের বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটারির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চ্যাপেলের ঘণ্টার সঙ্গে তাই ঘাটটিও ঘণ্টাঘাট বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। আজ চ্যাপেলও নাই—ঘণ্টাও নাই কিন্তু ঘণ্টাঘাট নামটি প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদটি এই:

কে বলেরে জটাইবুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন।
ঘণ্টাঘাটের গির্জে দেখে বলে গিরি গোবর্ধন॥

চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছিলেন যে, 'ক্ষুদ্র' হইতে চুঁচুড়া নাম আসিয়াছে, কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ওলন্দাজগণ এই নাম দিয়াছিল, কিন্তু কেন এবং ইহার অর্থ যে কি তাহার কোন পূর্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। চুঁচুড়া পোর্তুগীজ শব্দ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে বলেন: "আমরা ক্ষুদ্র। চুঁচুড়া শব্দের অর্থই ক্ষুদ্র। শব্দের অর্থই বা কেন বলি? ক্ষুদ্র শব্দের রূপান্তরই 'চুঁচুড়া'। ক্ষুদ্র, ছুটর, ছটরা, ছোট, ছোকরা, ছুকরী, খুচর, খুচরা, করচা, চুঁচুড়া, কুর্চা, কাঁচ এই সকল পদই ক্ষুদ্র শব্দজাত। আমরা ক্ষুদ্র"

ইংরাজদিগের বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার বহু পূর্বে ওলন্দাজগণ এই দেশে বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহারা যে সময় চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় ফরাসীগণ চন্দননগরে ছিল; দুইটি স্থান পাশাপাশি বলিয়া সীমা নির্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা একটি খাল খনন করিয়াছিলেন। এই সীমানা 'ফরাসীগড়' বলিয়া অদ্যাপি অভিহিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ মুঘল হস্তে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা বণিকরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদের শাসনক্ষমতা অর্জন করিতে দেখিয়া তাহারও সেদিকে মনোযোগ দেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান ওলন্দাজদিগকে চুঁচুড়ায় কুঠী নির্মাণের সনন্দ প্রদান করেন।

* সেওড়াফুলী হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত সেকালে আর্ষা পরগণা বলিয়া খ্যাত ছিল।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাজাহানের নিকট হইতে ও ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ আরও দুইখানি সনন্দ বা 'ফরমান' পাইয়াছিলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার একজন সামান্য ভূম্যাধিকারী শোভা সিংহ বর্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া বর্ধমান আক্রমণ এবং বাঙ্গালায় মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ অধিকারপূর্বক বিদ্রোহীরা রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করেন।* কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরাম রায় কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁন এই সময় বাঙ্গলার নবাব এবং নুরউল্লা খাঁ হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের 'ফৌজদার' ছিলেন। বিদ্রোহীগণের উপদ্রবে বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি সহস্র সৈনিকের অধিনায়ক হইলেও কৃষি বাণিজ্যাদি অন্যান্য অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় সৈন্যচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, নবাবের হুকুম পাইয়া তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিল্ড সাহেব 'ফৌজদার' কথাটির যে অর্থ করিয়াছেন তাহা এইঃ

The Fouzdar was the Chief Police Officer and Judge of all crimes not capital.

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয় ব্যবসায়িবৃন্দ তাঁহাদিগের উপনিবেশ ও বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ 'ফোর্ট গ্যাস্টভস্' দুর্গ নির্মাণ করিলেন। নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পাইবার পূর্বেই ওলন্দাজগণ প্রাচীর দিয়া চুঁচুড়াকে সুরক্ষিত করিয়াছিল। কারণ ওলন্দাজ দুর্গের উত্তরদিকে "১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ" এবং দক্ষিণ দিকের ফটকে "১৬৮২ খৃষ্টাব্দ" এই সাল দুইটি লিখিত ছিল। উক্ত দুর্গ ঘণ্টাঘাট হইতে ব্যারাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া পূর্বোক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। দুর্গের উত্তরদিকের ফটকে "ও-ভি-সি ১৬৮৭" অঙ্কিত প্রস্তর ফলকখানি কমিশনার মহোদয়ের ভবনে রক্ষিত আছে। O. V. C. ইহার অর্থ Ostindiche Vereenigde Companie (United East India Company).

যাহা হউক, ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হুগলী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অতঃপর দুর্গমধ্যে থাকা নিরাপদ নহে বলিয়া তিনি ফকিরের বেশে পলায়ন করেন এবং হুগলী শোভা সিংহের হস্তগত হয়। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সহায়তায় হুগলী পুনরুদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহীগণ সপ্তগ্রামে পলায়ন করে। বর্ধমান রাজ-পরিবারের যে সকল ব্যক্তি বন্দী

* বর্ধমানে রাজা কৃষ্ণরামের নামানুসারে "কৃষ্ণসায়ার" নামে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী আছে।

হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজার এক সুন্দরী কন্যাও ছিলেন। শোভাসিংহ তাহাকে বলপূর্বক অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি শাণিত ছুরিকার দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া পরে নিজেও 'কলঙ্কিণীর দেহ বহন করিব না' বলিয়া আত্মহত্যা করেন।

শোভাসিংহ বর্ধমান জয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ নামক স্থানে যে হজরৎ ইসমাইলের দরগা আছে তাহা নির্মাণ করিয়া দেন। শোভা সিংহের বীরত্বের কাহিনী পরে বিবৃত হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় যে-সমস্ত স্থান ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা হইতে তের হাজার একশত বাইশ টাকা (১৩,১২২্) তাহাদের রাজস্ব আদায় হইত। বাস্তুভিটার উপর তাহারা বিঘা প্রতি সাড়ে বাইশ টাকা খাজনা আদায় করিত এবং চুঁচুড়ায় তৎকালে বাস্তু-ভিটার পরিমাণ ছয়শত আটান্ন বিঘা ছিল। মোগলদের নিকট হইতে চুঁচুড়া ওলন্দাজদের অধিকারে আসিবার পর, তাহারা খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করে নাই, তবে নষ্ট জমি বা জমি হস্তান্তর করিবার সময় তাহারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য খাজনা আদায় করিত। চুঁচুড়ার কোষাধ্যক্ষ মিঃ হার্কলোটো ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর কালেক্টার সাহেবকে বলেন যে, তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরের ওলন্দাজের দলিলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক জমির খাজনা তখনও যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন ওলন্দাজদের চুঁচুড়া ও বরাহনগর কুঠী পরিদর্শন করেন বরাহনগর কুঠীকে তিনি দুর্নীতির আকর "School of debauchery" বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু চুঁচুড়ার সুখ্যাতি করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ্যঃ

About half a league further up is the Chinchura where the Dutch Emporium stands. It is a large Factory, walled high with brick, and the Factors have great many good houses standing pleasantly on the river side and all of them have pretty gardens to their houses. (১)

ওলন্দাজদের সময় একুশ ইঞ্চি মাপে সাধারণতঃ এক হাত ধরা হইত; কিন্তু ইংরাজী মাপে আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত হয়। জন ডিক্‌স নামক একজন ওলন্দাজের হাতের মাপে জমি মাপা হইত এবং তাহার হাত একুশ ইঞ্চি লম্বা ছিল। চুরাশী ইঞ্চি লম্বা একটি লাঠির দ্বারা জমি মাপা হইত এবং উক্ত লাঠিটী চারি ভাগে ভাগ করা ছিল। পরে উক্ত লাঠিটী তিন ইঞ্চি কমাইয়া দেওয়া হয় এবং লাঠিটীর মাপ সাড়ে চার হাত দাঁড়ায়; এই মাপকে 'রাইনল্যাণ্ড' মাপ বলা হইত। ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ওলন্দাজদিগের প্রদত্ত পাট্টা পরিবর্তন করিয়া আঠারো ইঞ্চি হিসাবে মাপিতে আরম্ভ করেন কিন্তু চুঁচুড়ার শীল-বংশ উক্ত পরিবর্তনে বিশেষ আপত্তি জ্ঞাপন করেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত পরিবর্তন করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং হুগলীর কালেক্টার মিঃ এইচ, বেলী কর্তৃক তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হন।

ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া উপনিবেশ ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল এবং চুঁচুড়ার কোন পদ

শূন্য হইলে ব্যাটেভিয়া হইতে উক্ত স্থানে কর্মচারী নিয়োগ হইত। একজন গভর্ণর ও সাতজন কাউন্সিলের সদস্যের উপর চুঁচুড়া-উপনিবেশ পরিচালনের ভার ছিল। উক্ত সাতজন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সদস্য ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন; বাকী দুইজন সদস্য ভোট দিতে না পারিলেও চুঁচুড়ার গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। ওলন্দাজ গভর্ণরগণ বিলাসিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাঁহারা সংসার-খরচ করিতেন। চুঁচুড়া গভর্ণরের "তাঞ্জাম" একমাত্র গভর্ণর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না। গভর্ণর যে সময় নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন সেই সময় বাদ্য-করগণ বাজনা বাজাইয়া অগ্রে যাইত। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর কর্তৃক টানা-পাখার প্রথম প্রচলন এই দেশে হইয়াছিল এবং বড় বড় তালপাতার পাখাও তাহারা প্রথম ব্যবহার করিত। তৎকালে কাঁচের শার্সির প্রচলন না থাকিলেও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের বাড়ীতে বেতের জাফ্রি লাগান হইত। ওলন্দাজ গভর্ণরদের মধ্যে ভার্লেট, ভিনসেন্ট, সিট্যারম্যান, ওভারব্রিকের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজদিগের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া গীর্জার মধ্যে বহু গভর্ণর এবং তাহাদের সহধর্মিণীদের তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। ওলন্দাজ কাউন্সিলের সাতজন সদস্যের উপর চুঁচুড়া পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে একজনের উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল, তিনি জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল এবং বেত্রাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া জেল ও ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি ধনী ব্যক্তি-গণকে জরিমানা করিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি আরও কয়েকটী উচ্চ পদ ছিল। জমি হস্তান্তর করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের দুইটি আদালত ছিল; একটি দেশীয় বা জমিদারী আদালত এবং আর একটি ইউরোপীয় আদালত।

ইংরাজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং ইংরাজগণ ওলন্দাজ-রমণীদের সহিত নৃত্য-গীত করিবার জন্য চুঁচুড়ায় প্রায়ই যাইতেন। প্রথম ইংরাজ গভর্ণর উইলিয়ম হেজ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে আসিয়া ওলন্দাজ গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে হেজ সাহেবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাইফোর্ডের মনোমালিন্য হইলে তিনি কিছুদিন চুঁচুড়ায় অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে তাহার ডাইরীতে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"I went to visit Dutch Direct or and give him thanks for his kindness in so readily in his quarters."

ওলন্দাজরা এই স্থান হইতে বহুবিধ জিনিষ ইউরোপে চালান দিয়া ধনৈশ্বর্যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে তাহারাই প্রধান হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাভায় অহিফেন রপ্তানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলন্দাজগণ পাটনা হইতে অহিফেন কিনিয়া জাভায় উহা চালান দিয়া বৎসরে চারলক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত বাগানে তাহাদের বিশেষ সখ ছিল এবং কড়াইশুঁটির চাষ তাহারাই এই স্থানে প্রথম করিয়াছিল। 'ওলন্দাশুঁটি' নামক কড়াই আজও তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। চুঁচুড়াতে তাহারা এত শাক-সব্জীর বাগান করিয়াছিল যে, শাক-সব্জী বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহারা বহু অর্থ লাভ করিত।

॥ সরস্বতী তীরে যুদ্ধ ॥

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া মিরজাফরকে বাঙ্গলার নবাব করেন কিন্তু তাহার শাসনকালে বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাজ করে। একদিকে ইংরাজের প্রভুত্ব ও অন্যদিকে মীরকাশিমের ষড়যন্ত্রে মীরজাফর আর একটি ইউরোপীয় জাতিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হন। ওলন্দাজগণ এতদিন ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত ছিল কিন্তু মীরজাফরের সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে তাহারাও রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হয়। ব্যাটাভিয়া হইতে ওলন্দাজগণ সাতখানি রণতরী আনাইল, উহার তিনখানি জাহাজে ছত্রিশটি করিয়া কামান, আর তিনখানিতে ছাব্বিশটি করিয়া কামান এবং একখানি জাহাজে ষোলটি কামান বসান ছিল। এ ছাড়া ঐ সমস্ত জাহাজগুলিতে দেড় হাজার ওলন্দাজ সৈন্য ছিল। তাহারা বাহিরে প্রকাশ করিল যে, জাহাজগুলি করমণ্ডল উপকূলে যাইবে, কোন বিশেষ কারণে কেবল একবার চুঁচুড়ায় থামিবে। ক্লাইভ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি অবশ্য যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করেন নাই, তথাপি ইংরাজদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য যে, জাহাজ-গুলি আসিয়াছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া কর্ণেল ফোর্ডকে উক্ত নৌবহর ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। ফোর্ড লিখিত আদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইভ তখন তাস খেলিতেছিলেন। তাস খেলিতে খেলিতে লিখিলেন "প্রিয় ফোর্ড, অবিলম্বে যুদ্ধ কর। কৌন্সিলের আদেশ কাল পাঠাইব।" সরস্বতী তীরে বিদেড়া* ক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণেল ফোর্ড ওলন্দাজদিগকে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশ হইল। ম্যালিসন এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

The action was short, bloody and decisive. In half an hour the enemy were completely defeated. The loss of the English on this occasion was comparitively trifling. (২)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা একবার চুঁচুড়া দখল করেন এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করেন। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ইংরাজগণ পুনরায় চুঁচুড়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই বাইশ বৎসর মিঃ আর রিচ চুঁচুড়ার কমিশনার রূপে কার্য করেন। উক্ত সময় তিনি ইংরাজদিগকে ৮৪৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন। ওলন্দাজগণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইলেও 'ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' [illegible] অসাধুতায় সমস্ত অর্থ কোম্পানীর নিকট পৌঁছাইত না। ওলন্দাজ কর্মচারিবৃন্দের অসাধুতার জন্য হল্যাণ্ডের রাজা চুঁচুড়া ইংরাজগণকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজদিগেরও সমমাত্রায় লোকসান হইতেছিল বলিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং উক্ত সন্ধির সর্তানুযায়ী ওলন্দাজদিগের একশত আশী বৎসরের উপনিবেশ চুঁচুড়া সহর ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। উপরোক্ত সন্ধি অনুযায়ী ওলন্দাজ-

বিদেড়া চন্দননগরের নিকট 'ব্যাজড়া' গ্রাম।

গণ ইংরাজদের নিকট হইতে সুমাত্রা দ্বীপ ও ফোর্ট মার্লবো প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজগণ চুঁচুড়া, মালকাপুর, পলতা, বালেশ্বর এবং মালাক্কা দ্বীপ প্রাপ্ত হয়। এই হস্তান্তর সম্বন্ধে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের "সমাচার-দর্পণে"র সংবাদটি এইরূপঃ

ইংরাজের হস্তে চুঁচুড়া সমর্পণ। "৭ই মে চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুক্ত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুক্ত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যুষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ সহরের বড় সাহেব শ্রীযুক্ত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলাণ্ডীয় অধিপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজপত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগ পর্যন্ত উঠিত যে হলাণ্ডীয় নিশান, সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংলণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে, এই স্থান এতদিন পর্যন্ত হলাণ্ডীয়দের অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলাণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংলণ্ডীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।"

ওলন্দাজগণ খুব মিশুক ছিলেন এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহারা খুবই মেলামেশা করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ-মহিলা বিবাহ করিয়া চুঁচুড়ায় বহু বৎসর যাবত বসবাস করেন। তাহাদের বংশধরগণ হুগলীর কালেক্টরের নিকট হইতে পেন্সেন প্রাপ্ত হইতেন। চুঁচুড়ার হিন্দুদিগের প্রাচীন বিগ্রহ ষণ্ডেশ্বর জীউর যে পিতলের দুইটি ঢাক অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ওলন্দাজ গভর্ণর করিয়া দিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ ইংরাজদিগকে চুঁচুড়া অর্পণ করিলেও, ওলন্দাজ গভর্ণর ওভারব্রিক এবং আটজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাহাদের মাহিনার এক-তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইতেন। প্রথমে পামার এণ্ড কোম্পানী পেন্সনের টাকা দিতেন; পরে হুগলীর কালেক্টার উক্ত পেন্সন দিতেন।

॥ চুঁচুড়া ব্যারাক ॥

ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কর্তৃক নির্মিত "ফোর্ট গ্যাস্‌টোভস্‌" দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উক্ত দুর্গের কড়ি, বরগা প্রভৃতি লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ করেন। এই ব্যারাক নির্মাণ করিবার জন্য ইংরাজগণ বহু প্রজার বাস উচ্ছেদ করেন এবং সেইজন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। এই দীর্ঘ অট্টালিকার মধ্যে এক হাজার ব্যক্তির থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা এবং প্রত্যেক তলায় ৬৫টী করিয়া বৃহৎ খিলান আছে। ব্যারাক নির্মাণের পূর্বে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবরের "সমাচার দর্পণে" এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

"চুঁচুড়া—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, চুঁচুড়া ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত হইয়াছে। সম্প্রতি শুনা গেল যে, শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেখানকার প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।"

এই অট্টালিকার দ্বিতলে ইংরাজী ও বাঙগলা ভাষায় নিম্নোক্ত লিপিগর্লি খোদিত আছে

"This Barracks were commenced December 1829. The foundation and plinth of the whole and superstructure of the lower storey west wing by Lt. J. A. Crommelin, Executive Engineer, the remainder of the structure and entire finishing by Captain Won Bell of Artillary Ex. Officer."

বঙগভাষায় লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কা বেল সাহেবের দ্বারায় ন্মতসিন্ধ শ্রীরামহরি সরকার, সাং চক্রবেড়ে এবং শ্রীসেখ তন্ দফাদার, সাং চক্রবেড়ে, ইং সন ১৮২৯ বাঃ সন ১২৩৬।"

বহ্ প্রজা উচ্ছেদ এবং বিপ্ল অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যদের জন্য এই ব্যারাক নির্মিত হইলেও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক এই স্থান হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার অজ্হাতে সৈন্য স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জঙগী-লাট তাহার বির্দ্ধাচরণ করিলে বিলাতে এই ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য যায়। বিলাত হইতে সৈন্য স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব গ্হীত হয় এবং চুঁচুড়ার যাবতীয় সৈন্য কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং ব্যারাক খালি পড়িয়া থাকে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যারাকে ইংরাজ সৈন্য থাকিত। চুঁচুড়া হইতে গোরা সৈন্য স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কারণ এই যে সেই সময় গোরা সৈন্যের অত্যাচারে চুঁচুড়া ও পার্শ্ববর্তী স্থানসম্হ ভীষণভাবে জর্জরিত হইয়াছিল। সেই জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ মিউনিসিপ্যাল কমিটির সম্পাদক গোরা সৈন্যের অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গোরা সৈন্য ব্যারাক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এবং চুঁচুড়ার অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিস এবং হ্গলী হইতে আদালতসম্হ উক্ত ব্যারাকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় কমিশনার র্পে মন্ট্রেসর, আলেকজান্ডার, টয়েনবি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বোর্ডিলন, বাকল্যান্ড, উইলিয়মস্, কেনেডি, ফন্ডার, কাস্টেয়ার্স প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যনাথ ধামে কাষ্টেয়ার্স সাহেবের উদ্যোগে "কাষ্টেয়ার্স টাউন" স্থাপিত হয়।

॥ প্রাচীন গীর্জা ॥

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা হিসাবে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত আরমেনিয়ানদের গীর্জাটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টানদিগের উপাসনা করিবার ইহা বঙগদেশের মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজা যোয়ানিজের প্ত্র মার্গার এই গীর্জার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার ভ্রাতা জোসেফ কর্তৃক ইহা সমাপ্ত হয়। প্রতি বৎসর ২৬শে জান্য়ারী এই স্থানে আরমেনিয়ানগণ 'জন্-দি-ব্যাপ্টিষ্টে'র স্মরণার্থে উপাসনা করিয়া থাকেন। মার্গার-বংশের কয়েকটি প্রাচীন সমাধি এই গীর্জার প্রাঙগণে আছে। এই প্রাচীন গীর্জা সম্বন্ধে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখের "সমাচার-দর্পণে" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

গির্জা—"মোং চুঁচুড়াতে এক আরমানী গীর্জাঘর আছে, সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গির্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না, তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবি বেগরাম ঐ গীর্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজ গভর্ণর মিঃ জি, ভারনেট কর্তৃক নির্মিত গঙ্গার ধারে একটি ওলন্দাজদিগের গির্জা আছে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিটারমান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি গতাসু হইলে মিঃ ভারনেট ইহা সমাপ্ত করেন। ইহার মধ্যে বহু ওলন্দাজ গভর্ণর ও তাহাদের সহধর্মিণীর তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। চুঁচুড়ার গির্জাটি ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের দান। চ্যাপেল স্থাপিত হইলেও এই স্থানে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কোন ধর্মযাজক ছিল না, কারণ তাহারা ধর্ম লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইত না। সিটারম্যান গির্জার চূড়া ও ঘন্টাঘড়ি (চিম ক্লক) স্থাপন করেন। এই ঘণ্টাঘড়ি হইতে ইহার পাশে গঙ্গার ঘাট "ঘণ্টাঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে গীর্জার চূড়া ও ঘন্টাঘড়ি পড়িয়া যায়। এই প্রাচীন গীর্জা সম্বন্ধে List of Ancient Monuments In Bengal নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

"Chinsurah Church—Dutch now English Church. This Church was erected in A. D. in 1763 by G. Vernet, then attached Governor entirely out of his own means. The steeple had been previously constructed by Mr. Schittermann in 1744 who was Governor at that time. Hung around the inside of the Church are the portraits of some of the Dutch Governors and their wives."

এই চ্যাপেলটিতে কয়েকটি স্মৃতিফলক আছে। গভর্ণর সিটারম্যান সম্বন্ধে লেখাটি এই রকমঃ

GE BOVWD DOOR
J. A. SICHTERMANN
RAAD EXTRAORDINAR
VAN NEDERLANDS
INDIA EN DIRECTEVR
DISER BENGALSI
DIRECTINE ANNO 1742.

যা ছিল ধর্মমন্দির, আজ ইতিহাসের ভাগ্যচক্রে হইয়াছে বিদ্যামন্দির। এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন যে, পূর্ত বিভাগ তাহাদের চূণ বালির পলেস্তারায় অন্যান্য স্মৃতি ফলকগুলি আর পড়া যায় না। এখানে ওলন্দাজ গভর্নরদের অনেক আলেখ্য ছিল; সেগুলি যে কোথায় তাহার সন্ধান মেলে না। তবে এটা লক্ষণীয় যে, সিটারম্যানের যে স্মৃতিফলক আছে, তার তারিখ Anno 1742 সুস্পষ্ট। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক উধৃতিতে এই সালটি "১৭৪৪" বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ভুল।

চুঁচুড়ায় রোমান-ক্যাথোলিকদের আর একটি গীর্জা আছে; ইহা সেবেস্তানা সাউ নামক এক মহিলার অর্থে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের হস্তে আসিলে চুঁচুড়ার গীর্জাগুলি ও দুইটি সমাধিক্ষেত্র কলিকাতার লর্ড বিশপের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং ওলন্দাজগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যে চারিখানি 'ফরমান' পাইয়াছিল তাহাও 'প্রেসিডেন্সী কমিটি অফ রেকর্ডে'র অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ 'ফরমান' খানি ওলন্দাজগণ ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিল। অন্যান্য তিনখানির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ওলন্দাজদের শাসনকালে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে "হুগলী মহসীন কলেজের" ভবন নির্মিত হইয়াছিল; মঁসিয়ে পেরন্ নামক একজন ফরাসী সামান্য সৈনিকরূপে বঙ্গদেশে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন এবং মহারাষ্ট্রীদের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন পূর্বক উক্ত সুবৃহৎ ভবনটি নির্মাণ করেন। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হুগলী কলেজ আলোচনাকালে বিবৃত হইয়াছে। এই বাটী নির্মাণের কিছুদিন পরেই তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন এবং প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক চুঁচুড়ার একজন বিলাসী ধনী জমিদার ইহা ক্রয় করিয়া তাঁহার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। এই বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে বৃহৎ ভবনটি বর্তমানে হুগলী মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্র নিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্বোক্ত হালদার মহাশয়ের পূজার বাড়ী ছিল এবং পঞ্চ খিলানবিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গা-পূজার দালানটি অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তি এ অঞ্চলে তৎকালে কেহ ছিল না। ওলন্দাজগণ তাই তাহার প্রাসাদোপম বাড়ীর সম্মুখে ছয়জন সিপাহী রাখিবার অনুমতি দেন। পেরন সাহেবের বিষয় ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তের হাজার টাকা দিয়া ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর উপর একটি পুল নির্মাণ করাইয়া দেন। এই পুল সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র দে লিখিয়াছেনঃ

In 1828 the well known Zamindar Babu Pran Krishna Haldar made a gift of Rs. 13000 for a masonary bridge over the river Saraswati at Tribeni." (৩)

তৎপর এই ভবন চুঁচুড়ার জগমোহন শীল ক্রয় করেন এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার টাকায় এই ভবনটি হুগলী মহসীন কলেজের জন্য ক্রয় করা হয় এবং উক্ত বৎসরের ১লা আগষ্ট তারিখে মহসীন কলেজের দারোদ্ঘাটন হয়। চুঁচুড়ার উক্ত হালদার বংশে বাবু নীলমণি হালদার এবং বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার জন্মগ্রহণ করেন। নীলরত্ন হালদার কলিকাতা হইতে "বঙ্গদূত" নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করিতেন এবং এই পত্রিকাখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইঃ "বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ

ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্টবোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন। (৪)

বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকে ১ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৯) লিখিত আছে।

চুঁচুড়ায় 'হুগলী মহসীন কলেজ' বঙ্গদেশের একটি গৌরব, বঙ্গের প্রাচীনতম কলেজ-গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। হাজি মহম্মদ মহসীনর 'ফণ্ড' হইতে এই কলেজ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে খোলা হয় এবং ডক্টর টমাস, এ, ওয়াইজ নামক হুগলীর সিভিল সার্জেন এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথম এই কলেজের নাম "কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন" ছিল এবং প্রত্যেক ছাত্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিনা বেতনে এই কলেজে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। স্কুল ও কলেজ একই বাড়ীতে হইত এবং পরস্পর সংস্পর্শযুক্ত ছিল। তখন এন্ট্রান্স বা বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয় নাই বলিয়া ছাত্রেরা জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিত। তৎকালে এই কলেজের ইংরাজী বিভাগ কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুল এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। সিনিয়ার ডিভিসান সেকশ্যান 'এ' এবং জুনিয়ার ডিভিসনে সেকশ্যান 'বি' তন্মধ্যে সিনিয়ার ডিভিসানে তিনটি শ্রেণী ও জুনিয়ার ডিভিসানে চারিটি শ্রেণী ছিল।(৫)

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার প্রথা এই কলেজ হইতে তুলিয়া দেন এবং সিনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের তিন টাকা এবং জুনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের দুই টাকা বেতন ধার্য হয়। অক্ষম ও দরিদ্র ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। কিন্তু শিক্ষকগণকে লইয়া একটি কমিটি উক্ত ছাত্রগণ বেতন দিতে অক্ষম কি না তাহা নির্ধারণ করিতেন। এই সময় হইতে এই কলেজের নাম "হুগলী কলেজ" বলিয়া অভিহিত হয়। হুগলী কলেজের বিবরণ ৩৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ১ম জরিপ-কার্য (Trigonometrical Survey) অলিভার কর্তৃক আরম্ভ হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; উক্ত জরিপকার্যের জন্য এই কলেজের সুপ্রশস্ত ছাদ নির্বাচিত হইয়াছিল।(৬) জেলার অধিবাসিগণ গভর্ণমেন্টের জরিপ করার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারায় বিশেষভাবে বাধা প্রদান করে। জরিপে নিযুক্ত লোকজনকে সেইজন্য খুব কষ্ট পাইতে হয় এবং জরিপ শেষ হইতে অযথা বিলম্ব হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কলেজে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। চুঁচুড়ার অপর তীরস্থ কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে এবং তাঁহার প্রপিতামহ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় মাতুলের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "সঞ্জীবনী-সুধায়" লিখিয়াছেন:

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণী ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব পুরুষ।

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যদুনাথ বসুও প্রথম বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যদুনাথের বিষয় ৩৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

গঙ্গানন্দের ঊর্ধতন অষ্টমপুরুষ সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়-ও 'অবসথ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 'অবসথী' আখ্যা পান।

নাম্না সর্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানে কল্প মহীরুহঃ।
অবসীথি বিখ্যাতো যস্যাবসথ্যং পালনাৎ॥

॥ লীলাবতী নাট্যাভিনয় ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন চুঁচুড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই স্থানে বসিয়া তিনি 'আনন্দমঠ' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক সখের নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন।

এই সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত "বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্তে" লিখিয়াছেনঃ

"লীলাবতী মহলায় গিরিশচন্দ্র নানা কার্যের ঝঞ্ঝাটে প্রথমে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ আসিল দেশমান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া 'লীলাবতী' মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন, অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাবো, আর তুমি বসে তাই দেখবে?" গিরিশ অগত্যা অভিনয়ে যোগদান করিয়া ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বয়ং গ্রন্থকার লীলাবতীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন; অভিনয় দেখিয়া দীনবন্ধু নিজে গিরিশবাবুকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার কবিতা যে এমন করে পড়া যায় তা আমি জানতাম না, আপনি Please take this compliment at least; অভিনেতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এইবার চিঠি লিখবো—দুয়ো বঙ্কিম।"

১৮৭২, ৩০-এ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাড়ীতে "লীলাবতী" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭২, ৫ই এপ্রিল (শুক্রবার) তারিখের "এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহে" এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপঃ

বিগত শনিবারে চুঁচুড়া শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটস্থ মল্লিক-বাটীতে বাবু দীননাথ মিত্র প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাড়ীটী অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মহা কোলাহল হইয়াছিল। অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি শেষ করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও এবং সুচারুরূপে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

রাত্রি সার্দ্ধদশ ঘটিকার সময় পূর্বোক্ত নাটকাভিনয় কার্য আরম্ভ হইল। ঐক্যতান বাদ্যকরেরা আপনাপন যন্ত্রে সুর মিলাইয়া বাজনা আরম্ভ করিল। বাদ্য শুনিয়া দর্শকবৃন্দের অন্তরে বিকটভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল।... দৃশ্যগুলি বড় মন্দ হয় নাই। কস্যাচিৎ দর্শকস্য। শ্রীঃ—হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার। ২২শে চৈত্র, ১২৭৮।

১৮৭২, ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারুপূর্বক হইয়াছিল। আমরা নাটকটির অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটি।

অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেটি উদ্ধৃত না করিলে চুঁচুড়ার অভিনয়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়,...। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে আরও দুই-চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সহিত সাহিত্যের বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য; দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়, বঙ্কিম বাবুতে আমাতে লীলাবতী একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা টুক্‌রা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই অভিনয়-রঙ্গে ৭/৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

"আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখিজল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে—তরুমরে কে করে বিহিত তার?"

বোধকরি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের গুড্‌ফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক-বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁঠালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবুপ্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের

মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শুরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিমবাবু গুড়ফ্রাইডের ছুটী পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে "কীর্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

"কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু বাজে তোরা শোন গো সবাই।"

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউন্ড-শিলিং-পেন্স গণনায় যাপিতজীবন মহারাজকে সকলে কঠোরপ্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাট-পাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধুলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন 'যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম্।' সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়াঃ

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গলতা, কোথা গো উর্বশী কোথা,
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝমঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সে দিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রসপিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয়ে সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌঁছান পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

"আজি কি সুখের উদয়
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।

যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশায়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত করিয়াছিলাম।

॥ কুলীন কুলসর্বস্ব নাট্যাভিনয় ॥

লীলাবতীর অভিনয়ের বহু পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত "কুলীনকুল সর্বস্ব" নামক বঙ্গদেশের প্রথম অভিনীত নাটক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে, চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়ীতে অভিনয় করা হয়। চুঁচুড়ায় এই নাটকের অভিনয়ে তৎকালে কুলীনদিগের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। হরিনাভির সুবিখ্যাত পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় কুলীনগণ বহুবিবাহে রত থাকায় সমাজে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রূপচাঁদ পক্ষী উক্ত নাটকের জন্য কয়েকখানি সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন।

"Rupchand Pakshee a noted musician of that time, composed songs for the occasion and sang them." (Calcutta Review)

'সংবাদ প্রভাকরে' (৯ই জুলাই ১৮৫৮, শুক্রবার) এই অভিনয় সম্বন্ধে প্রকাশঃ

বিগত শনিবার রজনীযোগে চুঁচুড়া নগরস্থ নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের ভবনে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারুরূপে হইয়া গিয়াছে. এই উপলক্ষে প্রায় নয় শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন, যেরূপে অভিনয় প্রদর্শনের কার্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন এবং নটগণের অঙ্গভঙ্গী ও বাক্য-কৌশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ নবানুরাগি নটগণ এই প্রথমবারেই এতদ্ব্যাপায় একপ্রকার উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করাতে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের প্রশংসিত কর্মের ঘোষণা করিতেছেন, এই নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল, ইনি সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সরকারে নাটকাভিনয়ের নিয়মিত কার্য ধার্যকরণ একটি সভা করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কর্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র। সভাপতি—শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ লাহা। রঙ্গভূমির ব্যবস্থাপক—শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র দিচ্ছিত। সহকারী ব্যবস্থাপক—শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত বাবু নিমাইচরণ শীল।

অধিকন্তু কোনো বিশেষ কারণে সহকারী ব্যবস্থাপক অবসর গ্রহণ করাতে সভার অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত বাবু বনমালী সোম তাঁহার সকল কর্তব্যকর্ম নিষ্পাদন করিয়াছেন, পরন্তু শুনিলাম আগামী রবিবার দিবসে আর একবার উক্ত নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবেক। কস্যাচিৎ চুঁচুড়া নিবাসী দর্শকস্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারও চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

...মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হইল।...প্রসিদ্ধ গায়ক

এবং গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও ছিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে-বাজারে গীত হইতে লাগিল।—'অধিনীরে গুণমনি পড়েছে কি মনে হে?' কৌলীন্য ও এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ২৩০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহা ১৫ই জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে প্রকাশিত নিম্নের সংবাদটি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

The acting of the Kulinkulsarvasa Natak at Chinsurah has, it appears given great offence to the Kulins of the locality. The Natak is an illexecuted burlesque. The acting took place in the house of a gentleman of the Baniya caste and Kulin Brahmins indeed, it is said, to retaliate in kind. (Hindu Patriot)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি, ১২৭৭ সালের "৩০-এ আশ্বিন [১৫ই অক্টোবর] শনিবার হুগলীর ঘুটিয়া বাজারের নবনির্মিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে।"

॥ শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ ॥

চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা 'শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বরজীউ' নামক মহাদেব বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা। ষোড়শ শতাব্দীতে দিগম্বর হালদার ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে গঙ্গার ধারে এই স্থানে বহু জঙ্গল ছিল; দিগম্বর হালদারের পুত্র উক্ত বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণের সময় জঙ্গল কাটিতে কাটিতে একটি বাঘ দেখিতে পান এবং তিনি এরূপ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন যে একাই ঐ বাঘটিকে মারিয়া ফেলেন। সেই জন্য বাগু হালদার বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বে ষণ্ডেশ্বর জীউর কাঁচা মন্দির ছিল; সিদ্ধেশ্বর রায় চৌধুরী বর্তমান পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের দুইটি পিতলের ঢাক ওলন্দাজ গভর্নর তৈয়ারী করিয়া দেন। এবং গঙ্গার ধারে 'ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট' নীলাম্বর শীল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের পূজার জন্য যে সমস্ত দেবোত্তর জমি আছে তাহা "হালদারল্যান্ড" বলিয়া অভিহিত। চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটে ষণ্ডেশ্বরজীউর প্রতিষ্ঠাতা হালদারবংশের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। বালীর গঙ্গোপাধ্যায় বংশ ষণ্ডেশ্বর-জীউর বর্তমান সেবায়েত।

'ষণ্ডেশ্বর জীউর' মন্দিরের পার্শ্বে একটি দুর্গা-মন্দির আছে, চুঁচুড়ার বল্লভ সোম ইহা নির্মাণ করেন। বর্তমানে মন্দিরের উপরে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীশ্যামাপদারবিন্দ

ভজ শ্রীরাধাগোবিন্দ সন ১২৫২ সাল বৈশাখ।

চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা 'ষণ্ডেশ্বর শিবঠাকুরের চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসব এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। চৈত্রসংক্রান্তির দুই দিন পূর্বে প্রতি রাত্রে শিব বিবাহ দেখিতে এবং পরদিন অপরাহ্ণে ১৫ ফুট উচ্চ মঞ্চ হইতে ষণ্ডেশ্বর-সন্ন্যাসী-গণের তীক্ষ্ণধার ফলাযুক্ত বঁটির লম্ফ-প্রদান দেখিতে মন্দির প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া যায়। শিবতলায় রাত্রি পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিরাত্রে যাত্রা কথকথা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়দিন রাত্রে ষণ্ডেশ্বর-দেবতাকে অপূর্ব ফুলশয্যায় সজ্জিত করা হয়।

চুঁচুড়ার শেষ ওলন্দাজ গভর্ণর এনথনি ওভারবেক (১৮২৪ খৃঃ) এই দেবতার ভক্ত ছিলেন এবং তিনি চুঁচুড়া বৃটিশ সরকারকে হস্তান্তরের প্রাক্কালে যে পিতলের সুবৃহৎ ঢাক উপহার দিয়াছিলেন (এবং যাহা অদ্যাবধিও গুরুগম্ভীর আওয়াজ দিয়া থাকে) তাহা এই কয়েকদিনব্যাপী উৎসবে প্রধান বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে এই ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির সম্মুখস্ত গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত ছিল। চুঁচুড়া শ্যামবাবু ঘাটস্থ প্রসিদ্ধ হালদার বংশের শিবভক্ত এক সন্তান স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্থানীয় জেলেগণের জালে নিজেকে ধরা দেন। পরে এই শিবদেবতাকে আনিয়া বর্তমান স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং বর্তমান মন্দির গঠন করা হয়।

এই শিব-দেবতা পশ্চিমমুখে অধিষ্ঠিত; ইঁহার সম্মুখে পূর্বমুখে সিদ্ধেশ্বরী (কালী) মাতার নবকলেবর ও মন্দির নূতন করিয়া "সিদ্ধেশ্বরী মাতা মন্দির সংস্কার কমিটি" কর্তৃক গঠিত হইয়াছে। ইহার পর এই স্থানে বৈশাখী মেলা হয়।

॥ এমামবাড়া হাসপাতাল ॥

'এমামবাড়া হাসপাতাল' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সিভিল সার্জন ডাক্তার টমাস ওয়াইজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হাজি মহম্মদ মহসীনের ফণ্ড হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল বর্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে। দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহসীনের ভগ্নী মন্নু বেগম তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি মহসীনকে দিয়া যান। মহসীন উক্ত সম্পত্তি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চরম দানপত্র দ্বারা সৎকার্যে ব্যয় করিবার জন্য দান করিয়া যান। মহসীনের মৃত্যুর পর তাঁহার নিযুক্ত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহসীনের দান নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। বান্দা আলি খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি মন্নু বেগমের পোষ্যপুত্র বলিয়া আদালতে নালিশ করেন এবং এই মামলায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন এবং বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিল হইতে আলি খাঁ হারিয়া যায়। এই সময়ে সম্পত্তির আয় নয় লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া ইহার বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত অর্থ হইতে এই হাসপাতাল, হুগলী মহসীন কলেজ ও হুগলীতে প্রসিদ্ধ 'এমামবাড়া' নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'মহসীন ফণ্ড' হইতে বহু মক্তব এবং মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্যও অর্থ পাইত।

ইমামবাড়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে হুগলীর প্রথম সিভিল সার্জন হন ডাঃ টমাস

ওয়াইজ, দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন ইনিস এবং তৃতীয় ডাঃ ওল্ডহ্যাম। ইহাদের সুচিকিৎসার জন্য হুগলীর সর্বত্র তাহাদের খুব খ্যাতি ছিল।

সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা

ক্লোরোফর্মের দ্বারা অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করা বর্তমান পদ্ধতি। কিন্তু ইহার পূর্বে হুগলীর সিভিল সার্জন ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৩৯-১৮৪৭) ডাঃ জেমস্ এস্‌ডেল রোগীকে সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল হুগলীতে প্রথম পরীক্ষা করিয়া তিনি সাফল্য-মণ্ডিত হন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডাঃ এস্‌ডেল তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী অস্ত্রোপচার করিয়া বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে লাগিলেন এবং আট মাসের মধ্যে তিনি ৭৩টি কঠিন রোগীকে আরোগ্য করেন। "মেডিক্যাল সার্ভিস" নামক পুস্তকে এবং টয়েনবি সাহেবের হুগলীর ইতিহাসে এস্‌ডেলের অস্ত্রচিকিৎসার কথা আছে।

"Esdaile began his first experiments in mesmerism in 1845 and performed the first operation on the 4th . pril of that year. Within eight months he performed 73 operations, including major operations like Amputations, and removal of Tumours on patients rendered unconscious by mesmerism." (Medical College Centenary Volume.)

তাঁহার এই কার্যে হুগলী ইমামবাড়া হাসপাতালের এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন বদনচন্দ্র চৌধুরী বিশেষ সহায়তা করিতেন। ডাঃ চৌধুরী মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম প্রথম ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

"One of the Brahmin students Badan Chandra Chowdhury, who entered the Medical College with the first batch passed out in 1841 and was appointed Sub-Assistant Surgeon to the Imambara Hospital at Hoogli. He resided there for half a century, dying as recently as the 18th August 1907, aged 97, leaving a large fortune."

ডাঃ এস্‌ডেল হুগলীতে তাঁহার নূতন পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিষয় সরকারকে জ্ঞাপন করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা করিতে সরকার অনুরোধ করেন। তিনি কলিকাতা নেটিভ হাসপাতালেও পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করেন এবং সরকার কর্তৃক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মট লেনে "মেসমেরিক্ হাসপাতাল" সেইজন্য খোলা হয়।

তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "Mesmerism in India" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে তিনি যতগুলি অস্ত্রোপচার করিয়াছেন তাহা লিখিত আছে। তাঁহার আবিষ্কৃত পন্থায় অস্ত্রোপচার জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, কারণ স্যার জেমস সিম্পসন (১৮৪৬-৪৭) ইথার ও ক্লোরোফর্ম দিয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

চুঁচুড়ায় একটি প্রাচীন সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মূর্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চুঁচুড়ায় সূর্যমূর্তি' ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সোমবংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছিঃ

"চুঁচুড়ায় সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ (৭) পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করেন তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী বা 'উজীর মমালক' ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এক পরম রূপবতী কন্যা নিত্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী সূর্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পূজানিরত রহিয়াছেন, এমন সময় বলভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিনি পুরন্দরের নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন এবং পুরন্দরও তাঁহাকে জামাতারূপে লাভ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র ক্রমশঃ সূর্যো-পাসক হইয়া পড়িলেন। এই বলভদ্রের বংশ-পরম্পরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্ত্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরাম মন্ত্রান্তরে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহাদিগের গৃহস্থিত সূর্যমূর্ত্তি অপূজিত থাকে। এই শ্যামরাম বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে 'বাবু' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার নাম-প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্য দুইটি ঘাট নির্মাণ করাইয়াছেন। শ্যামরাম বাবুর বাড়ীতে কোন এক বৃহৎ কার্যোপলক্ষে সূর্যমূর্তিটি স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্তৃক নির্মিত ঘাটে স্থান লাভ করে।" শ্যামরাম বাবুর বিবরণ ৬১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ চুঁচুড়ার সোম পরিবার ॥

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখিয়াছেন যে 'চুঁচুড়ার সোমবংশ ও বাগবাজারের মহারাজ রাজবল্লভের বংশ একই। কারণ, ল[illegible] সোম ও কৃষ্ণবল্লভ সোম এই দুই সহোদর যথাক্রমে উক্ত দুই বংশের পূর্বপুরুষ। (৮) সোমবংশের মধ্যে মহারাজা জানকীরাম সোম, মহারাজা দুর্লভরাম (ওরফে রায় দুর্লভ), রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম, শিবচন্দ্র সোম ও নগেন্দ্রনাথ সোম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহা ছাড়া উনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ কার্যদ্বারা সোম বংশের যে সকল কৃতি সন্তান সমাজের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন-হিতকর কার্যকলাপের বিবরণ শ্রীকেদারনাথ সোম লিখিত "সোম বাবুদের বংশাবলী" নামক পুস্তকে সবিস্তারে লিখিত আছে। সোমবাবুদের কুলদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর।

মহারাজা জানকীরাম সোম ॥ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কৃষ্ণবল্লভ উড়িষ্যার সুবেদার নবাব সু[illegible] কানুনগো ছিলেন। কৃষ্ণবল্লভ জানকী-রামকে নবাবী সেরেস্তার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ স্বয়ং শিখাইয়াছিলেন। [illegible], মীর্জা

মহম্মদ আলী নামে একজন তহশীলদারের অধীনে প্রথমে পেস্কার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই মীর্জা মহম্মদ আলী পরে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ নামে পরিচিত হন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন বাঙ্গলার সুবেদার এবং আলীবর্দ্দী বিহারের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত হন। আলীবর্দ্দী জানকীরামকে সুবে-বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর আলীবর্দ্দী বাঙ্গলার নবাব অথবা সুবেদার নিযুক্ত হইলেন। সুবেদার হইবার পর জানকীরামকে আলীবর্দ্দী মুর্শিদাবাদে তাঁহার দেওয়ান অথবা রাজস্ব মন্ত্রীপদে বহাল করিলেন। অতঃপর জানকীরাম সোম বুদ্ধিবলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করিয়া মারাঠাগণকে পরাজিত করিতে পারায়, তাঁহার কৌশল ও বুদ্ধির জন্য জানকীরাম "দেওয়ান-ই-তান" অথবা সেনাবিভাগে প্রধান দেওয়ানী পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে নবাব তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বিহারে নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করেন তিনি নামতঃ । সিরাজউদ্দৌলার অধীনে সুবেদার ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নবাব যখন মরাঠাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যায় গমন করেন তখন সিরাজদ্দৌলা স্ব-সৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হইয়া রাজা জানকীরামকে দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। জানকীরাম দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করাতে সিরাজদ্দৌলা তাঁহার প্রতি আগ্নেয়অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজা জানকীরামও সেইভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন। সিরাজের সেনাপতি মেদী-নেসার যুদ্ধে নিহত হন এবং সিরাজদ্দৌলাও প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত শহরের বাহিরে এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দুইপক্ষকে শান্ত করিলেন রাজা জানকীরাম বিহারে নায়েব সুবেদার থাকাকালীন শাসনকার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিদ্রোহী জমিদারগণকে সমূলে আয়ত্তে আনিয়া অতি নিপুণভাবে সরকারী রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং বিহারের জায়গীরদারসমূহের জমা দিল্লীর রাজ দরবারে সম্রাটদের নিকট প্রেরণ করিতেন। সেজন্য দিল্লীর সম্রাট জানকীরামকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। মহারাজা জানকীরাম ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

মহারাজা দুর্ল্লভরাম সোম ॥ (ইনি রায়দুর্ল্লভ বলিয়া খ্যাত) মহারাজ জানকীরাম সোমের পুত্র। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত-সহ মারাঠাগণ তাঁহার পিতার কৌশলে ধ্বংস হইয়াছিল তখন আলীবর্দ্দী খাঁ, সুবেদার আবদাস-সোভানের অধীনে মহারাজা দুর্ল্লভরামকে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিয়োগ করিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আবদাস-সোভানের মৃত্যুর পর, নবাব দুর্ল্লভরামকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া উড়িষ্যায় সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। অনতিকাল মধ্যে মারাঠাগণ হঠাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। দুর্ল্লভরাম বন্দী হইলেন তাঁহার উদ্ধারের জন্য মারাঠা সর্দারকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হইলে তিন মুক্ত হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলেন এবং তিনি দুর্ল্লভরামকে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর মিষ্টার ড্রেকের নিকট প্রেরণ করিয়া, ফোর্ট উইলিয়মের যে সকল অংশ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নির্দেশ দেন।

মিঃ ড্রেক নবাবের নির্দেশনামা অমান্য করিলে নবাব দুর্ল্লভরামকে তিন হাজার সৈন্য লইয়া ইংরাজদের কাশীমবাজারের কুঠী দখল করিবার হুকুম দেন। ৪ঠা জুন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াট সমগ্র কুঠী দুর্ল্লভরামের হস্তে সমর্পণ করেন। ২০শে জুন ১৭৫৬ নবাব, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন এবং মানিকচাঁদ নামে এক ব্যক্তি যাহার উপর দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাহার অসাবধানতায়, অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়। ২রা জানুয়ারী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরাধিকার করে। নবাব সেই সময় মীরজাফর ও রাজা দুর্ল্লভরাম সেনাপতিদ্বয়-সহ কলিকাতার দিকে পুনর্যাত্রা করেন। কর্ণেল ক্লাইবের জীবন রাজা দুর্ল্লভরামের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল এবং কর্ণেল ক্লাইভ তখন সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফরকে সিংহাসন দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজা দুর্ল্লভরাম "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়া "দেওয়ান-ই-আলা" (প্রধানমন্ত্রী) হইয়াছিলেন। পরে ইংরাজদের এক সনন্দ দেওয়া হইল যে, দক্ষিণ কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য তাহারা একটি জমিদারী ক্রয় করিতে পারে। এই সনন্দ নবাব মীরজাফর প্রধানমন্ত্রী মহারাজা দুর্ল্লভরাম এবং তদীয় পুত্র "হুজুরনবিশ" (চীফ-সেক্রেটারী) রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ, দিল্লীর সম্রাট "সা-আলমের" সহিত সন্ধিসূত্রে দৃঢ়তর হইয়াছিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে দুর্ল্লভরামের জন্য সনন্দ "মহারাজা-মুণীন্দ্র-বাহাদুর" লইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ দুর্ল্লভরামকে বিহারের নীটপুর নামক পরগণা 'জায়গীর' উপহার দিয়াছিলেন, যাহার বাৎসরিক আয় ৮৭,৫০০্ টাকা ছিল। ১২ আগষ্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ মহারাজা দুর্ল্লভরামের পরামর্শে সম্রাট শা-আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তাহার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য মহারাজ দুর্ল্লভরামকে লর্ড ক্লাইভ রংপুর জেলার অন্তর্গত 'পৈরাবন্দ-দিগার' বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকার আয়ের এক জায়গীর দান করিলেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ রাজা দুর্ল্লভরামের জন্য বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা পেন্‌সন্ মঞ্জুর করেন। মহারাজা দুর্ল্লভরাম ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি ইংরাজদের অভূতপূর্ব সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া কোম্পানী এক অঙ্গীকার পত্রে স্বীকার করেন। অঙ্গীকার পত্রখানি এইস্থানে উল্লেখ্যঃ

"আমরা বাইবেল চুম্বনপূর্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে অঙ্গীকার করিতেছি যেঃ যতদিন রাজা দুর্ল্লভরামের (মহারাজা দুর্ল্লভরাম সোম) পরিবারের মধ্যে একজন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশ পরম্পরায় সম্মান ও ভরণপোষণের সম্যক যত্ন লইব।"

(স্বাক্ষর)— জে, গ্রেহ্যাম	(স্বাক্ষর)— ভ্যানসিসটার্ট
সেক্রেটারী	(স্বাক্ষর)— ক্যাম্যাক
১৭৭৫	(স্বাক্ষর)— হেষ্টিংস

চুঁচুড়ার সোম বংশের একজন পূর্ব-পুরুষ রামচরণ সোম চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার এক পুত্রের নাম শ্যামরাম সোম। শ্যামবাবু ১৭১৭

খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্যামরাম সোম ওলন্দাজ কৌন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন ও গঙ্গার উপর ঘাট নির্মাণ করেন। ঘাটের সোপান গঙ্গাগর্ভের অতি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই ভাঁটার সময়ও সোপানের শেষ হইত না। ঐ অট্টালিকার চারিদিকে ৪টি সিংহদ্বার ছিল। ঐ অট্টালিকা নির্মাণ শেষ হইলে শ্যামরাম কৌশল করিয়া নবাবের নহবৎ আনাইয়া নিজ বাটীতে নহবৎ বাজাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে শ্যামরামকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করেন। তিনি কোন প্রকারে বাড়ীতে সংবাদ পাঠান, পরে বাটী হইতে কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকন নবাবকে দেওয়া হয়, নবাব উহা পাইয়া প্রীত হন এবং শ্যামরামকে ছাড়িয়া দেন শুধু তাহাই নহে, শ্যামরামকে তিনি বাবু উপাধি দিয়াছিলেন। "শ্যামবাবুর ঘাট" অদ্যাপিও চুঁচুড়ায় বিদ্যমান আছে। শ্যামরাম বাবু চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরস্থ একটি মনোরম বৈঠকখানা বাড়ী এবং সুন্দর ও সুসজ্জিত বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন ঐ স্থানে বর্তমানে "চুঁচুড়া শিবচন্দ্র সোম ট্রেনিং একাডেমী" নামক স্কুল রহিয়াছে। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখে তাঁহার নিজের নির্মাণ করা ঘাটের (যাহা অদ্যাবধি শ্যামবাবুর ঘাট বলিয়া খ্যাত) ও তদনুসারে সোম পরিবারের বাসের পল্লীর নাম শ্যামবাবুর ঘাট ও রাস্তার নাম "শ্যামবাবুর ঘাট রোড" হইয়াছে। তিনি বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে যে ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভিন্ন তাহার উত্তর দিকে অর্থাৎ ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাটের (এই ষণ্ডেশ্বর তলা ঘাট ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাবু পিতাম্বর শীলের দ্বারা নতুন সংস্কার হইয়াছিল) দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকদিগের স্নানের উপযোগী আরও একটি ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয় ঘাটই বর্তমানে ভগ্ন ও অতীব জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া তিনি ঐ ষণ্ডেশ্বর তলায় শ্রীশ্রীযোগদ্যা ঠাকুরাণী দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাবু পরলোকগমন করেন।

রাজা রাজবল্লভ ॥ মহারাজা দুর্লভরাম সোমের পুত্র। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফর কর্তৃক ইংরাজদিগের সনন্দ দেওয়া হয় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য তাহারা জমিদারী ক্রয় করিতে পারেন। তখন রাজা রাজবল্লভ ঐ সনন্দে তাঁহার পিতা "হুজুরনবিশ" অর্থাৎ প্রধান সম্পাদক হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান ও পরহিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলিকাতায় তাঁহার পিতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে বাস করিতেন। কলিকাতার উত্তরে বাগবাজার নামক স্থানে একটি রাস্তা আছে যাহা অদ্যাবধি তাঁহার নাম স্মরণার্থে "রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদানীন্তন মিঃ কটন লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতার কাশী মিত্র (যাঁহার নামে কাশী মিত্র ঘাট আছে) তিনি রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের বিষয়, মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের জীবন চরিতে লিখিত আছে দেখা যায়।

১১ই অক্টোবর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার সমগ্র পরিবারবর্গ, নবাব মীরকাশীমের কোনও কিছু ক্ষতির জন্য বিষম কোপানলে পতিত হইয়া তিন হাজার ইংরাজ ও অন্যান্য তিন হাজার ব্যক্তির সহিত মীরকাশীমের সেনাপতি রেনহার্ডের

(Reinhardt) দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যে ইংরাজদের হস্তে মীরকাশীম পরাজিত হইয়াছিলেন। আর, কে, মিত্র রচিত 'সেকালের কলিকাতা' নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পাটনা শহরে গোরস্থানে যে সব ইংরাজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণার্থে তাঁহাদের নাম পাথরে খোদিত আছে।

মুকুন্দবল্লভ ॥ ইনি রাজা রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র। তাঁহার কোনও সন্তানাদি না হওয়াতে তাঁহার বিধবা পত্নী গৌরবল্লভ নামীয় এক শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ অস্বীকার করায় রাজবল্লভের যাবতীয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে ব্রিটিশ সরকারে স্বত্ব প্রত্যাবর্তন করে ও তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। রাজা রাজবল্লভের কন্যার বংশ কলিকাতায় বর্তমানে বাস করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারার শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র রাজবল্লভের দৌহিত্র বংশ। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র সোম **করুণাময়ী দেবীর** পাষাণময়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বসতবাটীর সামনে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। করুণাময়ী কাল কোষ্টী পাথরের ও শিবমূর্তি শ্বেতপাথরের দ্বারা নির্মিত। মহেশচন্দ্র তড়া আঁটপুরের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম বসুর কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণরাম হুগলীর দেওয়ান ছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দশম আইন অনুসারে 'হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটী' গঠিত হইলে ঈশানচন্দ্র মিত্র মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কৃষ্ণদাস লাহা চুঁচুড়ার জলের কলের জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার বিখ্যাত 'লাহা-বংশ' চুঁচুড়ার লাহাবংশসম্ভূত। ইহা ছাড়া সেন, শীল, মণ্ডল, দত্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত বংশও এইস্থানে আছে। পৌরসভার বিষয় ৬২০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রাচীন গদ্যপুস্তক 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচয়িতা রামরাম বসু, স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর, ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাস, বিচারপতি আমির আলি, প্রসিদ্ধ গায়ক লালবিহারী পাঠক, মথুরামোহন দত্ত, নিমাইচাঁদ শীল, নন্দলাল দে, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, নিতাইচাঁদ শীল, পদ্মলোচন মণ্ডল, প্রভৃতির আবাসস্থান এই চুঁচুড়ায়। এতদ্ব্যতীত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং বৈদেশিকগণের মধ্যে বাঙ্গলার প্রথম প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশনারী কিরনাণ্ডার (ইনি বাঙ্গালীকে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন) এবং চার্লস ওয়েষ্টন নামক অন্ধকূপহত্যার সহিত জড়িত হলওয়েল সাহেবের বিশেষ বন্ধু এই স্থানে বাস করিতেন। ওয়েষ্টন সাহেব ব্যবসায়ের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, প্রতি মাসে ষোলশত টাকা করিয়া তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৮২৭, ২২শে ফেব্রুয়ারি; মৃত্যু ১৮৯৪, ১৫ই মে। নিবাস—চুঁচুড়া, হুগলী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পরে তিনি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া শেষে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং ইন্সপেক্টর-অব-স্কুল্‌স্‌ রূপে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি লেখকরূপে

খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাভাষায় প্রবন্ধ রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আদর্শ নিবন্ধ-লেখক হিসাবে তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন। বাংলাদেশের নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' (মাসিক) ও 'এডুকেশন গেজেট' (সাপ্তাহিক) তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার বিবরণ ৫০৯ পৃষ্ঠায় আছে। **অক্ষয়কুমার বড়াল ॥** জন্ম ১৮৬০; মৃত্যু ১৯১৯, ১৯শে জুন, কলিকাতা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু আজীবন লেখাপড়ায় অনুরাগ ছিল। পাঠদ্দশায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতা রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "পুনর্মিলন" নামক কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া 'প্রদীপ' (প্রথম সংস্করণ ১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে। **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥** লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩রা অক্টোবর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কঠোর সংগ্রাম করিয়া, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়াইয়াও একটি সাধারণ মানুষ কি করিয়া স্বীয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায় বলে বাঙলা সাহিত্যের লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সাফল্যের শিখরে আরোহণ করিতে পারে, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। মাত্র ১ বৎসর বয়সে পিতৃহীন এবং ১১ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া তিনি এন্ট্রান্স কোর্স অবধি কায়ক্লেশে পাঠ করেন। ইহার পর কিছুকাল বিলাতী কোম্পানীতে কেরাণীগিরি করিয়া তিনি অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ-রিভিউ'তে সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা', 'বাঙলা সাময়িকপত্র' ও 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা বাঙলা-সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় তাঁহার জন্ম হয়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তারপর শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় এবং চুঁচুড়ার রামরাম বসুর উৎসাহে ও আগ্রহে বঙ্গভাষার অন্যতম প্রাচীন গদ্যপুস্তক "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" এবং "লিপিমালা" যথাক্রমে ১৮০১ এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্বন্ধে ৪২৫ পৃষ্ঠায় এবং প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ৪১৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে।

তৎকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন এবং তাঁহারা যাবতীয় চিঠি-পত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবে চলিতেছিল। তারপর

খৃষ্টান মিশনারীগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকল্পে পূর্বোক্ত ধারার পরিবর্তন হয়। রামরাম বসুর রচিত প্রাচীন গদ্য পুস্তক কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১৫৬। নিম্নে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল ঃ

"নহবৎখানার উপরে ঘড়ি-ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।" রামরাম বসুর ২য় পুস্তক "লিপিমালা" ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক কি জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পুস্তকের নিম্নোক্ত কয়েক লাইন হইতেই বুঝা যাইবেঃ

"এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহাদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রথিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া নিবাসী মথুরামোহন দত্ত 'মুগ্ধবোধের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে সন্ধি-প্রকরণ পর্যন্ত আছে এবং ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫। সাহিত্য প্রসঙ্গে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিষয় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। তারকনাথ বিশ্বাসের জীবনী জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সম্পাদিত "বংশ পরিচয়" (২০শ খণ্ড) নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত সাময়িক পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলা বাহুল্য সাময়িকপত্র প্রচার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসারে চুঁচুড়ার দান বড় কম নয়। চুঁচুড়া-হুগলী হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ ৫০৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

চন্দনগরের তন্তুবায়বংশীয় একজন অন্ধ স্বভাব-কবি চুঁচুড়ায় বাস করিতেন, লোকে তাঁহাকে 'কানাচণ্ডী' বলিয়া ডাকিত। ভিক্ষা করিয়া তিনি দিনাতিপাত করিতেন; স্বরচিত গান ব্যতীত অন্য কোন গান তিনি গাহিতেন না। আজও চুঁচুড়ায় লোকমুখে তাঁহার বহু গান প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কালনায় তাঁহার আদি নিবাস ছিল, কিন্তু তিনি ভগিনীর বাড়ী থাকিতেন। তাঁহার স্বরচিত একটি গানের দুই পঙক্তি এইরূপঃ

চক্ষু বিনে ভাই, যত দুঃখ পাই, বলে কি জানাব, আমি তা জানি।
অন্ধের যত কষ্ট, জানেন ধৃতরাষ্ট্র, আর জানেন বিশিষ্ট অন্ধমুনি॥

ভারতের মধ্যে একমাত্র চুঁচুড়ায় প্রাচীনকালে বরফ প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়। এই দুর্লভ পদার্থ কুলীহাণ্ডা মহালের অন্তর্গত নফরডাঙ্গার মাঠে উৎপন্ন হইত। (১০) ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় সাহেবদের এক নাচের মজলিসে বরফ আসিয়াছিল দেখিয়া 'কলিকাতা গেজেটে' যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ ঃ

"The ice it is presumed must have come from the well known ice-field at Hooghly, the only one have existed in the lower provinces."

ইহার অর্ধশতাব্দী পরেও চুঁচুড়ার বরফ কুণ্ডে বহু বরফ উৎপন্ন হইত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল ঃ

"চুঁচুড়ায় বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুয়ারী মাসের প্রথম ২৯ দিবস পর্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মণ বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মণ করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।" (১১)

॥ মহিষমর্দ্দিনী পূজা ॥

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাধান্যের অবসানের পর হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে ক্রমশঃ পূজাপাবর্বনের বহুল প্রচলন সুরু হয়। সেই সময় চুঁচুড়া ধরমপুরে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ভগ্নাবশেষ মন্দিরে তথাকথিত ধর্ম্মরাজের পূজা নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীগণ শক্তিপূজায় আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মাতার পূজার প্রবর্তন করিলে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের উৎসব ক্রমে ম্লান হইয়া আসে।

ধরমপুর দক্ষিণপাড়ায় ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের ভগ্নমন্দিরের প্রায় পার্শ্বে অবস্থিত চণ্ডী-মণ্ডপে এই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামাতার পূজা তদবধি একাদিক্রমে চলিয়া আসিতেছে। দেবীর নামানুসারেই পল্লীটির নাম মহিষমর্দ্দিনীতলা। মণ্ডোপপরি দেবীর স্থায়ী দেউল বিদ্যমান। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠী (জামাইষষ্ঠী) তিথিতে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সপ্তমী হইতে দশমী (দশহরা) পর্যন্ত যথাবিধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। **মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য হইল, প্রতিমার দক্ষিণভাগে দেবাদিদেব মহাদেব এবং বামভাগে [illegible] গণপতির মূর্তি ব্যতীত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকের মূর্তি থাকে না।** মহিষমর্দিনীর আলোকচিত্র ১৫ নম্বর প্লেটে এবং অন্যান্য বিবরণ ২৬৪ পৃষ্ঠায় আছে। পূর্বে প্রচুর মহিষ, ছাগাদি বলির প্রথা ছিল। বহুদিন হইতে মহিষ বলি রহিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ছাগাদির বলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজা চারিদিন বিধিনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও পূর্বে প্রতিমা স্নানযাত্রার দিনাবধি মন্দিরে রক্ষিত হইত। সুতরাং উৎসব ততদিন ধরিয়া চলিত এবং গান যাত্রাভিনয়, পুতুলনাচাদি চলিতে থাকিত। স্নানযাত্রা দিবসে স্থানীয় "ময়রা-পুকুর" নামক পুষ্করিণীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হইত। দেবী-মাহাত্ম্যে পুষ্করিণীটির জল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইলেও নিরঞ্জনকালে প্রয়োজনমত জল আপনি যোগাইত। বর্ত-মানে দশহরা-দিবসে নিরঞ্জন হইয়া থাকে। জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষানুসারে কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গায় নিরঞ্জন করা হইতেছে। অধুনা উৎসবের জাঁকজমক বহুলাংশে হ্রাস পাইলেও যাত্রা, থিয়েটার, সঙ্গীতানুষ্ঠান যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও লালমোহন পাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লটারীতে এক লক্ষ টাকা

প্রাপ্ত হন। ১২২৮ সালের ৩ ফাল্গুন তারিখের সমাচার দর্পণের সংবাদটি উদ্ধারযোগ্যঃ

কলিকাতা ২৬ লাটরী ॥ ৮০ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুঁচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে, এ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।"

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডি, সি, স্মিথ হুগলীর জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি হুগলী জেলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি চাঁদা তুলিয়া চুঁচুড়ায় একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার নামানুসারে স্মিথ সাহেবের ঘাট আজও বিদ্যমান আছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম কালেক্টরী স্থাপিত হয়। মিঃ বেলী প্রথম কালেক্টর হন বলিয়া টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি বিশ বৎসরকাল হুগলীর কালেক্টর ছিলেন। কিন্তু হান্টার সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সান্ডার্স সাহেব কালেক্টার নিযুক্ত হন বলিয়াছেন।

চুঁচুড়ায় কেবল যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাস করেন তাহা নয়, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এই স্থানে বাস করেন এবং চুঁচুড়া হইতেছে বর্ধমান বিভাগের হেড কোয়ার্টার। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একই ব্যক্তি জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্য করিতেন বলিয়া তাঁহারা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া কথিত হইতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য পৃথক করা হয়। মিঃ এইচ, বি, ব্রাউনলো প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং স্মিথ সাহেব জজের কাজ করিতে লাগিলেন।

সরকারী কাগজপত্রে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর, হোমস-এর অধীনে হুগলী জেলা ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হুগলী বলিয়া কোন পৃথক জেলা গঠিত হয় নাই। ওম্যালি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য বোধ হয় মিঃ হোমস্ হুগলী অঞ্চলে মিঃ রেডফিয়ার্ণ সাহেবের অধীনে কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি নিম্নে "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"As mentioned in the history, in 1787 R. Holmes was in charge of Hughli, apparently as a sub-district which in March 1787 was combined with Nadiya under Mr. T. Redfearn. The jurisdiction of these officers was that of Revenue Collector than of Magistrate."

জেলা বোর্ড ॥ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ছত্রিশ আইনানুসারে বর্ধমান জেলাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বর্ধমান ও হুগলী এই দুইটি জেলা গঠিত হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জেলার রাস্তাঘাট নির্মাণ মেরামত স্বাস্থ্যোন্নতি শিক্ষা, পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করিবার জন্য হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত হয়। চুঁচুড়ায় জেলা বোর্ডের কার্যালয় অবস্থিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের কার্য পরিচালনের জন্য সরকার হইতে একজন চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর, মনোনয়ন প্রথা উঠিয়া যায় এবং সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইতেছেন।

বর্তমানে ত্রিশ জন সদস্য লইয়া হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত। তন্মধ্যে কুড়ি জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং দশজন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। জেলাবাসী খাজনার সহিত যে রোডসেস্ দেন, তাহা হইতে এবং সরকার প্রদত্ত অর্থে ও রেলওয়ে, খেয়াঘাট ও খোঁয়াড় প্রভৃতির আয় হইতে জেলা বোর্ডের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। সরকার জেলাবোর্ডগুলি তুলিয়া দিবার বিষয় এখন চিন্তা করিতেছেন। জেলাবোর্ডের সভাপতি-গণের নাম ঃ

মিঃ জি, টয়েনবি—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এইচ, জি, কুক—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
স্যার এফ, ডিউক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ ডি, বি, এ্যালেন—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এফ, সি, ফ্রেণ্ড—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ টি, ইংগলিশ—১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এ, জি, হ্যালিফ্যাক্স—১৯০৩ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত।
মিঃ বি, দে—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত।
মিঃ জে, ল্যাং—১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত।
মিঃ ডবলিউ, প্রেণ্টিস—১৯১২ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত।
মিঃ এফ, ব্রাডলি-ব্যার্ট—১৯১৬ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত।
মিঃ এস, মুখার্জি—১৯১৮ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত।
মিঃ এ, এন, মবার্লি—১৯১৯ হইতে ১৯২০ (মার্চ) পর্যন্ত।
* শ্রীবরদা প্রসাদ দে—১৯২০ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত।
* রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জি—১৯২৪ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত।
* শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯৩১ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত।
* শ্রীঅতুল্য ঘোষ ১৪মে ১৯৪৯ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩।
* শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪ মাচ ১৯৫৩ হইতে ১১ জানুয়ারী ১৯৫৬।
* শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২ জানুয়ারী ১৯৫৬ হইতে চলিতেছে।

॥ হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি ॥

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের দ্বাবিংশতি প্রবিধানানুসারে হুগলী-চুঁচুড়ায় আবর্জনা অপসারণ, রাস্তায় আলো দিবার ব্যবস্থা ও শহরের অন্যান্য উন্নতিকল্পে পৌরশাসনের প্রাথমিক কাজের সূত্রপাত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে পচা পুকুর ও খানাডোবা ভরাট করা, পাকা সাঁকো ও জলনিকাশের জন্য নালা তৈয়ারী করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও চওড়া করা এবং অন্যান্য ছোটখাটো উন্নয়ন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং হুগলীর তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ জি, ডি, স্মিথের নেতৃত্বে এই সকল

* ইহারা বে-সরকারী এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যান

কার্যের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। শহর উন্নয়নের জন্য ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের 'মিনিটে' যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার অংশবিশেষ এইরূপঃ "filling up hollows, stagnant pools and useless ditches, in the construction of *pucca* drains and bridges the opening up and widening of the public roads and in other minor improvcments."

এই সমিতির মাধ্যমে শহর উন্নয়নের কাজ চলিতে লাগিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের দশম বিধানানুযায়ী উদ্বৃত্ত কর হইতে (surplus town duties for the improvement of the town) হুগলীর কাছারী বাড়ির নিকট রাস্তা চওড়া করিয়া তৈয়ারী হইল; ইহা ছাড়া রাস্তার ধারে পথচারীগণের জন্য গাছ লাগান, কতকগুলি নূতন পুকুর কাটান, অনেক রাস্তা ইট দিয়া বাঁধান, ময়লা বহনের জন্য গাড়ী কেনা এবং ময়লা সাফ করিবার জন্য কয়েকজন ঝাড়ুদারও নিযুক্ত হয়। প্রথম বৎসর দু'হাজার টাকা খরচ হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থকৃচ্ছতার দরুণ সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শহর উন্নয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার কাজ শেষ হইলেও, ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সমস্ত উন্নয়ন কার্যের ভার দেওয়া হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ জুন হুগলীতে স্থানীয় ব্যক্তিগণের এক সভায় হুগলী-চুঁচুড়া ও চন্দননগরে পৌরকার্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং স্থির হয় যে উক্ত কমিটি কর আদায়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবে। এই সভায় হুগলীর কালেক্টার স্যামুয়েল সাহেব সভাপতিত্ব করেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সভার বিষয় জানান হইলে, দূষণাদি হইতে রক্ষা ও চৌকিদারী বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তৎকালীন আইনে বিধিবন্ধ না থাকায়, তিনি কিছু করিতে না পারিলেও, সরকারকে এই বিষয়ে জানান; ফলে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশম আইন প্রবর্তিত হয়। ইহাই বাঙ্গলাদেশের নাগরিকগণের পৌরস্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রথম আইন। এই সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেনঃ

The Committee requested the Magistrate to make over to them the full control of the conservancy and *chankidari* establishments, but this the Magistrate could not legally do. At length, after a year's correspondence, the committee asked the Magistrate to move the Government to define its duties, powers and responsibilities; and the outcome of this request was the passing of Act X of 1842, the first purely Municipal law in Bengal.

পৌরকার্যের সুব্যবস্থার জন্য প্রথম যে কমিটি গঠিত হয় (৫ই জুন ১৮৪০) তাহাতে বলরাম মল্লিক সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য ছিলেনঃ

হুগলী ঃ সৈয়দ কেরামত আলী, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর, হলধর ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়। **চুঁচুড়া** ঃ মিঃ জি, হারক্লট্‌স, জীবনকৃষ্ণ পাল, মৌলভী আকবর শাহ, চণ্ডীচরণ ঘোষ। **চন্দননগর** ঃ তারিণীচরণ চক্রবর্তী, রসিকলাল ঘোষ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পৌর আইন পাশ হইবার পর হুগলী যাহা ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র শহর-

হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা এলাকা

রূপে পরিগণিত হইত উহা চুঁচুড়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চন্দননগরের যে অংশ ইংরাজদের অধিকৃত ছিল তাহাও হ্‌গলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার মধ্যে যায়। পৌরস্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনরায় একটি কমিটি গঠিত হইলেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে হ্‌গলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, ডি, ককরেলের সভাপতিত্বে দশজন মনোনীত সদস্য লইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে হ্‌গলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে গভর্নমেন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মনোনীত করিতেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভাপতি হইতেন এবং পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সাত জন অধিবাসী লইয়া কমিটি গঠিত হইত। হ্‌গলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ওমালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ

Hooghly-Chinsurah was constituted a regular Municipality in 1865, and is now governed by the Bengal Municipal Act.

সরকার নিযুক্ত প্রথম পৌর সমিতির যাঁহারা সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের নামঃ

সভাপতি ঃ আর, ডি, ককরেল, **সহকারী সভাপতি** ঃ জি,এস, পার্ক, **সদস্য** ঃ টি, এম, কার্কউড, আর থোটস, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ লাহা, লালবিহারী দত্ত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়চরণ নন্দী, রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ কেরামত আলী।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আইনে যখন বাঙলাদেশের সমস্ত পৌরসভার শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তখন হ্‌গলী-চুঁচুড়া পৌরসভার স্থান প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়। পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আইনে পৌরসভার অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হয়। হ্‌গলী-চুঁচুড়ার এলাকা ছয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সভাপতির পরিবর্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বেসরকারী নির্বাচিত সভাপতির দ্বারা কার্য পরিচালিত হয়। প্রথমে ছয়টি ওয়ার্ড হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত সভ্য এই বারজন এবং সরকার মনোনীত চারিজন এই ষোলোজন এবং পদাধিকারবলে মনোনীত (এক্স-অফিসিও) দুইজন মোট আঠারোজন কমিশনার দ্বারা পৌরসভার কার্য নির্বাহ হইত।

Municipal Board consists of 18 Commissioners, of whom 12 are elected, 4 are nominated and 2 are *ex-officio* members.

নিম্নলিখিত স্থান লইয়া ছয়টি ওয়ার্ড বিভক্তঃ এক নম্বর ওয়ার্ড **সাহাগঞ্জ, কেওটা** ও **ব্যান্ডেল,** দুই নম্বর ওয়ার্ড **বালী** ও **হ্‌গলী,** তিন নম্বর ওয়ার্ড **বাবুগঞ্জ, ঘুটিয়াবাজার** ও **পিপুলপাতি,** চার নম্বর ওয়ার্ড **বড়বাজার** ও **চুঁচুড়া,** পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড **চৌমাথা, কামার-পাড়া** ও **চুঁচুড়া** এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ড **চন্দননগর।** উত্তর দিকের তিনটি ওয়ার্ড হ্‌গলীর মধ্যে এবং দক্ষিণের তিনটি ওয়ার্ড চুঁচুড়ার মধ্যে অবস্থিত।

রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র হ্‌গলী-চুঁচুড়া পৌরসভার প্রথম বেসরকারী সভাপতি হন। মধ্যে দু-একবার সরকারী তত্ত্বাবধানে এই পৌরসভা যাইলেও, জনগণের দ্বারা ইহা যে সুপরিচালিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পৌরসভার এলাকার তুলনায় কমিশনারদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া, ভোটারদের সংখ্যার ভিত্তিতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ত্রিশ জন স্থির হয় এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকারী মনোনয়ন প্রথা বন্ধ

করা হয়। এই পৌরসভার জনসংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। নিম্নে ইহার সরকারী ও বেসরকারী সভাপতিগণের নাম ও কার্যকালের বৎসর প্রদত্ত হইল:

সরকারী : মিঃ আর, ডি, ককরেল (১৮৬৫-১৮৭০), মিঃ পি, এইচ, পেল্যু (১৮৭০-১৮৭৫), মিঃ এ, উইকস্ (১৮৭৫), মিঃ ডবলিউ, জে হারশেল (১৮৭৬), মিঃ আর, কর্নিশ (১৮৭৭-১৮৭৯), মিঃ জন, বিমস্ (১৮৮০), মিঃ আর, কর্নিশ (১৮৮০-১৮৮১), মিঃ এফ, উয়্যার (১৮৮২-১৮৮৪), মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে (১৮৮৫-১৮৮৭)।

বেসরকারী : রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র (১৮৮৭), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৮৮৭-১৮৮৯), বলরাম মল্লিক (১৯০০-১৯০১), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও প্রসাদদাস মল্লিক (১৯০১-১৯০৩), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯০৬), বিপিনবিহারী মিত্র, (১৯০৬-১৯১০), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৯১১-১৯১৭), মিঃ এ, এল, মোবার্লি (সরকারী পরিচালক, ১৯১৮-১৯১৮), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৯২০-১৯২৬), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-১৯২৯), প্রসাদদাস মল্লিক (১৯২৯-১৯৩২), রাজেন্দ্রলাল সাধু (১৯৩২-১৯৩৮), খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় '১৯৩৮), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮-১৯৪০), দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯৪১), প্রসাদদাস মল্লিক (সরকারী পরিচালক ১৯৪১-১৯৪৫), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৫-১৯৪৭), নরেন্দ্রনাথ সেন (১৯৪৭-১৯৪৮), অবনীনাথ নন্দী (১৯৪৮-১৯৪৯), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সরকারী পরিচালক, ১৯৪৯-১৯৫২), অবনীনাথ নন্দী (১৯৫২-১৯৫৭), প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৭-১৯৬০) ইহার পর শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ এডমিনিস্ট্রেটর রূপে ইহা পরিচালনা করেন।

॥ পৌর-সমাচার ॥

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির মুখপত্ররূপে **"পৌর-সমাচার"** নামে একখানি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্র চুঁচুড়া শান্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। ইহা সম্পাদনা করিতেন মেজর কমলকৃষ্ণ শীল, শ্রীবিশ্বনাথ বসু ও শ্রীশম্ভু ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র "হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট" ছাড়া আর কোন মিউনিসিপ্যালিটির কোন মুখপত্র ছিল না। পৌর-সমাচার সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পত্র। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুরাভাষে হুগলী-চুঁচুড়া পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅবনীনাথ নন্দী লিখিয়াছিলেন :

পৌর-সমাচার পত্রিকার মধ্য দিয়া পৌর সভার সদস্যদের কার্যধারার গতি ও প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, মনুষ্য ও যান চলাচলের সুবিধা বিষয়ক ব্যবস্থা ও তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, কর-নীতি ইত্যাদি করদাতাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের গোচরে আনিবার ব্যবস্থা হইবে।

পত্রিকাখানি সৎসাহসের সহিত হুগলী-চুঁচুড়ার করদাতৃগণের নাগরিকবোধ বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও, অর্থাভাবে এই সুসম্পাদিত সুপাঠ্য কাগজখানি ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ পত্রিকা পৌরসভাকে পুনরায় আমরা বাহির করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে সব রাস্তা আছে, তাহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় আশি মাইল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ মাইল পাকা ও ত্রিশ মাইল কাঁচা। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য পৌরসভার নিজস্ব এগারটি বিদ্যালয় আছে। পৌর এলাকায় পানীয়জলের কলের জন্য কৃষ্ণদাস লাহা এক লক্ষ টাকা দান করেন। বর্তমানে এই পৌরসভার বাৎসরিক আয় প্রায় সাত লক্ষ টাকা। শহরে কোন বড় কল-কারখানা স্থাপিত হয় নাই বলিয়া পৌরসভার আয়ও বিশেষ বাড়ে নাই।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয়ন্তী উৎসব স্মরণার্থে হুগলী-চুঁচুড়ার অধিবাসীগণের এক সভায় পৌরসভা ভবনে 'টাউন হল' নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ জুলাই বঙ্গের ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট 'ভিক্টোরিয়া হল'এর উদ্বোধন করেন। পৌরসভা ভবনে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

1891.

VICTORIA HALL

This Town Hall was erected in pursuance of a resolution at a public meeting of the inhabitants of Hooghly and Chinsurah held on the 31st March 1887 to commemorate the Jubilee of Her Most Gracious The Queen Empress of India.

The Hall was declared open by His Honour The Lieutenant Governor of Bengal by Sir Charles Elliott, K. C. S. I. on the 10th July.

হুগলী-চুঁচুড়ায় পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আমলে নির্মিত জলনিষ্কাশনের জন্য গভীর পয়ঃপ্রণালী আছে। এইগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় সুসংস্কৃত করিলে অর্থাৎ ঢাল ঠিক করিয়া দিলে এবং সমস্ত নর্দমাগুলি পাকা করিলে পৌর এলাকায় জল নিষ্কাশনের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হাওড়া শ্রীরামপুর ও বৃহৎ কলিকাতার অন্যান্য শহর অপেক্ষা এই স্থানের রাস্তাঘাট ও নর্দমা অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং আবর্জনা রাস্তায় দিনের পর দিন পড়িয়া থাকে না। এই সম্বন্ধে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রে হুগলী-চুঁচুড়া সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধারযোগ্য ঃ

To one, who has seen Howrah, Serampore and some other towns in greater Calcutta areas, Chinsurah in general appearance presents a vast improvement, Its streets are fairly clean and it was the first place, where I saw the drains are freshly swept. What was more important, the sweepings were not left on the road to be washed back into the drains.

॥ ডাচ আমলের পুরাতন শহর হুগলী-চুঁচুড়া ॥

পৌর এলাকার মধ্যে যে সকল পুরাতন ভূগর্ভস্থ নর্দমা আছে সেইগুলি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে শহরের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০ মাঘ ১৩৬৮ সালে যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার অধিবাসীরা অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছেন, তাঁদের আতঙ্কের কারণ, কখন বাড়ীর কিছুটা অংশ ধসিয়া পড়ে, কেহই জানে না।

এই শহরের পত্তন করে ডাচ বণিকেরা চারশ' বছর আগে। এই সময়ে নির্মিত ভূগর্ভস্থ নর্দমাগুলো একের পর এক শহরের বিভিন্ন স্থানে ধসতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই আট জায়গায় ধস নেমেছে, তার মধ্যে চারটি বড় রকমের। সৌভাগ্যের কথা, সব গর্তই কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে বাড়ীর বাগানে এবং রাস্তার মাঝে ও পাশে। তাই এ পর্যন্ত কেহ হতাহত হননি, যদিও দত্ত লজের মালিক বলেন যে, অল্পের জন্য তিনি ও তাঁর ছোট মেয়ে বেঁচে গেছেন। যেদিন সন্ধ্যাবেলা দত্ত লজে ধস নেমে এক বিরাট গহবর সৃষ্টি হয়, সে সময় তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। এরূপ ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে মোঘলটুলিতে ছোট ইমামবাড়ার ঘরের মেঝের নীচে, ডান মেমোরিয়ালের সামনে, হুগলী মহসীন কলেজের সামনে, কাছারীঘাটের কাছে, আর বড় রাস্তায়, চারটি বাস রুটের স্ট্যান্ড ক্লক টাওয়ারের একেবারে কাছে।

সবচেয়ে মজার কথা এই, ভূগর্ভস্থ নর্দমাগুলো সকলেই জানে শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না, কোথা দিয়ে কিভাবে এগুলি বহে গেছে। চারশ' বছরের পুরানো এই নর্দমার কোন নক্সা সরকারের কাছে নেই, পৌরসভার কাছে নেই অথবা অন্য কোন স্থানেও নেই। থাকা সম্ভবও নয়। নর্দমার গতি দেখে মনে হয়, অনেকের বাড়ীর তলা দিয়েই শাখা-প্রশাখায় বিরাট নর্দমা বহে গেছে। উপর থেকে কেউ কোনদিন প্রবাহিত জলরাশির নীচেকার গর্জন ধ্বনি শুনতে পেয়েছে বলে জানা যায়নি।

পৌরসভার বর্তমান পরিচালকের মতে, একে একে সকল নর্দমাই ধসে পড়বে এবং গহবরের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে। জোড়াতালি দিয়ে এই নর্দমাকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না, যদিও পৌরসভা বর্তমানে তাই করছেন অর্থের অভাবে। যেখানেই গর্ত দেখা দিচ্ছে, পৌরসভার পক্ষ থেকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে এবং তার পরই চলছে প্রয়োজনমত মেরামতির কাজ।

সারা শহরের ভূগর্ভস্থ নর্দমার একটা পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে প্রাথমিক হিসাবে খরচ পড়বে নাকি একুশ হাজার টাকার মত আর নতুন করে তৈরী করতে হলে কত খরচ পড়বে তার হিসাব এখনও করা হয়নি।

এদিকে পৌরসভার পরিচালকের কথা শোনার পর থেকে শহরের বাসিন্দারা অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, শীগগিরই আরও অনেক গর্ত দেখা দেবে।

পৌর এলাকায় এখন রাস্তার দুধারে অনেক নূতন দোকানঘর এবং বহু নূতন বসতি স্থাপিত হইয়াছে। বাবুগঞ্জ, বালী, তামলীপাড়া, রায়বাজার, বড়বাজার, চৌমাথা প্রভৃতি

স্থানে এখন আর খালি জমি পাওয়া যায় না। এই শহরের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক জমকালো হইয়াছে।

॥ দ্রষ্টব্য স্থান ॥

হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

১। বঙ্গের প্রাচীনতম ও প্রথম গির্জা **ব্যাণ্ডেল চার্চ**। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গির্জা নির্মিত হয়।

২। চুঁচুড়া ব্যারাকের উত্তর দিকে অবস্থিত **আর্মেনিয়ান চার্চ**। ইহা ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্গাস কর্তৃক স্থাপিত হয়।

৩। রোমান ক্যাথলিক **চ্যাপেল**—ইহা মিঃ সিবাস্টিয়ান-এর অর্থ সাহায্যে ১৭৪০ খৃটাব্দে নির্মিত হয়।

৫। **প্রোটেস্টান্ট চার্চ** ওলন্দাজ গভর্ণর ভার্নেটের ব্যয়ে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহার পূর্বদিকের দ্বারে পোর্তুগীজ ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছেঃ

"Ad Majorem Dei Gloriam edificare Jussit G. Vernet A. D. 1767."

৫। ইউরোপীয় **গোরস্থান** সম্ভবতঃ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। এই স্থানে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমাধিস্তম্ভ আছে। সমাধিস্থানের উত্তরে একটি বহু পুরাতন বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাড়িতে এখনও ভূতের উপদ্রব হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

৬। **চুঁচুড়া ব্যারাক** বঙ্গদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা। ইহার নির্মাণকার্য ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহা চারটি ব্যারাকে বিভক্ত। বড় ব্যারাকটি ছয়শত হাত লম্বা, ইহার মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন আদালতসমূহ ও জেলাবোর্ডের অফিস স্থাপিত। চতুর্থ ব্যারাক সার্কিট হাউস, সিভিল সার্জন ও পুলিস সুপারিন্টেডেন্টের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যারাকের বিবরণ ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭। পুরাতন **সার্কিট হাউস** ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডেলে স্থাপিত হয়। এই ভবনে পূর্বে ডাকাতি-কমিশনার অবস্থান করিতেন। ইহা 'হগসাহেবের কুঠী' বলিয়া খ্যাত। স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এই ভবন পরিত্যক্ত হয়।

৮। **কমিশনারের আবাস ভবনে** পূর্বে ওলন্দাজ গভর্নর বাস করিতেন। সিটারম্যান ইহা নির্মাণ করিয়া ইহার নাম দেন "Welgeleegen" প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্টাভোরিনাস এই ভবনের একটি সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে এই ভবনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এই ভবনে বাস করেন।

৯। **হুগলী ইমামবাড়ী** ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। ইহার সম্বন্ধে পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১০। **জুবিলী ব্রিজ** ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী বর্ষে খোলা হয়। বড়লাট লর্ড ডাফরিন ইহার উদ্বোধন করেন। প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লেসলী সেতুটি নির্মাণ করেন। সমস্ত সেতুটি লৌহ নির্মিত ও লম্বা বারশত ফুট। সেতুটি তিন ভাগে বিভক্ত, মধ্যভাগের লম্বা ৩ শত ৬০ ফুট নদীগর্ভ হইতে গ্রথিত দুইটি বৃহৎ

স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অপর দুই অংশ প্রত্যেকটি ৪ শত ২০ ফুট লম্বা গঙ্গার দুই দিক হইতে টানিয়া মধ্যের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানী নৈহাটী হইতে হুগলীর যোগাযোগকল্পে ইহা নির্মাণ করেন। গঙ্গার উপর ইহাই প্রথম সেতু। হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস, চট্টোপাধ্যায় এই সেতু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

It is of cantilever type with the central span projected on both ends resting on the central piers. One end of the shore spans rests on the cantilever arm of the central span and the other end rests on the abutments. (Indian Construction News, June 1960).

হুগলী শহীদ স্তম্ভ

হুগলী শহরে রায়বাহাদুর সতীশ মুখার্জি রোডের উপর একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত স্তম্ভে হুগলী জেলার দশজন শহীদের নাম আছে। এই নামের তালিকায় দু-তিন জন ছাড়া অনেকের নামই সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত নয় বলিয়া, উক্ত শহীদদের সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করিলাম। শহীদ স্তম্ভে যে নামগুলি আছে, তন্মধ্যে গোপীনাথ সাহা ব্যতীত আর কেহ আক্ষরিকভাবে ঠিক শহীদের মৃত্যু বরণ না করিলেও, তাঁহারা দেশপ্রেমিকরূপে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাও আজ শহীদ পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। বিদেশী শাসকের নির্যাতন, অবহেলা ও বন্দী অবস্থায় অত্যাচারের ফলে ইহারা সকলেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শহীদগণের তথ্যানুসন্ধানে শ্রীলালমোহন ঘোষ আমায় সহায়তা করিয়াছেন। শহীদ স্তম্ভে সাদা পাথরের উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

বন্দেমাতরম্‌

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নগরের যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন:

গৌরহরি সোম — সাগরলাল হাজরা
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় — সেখ শরুর আহম্মদ
রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় — গোপীনাথ সাহা
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় — নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ — শশীশেখর রায়চৌধুরী

মোদের দেশের আদর্শ এঁরা, এঁদের করি নমস্কার। জয়হিন্দ, ১৩৫৪।

॥ শহীদ পরিচয় ॥

গৌরহরি সোম ॥ হুগলী জেলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; হুগলীর প্রসিদ্ধ সোম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুগলীতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী থাকা কালে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কাঁথিতে লবন আইন ভঙ্গ করায় কারাবরণ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার দুইবার কমিশনার নির্বাচিত হন। হুগলী জেলার সর্বত্র কংগ্রেসের বাণী ইনি প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার

তিনি সভ্য নির্বাচিত হন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার পরলোকগমনে যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন, তাহা সকলের পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ॥ চুঁচুড়া রায়েরবেড়ের বিখ্যাত রায়চৌধুরী বংশের দৌহিত্র। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ, তিনি ডেনহাম সাহেব ভ্রমে ফাউল সাহেবের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ধৃত হন এবং অল্প বয়স বলিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হন। সেই স্থানে জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি সত্তর দিন অনশনে থাকেন। ইহাই ভারতের মধ্যে বোধহয় প্রথম অনশন। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর তিনি যে কতবার কারাবরণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ইনি হুগলী শহরের অধিবাসী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারার্থে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোকগমন করেন।

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ইনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এম-এ ও ল' পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। ওটেন সাহেবের প্রেসিডেন্সী কলেজের হাঙ্গামার সহিত তিনিও জড়িত ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ইনি সুবক্তা ছিলেন এবং হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ॥ ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। হুগলীর নানা স্থানে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করেন। আরামবাগ মহকুমার কেশবপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণের সময় তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কেশবপুরে পরলোকগমন করেন।

সাগরলাল হাজরা ॥ ইনি হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আরামবাগ মহকুমার বড়ডোঙ্গল গ্রামে তিনি খদ্দরের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ স্থানে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার অপরাধে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। জেলে থাকাকালীন তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং জেল হইতে বহির্গত হইয়া তিনি অকালমৃত্যু বরণ করেন। তথায় "আনার কুটীর" তাহার পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে।

সেখ শুকুর আহম্মদ ॥ ইনি হুগলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন; কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবকরূপে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকালে পরলোকগমন করেন।

গোপীনাথ সাহা ॥ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া হুগলী শহরে আসেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী তিনি তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার স্যার টেগার্টের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় পার্ক স্ট্রীটে রিভলভার দিয়া হত্যা করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে মিঃ ডে নামক এক সাহেবকে হত্যা করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। বিচারালয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

চৌরঙ্গীতে হুলুস্থুল : বাঙ্গালী যুবকের গুলীতে ইউরোপীয় আহত

গতকল্য সকালবেলা পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে একজন বাঙ্গালী যুবক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও তিনজন মোটর চালককে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। যুবকটির নাম এখনও জানা যায় নাই। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াই পুলিশ তাহার পকেট খানাতল্লাস করিয়া একটি পিস্তল ও কিছু অব্যবহৃত টোটা বাহির করে। প্রকাশ যে, গতকল্য ৫॥ টার সময় হাসপাতালে মিঃ ডের মৃত্যু হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া সিরাজগঞ্জে জাতীয় সম্মেলনে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া গোপীনাথ বলেন "আমার রক্তের প্রতি বিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।"

নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ইনি চুঁচুড়া শহরের অধিবাসী ও কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বলাগড় থানায় কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার সময় তাহার এক সহকর্মী পুলিশে ধরাইয়া দেয়। তখন তাহার কাছে একটি রিভলবার ছিল। তিনি দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কারাবাসকালে তাহার মৃত্যু হয়।

শশীশেখর রায়চৌধুরী ॥ ইনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি যখন দেশবন্ধু মেমোরিয়াল স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় বিনা বিচারে তাহাকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। আটক অবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ শোভা সিংহ ॥

শোভা সিংহ বর্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতোবরদার তালুকদার ছিলেন। শোভা সিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথ সিংহ প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন; রঘুনাথের পুত্র কানাই সিংহ চেতুয়া মহল ক্রয় করেন পরে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় চেতুয়া মহল বরদার জমিদার ফতে সিংহের হস্তে গিয়া পড়ে। শোভা সিংহের পিতা দুর্জয় সিংহ ওরফে দুর্লভ সিংহ ফতে সিংহের পুত্র বীর সিংহের নিকট হইতে চেতুয়া ক্রয় করেন, এবং শোভা সিংহ পৈতৃক সম্পত্তি চেতুয়ার সহিত বরদা সংযুক্ত করিয়া দেন। এই উভয় মহলের সংযোগে

শোভা সিংহ প্রভৃত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। চারিপুরুষ মাত্র বাঙলায় বাস করিয়া ক্ষুদ্র তালুকদার বাঙলার অধিপতি হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতে থাকেন।

বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায় কোন সময়ে শোভা সিংহের তালুক লুণ্ঠন করিয়াছিলেন—সেই আক্রোশে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করেন; কথিত আছে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ ও চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন; বর্তমান আরামবাগ মহকুমার মধ্য দিয়া এক অজানা বনপথ অবলম্বন করিয়া দামোদর পার হইয়া শোভা সিংহ একদিন হঠাৎ বর্ধমান রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে সসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বীয় পুত্র জগৎরামকে স্ত্রী-বেশে "স্ত্রীনামারোহণযোগ্যাযানেন" নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায়ের সন্নিধানে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করিলেন, এবং আপনার সামান্য সৈন্যসম্ভার লইয়া অসীম সাহসে শোভা সিংহের সম্মুখীন হইলেন। কথিত আছে যুদ্ধাভিযানের পূর্বে কৃষ্ণরাম স্বীয় অন্তঃপুরচারিনি-গণকে বৈরীকৃত লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার মানসে প্রাচীন রাজপুত প্রথানুযায়ী জহরব্রতের অনুকরণে স্বহস্তে হত্যা করেন; এ ব্যাপার সত্য হইলে জহরব্রতেরও উপর এক পর্যায় বলিতে হইবে!

অল্প সৈন্য লইয়া শোভা সিংহের বিপুল সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধে কৃষ্ণরাম পরাজিত হইলেন এবং শোভা সিংহ কর্তৃক নিহত হইলেন। শোভা সিংহ রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিলেন এবং কৃষ্ণরামের পরিবারবর্গকে বন্দী করিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ধমান পরগণা তাঁহার হস্তগত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভৃত বলবৃদ্ধি হইল, দলে দলে লোক তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল।

জগৎ রায় কৃষ্ণনগর হইতে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট বর্ধমানের বিপত্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম স্বয়ং শান্তিপ্রিয় শৌর্য্যবিহীন যুদ্ধানভিজ্ঞ এবং বর্তমান বিদ্রোহের প্রকৃতি ও পরিণাম কল্পনা করিতেও অক্ষম—তিনি যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লার উপর হুকুম দিলেন, শোভা সিংহকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক।

বর্ধমান জয়ের পর শোভা সিংহের দলবৃদ্ধি হইয়াছিল, শোভা সিংহ উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এই সময়ে রহিম খাঁও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেহ বলেন বর্ধমান যুদ্ধের সময় রহিম খাঁ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শোভা সিংহের অভিযান বর্ধমানের জমিদারের প্রতি প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়াই আরম্ভ হয়; তার পর বর্ধমান জয়ের পর আশা আর বাঁধ মানে নাই, সমগ্র বাঙলা করগত করিতে ধাবিত হইয়াছিল; সেই সময় রহিম খাঁর সহায়তার আবশ্যক হয়।

যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য—ইব্রাহিম শান্ত কাব্যামোদী, নুরউল্লা নামে মাত্র ফৌজদার, ফৌজের বড় একটা সংবাদই রাখেন না, ব্যবসায় বাণিজ্য লইয়া অর্থসঞ্চয় লইয়া তাঁহার দিন কাটিত। তিনি তিনহাজারী মনসব্দার, তিন হাজারের কতক সৈন্য কোনমতে সংগ্রহ

করিয়া যশোহর হইতে হ্গলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগীরথী পার হইয়া বিদ্রোহী সেনার ভঙ্গী দেখিয়াই তিনি হ্গলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ-গণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাঙ্গলায় পরদেশীর সাহায্যে গৃহবিবাদ নিষ্পত্তি চেষ্টার এইখানে সূত্রপাত এবং পলাশিতে তাহার উদ্‌যাপন। বিদ্রোহী সৈন্য হ্গলী দুর্গ অবরোধ করিল; নুরউল্লা প্রমাদ গণিলেন, আপনার প্রাণরক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন এবং গোপনে "একমাত্র ল্যাঙ্গট পরিধান করিয়া কেবল নাক কান লইয়া পলায়ন করিলেন"। সেনানায়ক পলায়িত দেখিয়া সৈন্যগণ দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল এবং বিদ্রোহী কটক হ্গলী বন্দরের মালিক হইল (১লা আগস্ট, ১৬৯৬) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া চারিদিক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নিকটবর্তী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ধনপ্রাণ লইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের সুরক্ষিত অধিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদিন মাত্র হ্গলী সহর বিদ্রোহীর কবলে ছিল, পরদিন ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ দুইখানি রণতরীর সাহায্যে নদীবক্ষ হইতে হ্গলী দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করেন, তাহাতে বিদ্রোহী সৈন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রাম অভিমুখে চলিয়া যায়। সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া শোভা সিংহ চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণপূর্বক লোক সকলকে করায়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন; যে বশ্যতা স্বীকার না করিল বা বিদ্রোহে যোগ না দিল তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইল। শোভা সিংহ তৎপরে রহিম খাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া নদীয়া ও মুকসুদাবাদ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বর্ধমানে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতি সত্বর হ্গলী হইতে মুকসুদাবাদ পর্যন্ত নদীতীরবর্তী চৌকী অর্থাৎ পণ্যশুল্ক আদায়ের স্থান সকল বিদ্রোহী সেনাপতির কবলিত হইল। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে রহিম খাঁ নাক কান লইয়া পলায়ন করেন বলিয়া তিনি "নাক কাটা রহিম" বলিয়া খ্যাত হন।

লুণ্ঠন নিরত বিদ্রোহী সৈন্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরভূমিকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। ইউরোপীয়গণের কুঠিগুলি—বিশেষতঃ চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ ও চন্দননগরে ফরাসীগণ এক প্রকার অবরোধের মধ্যে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট হইতে প্রায় সকল ইতিহাস লেখক বলেন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ কুঠিয়ালগণ সম্মিলিত হইয়া এই বিপত্তির হস্ত হইতে উদ্ধারলাভের আশায় নবাব সরকারে নালিশ করেন, তাহার উত্তরে তাঁহারা সাধারণ ভাবে আপনাপন কুঠির রক্ষাকল্পে নিজে ব্যবস্থা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আদেশ দুর্গ নির্মাণের আদেশ ধরিয়া লইয়া তাঁহারা দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়া দেন; চুঁচুড়ায় ফোর্টগ্যাসটোভস্, চন্দননগরে ফোর্ট ডি-অরলিন্স এবং সুতানটিতে ফোর্ট উইলিয়াম ইহাই সূচনা। ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের সম্বন্ধে এ কথার কোনই মূল্য নাই। ওলন্দাজগণের দুর্গের সূচনা ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ও চন্দননগর দুর্গের সূচনা ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। কালে উক্ত দুর্গদ্বয়ের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর কিছু অধিকমাত্রায় হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সূচনা উক্ত ঘটনার বহু পূর্বে হইয়াছিল—অনুমতির অপেক্ষায় ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সুতানুটিতে ইংরাজগণের কথা স্বতন্ত্র—কেননা ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে জব চার্ণক সুতানুটিতে মাত্র ৩০টি

সৈনিক লইয়া কুঠি বসান। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ছুতায় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম রচনা আরম্ভ হইয়াছিল একথা সত্য। সকল কুঠিয়ালই এই বিদ্রোহ দুর্বিপাকে অস্থায়ী ভাবে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শোভা সিংহ বর্ধমানে চলিয়া গেলেও, বিদ্রোহী সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া হুগলী ও চন্দন-নগরের সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ বিধ্বস্ত করিতে থাকে এবং মোগল সৈন্যের সহিত বহু খণ্ড যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকে। ২৫-এ আগস্ট তারিখে চন্দননগরের উত্তর প্রান্তে নবাব সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীগণের এক যুদ্ধ হয়, নবাব সৈন্য পরাজিত হইয়া অরলিন্স দুর্গের প্রাচীরপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিদ্রোহীদলের বল ও উপদ্রবের প্রকোপ অনুভব করিয়া, দেশের শাসনকর্তার ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া এবং পরোক্ষভাবে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিজেই করিতে হইবে এইরূপ ইঙ্গিত লাভ করিয়া, ইউরোপীয় বণিকগণ পরস্পর একটা মন্ত্রণার ব্যবস্থা করিলেন; চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কুঠিয়াল, ফরাসি ও ইংরাজ কুঠিয়াল দ্বয়ের মার্টিন ও চার্ণকের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে বিদ্রোহী রাজার নিকট তিন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটা আবেদন পাঠান হউক, যাহাতে তিনি এই তিনটি বণিক সম্প্রদায়ের কুঠিত্রয়ের নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন। মোগলের সঙ্গে হিন্দু ও পাঠানের দ্বন্দ্বে খৃষ্টীয়ান বিদেশী বণিকের যেন কোন সম্বন্ধ নাই; যে মোগল রাজশক্তির অনুগ্রহে তাঁহারা বার মাস ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন যেন সে রাজশক্তির প্রতি তাঁহাদের কোন কর্তব্য বা তাহার সহিত কোন বাধ্যবাধকতা নাই! ওলন্দাজ কুঠিয়ালের উপরোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধে মার্টিন ও ডেস-ল্যানডেস্ চন্দননগরের কর্তৃযুগল পোলি নামক, জনৈক ফরাসীকে প্রতিনিধিরূপে চুঁচুড়ায় পাঠাইলেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ওলন্দাজগণ সমবেত চেষ্টার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইলেন।

সমবেত হইয়া কার্য হইল না বটে কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ফরাসী ও ইংরাজ, বিদ্রোহীর সহিত একটা বুঝাপড়ার ব্যবস্থা করিলেন—দেশদ্রোহীর সহিত গুপ্ত পরামর্শ বা আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা রাজদ্রোহিতার প্রকারান্তর মাত্র, বিদেশী বণিকগণ সে কার্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। ওলন্দাজগণ সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ পাই নাই কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন তাহা মনে হয় না।

ফরাসী অধিনায়ক ফ্রানসিস্ মার্টিন শোভা সিংহের সহিত এবং পরে হিম্মৎ সিংহের সহিত গুপ্তভাবে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া আশু বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হন নাই। সেই বৎসর নভেম্বর মাসে একদল বিদ্রোহী সৈনিক চন্দননগরের সংলগ্ন গ্রামে (বোধ হয় বোড়োতে) অগ্নি-সংযোগ করিয়া দগ্ধ করিবার উপক্রম করে; মার্টিন তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করেন এবং একদল পদাতিক ও নাবিকসেনা পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং ওলন্দাজগণের অনু-করণে, চন্দননগর দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে কাঠের বেষ্টনী দিয়া দুর্গকে সুদৃঢ় করেন ও ভাগীরথী তীরবর্তী প্রাচীর প্রান্তে তোপ বসাইবার স্থান নির্মাণ করেন; এবং ভাগীরথী

বক্ষে ভাসমান ইউসিল ও গেলার্ড (Ecucil & Gaillard) নামক জাহাজ দুইখানিকে সুসজ্জিত করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত করেন। ব্রুস তাঁহার এ্যানালস নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

"The French and Dutch declared against the Rajah but the English did not intermeddle with either party."

ফরাসী কিরূপ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহার কথা বলিয়াছি এইবার ইংরাজের নিরপেক্ষতার পরিচয় দিব।

"ওল্ড ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট সেন্ট জর্জ হইতে প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে, তাহা এইরূপ ঃ

That which respects your Honors affairs is the present security of the factory (Sutanuti). The carrying on the investment and fortifying of the factory. The Agent (Mr. Eyre) and Council seem to have taken the most prudent method for those purposes in maintaining a friendship with both parties in such a manner as that the Raja (Sobha Sing) doth not suspect them and yet the Nabab sends them thanks for their assistance against the Raja. It will be difficult for them to carry on such a policy long without being necessitated by one accident or other to declare for one party in which case we have advised them in our letter of the 5th instant to take the part of the Moors Government as far as will consist with their present safety. Because it is more probable they will at last subdue the rebel. Then those who have assissted him must fall under the displeasure (?) of the Govt. and if they have built anything like a fortification it will be observed and probably will either be demolished or must be maintained by force, whereas the buildings of these who have assisted the govermnent may probably be connived at if not too great and too much like a Fort.

পাঠকগণকে উপরোক্ত ছত্র কয়টি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি—এই "বরের ঘরে মাসি ও ক'নের ঘরে পিসি" পদ্ধতি—ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে—"hunting with the hounds and running with the hare." —এই "পলিসি" জাতি-বিশেষের চিরন্তন নীতি এবং বর্তমান নিরাপত্তাই একমাত্র কাম্যবস্তু এবং ইহারই নাম 'ডিপ্লোমাসি'।

বর্ধমান রাজপরিবার শোভা সিংহের বন্দী, তন্মধ্যে কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী কন্যা কুমারী সত্যবতী বন্দিনী। শোভা সিংহ সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ। তারিখি বাঙ্গলার অজ্ঞাত-নামা লেখক বলেন "চীনের ছবির মত সুন্দরী, পবিত্র হৃদয়া রাজকন্যা কোন মতেই ব্যভিচার

পাপে লিপ্ত হইবেন না, দুর্বৃত্ত শোভা সিংহ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে।" একদা রাত্রি-যোগে শোভা সিংহ কন্যার কারাগৃহে প্রবেশ করিল—"এবং শয়তানের পরামর্শে সেই অলোক-সামান্য রূপবতীকে কলঙ্কিত করিতে হস্ত প্রসারণ করিল। তেজস্বিনী রাজকন্যা তীক্ষ্ম-ধার প্রাণনাশক ছুরিকা এইরূপ দুঃসময়ের জন্য সংগোপনে রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা দ্বারা শোভা সিংহের নাভির নিম্নে আঘাত করিয়া উদর বিদীর্ণ করিলেন, তারপর সেই অস্ত্রাঘাতে স্বীয় আয়ুসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।"

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ অনেক সৈন্য লইয়া বর্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় পলায়নপর জগৎরামকে কিয়ৎ-কালের জন্য আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবদ্বীপাধিপতি সে আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিলেন।

যতদিন শোভা সিংহ জীবিত ছিলেন রহিম খাঁ তাঁহার অধীনে সেনানী মাত্র ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর সৈন্যগণ রহিম খাঁকেই অধিনায়কত্বে বরণ করিল এবং রহিম খাঁ রহিম সা পদবী গ্রহণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী প্রদেশের অধিপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। ইউরোপীয় অধিষ্ঠানগুলি ব্যতিরেকে, রাজমহল হইতে সুবর্ণরেখার তীর পর্যন্ত, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার পদানত হইল। তাঁহার লোকবল ও অর্থবল একজন পরাক্রান্ত নরপতির সমতুল্য হইল—তাঁহার বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা—সৈন্য সংখ্যা, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতি।

তখনও বাংলার সুবাদার নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট; রহিম সার অব্যাহত গতি কেহই রোধ করিতে পারিল না—না রাজা না প্রজা। রহিম সার ফৌজ মুকসুদাবাদে গিয়া হানা দিল। তথায় দুই একজন তালুকদার বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়া দলপুষ্টি করিল; কিন্তু নিয়ামৎ খাঁ নামে একজন সাহসী রাজভক্ত জায়গীদার রহিম সার আনুগত্য স্বীকার করিল না। বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ামৎ খাঁর মাথা লইতে আদিষ্ট হইল। নিয়ামৎ খাঁ, মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। প্রথমে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাহওয়ার বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন কিন্তু অচিরে শত্রু পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। নেয়ামৎ খাঁ যুদ্ধ সজ্জায় অপেক্ষা না করিয়া "কেবল একখানি তরবারি গলদেশে রক্ষা করিয়া দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে শত্রু সেনা বিদীর্ণ করিয়া মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া রহিম সাহের মস্তকে আঘাত করিলেন।" রহিম সার শিরস্ত্রাণ ও বর্ম তাহাকে বার বার নেয়ামতের নিদারুণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল, পরিশেষে নেয়ামত সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নিদারুণ পিপাসায় কাতর হইয়াও শত্রু প্রদত্ত বারি প্রত্যাখান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এক এক করিয়া তিন জন বীরপুরুষ বিদ্রোহীর অবাধগতির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফল হইল না—বর্ধমানে কৃষ্ণরাম রায়, নদীয়ায় রামকৃষ্ণ রায় ও মুকসুদাবাদে নিয়ামৎ খাঁ। দেশে অরাজকতার স্রোত বহিয়াছিল, তাহার গতিরোধ ব্যক্তিগত চেষ্টার অতীত, সুতরাং উক্ত বীরত্রয়ের ব্যক্তিগত বীরত্ব ব্যর্থ হইল। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুক-

সুদাবাদ, কাশিমবাজার, রাজমহল, মালদহ—সবই রহিম খাঁর করতলগত হইল। রাজমহল নগরে ট্যাঁকশাল ছিল; কাশিমবাজার একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান ও তান্নিকটবর্তী চুনাখালী, হুগলীর ন্যায় বিশিষ্ট বাণিজ্য শুল্ক গ্রহণের স্থান ছিল।

কাশিমবাজারের বণিকগণ, বিদ্রোহী সেনাপতির নিকট একখানি আরজি পাঠান, যেন তিনি সহরের উচ্ছেদ সাধন না করেন; রহিম সা তাহাদের আরজি মঞ্জুর করেন কিন্তু পরিশেষে নবাব বণিকগণের মুখপাত্র গোপীচাঁদের কঠিন অর্থদণ্ড করেন।

কাশিমবাজারস্থিত ওলন্দাজ ও ফরাসী কুঠিয়ালদিগের উপর বিদ্রোহী সেনাপতি শুল্ক আরোপ করিবেন এই আশঙ্কায় ফরাসী কুঠিয়াল ফনভিল পূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন; এবং একজন দেশীয় ও একজন ফরাসী সৈনিক কুঠির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। টাকা না দিতে পারিলে দুইজনের উপর বেত্রাঘাতের আদেশ হয়, কিন্তু কোন প্রকারে উভয়ে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পান। ফরাসী কুঠি লুণ্ঠিত হয়।

দক্ষিণে সুতানুটি পর্যন্ত বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিবার উপক্রম করে; স্থানীয় জমিদারগণ তাহাদের গতিরোধ করে। ২৩শে ডিসেম্বর (১৬৯৬) বিদ্রোহী সেনা ভাগীরথী পার হইবার চেষ্টা করে। "ডায়মণ্ড" নামক একখানা জাহাজ সুতানুটির "ট্যাঁকে" থাকিয়া তাহাদিগকে নদীপার হইতে নিরস্ত করে; "টমাস" নামে আর একখানা জাহাজ বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ থানা দুর্গের সহায়তায় প্রেরিত হয়।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সকল উপদ্রব চলিতে থাকে। মার্টিন চন্দননগরের দুর্গপ্রাচীরের আর এক কোণে আর একটি কামান স্থাপনের স্থান প্রস্তুত করেন; বিদ্রোহী সৈন্য মুহুর্মুহু চন্দননগরের নিকট লুটপাট করিতে থাকে, তাহাদের উপর গোলা চালাইয়া ও তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া চন্দননগরের কুঠি রক্ষা হয়।

তখনও বাঙ্গলার সুবাদার নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া ভাবিতেছেন—"তরবারির ধার নরম, বিবাদের শৃঙ্খল বড়ই লম্বা, স্বীয় হস্ত বড়ই সঙ্কীর্ণ" অতএব "বাদসাহের নিকট আরজী পাঠান যাউক"। তিনি বলিতেন "যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী হত্যা করিতে হয়, অতএব উভয়পক্ষেই অনর্থক প্রাণীহত্যা করিয়া কি ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে?"

বাদসাহ সংবাদপত্রে বাঙ্গলার এই শোচনীয় অবস্থার কথা ও তাঁহার প্রতিনিধির নিশ্চেষ্টতার কথা অবগত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পৌত্র আজীমুশ্বানকে বাঙ্গলা-বেহারের শাসনভার দিয়া সসৈন্যে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন এবং ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও অন্যান্য চাকলার ফৌজদার-পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহ দমন জন্য নিয়োজিত করিলেন। অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহারের শাসনকর্তৃগণও বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্রোহ দমনের এই বিপুল অয়োজনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল; রহিম সা পরাজিত হইলেন ও বঙ্গে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল। ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁর কৌশল ও বীরত্ব, আজীমুশ্বানের মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা, ও রহিম সার পরাজয়ের বিশদ ইতিহাস পাঠকগণ রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থে পাঠ করিবেন।

বিদ্রোহ শান্ত হইল। ইউরোপীয় কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ তাঁহাদের ডিপ্লোমাসির ধারা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া বর্ধমানে অধিষ্ঠিত "ইন্দ্রপ্রস্থরাজপৌত্রে"র দরবারে সাত কুর্ণিস করিয়া নজরানা বহন করিয়া হাজির হইলেন। প্রথমে গেলেন ওলন্দাজ, তারপর ইংরাজ, সর্বশেষে "গতিরন্যথা" হইয়া ফরাসী। চ্যালোন ও ফর্নভিল (যাহারা কাশিমবাজার হইতে পলায়ন করেন) নামে দুই জন ফরাসী ২৫০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার লইয়া ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, সুলতান মুসেন্দীর দরবারে হাজির হইলেন। ফরাসী প্রতিভূদ্বয় সুলতানের দরবারে নাকি বড় সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন; প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে ওলন্দাজগণের মত এক মাস দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই পরন্তু তাঁহাদের উপস্থিতির তৃতীয় দিনেই দুইবার সুলতানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা স্ব স্ব তরবারি লইয়া সুলতান সমীপে উপস্থিত হইতে হুকুম পাইয়াছিলেন; তৃতীয়তঃ দরবারে প্রবেশের পূর্বে তাঁহাদের তল্লাস লওয়া হয় নাই। তার উপর সুলতান আওরঙ্গজেব-দত্ত ফরমানের সমর্থন করিয়াছিলেন। মার্টিন সুলতানের এই আপ্যায়নে একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন।

উপন্যাসের ঘটনাবলীর ন্যায় চমৎকারিণী বিদ্রোহ-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের প্রথমেই মনে হয় রাজমহল হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত করায়ত্ত করিয়াও বিদ্রোহী সেনাপতি, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কেশস্পর্শ করিতে পারেন নাই কেন? সুদূর কাশিমবাজারের বা মালদার ক্ষুদ্র কুঠি লুঠ করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও, চুঁচুড়া বা চন্দননগরের ত্রিসীমায় আসিতে পারেন নাই কেন? সুতানুটি না হয় ভাগীরথীর পরপারে ছিল কিন্তু যে হুগলী লুট করিতে পারে সে চুঁচুড়া চন্দননগর ছাড়িয়া দেয় কেন? ইহার উত্তরে এক এক করিয়া অনেক কথাই মনে হয়—হয়ত সেগুলা নগণ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, হয়ত চুঁচুড়া চন্দননগর জলে স্থলে সুরক্ষিত ছিল, জাহাজী কামানের আক্রমণ বড় ধাঁধা লাগাইয়া দিত, হয়ত বা শ্বেতাঙ্গগণের ডিপ্লোমাসি আরও ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া সেগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল। কেননা আমরা দেখিয়াছি দেশের রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া তাঁহারা বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার রাজা জয়ী হইলে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন এবং বিদ্রোহ নিবারণের ব্যয়স্বরূপ যখন রাজা শুল্ক আরোপ করিয়াছেন তখন চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইয়াছেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেশের লোক ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য দেশের রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, বিদেশীয় আশ্রয়ে আসিয়া ধনমান সমপর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এতখানি বিদেশী-প্রীতি কোথা হইতে আসিল? চন্দননগরের বহু সমৃদ্ধ পরিবার শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় বা পরবর্তী কালে, মারাঠার আক্রমণের সময় সাতগাঁ বা তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে পলাইয়া আসিয়া বাস করিয়াছেন—চুঁচুড়া ও কলিকাতায়ও তাহাই। যাঁহারা সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আপনাদের ধনরত্ন বিদেশীর সুরক্ষিত কুঠিতে স্থাপন করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। কেহই দেশের রাজাকে বা দেশের লোককে আশ্রয় করিতে পারে নাই।

নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় ৪০ হাজার টাকা সুতানুটির এজেন্ট মিঃ আয়ারের নিকট মাসিক শতকরা দশ আনা সুদে গচ্ছিত করিয়া রাখেন।

রামকৃষ্ণ চক্রী কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামকৃষ্ণের সহিত এজেন্ট সাহেবের বড়ই প্রীতি ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরাজপ্রীতি বংশগত বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে সেই পুরাতন কাল হইতে বিদেশী বণিক দেশের রাজা-প্রজার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়া আসিতেছে—এই মনের উপর আধিপত্য যথাকালে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

শোভা সিংহের বিদ্রোহরূপ এই খণ্ডপ্রলয় যে বঙ্গদেশের বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল তাহার নিগূঢ় অভিসন্ধি তখনকার বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই—সে অভিসন্ধি আওরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন আর নব সাম্রাজ্যের সূচনা। আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন—তাহার ঠিক ১০ বৎসর পূর্বে ফরাসী কোম্পানীর অধিনায়ক ফ্রান্সিস মার্টিন শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, এই সকল ক্ষুদ্র বিদ্রোহ তাহারই পূর্ব সূচনা মাত্র। সে বিপুল বিপ্লবে বাদসাহের সন্ততি ও সামন্তগণ তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইবেন—তজ্জন্য তাঁহারা বহু পূর্ব হইতেই স্ব স্ব পক্ষ পরিপুষ্ট করিতে ব্যস্ত।" (১১)

॥ হুগলী ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না; হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বণিকদের যত্নেই এই শহরের গোড়া পত্তন হয়; পর্তুগীজগণ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোলঘাটে* একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগীরথী তীরবর্তী যে সমস্ত স্থানে ইউরোপীয় বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই স্থানটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত হইবার পূর্বে ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে হুগলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের পতন হয়। সেইজন্য হুগলী তৎকালে প্রাচ্যের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে।

হুগলী নামটি পর্তুগীজের দেওয়া নাম; তৎকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্রাদিতে হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু ঠিক কোন সময়ে যে, হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

---

* Golghat or, as it is sometimes written Gholghat. It was so called from the fact that in the bank here there was a semi-circular cove (*gol*, circular and *ghat*, landing stage.)

বঙ্গদেশে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম বাণিজ্য বিস্তার করে; সেই সময় ভাগীরথীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ আনিবার সুবিধা হইত না বলিয়া, তাহারা মুচিখোলার নিকটে জাহাজ নোঙ্গর করিত এবং তথা হইতে ছোট ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিত। ইহার কিছুদিন পর হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী নদীর খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হওয়ায়, সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করা পর্তুগীজদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বিস্তার করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রায়ো নামক জনৈক পর্তুগীজ হুগলীতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। পর্তুগীজদের এই নূতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবতীয় বাণিজ্য সেইজন্য এই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের তিন ক্রোশ দূরে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পার্শ্বে ত্রিবেণী এবং ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিফা প্রভৃতির উল্লেখ আছে; কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না।

বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রধান নগরগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

"হুগলী শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।" (১২)

মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ছিল এবং অনার্য রমণীগণের নৃত্যসহকারে গানের সময় তৎকালে হুগলী নামের উল্লেখ করা হইত। নাগর, ধানুক, ঢাঁই; কোচ, পলে প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ মধুর কণ্ঠে আজও এই "লাচারি" গাহিয়া থাকে। উক্ত গানের দুইটি পঙ্‌ক্তি হরিদাস পালিত লিখিত মালদহের পল্লীভাষা হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

"হুগলী সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি॥" (১৩)

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে হুগলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

হুগলী নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্তুগীজগণ আসি করিল নির্মাণ;
তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখা যায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।

পর্তুগীজদিগের 'গোলিন' নামক উপনিবেশের মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাণ্ডেল, পিপুলবাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই 'ব্যাণ্ডেল' নামটির উৎপত্তি হয়। পর্তুগীজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই স্থানে তাহারা সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহারা সপ্তগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্য করিত। সম্রাট আকবর পর্তুগীজদিগকে সুনজরে দেখিতেন বলিয়া তাহাদের ঔদ্ধত্য ও দুর্বৃত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরি' পাঠে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্ধ ব্যবহিত দুইটি স্থানই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল এবং দেশীয় লেখকদের প্রতি তাহারা নানারূপ অত্যাচার করিত। ভাগীরথীতীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্ত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহার মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং তাঁহাদের মধ্যে পোর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম প্রাচ্যে আসিয়াছিল।

ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অযথা অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নবাবের বিনা অনুমতিতে গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থান করায়, প্রত্যেক নৌকার যাতায়াতের সময় শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যবসা করিত এবং হুগলী ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ প্রজাদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের গৃহে অগ্নিদান করিত। নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম করিতেই তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া, তৎকালে ভাগীরথীর নাম 'দস্যু-নদী' ছিল, কর্ণেল ইউল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। (১৪)

পর্তুগীজগণ হুগলী ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যাহাদের পাইত তাহাদের নৌকায় তুলিত; নৌকায় তাহাদের হাতের 'চেটো' ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রমধ্যে বেত ঢুকাইয়া নর-নারীকে স্তূপাকারে নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগীকে ধান দিবার মত, তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। পর্তুগীজদের আগমন-সংবাদ পাইলে পাছে তাহারা কূলে নামিয়া উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীগণকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। (১৫)

১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উত্তরকালে সম্রাট্ শাহ্জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা মাইকেল রড্রিকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রড্রিক তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করেন এবং এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, শাহ্জাহান তাহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী মমতাজ বেগম পৌত্তলিক পর্তুগীজদিগের উপর বিশেষ

ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহান বঙ্গের শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় পর্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া যান। পরে পিতা-পুত্রের মিল হইয়া যায়।

পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি পর্তুগীজদের অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং বঙ্গের শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পর্তুগীজদের দূরীভূত করিবার আদেশ দেন। কাশিম খাঁ বিশেষ সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া, জয় করিতে তাঁহার সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিলে মোগলেরা পর্তুগীজদের প্রধান আড্ডা হুগলী দুর্গ দখল করে। বিজিত পর্তুগীজগণ কেহ মোগলের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে গঙ্গায় অবস্থিত তাহাদের জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গঙ্গায় পর্তুগীজদের একখানি বড় জাহাজে দুই হাজার নরনারী বহু ধনরত্নাদিসহ উক্ত জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহারা আগুন দিয়া নিজেরাই জাহাজখানি পুড়াইয়া দেয়। চৌষট্টিখানি বড় জাহাজ, সাতান্নখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুই শত ছোট জাহাজের মধ্যে মাত্র একখানি মাঝারি ও দুইখানি ছোট জাহাজ মোগলদের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিল। সাড়ে চার হাজার পর্তুগীজ নরনারী ও বালক-বালিকা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহ্‌ ও ওমরাহ্‌দিগের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী অধিকার করিয়া মোগলেরা এই স্থানে একজন **'ফৌজদার'** নিযুক্ত করেন এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তগ্রাম পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জলদস্যু মগ-দিগের আক্রমণ হইতে হুগলী বন্দর রক্ষা করিবার জন্য হিজলীতেও একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল।(১৬) পর্তুগীজদের নির্মিত দুর্গ হুগলী আক্রমণের সময় মোগলরা ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেল্লা নির্মাণ করেন।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও জলে দস্যুবৃত্তি পর্তুগীজদিগের কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাহারা বণিক বেশে এই দেশে আসিয়াছিল; উদ্দেশ্য এই দেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। বহু বৎসর যাবত তাহারা বাণিজ্য কার্যে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত দুইটি কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও, তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এমন কি তাহাদের রক্ত পর্যন্ত অদ্যাপি বঙ্গদেশে বিদ্যমান, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পর্তুগীজশক্তি এই স্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার পর, বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের ভাষা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের

'কথ্য-ভাষা' বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল পর্তুগীজ শব্দ আসিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ৫৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিজলী রাজ্য মোগল কর্তৃক অধিকৃত হয়; উক্ত রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজদার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। হুগলীর ফৌজদার সেইজন্য সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্তৃক Zeevoogd উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং হিজলীর শাসনভারও তাঁহার অধীনে জনৈক 'ক্ষুদ্র রাজা'র উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।(১৭)

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্যন্ত না নিজেদের নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ হুগলী বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্পদশালী হইয়াছিল। মোগল শাসনকর্তা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন। সুলতান সুজার রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে 'ফারমান' লইয়া ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং বঙ্গে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন। বঙ্গের সুবাদারগণের অনুগ্রহে পুজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ হুগলী পর্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। ইহার পূর্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন সম্রাট্ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিলে, সম্রাট্ ডাক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বদেশহিতৈষী ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন পুরস্কারের পরিবর্তে বিনা মাশুলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি চান এবং সম্রাট্ সেই অনুমতি দান করেন। তারপর কি ভাবে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া 'রাজদণ্ড' গ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ইংরেজ বণিকের সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হুগলীর সম্বন্ধ আছে, কারণ এই স্থানেই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠি নির্মিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন হুগলীতে প্রধান কুঠী ছিল সে সময় কুঠীর প্রধান কর্মচারীর (Agent) বেতন ছিল বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তৎকালে এক পাউণ্ড আট টাকা হিসাবে ৮০০্ টাকা। তাঁহার অধীনে দ্বিতীয় কর্মচারীর বেতন ছিল ৪০ পাউণ্ড বা ৩২০ টাকা, তৃতীয় কর্মচারীর ৩০ পাউণ্ড বা ২৪০্ টাকা, চতুর্থ এবং পঞ্চম কর্মচারীর প্রত্যেকে বার্ষিক ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৬০্ টাকা। সকল কর্মচারী একত্রে আহার করিতে বাধ্য ছিলেন। আহারের ব্যয় কোম্পানী দিতেন। বিবাহিত কর্মচারীগণ পৃথক খোরাকী পাইতেন। সুশৃঙ্খলের সহিত কার্য নির্বাহের জন্য নিম্ন-লিখিত নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর [illegible] জন্য করা হয়ঃ

১॥ রাত্রি ৯টার সময় ফটক বন্ধ হইলে পর এবং রাত্রিতে অনুপস্থিত হইলে জরিমানা ১০৲ টাকা।

২॥ শপথ করিলে ১ শিলিং জরিমানা বা তিন ঘণ্টা কয়েদ হইত।

৩॥ মিথ্যা কথা কহিলে প্রত্যেক মিথ্যা কথার জন্য ১ শিলিং জরিমানা।

৪॥ মাতলামি করিলে ৪ শিলিং জরিমানা।

৫॥ উপাসনার সময় অনুপস্থিত থাকিলে প্রত্যেক বারের জন্য ১ শিলিং।

॥ পরস্ত্রীগমন, কুমারীগমন, অপবিত্রতা, অন্যবিধ পাপ কর্ম, কুঠীর শান্তি ভঙ্গ, বিবাদ বিসম্বাদ এবং প্রথম পঞ্চম নিয়মের পুনঃ পুনঃ ব্যতিক্রম করিলে অপরাধীকে ফোর্ট সেণ্টজর্জে গুরুতর শাস্তির জন্য প্রেরণ করা হইত।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসর হুগলীর প্রধান কুঠীয়ালগণের অর্থাৎ এজেণ্টদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১। কাপ্তেন জন ব্রুক্ হেভেন্ ১৬৫০ ২। জেমস্ ব্রিগ্ম্যান ১৬৫১-৫৩
৩। পাউল্ ওয়াল্ডি গ্রেভ ১৬৫৩ ৪। জর্জ্জ গর্চন্ এবং বিলিংসলী ১৬৫৮
৫। এজেণ্ট জনাথন ট্রেভিসা ১৬৫৯-৬৩ ৬। উইলিয়ম ব্লেক্ ১৬৬৩-৬৯
৭। শেম্ ব্রিজেস ১৬৬৯-৭০ ৮। ওয়াল্টার ক্লাভেল ১৬৭০-৭৭
৯। মেথিয়াস্ ভিন্সেণ্ট ১৬৭৭-৮২ ১০। এজেণ্ট উইলিয়ম হেজেস ১৬৮২-৮৪
১১। এজেণ্ট জন বিয়ার্ড ১৬৮৫ ১২। ফ্রান্সিস এলিস ১৬৮৫-৮৬
১৩। জব চার্ণক (১৬৮৬—কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করেন)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী "কলিকাতা গেজেটে" হুগলীর উন্নতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এইরূপঃ

Hooglee : The city of Hooglee, which was the seat of Government of the Mussulmans, has been in a ruinous state for a long time. Mr. Smith, the Judge and Magistrate, has improved it so much that one who sees it now will not know that it is that old and decayed town. He has also, by his judicious arrangements and exertions, adorned it with a splendid spacious pucka ghaut opposite to his Cutchery,

কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চারণক প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে জব চার্ণকের সহিত দেশীয় ব্যক্তিগণের নানা কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল কারণ বাণিজ্যের জন্য তাহারা দেশের ক্ষতি করিতেছিল এবং মোগলের সহিতও ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল না। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই সমীচীন মনে করেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে মাদ্রাজের 'ফোর্ট-জর্জের' শাসনকর্তাকে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'ফরমান' গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার

মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্মাণ এবং তাঁহার কর্মচারীগণ কর্তৃক যাহাতে ইংরেজগণ অত্যাচারিত না হয় তদ্বিষয়ে নির্দেশ দিবার জন্যও মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক ছিল।

নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে শুনিয়া, জব চারণক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবেন সংবাদ পাইয়া, তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজ-দারকে পরাভূত করেন। ইহাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বণিকগণ নবাগত সৈন্যের সাহায্যে তোপ দাগিয়া হুগলী শহরের বহুলাংশ উড়াইয়া দেন। তোপের আগুনেই হুগলীর পাঁচ শত বাড়ী এবং পণ্যরাশি-পরিপূর্ণ ইংরেজদিগের গুদামঘর পুড়িয়া যায়, ফলে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদিগের অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির সর্তানুযায়ী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি সমগ্র গঙ্গা নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবের হুগলীর কুঠি পুড়াইয়া দিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার পর জব চারণক ইংরেজ সৈন্যকে প্রেরণ করেন এবং বালেশ্বর অধিকৃত হয়। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারতসম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেবল-মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হুগলী, হিজলী ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ এযাবত বঙ্গদেশে মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর অধীন-ভাবে বাণিজ্য করিতেছিলেন; ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাদ্রাজ কোম্পানীর অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ হেজেস প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন ও হুগলীতে তাঁহার আবাসস্থান নির্ধারিত হয়। মিঃ হেজেসের পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্ণর হইয়া হুগলীতে আগমন করেন এবং হুগলী তখন ইংরেজের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় কোম্পানীর আটাশ হাজার মণ সোরা বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত।

সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ব্রোটনের চেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই

সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'মীরকাশিম' নাটকের মধ্যে নবাবের নিজস্ব ডাক্তার ফুলারটন সাহেব মিরকাশিমকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধারযোগ্যঃ

"আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট্ সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদশাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন কিন্তু Trueborn Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাংলায় ইংরেজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনদ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার,† আমিও নবাবের বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর স্বদেশী হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল।" ওম্যালী সাহেব বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ

"In all, 198 prisoners were massacred including one Lushington, who had been one of the few survivors of the Black Hole of Calcutta. Only one Dr. Fullarton was spared on account of services which he had rendered to Mr. Kasim Ali."

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদারী প্রাপ্ত হন; তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ সুবিধা হয়।(১৮) ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন এবং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করেন।

রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার করিয়া, শোভা সিংহ বর্ধমান রাজ প্রাসাদ অধিকার করেন; রাজকুমার জগৎরায় নদীয়ায় রাজা রাম কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শোভা সিংহ রহিম খাঁ নামক একজন আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া হুগলী অধিকার করে। ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীগণকে বিতাড়িত করেন এবং তাহারা সপ্তগ্রামে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অতঃপর তাহারা রহিম খাঁর নেতৃত্বে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হয়। শোভা সিংহের বীরত্বের ইতিহাস ৬৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

বর্ধমান রাজকুমার নদীয়ায় পলায়ন করেন, কিন্তু রাজকুমারী পলায়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শোভা সিংহ রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার ধর্মনাশ করিবার চেষ্টা করিলে, তেজস্বিনী রমণী ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহকে হত্যা করিয়া, নিজেও আত্মহত্যা করেন। অতঃপর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া লন।

দেশে এইরূপ অরাজকতার সুযোগে ইংরাজগণ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ফরাসীগণ চন্দননগরে আরলাঁ দুর্গ (Fort Orleans) এবং ওলন্দাজগণ চুচুঁড়ায় গেসটোভস্ দুর্গ (Fort Gastoves) দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপনার্থে তাহার পৌত্র আজিম ওস্বানকে প্রেরণ করেন। তিনি বঙ্গে আসিয়া দেখিলেন শোভাসিংহ নিহত এবং নবনিযুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন দেখিয়া তদানীন্তন জমিদারগণের সহিত বর্ধমানে থাকিয়া তিনি আনন্দোৎসব

করিতে লাগিলেন। বর্ধমানে যখন আনন্দোৎসব চলিতেছে, সেই সময় বিদ্রোহীগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া হুগলী এবং নদীয়া লুণ্ঠন করে।

"Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulations of Zamindars and principal men of the province, the rebels again collected in greatest force and had the audacity, not only to plunder the district of Nuddeah and Hoogly but to encamp within a few miles of Burdwan." (১৯)

॥ সিরাজদ্দোলার বংশধর ॥

পলাশীর যুদ্ধ অভিনয়ের পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজদ্দোলা নিহত হন; মুর্শিদাবাদের খুসবাগে অদ্যাপি তাহার এবং নবাব আলিবর্দী খাঁর সমাধি দৃষ্ট হয়। নবাব সিরাজদ্দোলার বংশধরগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। কোন ঐতিহাসিক তাঁহার বংশধরগণের বিষয় কোন কথা আলোচনা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ্য। নবাব আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল; জ্যেষ্ঠের নাম আমিনা বেগম এবং কনিষ্ঠার নাম ঘষেটি বেগম। আমিনার সহিত নবাব হাইবৎ জঙ্গ এবং ঘষেটির সহিত নবাব সহমৎ জঙ্গের বিবাহ হয় কিন্তু কনিষ্ঠা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠা আমিনা বেগমের মির্জা মহম্মদ ও এক্রামদ্দোলা নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং মির্জা মহম্মদ পরবর্তীকালে নবাব সিরাজদ্দোলা নাম ধারণ পূর্বক বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন।

নবাব সিরাজদ্দোলা মৃত্যুকালে কুদসা বেগম নামে একটি কন্যা রাখিয়া যান, তাঁহার সহিত এক্রামদ্দোলার পুত্র মুরাদুদ্দোলার বিবাহ হয়। কুদসা বেগমের সামসের আলি খাঁ নামক একটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা জন্মে; সামসের আলি ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে ১৮২৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান এবং তাহার চার ভগ্নী যথাক্রমে ৯১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। সামসের আলির দুইটি পুত্র জন্মে জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ও কনিষ্ঠ সৈয়দ জয়নাল আবেদিন। কনিষ্ঠ অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হন এবং জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সরকারী আদেশে মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। তাঁহার ফতেমা বেগম নাম্নী একটি কন্যা হয় এবং তিনিও সরকার হইতে মাসিক ১৪১৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দ্বারা দিনাতিপাত করেন।(২০) তাঁহার লুৎফন্নেসা বেগম, হাসমৎ আরা বেগম এবং অলফুন্নেসা বেগম নামক তিন কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ মাসিক ৮১৲ টাকা করিয়া এবং অন্য দুই কন্যা মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান।

হাসমৎ আরা বেগম, মৌলভী সৈয়দ জাকি রেজা নামক এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন, তিনি পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার সাব রেজিষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেও ১৯৩২

খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে সরকারী নির্দেশানুযায়ী (Govt. Order No. 152N.) ১৫ করিয়া বৃত্তি পান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের মোগলটুলি অঞ্চলের একটি ভগ্ন বাটিতে দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

রেজা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ গোলাম হায়দার এবং তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এটওয়াতে ড্রইং অফিসে ড্রাফট্সম্যানের অর্থাৎ নক্সার কার্য করেন। মধ্যম পুত্রের নাম সৈয়দ মহসিন রেজা এবং তিনি এম, ইস্পাহানী লিমিটেডে কার্য করেন। তৃতীয় পুত্র গোলাম মোর্তাজা মুর্শিদাবাদে সাব ডিভিস্যানাল অফিসারের দপ্তরে কেরানীগিরি চাকুরী করেন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ গোলাম আহম্মদ মুর্শিদাবাদে কৃষিকার্য করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ রেজা আলি বি-এ পাশ করিয়া ৭৫ টাকা মাহিনায় আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টর-রূপে কলিকাতায় চাকুরী করিয়া বর্তমানে দিনাতিপাত করিতেছেন।(২১)

বাঙ্গলাদেশে কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের হস্তে ক্ষমতা আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এই নবাব বংশকে রক্ষা করিবার জন্য করা হয় নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নুরউল্লা খাঁ যে সময়ে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য লইয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু শোভা সিংহ আসিতেছেন শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। হুগলী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। পরে ইব্রাহিম খাঁ ওলন্দাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন।

হুগলীর ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করিতেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহারা জৈনউদ্দীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য নবাব কর্তৃক প্রেরিত দিলপতি সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় নিহত হয়।(২২) তৎপরে হাসান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময় মারহাট্টারা বঙ্গদেশ লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ইহাই 'বর্গীর অত্যাচার' বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্গীর অমানুষিক অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে,

ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরেজ বণিকগণ কলিকাতায় 'মহারাষ্ট্র-খাত' (Marhatta Ditch) খনন করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক কলিকাতাকে সুরক্ষিত করেন। দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরবর্তী গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বিধর্মী ইংরেজের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরেজ বণিকগণের নব-নির্মিত বর্গীদের অনধিগম্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া কথঞ্চিৎ সাহায্য করিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস যে ভিন্ন রূপ ধারণ করিত তাহা সুনিশ্চিত। বর্গীদিগের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। "বর্গীরা গ্রাম ও নগর পুড়াইয়া শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষের নাক-কান ও পুরস্ত্রীর স্তন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলার প্রজাকুলকে সংহার করিয়াছিল।" (২৩)

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎকালে সুতানটির জন্য ৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুরের জন্য ৭০ টাকা ও কলিকাতার জন্য ৩৩ টাকা করিয়া কেবলমাত্র খাজনা দিত।

নবাব আলীবর্দী বর্গীদের সহিত পরে সন্ধি করেন যে, তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাঁহাদের কর দিবেন; তাহা হইলে তাহারা আর বাংলায় অত্যাচার করিবে না। বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্য বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম নামক দুই জন বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছুদিনের জন্য নিজ অধিকারে রাখেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হেদায়েৎ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, সেই সময় নবাব আলীবর্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দেন। এই সময় চতুর্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌঁছিত না। হেদায়েতের সহিত নন্দ-কুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক সাতাশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। (২৪) পরে মহম্মদ ইয়ার-বেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে তিনি 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে অভিহিত হন। এই সময় আলীবর্দী সিরাজদ্দৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন এবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবর্দী গতাসু হন এবং মৃত্যুকালে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ বণিকদের হইতে সাবধান থাকিতে বলেন। (২৫)

নবাব আলীবর্দী সিরাজদ্দৌলাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজদের দুর্গ স্থাপন বা সৈন্য সংগ্রহ করিতে দিয়া বিপদে পড়িও না; যদি তাহা করিতে দাও, তাহা হইলে এই দেশ আর তোমার থাকিবে না।"

"Suffer them not, my son, to have fortifications or soldiers; if you do, the country is not yours." (Ibid. Vol I, Pp. 16)

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃষ্বসা ঘসেটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সেই জন্য বহু ধনরত্ন দিয়া ইংরেজের নিকট কলিকাতায় পাঠান। সিরাজদ্দৌলা এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার চারদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে বলেন। ড্রেক সাহেব কৌশলে কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া যান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া শিবপুর ও ফলতা নামক স্থানে পলায়ন করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগম ইংরেজের সহিত হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত ঝগড়া করিলে চলিবে না জানিয়াই তাঁহারা বিপদের সময় সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিম ও সোরা জলঙ্গী দিয়া উমিচাঁদের মারফত হুগলীতে ইহাদের ব্যবসা চলিত। (২৬)

মহম্মদ আলি এই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; খোজা ওয়াজিদ নামে একজন ধনী মুসলমান বণিক সেই সময় হুগলীতে বাস করিতেন, দৈনিক এক হাজার টাকা তাঁহার ব্যয় ছিল। তিনি ফরাসী জেনারেল ল' সাবেবকে সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহম্মদ আলি বিশেষ কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার পরিবর্তে নবাব সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি; নবাব ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ আর কিছু করিবে না, সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগকে ফলতা হইতে বিতাড়ন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। হুগলীর সহিত নন্দকুমারের সম্বন্ধের বিষয় ৬৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন; তিনি ইংরেজদের আগমন রোধ করিবার জন্য বজবজ দুর্গের সংস্কার ও কলিকাতার দক্ষিণে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ এবং শিবপুরের দুর্গটিও সংস্কার করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর নবাব কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান ইংরেজের সহিত মিলিত হন এবং ইংরেজের যাহাতে খাদ্যাভাব না হয় সেইজন্য ফলতায় হাট বসান। ক্লাইভ এই সময় সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন; দেওয়ান মাণিকচাঁদ বজবজে গিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধের অভিনয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈন্য দখল করিল। তাহার পর মাণিকচাঁদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংবাদ দিয়া, মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দিতে চলিয়া

গেল; কলিকাতা অরক্ষিত অবস্থায় রহিল এবং ক্লাইভও সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য লইয়া অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরাধিকারের সংবাদ পাইয়া হুগলী রক্ষার জন্য নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং নূতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া হুগলীকে সুরক্ষিত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মেজর কিলপ্যাট্রিক ইংরেজ সৈন্য লইয়া হুগলী আক্রমণ করিল। গোলাবর্ষণে হুগলীর কেল্লার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায় এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন ও গ্রামে অগ্নিদান করে। নন্দকুমার যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন এবং ইংরেজগণ কলিকাতায় পলাইয়া আসে। ইহার পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে, যদি ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পায়, তাহা হইলে বাংলার ইংরেজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করেন। নবাবের সহিত ফরাসীদের বিশেষ প্রীতি ছিল, কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য না করায়, সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ গেল যে, নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবাব সেইজন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্মি সাহেব লিখিয়াছেন—"নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ কখনও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিত না।"

১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হুগলীর ফৌজদারের নিকট বার্ষিক তিন হাজার টাকা বাণিজ্য-শুল্ক দাখিল করিতে হইত। ইহা ছাড়া, প্রতি চার মাস অন্তর ৪২৫৲ টাকা ভূমির রাজস্ব এবং হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক দুইশত টাকা নজরানা দিতে হইত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখের মন্ত্রণাসভায় বাণিজ্য-শুল্ক ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদে দাখিল করা স্থির হয় কিন্তু ভূমির রাজস্ব হুগলীতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দাখিল করা হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের ছয় মাস পরে হুগলীর ফৌজদারের নায়েব সোলেমান বেগের সহিত কোম্পানীর ঘোলঘাট কুঠির সংলগ্ন জমিতে একটি বাজার উপলক্ষে গোলমাল হয়। তখনও সোলেমান বেগ বুঝেন নাই যে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বাঙ্গলার প্রভু হইয়াছেন।

পলাশীর রঙ্গমঞ্চে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ এ জুন যে যুদ্ধের অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান এবং ক্লাইভের অনুমোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাকা ক্লাইভকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব ক্লাইভকে হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দেন এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের

১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'তহশীলদার' হন; হেষ্টিংস সেই সময় বর্ধমানের রেসিডেণ্ট ছিলেন। বর্ধমানের রাজা তাঁহার রাজস্ব হেষ্টিংসকে দিতেন এবং হেষ্টিংসের ঐ স্থানে তখন অনেক উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমার বর্ধমানের রাজাকে রাজস্ব তাঁহার নিকট হুগলীতে পাঠাইতে বলেন এবং সেইজন্য হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট নন্দকুমারকে দুই বার বন্দী করেন। দেশের ও দশের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংসের চেষ্টায় মিথ্যা জাল মোকদ্দমায় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসি হয়। বর্তমানে কলিকাতায় যে স্থানে বিডন উদ্যান হইয়াছে, পূর্বে উক্ত স্থানে মহারাজার সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

মিরজাফর ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকে গদিচ্যুত করেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন পরে তাহার সহিতও ইংরেজের মতানৈক্য হয় এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর দ্বিতীয়বার বঙ্গের মসনদে বসিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে 'নবাবী' করিতে হইল না। নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে বর্গী-দলপতি শ্রীভট্ট পুনরায় হুগলী লন্ঠন করেন। (২৭)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী, মিরজাফর দেহত্যাগ করিল; নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসানা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক মতিরাম নামক এক ব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার এবং বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পরবর্তীকালে কোম্পানীর দ্বারা হঠাৎ কারারুদ্ধ হন।

॥ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ॥

মিরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আগস্ট মাসে সম্রাট সা-আলম কোম্পানীকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন, কিন্তু পরবর্তী সাতবর্ষ যাবত দেশীয় কর্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব আদায় হইত বলিয়া সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল বলিয়া আবুল ফজল কৃত 'আকবরনামায়' লিখিত আছে। (২৮) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরে ইংরেজ বণিকগণ ও রেজা খাঁ সমগ্র বঙ্গের ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর লর্ড ক্লাইভের স্বাক্ষরিত সিলেক্ট কমিটির একখানি পত্রে ক্লাইভ দেওয়ানীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

The collecting of all the revenues and after defraying the expenses of the army, and allowing a sufficient fund for the support

of *Nizamut*, to remit the remainder to Delhi or wherever the King shall reside or direct.

এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয় এবং শিয়াল কুকুর রাস্তায় বসিয়া শব ভক্ষণ করিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহে গঙ্গা ভরিয়া গিয়াছিল এবং শবদাহ করিবার কোন লোক ছিল না। দুর্ভিক্ষে হুগলীর অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম:

"Tender and delicate woman whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner-chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, throw themselves before the passerby and with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down every day thousands of crops closed to the porticos and garden of the English conquerors." (২৯)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। † মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে ও উৎসন্ন যায়।" (আনন্দমঠ)

এদেশীয় লেখকগণ এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। তবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও নবাব রেজা খাঁর অত্যাচারের বিষয় একটি কবিতা তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল; নিম্নে উহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল:

"নদ-নদী খাল-বিল সব শুকাইল,
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত মাল কিনিয়া বাজারে
দেশ ছারখার গেল রেজা খাঁর ডরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর,
ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর।

† ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হয়; তাহার পর নাজিমদ্দৌলা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬—১৭৭০) নবাব মিরজাফরের পুত্রদ্বয় সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র' মিরজাফর শব্দটি বঙ্গের ইংরেজ তাঁবেদারী নবাব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে,
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

স্যার জন শোর (পরবর্তীকালে লর্ড টেনমাউথ) সেই সময় বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিষয় কবিতাকারে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। উক্ত কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইলঃ

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shribelled limbs, sunk eyes and lifeless hue ;
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie ;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scenes of sorrow, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface." (৩০)

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীকে "বঙ্গদেশের চাবি কাঠি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ষ্ট্রাভোরিনাস এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিশালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলীকে শ্মশান করিয়া দিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ. মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাদের আত্মঘাতী নীতির ফলে, হুগলীর সেই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৩৩ এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেও হুগলীতে দুর্ভিক্ষ হয়।

হুগলীতে বিভিন্ন সময়ে চারটি দুর্গ ছিল। সর্বপ্রথম হইতেছে পোর্তুগীজ দুর্গ— ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ এই দুর্গ অধিকার করে। এই দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাংশ বর্তমান জেলখানার নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইলে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ একটি দুর্গ নির্মাণ করনে। ইহা হুগলীর দ্বিতীয় দুর্গ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মোগলদুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্তমান ইমামবাড়ি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভবন, পুরাতন আদালত প্রভৃতি স্থান লইয়া মোগলদুর্গ অবস্থিত ছিল। মোগলদুর্গের পরীখার পূর্বাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। তৃতীয় দুর্গ হইতেছে ইংরাজদের স্থাপিত ঘোলঘাট দুর্গ। বর্তমান জেলখানার কিছু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। এখন ইহার আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। হান্টার সাহেব হুগলীতে পোর্তুগীজদের ঘোলঘাট দুর্গ সম্বন্ধে "ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

GHOLGHAT—Village in Hugli District, Bengal. Famous as the site of a fortress built by the Portuguese, which gradually grew into the town and port visible in the bed of the river.

॥ নবাব খাঞ্জা খাঁ ॥

নবাব খাঞ্জা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার, তিনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বসবাস করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেন এবং সেইজন্য তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তাঁহার ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি বাবুয়ানা করিলেও তাহাকে "নবাব খাঞ্জা খাঁ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতাসু হইলে, তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে একশত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধূলিসাৎ করিয়া লুপ্ত করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দুই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া তালুক পূর্বে নবাব খাঞ্জা খাঁ-র জমিদারী ভুক্ত ছিল।

॥ গৌরী সেন ॥

পশ্চিমবঙ্গে গৌরী সেনের নাম জানে না, এরূপ লোক বিরল; তাঁহার নাম প্রবচনের মত তিন শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া অসাধারণ দানের জন্য সর্বত্র সুপ্রচলিত আছে। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া "লাগে টাকা—দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খ্যাতনামা ব্যক্তি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে হুগলী শহরের অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার সম্পূর্ণ নাম গৌরীশঙ্কর সেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক। ইনি যখন হুগলীতে বর্তমান ছিলেন, তখন মুসলমান রাজত্বকাল হইলেও পর্তুগীজরাই হুগলীর সর্বময় শাসনকর্তা; ইংরাজ-শাসন তখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষ পুরন্দর সেন সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তথায় ব্যবসাদি করিতেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর পুরন্দরের অধস্তন বংশধর হলধর সেন হুগলীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; এই হলধরের প্রপৌত্রের নাম অনিরুদ্ধ সেন; অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম নন্দরাম; তাঁহার পুত্রের নাম গৌরী সেন।

গৌরী সেনের পিতা নন্দরাম সেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনি পুত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গৌরী সেন সামান্য কিছু মূলধন লইয়া তাঁহাদের বংশগত প্রথানুযায়ী আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অতি সামান্য অবস্থা হইতে সাধুতা ও প্রখর বুদ্ধিবলে প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া অসাধারণ দানের জন্য বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গৌরী সেন অসাধারণ সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার প্রতি সৌভাগ্য-দেবীর আকস্মিক কৃপা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। গৌরী সেন পর্তুগীজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম গির্জা ব্যান্ডেল চার্চের দেওয়ান ছিলেন। গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদন করিয়া পর্তুগীজেরা ব্যাণ্ডেল নামক স্থানটি প্রাপ্ত হন এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওই স্থানে তাঁহারা একটি গির্জা নির্মাণ করেন। খৃষ্টাননদের উপাসনা করিবার

ভজনালয় দেখিয়া তাঁহার মনে অনুরূপ একটি হিন্দু মন্দির করিবার বাসনা হয়। সেই সময় তিনি মেদিনীপুরের ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতেন এবং তাঁহার নিকট বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্য পর্তুগীজদের নিকট হুগলী হইতে ক্রয় করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইতেন। একবার তিনি সাতটি নৌকা বোঝাই করিয়া মেদিনীপুরে দস্তা চালান দেন। নৌকাগুলি মেদিনীপুরে পেঁাছিলে তাঁহার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র দত্ত নৌকাগুলি রৌপ্যপূর্ণ দেখিয়া উহা তাঁহার জিনিস নয় বলিয়া হুগলীতে গৌরী সেনের নিকট সেই নৌকাগুলি ফেরত পাঠাইয়া দেন।

জনশ্রুতি আছে, যেদিন নৌকাগুলি হুগলীতে ফিরিয়া আসে, ঠিক তাহার পূর্ব রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, মহাদেব তাঁহার সম্মুখে যেন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তুমি মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমায় অর্থ পাঠাইয়াছি, কাল নৌকা হইতে তাহা গ্রহণ করিও এবং তোমার বাড়ির পশ্চিমদিকের বাগানে আমার মন্দির করিয়া দিও। পরদিন প্রাতঃকালে গৌরী সেন গঙ্গাতীরে যাইয়া তাঁহারই প্রেরিত সপ্ততরীর যাবতীয় দস্তা রৌপ্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় প্রাপ্ত এই অপর্যাপ্ত ধনরাশি পরহিতব্রতে ব্যয় করিবেন এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দেবাদিষ্ট মন্দির অচিরে নির্মাণ করাইয়া তথায় জাঁক-জমকের সহিত প্রাত্যহিক পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "গৌরীশঙ্কর মন্দির" অদ্যাপি হুগলীতে বিদ্যমান আছে। মন্দির গাত্রে একটি প্রস্তর ফলকে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ নিম্নোক্তভাবে লিখিত আছেঃ

গৌরী সেন
বাংলা সন ১০০৬ সাল
ইংরাজি সন ১৫৯৯ সাল

দৈবলব্ধ ধনরাশি পাইয়া তিনি অকাতরে দীন-দুঃখী-আতুর-অনাথদের মধ্যে দুই হস্তে সেই ধন দান করিতে লাগিলেন। যে-কোন লোক অভাবগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেই তিনি অকাতরে তাঁহার দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার দানশীলতার কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং তখন লোকের কোন কার্যে অর্থাভাব ঘটিলে তাহাদের ভরসা ছিল যে, গৌরী সেনের নিকট চাহিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। সপ্তগ্রামের সর্বত্র তখন যত খাবারের দোকান ছিল, সমস্ত দোকানে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম করিয়া যে-কোন দরিদ্র ব্যক্তি খাইতে চাহিবেন, তাহাকে যেন খাইতে দেওয়া হয়। তাঁহার দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেকে তাঁহার অর্থের অপচয় করিত; কিন্তু তিনি তাহাতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতেন না। অমিতধনের অধিকারী হইয়াও তিনি বিনয়ী, ধীর ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপাদি তিনি খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করেন; তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে এরূপ এক বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেন যে, গঙ্গার পশ্চিম কূলে সেইরূপ ভোজের ব্যবস্থা আর-কেহ করিতে পারেন নাই।

সেই সময় কেহ কোন জনহিতকর কার্য আরম্ভ করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলে গৌরী সেন তাহাকে অর্থ প্রদান করিতেন, সুতরাং অর্থের সংগ্রহ না করিয়া তখন কেহ কার্য আরম্ভ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না—কারণ সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" এইরূপ অসামান্য বদান্যতার জন্য তাঁহার খ্যাতি লোক-মুখে প্রবচনের মত আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অনুমান ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।*

গৌরী সেনের বংশধরগণ এখনও হুগলীতে বিদ্যমান আছেন; কিন্তু পূর্বের সে অর্থ-বল এখন আর তাঁহাদের নাই। বেশিদিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই বংশের কলিকাতায় ত্রিশখানি বাড়ি ছিল; এখন বোধ হয় দুই-একখানি আছে। বর্তমানে শ্রীসত্যচরণ সেন, গৌরী সেনের বংশে বর্তমান আছেন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌরী সেনের যে বংশ-

* হুগলীর অন্যতম পাক্ষিকপত্র "বর্তমান ভারতে"র [১৫ আশ্বিন ১৩৬৬] সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উল্লেখ্য : **লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন॥** এই বাক্যটি এখনও বাংলার মাঠে-ঘাটে, সহরে অলিতে-গলিতে বহু লোকের মুখেই শোনা যায়। এই গৌরী সেন সম্পর্কে হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্প্রতি দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বর্তমান ভারত' পত্রিকায় দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্থানীয় এলাকায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মতে গৌরী সেন ছিলেন এক ধনী ব্যক্তি এবং তিনি পরে সর্বস্ব দান করিয়া ফকির হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে সংসার চলে না—গৌরী সেন টাকা দিবে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষম—গৌরী সেন টাকা দিবে, দোল-দুর্গোৎসব হইবে—গৌরী সেন টাকা দিবে, এমন কি লোকে দোকানে জিনিষপত্র লইবে—গৌরী সেন টাকা দিবে ইত্যাদি।

সেই সুবর্ণ বণিক সমাজকুল শ্রেষ্ঠ দানবীর গৌরী সেন হুগলীর অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার এখনও বহু নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুগলী-চুঁচুড়া পৌর কর্তৃপক্ষ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। এমন কি একটি রাস্তার নামকরণও গৌরী সেনের নামে হয় নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও হুগলী-চুঁচুড়া পৌর কর্তৃপক্ষ বৃটিশ সরকারের প্রিয়পাত্র, দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল কায়েমকারী, সেই বৃটিশ চাটুকার, বৃটিশ খেতাবধারী, প্রগতি-বিরোধী, এমন কি সমাজ কল্যাণে যাহাদের কোনরূপ অবদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাঁহাদের নামে রাস্তার নামকরণ করিতেছেন; তাঁহাদের নামে নেমপ্লেটও পড়িতেছে। কিন্তু এই স্বনামধন্য ব্যক্তি গৌরী সেনের স্মৃতিরক্ষার্থে কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নাই। ইহা অতীব লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। আমরা এই বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং গৌরী সেনের সুযোগ্য বংশধর যাঁহারা হুগলী সহরে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তালিকা পাইয়াছি, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল। শ্রীসত্যচরণ সেন গৌরী সেন হইতে অধস্তন দশম পুরুষ। তাঁহার অন্যতম পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র সেনের নাম মন্দিরে একখানি প্রস্তরে সেবায়েত বলিয়া উৎকীর্ণ আছে। বর্তমানে শ্রীমহাদেব সেন এই মন্দিরের সেবায়েত। গৌরী সেনের প্রাসাদোপম বিরাট ভবন আজও আছে; কিন্তু তিনি যে-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া গিয়াছে। আর আছে তৎপ্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্করের মন্দির।

গৌরী সেনের বংশ-তালিকা

অনিরুদ্ধ সেন। তৎপুত্র নন্দরাম সেন। তৎপুত্র গৌরীশঙ্কর সেন। তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ ও মুরলীধর সেন। হরেকৃষ্ণের পুত্র ভীমচাঁদ সেন। তৎপুত্র ঠাকুরদাস সেন। তৎপুত্র চৈতন্যচরণ সেন। তৎপুত্র রাসবিহারী সেন। তৎপুত্র প্রেমচাঁদ সেন। প্রেমচাঁদের তিন পুত্র—ক্ষেত্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও নাটুরাম সেন। ক্ষেত্রমোহনের আট পুত্র—গোবিন্দ, মাণিক, ইন্দ্র, হাবু, জহর, অমৃত, মোহন ও মন্মথ সেন। গোবিন্দের পুত্রের নাম সত্যচরণ। সুশীলকুমার দে "বাংলা প্রবাদে" গৌরী সেনের নাম গৌরীকান্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম ছিল গৌরীশঙ্কর। আর এক জায়গায় "ইনি হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামের (কাহারো মতে, বহরমপুরের) অধিবাসী ছিলেন।" (পৃঃ ৭১৩) লিখিয়াছেন। তিনি কখনও বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন না।

॥ হুগলী ও মহারাজ নন্দকুমার ॥

মহারাজ নন্দকুমার অনুমান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণী নদী বর্তমান সময়ে লোপ পাইয়াছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ, রাঢ়ী শ্রেণীর কশ্যপ গোত্র। তাঁহার পিতামহের আদি নিবাস জরুল গ্রামে। পিতামহের বিবাহের পর তাঁহারা ভদ্রপুরে আসিয়া বাস করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বাঙগলা, সংস্কৃত ও তদানীন্তন পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষেমঙ্করী। নন্দকুমার বিবাহের পূর্বেই পিতার সহিত থাকিয়া বিষয়কার্য শিক্ষা করেন। বিবাহের পর পুনরায় পিতার অধীনে থাকিয়া ফতে সিং, ঘোড়াঘাট ও সাতপাইকা পরগণার নায়েব হন।

নন্দকুমার যখন দূরদেশে ছিলেন, তখন বৃদ্ধ জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ, রায় রাঁইয়া আলমচাঁদ ও আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরফরাজের প্রধানমন্ত্রী হাজী মহম্মদ, আলীবর্দীকে বাঙগলার নবাব করিবার জন্য সরফরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন এবং গিরিয়ার যুদ্ধে ঐ চক্রান্ত সফল হইল—নবাব সরফরাজ ঐ যুদ্ধে নিহত হইলেন। উমিচাঁদ ও দীপচাঁদও এই ষড়যন্ত্রে ছিল। এই সময় নন্দকুমারের বয়স ৩৫ বৎসর। বিপ্লব শেষ হইলে নবাব আলীবর্দী নন্দকুমারকে হিজলী ও মহিষাদলের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন, এই সময় হিজলী প্রভৃতি স্থানে বর্গীর আক্রমণ হয়। রাজস্ব আদায় দুরূহ হইয়া পড়িল অথচ নবাবের টাকা চাই। ৮০ হাজার টাকা বাকী পড়িল। চিন্ময় রায় নামে জনৈক বাঙগালী নন্দকুমারকে টাকা অনাদায়ের জন্য কর্মচ্যুত করিয়া কারাগারে পাঠাইলেন। নন্দকুমারের পিতা এই টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। নন্দকুমার অনন্য উপায় হইয়া হোসেনকুলী খাঁর নিকট কর্মপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাহাতে চিন্ময় রায় বাধা দিলেন। তিনি বিফলমনোরথ হইয়া

সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কারণ, সেনাপতির উপর চিন্ময় রায়ের কোন আধিপত্য ছিল না। এই সময় মুস্তফার সহিত আলীবর্দ্দীর মনোমালিন্য চলিতেছিল। কারণ আলীবর্দ্দী মুস্তাফাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি নবাব হইলে, মুস্তাফাকে বিহারের শাসনকর্তা করিবেন। আলীবর্দ্দী ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। মুস্তাফা সৈন্যদিগের বেতন চাহিয়া পাঠাইলেন। নবাব হুকুম দিলেন, জমিদারির রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে। জমিদারগণ নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন এবং তিনি তাঁহাদের জামিন হইলেন। এই উদারতাই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। টাকা আদায় না হওয়াতে মুস্তফা নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া চিন্ময় রায়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। নন্দকুমার কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কলিকাতা আগমন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মুস্তফা সমরক্ষেত্রে নিহত হন এবং চিন্ময়েরও ঐ সময় মৃত্যু হয়। নন্দকুমার পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিলেন। অনুমান ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীতে আসেন। নবাব গুণগ্রাহী ছিলেন, মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালে তিনি আলীবর্দ্দীর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দিলেন। হেদায়েৎ আলি তখন হুগলীর ফৌজদার—নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। এই সময় চারিদিকে যুদ্ধ; নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌঁছিত না। নন্দকুমার হেদায়েতের হাত এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন এই সময় লহরীমল হুগলীর দেওয়ান হইলেন। লহরীমলের পদচ্যুতির পর মুন্সী সাদকউল্লার বিশেষ সহায়তায় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগের সময় নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ান পদ পাইলেন।

এই সময়ে নন্দকুমার "দেওয়ান নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইলেন। তখন হুগলীর ফৌজদারের হস্তে হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি প্রদেশ ছিল। ফৌজদারের পরেই দেওয়ানের পদ। ফৌজদারকে সর্বদা বৈদেশিক বণিকদিগের কার্যকলাপ ও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক সংগ্রহ ও পরস্পরের বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইত। বৈদেশিক বণিকরা ফৌজদার ও দেওয়ানকে অর্থ দিয়া বিনা শুল্কে অনেক সময় ব্যবসা চালাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফৌজদারকে বার্ষিক ২৭ হাজার টাকা দিতেন। এই সময় বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী সিরাজকে উত্তরাধিকারী স্থির করেন। সিরাজ কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া যান।

কয়েক বৎসর পরে ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদারী পদ ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে হিসাব বুঝাইয়া দিতে গেলেন। নন্দকুমারেরও দেওয়ানী পদ চলিয়া গেল। কারণ, ফৌজদারই দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। এই সময় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তিনি সিরাজকে ইংরেজ হইতে সাবধান হইতে বলেন।

সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন, রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজের মাতৃস্বসা ঘসিটি বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিতে সংকল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণদাসকে বহু ধনরত্ন দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস নবাবের ভয়ে পুরী তীর্থ যাইবার ভাণ করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইলেন। সিরাজ সিংহাসন আরোহণের ৪/৫ দিন পরেই ইংরেজকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং

কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠান। এই কৃষ্ণদাসই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পরে ভীষণ দাবানলে পরিণত করাইয়া মুসলমান রাজ্যের পতনসাধন করান। ড্রেক সাহেব কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া নবাবকে জানাইলেন, তাঁহারা নগরের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত করেন নাই। সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ পরাজিত হইয়া শিবপুর, ফলতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট বন্দী হইলেন। সিরাজ কৃষ্ণদাসকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। সিরাজের এ মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নবাব কলিকাতা অধিকার করিয়া বর্ধমানের দেওয়ান মাণিকচাঁদকে* কলিকাতার ভার দিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ আলি। নবাব কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা দেখিয়া সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমার যখন হুগলীতে আসেন, তখন ইংরেজ বণিক ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজ আর কিছু করিবে না, সে জন্য ফলতা হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেন নাই। এই সামান্য ভুলের জন্য বাঙ্গলা ইংরেজের হইয়াছিল। সিরাজ মাণিকচাঁদ ও নন্দকুমারের উপর কলিকাতার ভার দিয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময় পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গকে দমন করিতে নবাব ব্যস্ত ছিলেন।

নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হইয়াই হুগলীর প্রবেশপথ রক্ষা করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বজবজ দুর্গের সংস্কার করিলেন এবং ইংরেজের আগমন রোধ করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ আলিগড়ে নূতন কেল্লা স্থাপন করিলেন এবং ইহার অপর পারে থানা , দুর্গ মেরামত করিলেন। এই দুই দুর্গের মধ্যে গঙ্গা নদী অপ্রশস্ত ও অগভীর ছিল। তিনি ঐ স্থানে ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিলেন। ঐ স্থান বুজিয়া গেলে ইংরেজের জাহাজ হুগলী আসিতে পারিবে না। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মাণিকচাঁদ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া ফলতায় হাট বসাইলেন —যাহাতে ইংরেজের খাদ্যাভাব না হয়। এই সময়েই ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাণিকচাঁদ লোকলজ্জার খাতিরে সৈন্য লইয়া বজবজ আসিলেন; সামান্য যুদ্ধও হইল। শেষে মাণিকচাঁদ বজবজ রক্ষা না করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং হুগলী হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। মাণিকচাঁদের অভাবনীয় পলায়ন, নন্দকুমারের চিন্তার অতীত—ঐ ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ আর গঙ্গায় ডুবাইবার সময় পাইলেন না। ইংরেজ অবাধে সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নায়কবিহীন সৈন্যগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলাইল—ক্লাইব কলিকাতা দখল করিলেন।

সিরাজ মাণিকচাঁদের কাছে কলিকাতা দখলের কথা শুনিয়া নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য হুগলীর রক্ষার জন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল। তিনি হুগলী সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া ইংরেজের বলবীর্য এমনভাবে বর্ণনা করিলেন—যাহাতে সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং ঐ ভীত

* মানিকচাঁদ বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের আত্মীয় ছিলেন।

সৈন্যই নন্দকুমারের কাছে পাঠান হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ইংরেজ হুগলী আক্রমণে বাহির হইলেন—মেজর কিলপ্যাট্রিক সেনানায়ক হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক জোয়ারেই হুগলী আসিবেন, কিন্তু একখানি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া কয়েক দিন দেরী হইল। ১০ই জানুয়ারী তিনি হুগলী আক্রমণ করিলেন। হুগলীতে একটি মোগল কেল্লা ছিল। ইংরেজ রাত্রি পর্যন্ত গোলা বর্ষণ করিয়া একটি স্থান ভাঙিগয়া ফেলিল। পরদিন প্রভাতে বড় দরজার দিক দিয়া ইংরেজ ভাল করিয়া আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্য ঐ দিক রক্ষার জন্য দৌড়াইল, এ দিকে পূর্বোক্ত ভগ্নস্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করিল। নবাবের সৈন্যগণ পলাইল। দুর্গজয় করিয়া কাপ্তেন কুট কতকগুলি সৈন্য লইয়া ব্যাণ্ডেল লুঠ করিতে গেলেন। নন্দকুমার এই স্থানে ইংরেজকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। শেষে কুট কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন।

নবাব হুগলী আক্রমণ ও গ্রামাদি লুণ্ঠন ও দহনের সংবাদ পাইয়া ইংরেজ দমনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক এবং ৫০টা কামান লইয়া কলিকাতার নিকট হালসী বাগানে* উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ ইতিপূর্বে জগৎশেঠের নিকট দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইংরেজ শেঠের আশ্রয়ে গেলেন। শেঠ দেখিল, ইংরেজ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের টাকা মারা যায়, সে জন্য রণজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তিকে নবাবের নিকট ইংরেজের পক্ষ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধি কার্যে পরিণত হইল না। ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব হঠাৎ নবাবশিবির আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে যদি মীরজাফর, রায়দুর্লভ লবণের মান্য রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর অভিনয় হইত না। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ক্লাইব কলিকাতা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। উমিচাঁদ (আমিনাচাঁদ) ও জগৎ শেঠের কর্মচারী রণজিৎ রায়ের সাহায্যে সন্ধির প্রস্তাব হইল। নবাব দেখিলেন, সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, সুতরাং সন্ধি স্থাপিত হইল।

॥ চন্দননগর ও নন্দকুমার ॥

ইংরেজের সহিত নবাবের সন্ধি হইবার পর দুইটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়—১ম সংবাদ আসে, আবদুল্লা কান্দাহার হইতে উত্তরভারতে আসিয়াছেন এবং তিনি বাঙগলা আক্রমণ করিবেন। দ্বিতীয় য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে! নবাব সন্ধির কথামত আসন্ন বিপদের জন্য ক্লাইবের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিলেন। এ সময় বাঙগলায় ইংরেজ ও ফরাসীতে কোন যুদ্ধ হয় নাই—সম্ভাবই ছিল। কিন্তু ক্লাইব মনে করিলেন, যদি ফরাসী নবাবের সাহায্য পায়, তবে ইংরেজকে ধ্বংস করিবে; সুতরাং ফরাসী ধ্বংস করা উচিত। ক্লাইব যেন নবাবকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন এই ভাব দেখাইয়া চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নবাব-নন্দকুমারকে কিছু সৈন্য পাঠাইলেন—ভাবিলেন, ক্লাইব যদি হুগলী আক্রমণ করেন। এ সময় নবাবের ফরাসী-প্রীতি ছিল স্বীকার করিতে হইবে। নন্দকুমারের সৈন্য আসিলে ক্লাইব নবাবকে জানাইলেন, তিনি বুঝি ফরাসীকে সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন।'

* উহা উমিচাঁদের বাগান, বর্তমান সময়ে ঐখানে পরেশনাথের জৈন মন্দির আছে।

নবাব জানাইলেন, ফরাসী তাঁহাকে এককানা কড়িও দেয় নাই—সৈন্য নন্দকুমারের জন্যই পাঠান হইয়াছে; ফরাসী ইংরেজের অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। ফরাসীরা কয়েকখানি অকর্ম্মণ্য জাহাজ গঙ্গায় ডুবাইয়াছিল— যাহাতে ইংরেজের জাহাজ বাধা পায়। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে কিছু অসুবিধা থাকে না। সাব-লেফটেনেন্ট টেরেনিয়ান নামে এক ফরাসী বিশ্বাস-ঘাতক ওয়াটসন সাহেবের নিকট ঘুষ লইয়া ঐ সংবাদ দেয়। ইংরেজ সতর্ক হইল—যুদ্ধ হইল—ফরাসী পরাজিত হইল। এই যুদ্ধের বিষয় ইংরেজ লেখক হিল বলেন, "নন্দকুমারকে ইংরেজ ১২ হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছিল, সেই জন্য নন্দকুমার হুগলীতে নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন।" এই অভিযোগ সবন্ধে দেশী লেখকগণ নীরব। কিন্তু মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন—যিনি নন্দকুমারের দোষ দেখাইতে শতমুখ, তিনিও কিছু লেখেন নাই।

In February 1757 the well-known Nanda Kumar was Diwan and acted as *Faujdar* of Hooghly. Mr. Watts through Umichand, offered him Rs. 10,000 to Rs. 12,000, on condition that he gave no assistance to the Fernch—a condition fulfilled by him—and later on dangled before him the prospeet of being confirmed permanently as *Faujdar.* (Bengal in 1756-57 by S. C. Hill.)

নন্দকুমার নবাবকে জানাইয়াছিলেন, "ফরাসী ইংরেজ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব, পাছে আপনার বিজয়ী সৈন্যের অবমাননা হয়, আমি সেজন্য সৈন্যদিগকে হুগলী আনিয়াছি। নন্দকুমার ইহাও ভাবিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির অভাব নাই, বিশেষতঃ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য সেনাপতি অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সাহায্য পাওয়াও অসম্ভব। এ অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ। এ দিকে নবাবের কাছে সংবাদ গেল, নন্দ-কুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া ফরাসীকে সাহায্য করেন নাই। অথচ নবাবের হুকুমও ছিল না যে, ফরাসীকে সাহায্য করা। নবাব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন। নন্দ-কুমার সম্বন্ধে ইন্দোস্তান লেখক অর্ম্মি সাহেব বলেন, নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিতেন না।" পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত্ হয়। এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই—ঐ যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী হন—মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে বসেন। নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক পদচ্যুত হইলেও জগৎ শেঠ ভবনে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নাই, কোন লেখক তাঁহার সম্বন্ধে দোষারোপ করেন নাই—তাঁহার চরিত্রের ঐ একটা গৌরবজনক বিশিষ্টতা। মীরজাফর দেখিলেন, তিনি নবাব হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্লাইবের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। মন্ত্রী রায়দুর্লভ বিশ্বাসঘাতক। সেইজন্য তিনি মন্ত্রীকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষার অবসানে মীরজাফর পুর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন ও পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং রায়-দুর্লভকে সঙ্গে যাইবার হুকুম দিলেন। মন্ত্রী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে অসুস্থতার

ত্যাগ করিলেন। নবাব ভাবিলেন, তিনি যদি মন্ত্রীকে ফেলিয়া যান, কি জানি, ক্লাইবের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, সেই জন্য তিনি ক্লাইবকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন—মন্ত্রীর অসুখ সারিয়া গেল। রায়দুর্লভ নন্দকুমারকে বিশেষরূপ চিনিতেন, সে জন্য তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিলেন—পাছে মীরজাফর তাঁহার বিরুদ্ধে ক্লাইবকে কিছু বলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের সঙ্গেই রহিলেন।

নবাব দুর্লভরাম, ক্লাইব ও নন্দকুমার সৈন্য লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে চলিলেন। রামনারায়ণও সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লাইবকে এক পত্র দিলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, রামনারায়ণকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবেন। নবাব যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—কি জানি, দুর্লভরাম দ্বিতীয় পলাশীর অভিনয় করে। নবাব রামনারায়ণকে নির্ভয় হইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরণকে নবাব করিলেন, রামনারায়ণকে দেওয়ান করিলেন। এই ব্যাপারে নন্দকুমার যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইব, রামনারায়ণ, এমন কি, নবাবও তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় সমাজে যেমন ক্লাইব 'কর্ণেল ক্লাইব' নামে খ্যাত হন, জনসমাজে নন্দকুমারও সেইরূপ "কালা কর্ণেল" নামে খ্যাত হন।

ক্লাইব কিছুদিন পাটনায় থাকিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের অনুমোদনে হুগলীর দেওয়ান হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মীরজাফরের নিকট তাঁহার পাওনা টাকা চাহিলে, নবাব তাহা দিতে না পারায়, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দিলেন। ক্লাইব ঐ গোলযোগের ভিতর না গিয়া নন্দকুমারের উপর ঐ রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ আগস্ট নন্দকুমার ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর তহশীলদার হইলেন। এই সময় হেস্টিংস বর্ধমানের রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক সুবিধা ছিল। নন্দকুমার বর্ধমানরাজকে রাজস্ব হুগলীতে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হুকুম দিলেন। হেস্টিংস ক্লাইবকে পত্র দিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সমর্থন করিলেন। এই দিন হইতেই হেস্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হইলেন। রেসিডেন্ট বস্তুটি যে কি, তাহার সম্বন্ধে ১২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

নন্দকুমার যখন হুগলীতে, তখন মুর্শিদাবাদে নবাব ও রায়দুর্লভের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য চলিতেছিল, উভয়েই উভয়কে হত্যা করিতে চেষ্টিত ছিলেন। রায়দুর্লভ আত্মরক্ষার জন্য নন্দকুমারকে সংবাদ দিলেন। তিনিও কিছু সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন। হেস্টিংস এই সুযোগে ক্লাইবকে লিখিলেন নবাব নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট। ক্লাইব জবাব দিলেন, নন্দকুমার ইংরেজপক্ষ, সেই জন্য নবাব অসন্তুষ্ট। নবাবের অসন্তোষ, আমিরবেগের ফৌজদারি পদত্যাগ জন্য, নন্দকুমার দেওয়ানী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

নন্দকুমার, রায়দুর্লভ ও আমিরবেগ তিন জনেই কলিকাতায় একত্র মিলিত হইলে

নবাবের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরেজ ধ্বংস করিতে বাসনা করিলেন। দূরদর্শী ক্লাইব ওলন্দাজের চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজ ধ্বংস করিলেন। ইংরেজ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসাইলেন। মীরজাফরের নবাবী তিন বৎসর চারি মাস মাত্র হইয়াছিল। মীরজাফর অনন্যোপায় হইয়া পূর্ববৈরিতা ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধ নবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি পুনরায় নবাব হইলে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবেন। গবর্ণর ভ্যানসিটার্ট ও হেস্টিংসের আক্রোশ বর্ধিত হইতে লাগিল। নন্দকুমার কর্ণেল কুটের আশ্রয় লইলেন। কুটের প্রস্তাবে নন্দকুমার তাঁহার সহিত ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাটনায় যাত্রা করিলেন। ইহার পর নন্দকুমার হেস্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট দ্বারা দুইবার বন্দী হন। মীরকাশিম পদচ্যুত হইলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন। ইংরেজের অনুমতি লইয়া নন্দকুমার নবাবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আসিলেন। ইহার পর তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হন। মীরজাফর যত দিন জীবিত ছিলেন, নন্দকুমার তাঁহার মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন ইংরেজ লেখক নন্দকুমাররের চরিত্রে দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মীরজাফর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নন্দকুমার বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া নাজিমউদ্দৌল্লাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত হুগলীর কোন সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং সে সম্বন্ধে লেখা অনাবশ্যক।

এত দূর পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকাহিনী; পারিবারিক জীবনচরিত এবং শেষ জীবনকাহিনী না লিখিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেজন্য লেখা আবশ্যক। মহারাজের পারিবারিক জীবন সুখকর ছিল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী ক্ষেমঙ্করী আদর্শ-পত্নী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ছিলেন—সকলেই একত্রে বাস করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেন। তাঁহার একমাত্র অশান্তি ছিল—তাঁহার জামাতা জগচ্চন্দ্রের জন্য। মহারাজ তাঁহাকে পুত্র গুরুদাসের অধীনে পেস্কার-কার্যে নিযুক্ত করেন। এই জামাতাই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন। অপর জামাতা রাধাচরণ বিপদে সম্পদে মহারাজের সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন আর জগচ্চন্দ্র বিশ্বাসঘাতক হইয়া সর্বদাই দূরে থাকিতেন। নন্দকুমারের পূর্বপুরুষগণ শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী হন; পরন্তু শাক্তকে কখনও ঘৃণা করিতেন না। তিনি হুগলীর কার্যে অবসর পাইলেই হালিসহরে আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মার নামগান করিতেন; নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সহিত একত্র বসিয়া মহামায়ার উপাসনা করিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার এতই উদারতা ছিল।

অদ্যাবধি যে কার্য কেহ করিতে পারেন নাই, মহারাজ সেই কার্য করিয়াছিলেন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ। তাঁহার রাজোচিত প্রাসাদে লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে পারেন নাই।

যিনিই অত্যাচারপীড়িত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি সাহায্য করিতেন—নিজের শুভাশুভ দেখিতেন না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল এবং এই বিশিষ্টতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। অত্যাচারী, লোভী, অর্থগৃধ্নুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সেই মহামানবকে ধ্বংস করিয়াছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহারাজের আশ্রয় লন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বৈবাহিক হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কি কম নৈতিক বল? ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় এবং যাহাকে অদ্যাবধি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালাদেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় তিনি ভদ্রপুর ও মালিহাটী গ্রামে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, অধিকন্তু যে কেহ তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছিল, সেই রক্ষা পাইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ রেজাখাঁ ও ইংরেজ বণিক। ইহারা ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এই দুর্ভিক্ষে অনেকে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল—নিম্নে একখানি আত্মবিক্রয়পত্রের অবিকল নকল দিলাম।

"শ্রীলালা গুরুদাস রায় আওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবিপত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম, ভরণপোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন, একরায় বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটীবিপত্র দিলাম ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক।" "শ্রীচারুবেওয়া সংঘরুতা।"

মহারাজের শেষ জীবন

যে নন্দকুমার এক দিন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন, আশ্রিতকে আশ্রয়দান যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, যিনি দরিদ্রের মা-বাপ ছিলেন, তাঁহার শেষ জীবন বড়ই দুঃখময়। হেস্টিংসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহারাজ হেস্টিংসের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কাউন্সিলে দিয়াছিলেন। হেস্টিংস আত্মরক্ষার্থে তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে জাল মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া ফাঁসী দেওয়াইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তখনকার আইনে জাল মোকদ্দমায় ফাঁসি হইত।

বুলাকিদাস নামে এক জন শেঠের কাছে মহারাজ কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহা মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য বুলাকি, নন্দকুমারকে এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় যথা—"আমি বুলাকিদাস। এক ছড়া মুক্তার হার, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারিটা আংটি দুইটা হীরার, দুইটা মাণিকের। রঘুনাথ জীউ মহারাজ নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া ১১৬৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার মুর্শিদাবাদের কুঠীতে বিক্রয় জন্য গচ্ছিত রাখেন। নবাব মীর মহম্মদ কাশীম খাঁ সৈন্যের পরাজয়ের পর উপর উক্ত মহারাজ পূর্বকথিত গচ্ছিত জহরত আমার নিকট দাওয়া করেন, আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরত ফিরাইয়া বা তাহার মূল্য

দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে, কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা যাহা আমার কোম্পানীর কাছে প্রাপ্য আছে, সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মূল্য আমার কাছে পাওনা আছে, সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি চার আনা সুদ দিব। এ বিষয় আমি মহারাজার কাছে কোন ওজর আপত্তি করিব না। ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল।"

বুলাকি দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী পদ্মমোহন ও গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে বুলাকি দাসের পাওনা টাকা আদায় করিয়া লেন এবং বুলাকির বিধবা পত্নী মহারাজের দেনা শোধ করিয়াছিলেন। চিরপ্রথানুসারে মহারাজ ঐ খতগুলির কোণ ছিঁড়িয়া ফেরৎ দেন।

বুলাকির বিধবা পত্নী ও পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর মোহনপ্রসাদ ও অন্যান্য অংশীদারগণ গঙ্গাবিষ্ণুকে উত্তেজিত করিয়া মহারাজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনিলেন। এ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইল। মোহনপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল, যদি ঐ টাকা আদায় হয়, তবে সে শতকরা ৫৲ টাকা পাইবে—না পাইলেও পাইবে এই বন্দোবস্ত হয়। পক (Mr. Palk) সাহেব মোকদ্দমার বিচারের পূর্বেই মহারাজকে কারাগারে দিলেন। এই সময় রেজাখাঁর মোকদ্দমা চলিতেছিল। হেস্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার ব্যতীত উদ্ধার নাই. সুতরাং কারাগার হইতে তাঁহাকে আনা হইল। কার্যোদ্ধার হইয়া গেলে তিনি পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। পরে পূর্বোক্ত দলিল জাল হইয়াছে বলিয়া মহারাজকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। এই ঘটনা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শনিবার আরম্ভ হয় এবং প্রথম বিচারের দিন ৮ই জুন পড়িল। মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। সরকার পক্ষের সাক্ষী—মোহনপ্রসাদ, কমলউদ্দীন ও তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খোজা পিদ্রুস, সদরউদ্দীন, সহবৎ পাঠক, কৃষ্ণজীবন দাস ও মুন্সী পরে রাজা নবকৃষ্ণ। এই সকল সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, (১) বুলাকি দাসের অঙ্গীকারপত্রোক্ত তিন জন সাক্ষীর মধ্যে কমলউদ্দীন খাঁই মহম্মদ কমল, (২) মহাতাব রায় নামে কোন ব্যক্তি ছিল না, (৩) শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজের সাক্ষী—তেজরায় বর্ধমান রাণীর পেষ্কার, রূপনারায়ণ চৌধুরী, লালা তোমন সিং, চৈতনন্যদাস ও ইয়ারবক্স মহম্মদ। মহারাজের সাক্ষীরা বলেন, কমল মহম্মদ মরিয়া গিয়াছে, এ সে কমল নহে! কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, নবাব নজামউদ্দৌলার সময় কমলউদ্দীন আলিখাঁ উপাধি লাভ করেন এবং ঐ নামের মোহর ব্যবহার করেন। কমলের কথা সমর্থন করে খোজা পিদ্রুস ও সদর উদ্দীন। শীলাবতের সহি জাল, ইহা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিলেন সহবৎ পাঠক ও মুন্সী নবকৃষ্ণ। মহারাজের পক্ষে সাক্ষী শেষ হইতে না হইতে হুজুরিমল ও কাশীপ্রসাদকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হইল। সকলেই মহারাজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। এই মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন লেসেস্টার ও হাইড সাহেব এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন সার ইলাইজা ইম্পে। ইম্পে হেস্টিংসের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। জুরীরা সকলেই ইংরেজ, দেশী জুরীর প্রার্থনা করিলেও ইংরেজি আইনমতে সকলই ইংরেজ জুরী গৃহীত হয়। ১৬ই জুন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জাল অপরাধে

অপরাধী ঘোষিত হইল ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বাহির হইল। ৯ই আগস্ট কলিকাতার কুলীবাজারে (এই স্থানের বর্তমান নাম হেস্টিংস, খিদিরপুর পুলের উত্তর দিক) মহারাজের ফাঁসী হইল। ব্রাহ্মণের এই প্রথম ফাঁসী। মহাত্মা সক্রেটিসের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার এক শিষ্য বলিয়াছিলেন—"বড়ই পরিতাপের বিষয়, আপনি নির্দোষ, তবু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইল।" ইহাতে সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন, "তুমি কি আমায় দোষী দেখিলে সুখী হইতে?" মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। কারণ, তিনি নির্দোষ হইয়া মৃত্যুর কবলে গিয়াছিলেন। সোমড়ার রাজা রামচন্দ্র নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি হেস্টিংসকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়।

কলিকাতায় মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন কিছুই নাই। মুন্সী নবকৃষ্ণ রাজা উপাধি পাইলেন, তাঁহার নামে রাস্তা আছে, এমন কি, হুজুরিমলের নামে বহুবাজারে "হুজুরিমল লেন" আছে। মহারাজ কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন—ইহাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন। মহারাজার প্রাসাদ যে স্থানে ছিল, উহা ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় "বিডন উদ্যান" হইয়াছে। উক্ত উদ্যান তাঁহার নামে করিলে মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতিরক্ষা হইতে পারে।

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনচরিত এক অদ্ভুত কাহিনী। তাঁহার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুরুষকারের ও অদৃষ্টের ভীষণ যুদ্ধ—শেষ পুরুষকারের পরাজয়, অদৃষ্টের জয়। তিনি দেশের জন্য—দশের উপকারের জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বাঙ্গালীর ভিতর তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, অদ্ভুত ও অক্লান্তকর্মী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দেশসেবক, প্রভুভক্ত ও দরিদ্রপ্রতিপালক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। (৩১)

॥ দৈব দুর্ঘটনা ॥

সন ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে (১৮২৩ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাস) হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। ভাগীরথীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধরমপুর, মোল্লা কাশিমের হাট, রাণীর মাঠ এবং বালী একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। রাস্তা সকল জলপূর্ণ হওয়ায় লোক যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বন্যা এবং উক্ত বৎসরের ২রা নবেম্বরের প্রবল ঝটিকার সময়ও গঙ্গায় এত জল বৃদ্ধি হয় নাই। সহরের যে যে উচ্চভূমিতে জলপ্লাবন হয় নাই সে সকল স্থানে বহু লোকে আশ্রয় লইয়াছিল। মফঃস্বলে জলপ্লাবন হওয়ায় অনেকে হুগলীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট স্মীথ সাহেব তাহাদিগকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের বাসের জন্য তিনি মোগল দুর্গের নিকটে অস্থায়ী কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অক্ষমদিগকে ১২৩৲ মূল্যের খাদ্য প্রদান করা হয়। সক্ষমদিগকে স্টেশন রোডে কার্য করাইয়া ১৩৮৲ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই প্রবল বন্যায় পরগণা মণ্ডলঘাটের (এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায়) বিশেষ ক্ষতি হয়। কলেক্টর বেলী সাহেব স্বয়ং তথায় গমণ করিয়া প্রজাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। সেই বৎসর উক্ত পরগণার রাজস্ব গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণায় পুনরায় বন্যা এবং ঝড় হইয়া বিশেষ অনিষ্ট হয়। চৈত্র কিস্তি পর্যন্ত ২,০৪,৯৭২ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া-

ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রূপনারায়ণ এবং দামোদর নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া মণ্ডলঘাট পরগণা পুনর্বার জলমগ্ন হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দামোদর নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া হুগলী জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জমিদারগণের ১৭০টি বাঁধ ও ভেড়ী ভাসিয়া যায়। বালী হইতে ধনিয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর এ-প্রদেশে এরূপ বন্যা পূর্বে হয় নাই। হুগলী চুঁচুড়ার পয়ঃপ্রণালী এবং রাস্তা জলমগ্ন হইয়াছিল। জলপ্লাবনে শস্য অজন্মা হইল। অন্নকষ্ট এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। সন ১৩০৭ সালের বন্যাতে ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শিলা বৃষ্টিতে হুগলী জেলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর ঝড় হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের ঝড় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। অকস্মাৎ ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া ছয় ঘণ্টা ধরিয়া প্রবলবেগে বহিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হয়। এই দৈব দুর্বিপাকে বহুলোক আশ্রয়হীন হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ঘূর্ণী ঝটিকাতেও জেলার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে যে ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্পে হুগলী জেলার নানা স্থানে বহু গৃহ পড়িয়া যাওয়ায় অনেক লোকের মৃত্যু হয়।

হুগলীতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি ভীষণ বন্যার সংবাদ "হেজেস ডায়েরী" হইতে পাওয়া যায়। সংবাদটি এইরূপ ঃ

"September 3rd 1684—The river of Ganges is risen so high as it has not been known in ye memory of man—the water being 3 and 4 foot high in ye Bazaar. It is reported more than 1000 houses are fallen down ye Dutch quarters and boats may row round their factory in Hoogly."

॥ হুগলীতে প্রথম ॥

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্তিত **প্রথম মুদ্রাযন্ত্র** হুগলীতে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গ-ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথনেল ব্রাসী হ্যালহেড কর্তৃক প্রণীত হইয়া, হুগলীর উইলকিন্স সাহেবের ছাপা-খানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা হইত না বলিয়া, তিনি বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য সাধনের এবং ইংরেজ বণিকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন; কারণ সেই সময় বিচারাদি ও জমিদারী কার্যের যাবতীয় কাগজপত্র পূর্বের ন্যায় বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। সেই জন্য ইংরেজগণ বঙ্গ-দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় অজ্ঞতার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দের অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি এই পুস্তক-খানি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশদভাবে ৪১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

হুগলী-নিবাসী এস, কে, ধর সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে বরফ আসিবার পূর্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত;

যে স্থানে বরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অদ্যাপি 'বরফ তোলার মাঠ' বলিয়া খ্যাত। "ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা" পুস্তকে হুগলীর বরফ তৈয়ারীর কথা লিখিত আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের কার্য আরম্ভ হয় এবং হুগলীতে আড়াই তোলা ওজনের একখানি পত্র পাঠাইতে এক আনা এবং কাশীতে ঐ ওজনের পত্র পাঠাইতে সাত আনা ব্যয় হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ভ্রমণের জন্য 'ডাক-চৌকি খোলা হয়। উক্ত চৌকিতে জলপথে বজরা করিয়া এবং স্থলপথে পালকি করিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা সুরু হয়। কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী ৪৬৷৹ খরচা পড়িত। ডাকঘর ও ডাক চৌকির ইতিকথা ৩৩০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে বলিয়া আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

॥ টানা পাখা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোর্তুগীজরা হুগলীতে সর্বপ্রথম টানা পাখা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের ঘরে ব্যবহার করেন। ইহার পূর্বে আমাদের দেশে তালপাতার পাখার প্রচলন ছিল। ভোলানাথ চন্দ্র পোর্তুগীজগণ যে টানাপাখার আবিষ্কারক তাহা লিখিয়াছেন। দ্যা-গ্রান্ডে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টানাপাখার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

Many houses have a large fan from the ceiling over the eating table, of a square form balanced of an axle fitted to the upper part of it. (M. L. De Grandre)

টানা পাখার জন্ম ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হয়। অনেকে ইংরেজদের টানাপাখার প্রবর্তক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল। ব্যক্তিগত বিলাশবিহবল জীবনকে শান্তি দিবার জন্য পোর্তুগীজগণ সদাসর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন এবং তাহার ফলস্বরূপ টানাপাখা আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে "ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল" এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেনঃ

It is generally known that the punkahs which are suspended in our rooms are machines originally introduced in this country by the Portuguese.

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরিয়ান বঙ্গদেশে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় হুগলী জেলায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার বসবাসের প্রিয়তম স্থান ছিল হুগলী মট্-সাহেবের "হুগলী হাউস" নামক আবাসভবন। হুগলীতে অবস্থান কালে হেস্টিংস তাঁহাকে যে সকল পত্র দেন, তাহা বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তৎকালীন বিদেশী সুন্দরীগণের মধ্যে সর্বপ্রধান মাদাম গ্রান্ডও এই স্থানে বাস করিতেন। ডাঃ বাস্টিড তাঁহার "ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা" নামক পুস্তকে মাদাম গ্রান্ডের দুইখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এ ছাড়া প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্, পার্কাশ, হ্যামিল্টন প্রভৃতি পর্যটকগণ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং এই বংশের ব্রহ্মমোহন মল্লিক-চৌধুরী ও মিত্র বংশের ঈশানচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে হুগলীর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাশিম আলি মল্লিক, মির্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ আশারুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হ্গলী ইমামবাড়া ॥

হ্গলীর ইমামবাড়া ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাংলার গৌরব হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ হইতে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এব ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। ইমামবাড়ার সম্মুখের বৃহৎ ঘড়িটি বিলাত হইতে আনাইতে ১১৭২১ টাকা এবং গঙ্গার ধার ইট দিয়া বাঁধাইতে ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা বঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল। গঙ্গার ধারে ইমামবাড়ার গাত্রে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহম্মদ মহসীনের দানপত্রখানি উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দানবীর মহাত্মা হাজি মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়জন মহাত্মার আবির্ভাবে বঙ্গজননী গৌরবান্বিত মহম্মদ মহসীন তন্মধ্যে অন্যতম। বাল্যকালে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম মন্নু বেগম; মন্নুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রাখিয়া গতাসু হইলে, মন্নুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন মহসীন তাঁহার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান মির্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নু তাঁহার ভ্রাতা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহসীনকে অর্ধ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহসীন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সৎকার্যে ব্যয় করিবার জন্য দান-পত্র করিয়া যান। পরে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত 'মহসীন-ফন্ড' হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পূর্বে সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর আস্রাফউদ্দীন আহম্মদের চেষ্টায় এবং জন-সাধারণের অর্থে তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মহসীনের জন্মে হুগলী ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মহসীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক হইলেও একটি দর্শনীয় বস্তু; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্যমান আছে। শ্বেত প্রস্তরের আড়ম্বর-বিহীন সমাধিগুলির শীর্ষ-দেশে মার্বেল প্রস্তরের এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিচয়-লিপি উর্দুভাষায় উৎকীর্ণ আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসীন, তাঁহার ভগ্নীপতি সালাউদ্দীন খাঁ, ভগ্নী মন্নু বেগম, মাতা জনাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামাল-উদ্দীন ঠিক যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর ভাগীরথীও যেন প্রতি উচ্ছ্বাসে মহসীনের পবিত্র নাম বঙ্গবাসীকে সত্যেন্দ্রনাথের কথায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেঃ

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,

সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

॥ মহসীনের দানপত্র ॥

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি নিম্নলিখিতরূপে দানপত্র সুসম্পন্ন করেন। এই দানপত্র হুগলী ইমামবাড়ার ধনভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে। উহার ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান ইমামবাড়ার গঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীর গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, আমরা এখানে মূল দানলিপির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলামঃ

"আমি হাজি মহম্মদ মহসীন বন্দর হুগলী নিবাসী হাজি ফৈজুল্লার পুত্র এবং আগা ফৈজুল্লার পৌত্র স্বজ্ঞানে স্ববুদ্ধিতে স্বেচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত সত্য এবং ন্যায্য কথা লিপি-বন্ধ করিতেছি। যশোহর জিলার সংলগ্ন কিস্‌মত সৈয়দপুর এবং হুগলী অবস্থিত ইমামবাড়া নামক বিখ্যাত বাড়ী ইমামবাজার এবং হাট ও স্বতন্ত্র তালিকাভুক্ত ইমামবাড়া সংলগ্ন সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি যে সকল আমি উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইহার দখল সত্ত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি, আমার কোন পুত্র, পৌত্র এমন কি ন্যায্য আইনসঙ্গত কোন উত্তরাধিকারী পর্যন্ত না থাকায় এবং আমাদের বংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে হজরতের 'ফতে' ইত্যাদি পর্বোপলক্ষে দানকার্য ও অন্যান্য রীতিনীতি রক্ষা করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকায় আমি পূর্বোক্ত সমুদয় সম্পত্তি সর্ববিধ অধিকার সহ নিম্নসর্তানিরূপ ব্যয়নির্বাহার্থ খোদার নামে স্থায়ীভাবে দান করিয়া যাইতেছি।

"সেখ মহম্মদ সাদিকের পুত্র রাজবউলিখাঁ ও আমাদ খাঁর পুত্র সকিরউলি খাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম-প্রবণতা এবং সাধুতা দেখিয়া আমি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যনির্বাহের জন্য আমার সম্পত্তির মাতোয়ালি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেছি। তাঁহারা পরস্পরের উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণান্তর পরামর্শ করিয়া ও একমত হইয়া উক্ত কার্য একত্রে নিম্ন-লিখিতভাবে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবেন। পূর্বোক্ত মতোয়ালিগণ রাজস্ব প্রদানপূর্বক অবশিষ্ট উপসত্ত্ব নয়ভাগে বিভক্ত করিবেন। তাহা হইতে তিন সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি হজরত সৈয়দ ইকায়ুনত এবং নিষ্পাপ ইমামগণের 'ফতে'র জন্য মহরম উলহরাম, উস্রা ও অন্যান্য পর্ব, পর্বদিন উপলক্ষে এবং ইমামবাড়া ও সমাধি স্থান সংস্কারের জন্য ব্যয় করিবেন! দুইভাগ সমভাবে বিভক্ত করিয়া মাতোয়ালিগণ নিজ নিজ খরচের জন্য রাখিবেন। অবশিষ্ট চারিভাগ কর্মচারিদিগের মাহিয়ানা ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ খরচাদি এবং যাহাদের নাম আমার স্বাক্ষরিত ও মেহরাঙ্কিত করিয়া ভিন্ন তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের জন্য প্রদান করিবেন। দৈনিক ব্যয়ও মাসিক বৃত্তি বা বেতন বিষয়ে সর্ত রহিল যে উক্ত বৃত্তি বা বেতনধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, প্যায়দাগণ ও অন্যান্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া উক্ত মাতোয়ালীগণ স্বেচ্ছামত তাহাদিগকে কর্মে বহাল কিম্বা কর্মচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আমি সর্বজনসমক্ষে এই অধিকার উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছি। যদি কোন সময়ে কোন মাতোয়ালী

এই দলিলোক্ত কার্য করিতে অক্ষম বোধ করেন তাহা হইলে তিনি একজন উপযুক্ত এবং সুদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচন করিয়া তাহার পক্ষ হইতে মাতোয়ালির কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন উল্লিখিত সর্তগুলি অ:জ হিজিরা ১১২১, বাংগলা ১২১৩ সনের বৈশাখ মাসের ১৯শে তারিখে এই দলিল লিখিয়া দেওয়া গেল এবং প্রয়োজন হইলে উক্ত দলিলই আমার ন্যায়ানুমোদিত কার্যের যথার্থতা সপ্রমাণ করিবে।"

বাংগালী ভ্রমণকারী ভোলানাথ চন্দ্র হুগলী ইমামবাড়ার যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

One of the noblest buildings in Bengal is the Emambarah of Hooghly. The courtyard is spacions and grand. The trough in the middle is a little-sized tank. The two-storied buildings, all around are neat and elegant. The great hall has a royal magnificience. But it is profusly adorned in the Mahomedan taste with chandeliers and lanterns and well-shades of all the colours of the rain-bow. The surface of the walls is painted in blue and red inscriptions from the Koran. Nothing can be more gorgeous than the doors of the gateway. They are richly gilded all over and upon them is inscribed in golden letters, the dates and history of the Musjeed. (Travels of a Hindu)

ব্যাণ্ডেল

ব্যাণ্ডেল হাওড়া হইতে পঁচিশ মাইল দূর। বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে ইহা পর্তুগীজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ এখানে একটি সুবৃহৎ গির্জা নির্মাণ করেন। ইহাই বাংলার আদি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির।

হান্টার সাহেব "ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন গির্জা সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

BANDEL, a village on the river bank, about a mile above Hugli, containing a Roman Catholic monastery, the oldest Christian Church of Bengal.

ইহার প্রাচীরগাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। বালক যীশু ও মাতা মেরীর মূর্তি এখানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজিত হয় এবং রোগ আরোগ্য ও মনস্কামানা পূর্ণ হইবার আশায় বহু রোম্যান-ক্যাথলিক খৃষ্টান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই গির্জাটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

এই গির্জাটি একাধিকবার যুদ্ধ-বিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হস্তে পর্তুগীজগণ পরাজিত এবং মুঘল কর্তৃক হুগলী অধিকৃত হইবার সময় পর্তুগীজগণের দুর্গ ও এই গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুঘলগণ বহু খৃষ্টানকে বন্দী করিয়া

আগ্রায় লইয়া যায়। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বন্দী পাদ্রী দা' ক্রুজকে একটি মত্ত হস্তীর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে পদদলিত না করিয়া শুঁড় দিয়া আদর করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ভীত ও বিস্মিত হইয়া দা' ক্রুজকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার অনুরোধে ব্যাণ্ডেলের গির্জা পুনরায় নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন এবং উহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য বহু নিস্কর জমি প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" লিখিয়াছেনঃ

The land thus assigned was given free of rent, and the Priars were declared exempted from the authority of the *subahdars*, *faujdars* and other officers of state. They were even allowed to exercise magisterial power over Christians, but not in the matters of life and death.

হস্তীর পদতল হইতে পাদ্রী দা' ক্রুজের আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটির স্মরণে আজও প্রতিবৎসর এই গির্জায় "ডোমিংগো দা' ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের "বেঙ্গল ক্যাথোলিক হেরাল্ড" পত্রে এই ঘটনার বিবরণ লিখিত আছে। প্রবাদ, এই গির্জায় মাতা মেরীর যে মূর্তি আছে উহা পূর্বে হুগলীস্থ পর্তুগীজ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাদ্রী দা' ক্রুজ ও তাঁহার এক স্বজাতীয় বণিক বন্ধু এই মূর্তির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের মুঘল-পর্তুগীজ সংঘর্ষের সময় উক্ত বণিক লাঞ্ছনার হাত হইতে এই মূর্তিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কিন্তু মূর্তি বা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাদ্রী দা' ক্রুজ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মূর্তিটির উদ্ধার সাধনের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকেন। আগ্রা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে ব্যাণ্ডেল গির্জার সংস্কার আরম্ভ করেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে গির্জার সম্মুখে নদীর জল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে। সেই শব্দে ঘুম ভাঙিগয়া গেলে পাদ্রী দা' ক্রুজ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন বহুদিন পূর্বে জলমগ্ন তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতে-ছেন। তিনি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নালোকে নদীর এক অংশ যেন উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এক ব্যক্তি গির্জার দিকে আসিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল এবং নদীর আলোকিত অংশ পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পর-দিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিগবার পর পাদ্রী দা' ক্রুজ দেখিলেন বহু লোক গির্জার সম্মুখে একত্র হইয়া বলাবলি করিতেছে "গুরুমা আসিয়াছেন"। দা' ক্রুজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাঁহার সেই অতি প্রিয় মেরীর মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল পূর্বরাত্রে তিনি যে তাঁহার বণিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র স্বপ্ন নহে। অতঃপর মহা আড়ম্বরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্যাণ্ডেল গির্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত দেখা যায়। যে দিন মাতা মেরীর মূর্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অকস্মাৎ

একখানি বড় পর্তুগীজ জাহাজ গির্জার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ বলেন যে তাঁহারা বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েন; জাহাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা ও মানত করেন যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া জাহাজখানিকে কোন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেন। কিছু পরে ঝড় থামিলে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পান যে জাহাজখানি এই গির্জার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। জাহাজের নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত রক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ হইতে একটি মাস্তুল লইয়া গির্জায় উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই উৎসর্গীকৃত মাস্তুল গির্জার প্রাঙ্গণে শোভা পাইতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝড়, জল ও রৌদ্রে ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই জাহাজ বা অধ্যক্ষের নাম জানা যায় নাই।

ব্যাণ্ডেল হুগলী জেলার অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; এবং ইউরোপীয়গণ কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই যাইত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চ্যাম্বারস্ পর্যন্ত এই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ব্যাণ্ডেলে ছুটি উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে সংবাদটি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বরের "কলিকাতা গেজেট" হইতে এইস্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

"Sir Robert Chambers, Judge of the Supreme Court, had gone to spend the vacation at the pleasant and healthy settlement of Bandel."

পর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেল গীর্জা বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা বলিয়া, বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়গণ ভজনা করিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হইতেন; কিন্তু বহু অসৎপ্রকৃতির ইউরোপীয় এই ভজনাগারের মধ্যে নানা প্রকারের গোলমাল করিয়া প্রায়ই বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। এই সম্বন্ধে 'কলিকাতা গেজেটের' নিম্নোক্ত সংবাদটি হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। [১৫ নভেম্বর ১৮০৪]

"Caution—Bandel, 10th November 1804. Every person presents at Bandel Church while divine service is performing from the 15th to the 24th current, are requested to behave with every due respect as in their own Churches, on the contrary, they shall be compelled to quit the temple immediatety, without attending the quality of person."

ব্যাণ্ডেল গির্জার অধ্যক্ষ আলেকজাণ্ডার রডরিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য "সেন্ট জনস মিডিল ইংলিশ স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ইহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মবার্লি সাহেব উদ্বোধন করেন। "ওরিলাস-হাউসে" অবস্থিত এই বিদ্যালয় হুগলী জেলার অন্যতম প্রধান শিক্ষালয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গির্জার পরিচালন ভার গোয়া মায়ালপুর হইতে হইত। তাহার পর হইতে ইহা কলিকাতার আর্চবিশপের অধীনে আছে। বর্তমানে আর্চবিশপ পদে প্রথম ভারতীয় রেভারেণ্ড অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি হুগলী জিলার অধিবাসী।

ব্যাণ্ডেলের প্রশংসা করিয়া জনৈক ইংরাজ কবি ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, কবিতাটি এই স্থানে উল্লেখ্যঃ

BANDEL

Come listen to me, whilst I tell,
In pleasing lines the objects fell,
There's Hughli mounted on a swell
Here the bank rises, there's a dwell.
Water you'll find in many a well
No dirty roads or stinking smell
All billious gloom you'll soon dispel
And now here meet with the parcil
'Tis fine to hear the Padre's bell
Would you be known to many a belle
Ask....................who loves to dwell
Lives like a hermit in his cell
I thought to have found there madame Pelle
Each other place is hot as hel
I'm sure no argument can quell
I'll kick the rogue and make him yell
Had I ten houses, all I'd sell
Come let's away there ; haste pelmel
The charms I found at fair Bandel
In prophet viewed from high Bandel
To improve the scenery round Bandel
A change peculiar to Bandel
That's clear and sweet about Bandel
Will e'er offened you at Bandel
By a short sejour at Bandel
Of healthy air that's at Bandel,
Summon to vespers at Bandel.
Whose beauty charms you at Bandel,
And seribble verses at Bandel.

হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পর্তুগীজদিগের নির্মিত ব্যাণ্ডেল গীর্জা বাংলা-দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খৃষ্টীয় উপাসনাগার। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গীর্জা নির্মিত হয় এবং মোগল কর্তৃক হুগলী আক্রমণের সময় ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা ধ্বংস করা হয়। এই প্রাচীন গির্জা সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"This Church was founded in 1588 A. D. and the oldest Christian Church in Bengal. The Church was burnt during the siege of Hooghly but the key stone with the year 1588 inscribed on it remained in tact and this key stone was used when the Church was rebuilt in A. D. 1661 by a Portugese gentleman named Gomes De Soto. who lies buried within the precincts of the church along with other relations. When Hooghly was taken, the Mahammadans destroyed the images and books of this Church. The Emperor of Delhi subsequently made a grant of 771 bighas of land, rent free, to the church. In November of each year there is a celebrity at this Church the disciple of Novena to which the Roman Catholics largely resort from Calcutta." (List of Ancient Monuments in Bengal)

সরকারী গ্রন্থে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রস্তরফলক দেখিয়া এই উপাসনাগার উক্ত বৎসর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এই গির্জার ধর্মাধ্যক্ষ (Prior) কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন পুস্তিকায় ইহার প্রতিষ্ঠা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে দেখিয়াছি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই গির্জার সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সমারোহের সহিত জয়ন্তী উৎসব ২৮ অক্টোবর হইতে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে গঙ্গার ধারে যেখানে মেরীর মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই চিহ্নিত স্থানে একটি পাথরের বেদীর উপর ক্রস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে উহা **"ক্রস মেমোরিয়াল অলটার"** বলিয়া পরিচিত। যীশুখৃষ্টের মাতা মেরীর শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত মূর্তি দেখিতে খুব সুন্দর। এই স্থানের মূর্তি "লেডি অফ ব্যাণ্ডেল" বলিয়া খৃষ্টানদের নিকট খ্যাত। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জয়ন্তী উৎসবে "লেডি অফ ব্যাণ্ডেলে"র উদ্দেশ্যে যে কবিতা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার কয়েক লাইন এইরূপঃ

O dearest Mother, round thy altar thronging
Behold thy children in this hallowed spot.
For peace and rest their weary hearts are longing,
Which to its slaves this drear world giveth not.

ব্যাণ্ডেলের নিকট গঙ্গার উপর 'জুবিলী-ব্রীজ' অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। এই সেতু লম্বায় বার শত ফুট এবং ইহা নির্মাণ করিতে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্ধমানের মহারাজা, স্বর্গীয়

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। ঈশানবাবু বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম "হায়ার গ্রেডেড সার্ভিস" পাইয়াছিলেন এবং ৭৫০্ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কর্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী 'গুপ্তিপাড়া' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সদর দেওয়ানী আদালত কর্তৃক জজদের প্রেরিত একটি সার্কুলার অর্ডার হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত রূপে মধুসূদন বাচস্পতি কার্য করেন। সেকালের ভদ্রসমাজে কবি ও খেউড গান প্রচলিত ছিল। এই কবিগান রচনায় চুঁচুড়া নিবাসী লালুনন্দ লাল খুব বিখ্যাত ছিলেন। তাহার পর হুগলী নিবাসী রামজী উত্তম কবিগায়ক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র "সেকালের আমোদ-প্রমোদ" প্রবন্ধে ইহাদের বিষয় লিখিয়াছেন।

ব্যাণ্ডেল হইতে একটি শাখা লাইন জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব-রেলপথের নৈহাটি স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নবদ্বীপ ও কাটোয়া হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বারহাড়োয়া পর্যন্ত গিয়াছে।

॥ চুঁচুড়ার সঙ ॥

চুঁচুড়ায় বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে প্রাচীনকালে খুব জাঁকজমকের সহিত সঙ বাহির হইত। এই সঙের বিষয়ে তৎকালীন সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' এবং অমৃতলাল বসু বাবু-তে চুঁচুড়ার সঙের বিষয় লিখিয়াছেন ঃ

'চুঁচুড়োর সঙ আমার কেবল দ্যায়লা করছেন।'

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেনঃ পূর্বে চুঁচুড়োর মত বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হত না। 'আচাভো', 'বোম্বা চাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হত; শহরের নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন; লোকের এত জনতা হত যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরোস্তর হাঁড়ি চড়েনি।

প্রসিদ্ধ গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী তাঁহার গানের মধ্যেও চুঁচুড়ার সঙের কথা সুর-তান-লয় যোগে গাহিতেন। যথাঃ

গুলি হাড়কালি মা কালীর মত রঙ।
টানলে ছিটে বেচায় ভিটে যেন চুঁচুড়োর সঙ॥

চুঁচুড়ার সঙের বিষয় এখন তাই প্রবাদে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। প্রবাদটি এইঃ

গুলিখোরের কিবা ঢঙ, দেখতে যেন চুঁচুড়োর সঙ।

হুগলী সম্বন্ধেও প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে।

"মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা॥"

॥ সাময়িক পত্র ॥

ঊনিশ শতকে বাঙলাদেশে পত্র-পত্রিকার জনক-জননী ছিল হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া। সাময়িক সাহিত্য আলোচনাকালে (৪৯১-৫৪৯ পৃষ্ঠা) হুগলী জেলার পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে হুগলীর গৌরব এখন কলিকাতা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ কলিকাতায় বহু লোকের বাস ও বিচিত্র রুচির পাঠকের সমাবেশ এবং দ্বিতীয় কারণ কাগজ, ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাচুর্য ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সুবিধা। ইহার ফলে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং সংবাদপত্রের জনক হুগলী আজ তাহার পূর্ব গৌরব ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলিতেছে। হুগলী জেলা হইতে এখন আর কোন দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয় না। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বর্ধমান প্রথম, চব্বিশ পরগণা দ্বিতীয়, মেদিনীপুর তৃতীয় ও হুগলী চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে কোন জেলা হইতে কতগুলি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইলঃ

	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	ত্রৈমাসিক	মোট
বর্ধমান	১৪	৭	৫	৩	২৯
চব্বিশ পরগণা	৭	৫	৭	৬	২৫
মেদিনীপুর	১৪	—	৬	—	২০
হুগলী	৭	৮	৩	১	১৯
হাওড়া	১	৩	৬	৩	১৩
বীরভূম	৯	১	১	২	১৩
মুর্শিদাবাদ	৮	১	১	২	১২
নদীয়া	৩	৪	৪	—	১১
বাঁকুড়া	৩	৪	১	—	৮
মালদহ	৫	—	২	১	৮
পুরুলিয়া	২	১	১	—	৪

॥ দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ ॥

বাঙলাভাষায় সর্বপ্রথম প্রবাদপুস্তক **"দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ"** চুঁচুড়া নিবাসী রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশ করেন বলিয়া শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার বাংলা প্রবাদে লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ ও ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদ আছে। এই পুস্তকখানি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় মর্টন সাহেব নামের পাশে "Chinsura, July 1832" এইরূপ তারিখ দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পরে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা খৃষ্টান

অবর্জাভার" পত্রের চারিটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে "বেঙ্গলী প্রর্ভাব" নাম দিয়া আরো ১৫৬টি বাংলা প্রবাদ প্রকাশ করেন।

ইহার আগে চুঁচুড়া নিবাসী 'বঙ্গদূত' সম্পাদক নীলরত্ন হালদার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে **"কবিতা রত্নাকর "** পুস্তকেও ২০৩টি সংস্কৃত নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে জন মার্শম্যান লিখিত ইংরাজী ভূমিকা ও প্রবাদগুলির ইংরাজী অনুবাদ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'কবিতা রত্নাকরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হুগলী **ভবানী প্রেস** হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির নাম "এ ফিউ সেয়িংস এন্ড ওপিনিয়ান্স অফ লেট্ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি"।

॥ ফৌজদার ॥

হুগলীর ফৌজদার বা গভর্নরদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায় ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মালিক বেগ্ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ বরাবর ঐ পদে ছিলেন না। চট্টগ্রাম অধিকার করিবার পূর্বে সংগ্রামগড়ের দুর্গ রক্ষার জন্য ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ সরীফকে পাঠান হয় বলিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লিখিত আছে। তারপর মালিক বেগের পুত্র মালিক কাসিম ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুইবার ফৌজদার হন বলিয়া টমাস বাউরি তাঁহার "কানট্রিস রাউন্ড দি বে অফ বেঙ্গল" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। হেজেস সাহেব তাঁহার ডায়রীতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে সফিদ মহম্মদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন বলিয়াছেন। তাহার পর মালিক বরকুর্দার ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার হন। তিনি ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল গণি, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে জিয়াউদ্দীন খাঁন ফৌজদার ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। উইলসন সাহেব আর্লি এ্যানালস অফ বেঙ্গল নামক পুস্তকে জিয়াউদ্দীন খাঁন ১৭১০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে ফৌজদারের কার্যভার গ্রহণ করেন বলিয়াছেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না বলিয়া মির্জাওয়ালি বেগকে তিনি নিজের ইচ্ছায় ফৌজদার করেন। এই পদে দুইজন মনোনীত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ওয়ালি বেগ হারিয়া যান। জিয়াউদ্দীন খাঁন ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া করমণ্ডলের দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। জিয়াউদ্দীন খাঁন সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উ সালাতিন' গ্রন্থ হইতে ওম্যালী সাহেব বলেন ঃ

> Zia-ud-din Khan was friendly to the English and other Europeans, but was on bad terms with Murshid Kuli Khan, who selected Mirza Wali Beg as *Faujdar* on his own authority. The two took up arms to support their claims, the struggle ending in the defeat of Wali Beg. (Hooghly District Gazetteer).

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মীর নাসির হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে আসানুল্লা খাঁন ফৌজদার থাকাকালীন অস্টেড কোম্পানীর [illegible] কুঠী অধিকার করেন।

তাঁহার পর পীর খাঁ ফৌজদার হন এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফৌজদার ছিলেন। পীর খাঁ গিরীয়ার যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁ-র বিরুদ্ধে যান এবং আলিবর্দী খাঁ-কে সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন এবং আলিবর্দী বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। তাঁহার সময়ে বর্গীদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং দেশময় অরাজকতা বিরাজ করিত। পীর খাঁ আলিবর্দীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার বিষয় বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় লিখিয়াছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের পেস্কার মানিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ও কলিকাতা অধিকারে নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ইংরেজ লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, মানিকচাঁদই অন্ধকূপ হত্যার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। মানিকচাঁদের পর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। মোগল সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। কলিকাতায় লোয়ার চিৎপুর রোড ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে যে বাটীতে কবিরাজ বিনোদলাল সেন বাস করিতেন, তথায় হুগলীর ফৌজদারের কাছারীবাড়ি ছিল। রাজা মাণিকচাঁদ কয়েক মাস এই বাটীতে আদালত করিয়া দেশীয় ব্যক্তিদের মামলা মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের পর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ওমর বেগ খাঁন হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। খাঞ্জা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

In 1780 the system was again changed. In each of the six divisions a separate civil court was set up under a European Judge who in 1781 was vested with the powers of a Magistrate, while the establishment of *Faujdars* and *Thanadars* was abolished.

॥ দেওয়ান ॥

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এই ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কালী-কীর্তনের এক স্থলে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

ভুকৈলাসের মহারাজা উক্ত সময়ে ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন করেন এবং ভারতের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তুসমূহের বিবরণ তাঁহার আদেশে বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লিখিত হইল।

"চলাচল আইলা নৌকা হুগলী সহরে।
সে রাত্রি বঞ্চিলা কর্তা নৌকার ভিতরে॥

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥
বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান॥
ক্ষণেক কর্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভ্রমণে॥"

হুগলীতে আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম বসু। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনর বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে তিনি হুগলীর দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও বীরভূম জেলায় তিনি বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে দেবকীর্তি স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য বহু জমি বন্দোবস্ত করিয়া যান। মাহেশে ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার খরচের জন্য তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা অদ্যাপি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। তিনি দানশীলতার জন্য তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) এবং লোকনাথ ঘোষের "মডার্ন হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান চিফস" পুস্তকের ২য় খণ্ডে (৪৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণরাম বসুর উল্লেখ আছে। তাঁহার নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে জুডিসিয়েল এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের জন্য হুগলীতে প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন পদে মৌলভী সৈয়দ আহম্মদ এবং সদর আমিন পদে মিঃ গ্রেগোরিয়াস হার্কলটস (সিনিয়ার) ও রাধাগোবিন্দ সোম মনোনীত হইয়াছিলেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংবাদে ময়মনসিংহ সাহাবাদ, জঙ্গল মহল, পাটনা, সিলেট, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও সদর আইন নিয়োগের কথা আছে।

॥ হুগলী রেলস্টেশন ॥

বাঙ্গলাদেশের প্রথম রেলগাড়ী হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ১৫ই আগস্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিতে সুরু হয়। সেই দিন রেলে প্রথম ভ্রমণ করিবার জন্য তিন হাজার দরখাস্ত পড়ে, কিন্তু এই নব-অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সৌভাগ্য মাত্র চারশত লোকের হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কারণ গাড়ীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচখানি ও খোলা ট্রাক ছিল তিনখানি। ট্রাকগুলি ছিল তৃতীয় শ্রেণী আর পাঁচখানি গাড়ীর মধ্যে তিনখানি ছিল প্রথম শ্রেণী ও দুইখানি ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী। সমস্ত কামরাগুলি এই দেশেই তৈয়ারি হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিলাত হইতে "ফেয়ারী কুইন" নামে একখানি ইঞ্জিন আসে। এই 'ফেয়ারী-কুইন' প্রথম রেলগাড়ীগুলি লইয়া হাওড়া স্টেশন হইতে হুগলী স্টেশন পর্যন্ত এই চব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে। সকাল সাড়ে আটটায়

হাওড়া হইতে যাত্রা সুরু হয়। অগণিত জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতারে কাতারে এই চমকপ্রদ দৃশ্য দেখিবার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন প্রথম রেলগাড়ী তাহাদের নিকট আসিল তখন শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জনতা রেলগাড়ীকে অভিনন্দন জানাইল। কেহবা ইঞ্জিনে ফুলের মালা দিল। বেলা বারটার পর প্রথম রেলগাড়ী **বাঙলার প্রথম রেলস্টেশন হুগলীতে** আসিয়া পেঁাছিল।

প্রথম রেলযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট তারিখের "বেঙগল হরকরা" পত্রে প্রকাশিত হয়। হুগলীর রূপচাঁদ ঘোষ নামে একজন ব্যবসায়ী প্রথম ট্রেনের যাত্রী ছিলেন তিনি হুগলী পেঁাছিয়া এমন দিশাহারা হইয়াছিলেন, যে তাহার বিশ্বাস হয় নাই তিনি হুগলী পেঁাছিয়াছেন। তাই তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে সত্যই এই স্থানটি হুগলী কি না? শেষে সত্যই যখন তিনি হুগলীতে আসিয়াছেন সকলে বলিতে লাগিল, তখন তিনি আশ্বস্ত হন। আর একজন যাত্রীর নাম পণ্ডিত রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাঁজিতে দিন ক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু রেলগাড়ীতে তিনি আর ফেরেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাঁজিতে লিখিয়াছে "অগ্নিদেবের এই রথে অতিরিক্ত ভ্রমণে ফল আশু মৃত্যু" তাই তিনি রেলে আর ফিরিয়া যান নাই।

হুগলী* বাঙলার প্রথম রেলস্টেশন হইলেও একদিকে চুঁচুড়া আর এক দিকে ব্যাণ্ডেল স্টেশনের চাপে ইহা আজ একটি নগণ্য স্টেশনে পরিণত হইয়াছে।

॥ প্রাণকৃষ্ণ হালদার ॥

হুগলী*—বাঙলার প্রথম রেলস্টেশন হইলেও একদিকে চুঁচুড়া আর এক দিকে ব্যাণ্ডেল সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ইহার ন্যায় ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খুব অল্পই ছিল। তাঁহার ভবনে প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হইত। তদুপলক্ষে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকীগণ উপস্থিত হইয়া অতিথি-বৃন্দকে নৃত্যগীতে পরিতৃপ্ত করিত। পূজোপলক্ষে দশ-পনের দিন ধরিয়া তিনি সমাগত অগণিত ব্যক্তিকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। এইরূপ সমারোহের সহিত দুর্গা-পূজা হুগলী জেলায় আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। প্রতি বৎসর পূজায় তাঁহার লক্ষাধিক টাকার উপর ব্যয় হইত। তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া পূজায় সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাচের ও তাঁহার ভবনে দশ দিন আহার ও বাস-স্থানের সুব্যবস্থা করিয়া যে বিজ্ঞাপন তিনি "কলিকাতা গেজেটে" দিয়াছিলেন, তাহা ২০শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

*রেলপথ প্রসঙ্গে ৩২৪ পৃষ্ঠায় হাওড়া হইতে হুগলী মুদ্রাকর প্রমাদ বশত ২৪ মাইলের স্থলে ৪০ মাইল ছাপা হইয়াছে।

GRAND NAUCHES
Doorga Pooja Holidays
BABOO PRANKISSEN HOLDAR
of Chinsurah

Begs to inform the Ladies and Gentlemen, and the Public in General, that he has commenced giving a Grand Nauch this day, that it will continue till the 29th inst. Those Ladies and Gentlemen who have received Invitation Cards, are respectfully solicited to favour him with their Company on the days mentioned above: and those to whom the Invitation Tickets have not been sent (strangers to the Baboo), are also respectfully solicited to favour him with their Company.

Baboo Pran Kissen Holdar further begs to say, that every attention and respect will be paid to the Ladies and Gentlemen who will favour him with their Company, and that he will be happy to furnish them with Tiffin, Dinner, Wines, &c.. during their stay there.

Chinsurah, September 14, 1827. PRANKISSEN HOLDAR.

দুঃখের বিষয় বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য তাঁহার সর্বনাশ ঘনাইয়া আসে। কথিত আছে মাটির নীচে গুপ্তগৃহ নির্মাণ করিয়া তিনি সেখানে নোট জাল করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ধরা পড়িয়া সাত বৎসরের জন্য তিনি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিচার হয়। তাঁহার বিচারের সংবাদ ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির রায় ৯ মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। বিচারপতি তাঁহার দীর্ঘ রায়ের একস্থানে বলেন যে, ৬০ লক্ষ টাকা তিনি জালিয়াতির দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের পক্ষ হইতে "ব্রাহ্মণ ও ধনী ব্যক্তি" বলিয়া তাঁহার শাস্তি যাহাতে কম হয় সেই জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই বরং তিনি বলিয়াছিলেন যতদিন ইংরাজী আইন থাকিবে, ততদিন এক দোষে ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি কম সাজা পাইবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না।

Brahmins should suffer a less severe punishment than any other person for an offence, for such a principle has never been recognised nor ever will be recognised so long the English Law exists.

"কলিকাতা গেজেটে" সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ তারিখে প্রাণকৃষ্ণ হালদার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উল্লিখিত হইলঃ

Judgment was pronounced on Monday, in the case of Praun Kissen Holdar for forgery, when he was sentenced to be transported for seven years to Prince of Wales Island. This unfortunate man

once moved in a superior sphere of life, and was, at one time, understood to be a person of great wealth, and of an expensive turn, as the splendid nautches, which he was in the habit of giving sufficiently testified. Whether these extravagant entertainments trenched so far upon his means, as to produce calls that could not well be liquidated, and tempted him to have recourse to forgery, to enable him to meet the demands made upon him, we cannot say ; but the case is certainly a melancholy one, and to some will, we hope, prove warningly instructive.

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দ্বীপান্তর বাসকালে তাঁহার কলিকাতা ও চুঁচুড়ার যাবতীয় সম্পত্তি নিলামে ম্যাকেঞ্জি লায়াল এন্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই তারিখে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। চুঁচুড়ার বাড়ি তিনি প্রাণকৃষ্ণ শীলের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৩৭ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন। উক্ত বাড়ি প্রাণকৃষ্ণ শীল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বম্ভর* শীলের নামে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাড়ে ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করেন। সেই ভবন পরে তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার টাকায় হুগলী কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই "কলিকাতা গেজেটে" নিলামের বিজ্ঞাপনটি এইরূপঃ

BABOO
PRAWNKISSEN HOLDAR'S
EXTENSIVE AND VALUABLE
LANDED PROPERTY
FOR ABSOLUTE AND UNRESERVED SALE
AT THE EXCHANGE

MACKENZIE, LYALL AND CO.

BEG to announce to the Public, that they will submit for Sale, by Public Auction, at the Exchange Rooms, on FRIDAY, next, the 31st JULY, 1829, the following extensive and valuable LANDED PROPERTY ; belonging to Baboo Prawnkissen Holdar, absolutely to the highest bidders, without limit or reserve :

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পনেরটি সম্পত্তি ৩১ জুলাই তারিখে নিলাম হয়। ইহার মধ্যে আটটি সম্পত্তি কলিকাতায়, ছয়টি চুঁচুড়ায় ও একটি চন্দননগরের মধ্যে ছিল। কলিকাতার সম্পত্তির মধ্যে প্রথম ছিল এক বিঘা চোদ্দ কাঠা দশ ছটাক জমির উপর হেয়ার স্ট্রীটের ত্রিতল বাড়ি। ফাগুর্সান এন্ড কোম্পানী এই ভবনের জন্য মাসিক ৪৫০্ টাকা ভাড়া দিতেন।

কলিকাতার সম্পত্তির দ্বিতীয় লটে ছিল ৯নং রাসেল স্ট্রীটে আট বিঘা পনের কাঠা জমির উপর বাড়ি। মিঃ বার্ড মাসিক ৩০০্ টাকায় এই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। তিন নম্বর লটে ছিল পার্কস্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে তিন বিঘা জমির উপর দুইটি বাড়ি।

* বিশ্বম্ভর নামটি ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ব্রজেন্দ্রকুমার বলিয়া ছাপা হইয়াছে।

বড় বাড়ির ভাড়া ছিল ৩৫০৲ টাকা ও ছোট বাড়ির ভাড়া ছিল ১০০৲ টাকা। চার নম্বর লটে জোড়াসাঁকো চাঁপধোবা পাড়ায় বার কাঠা জমির উপর বাড়ি। পাঁচ ও ছয় নম্বর লটে চার কাঠা চার ছটাক জমির উপর সুতানটিতে দ্বিতল বাড়ি। সাত নম্বর লটে খিদিরপুর মনসাতলায় দুই বিঘা সাত কাঠা জমি। আট নম্বর লটে বেনিয়াপুকুরে এগার বিঘা বাগান।

চুঁচুড়ায় সতের বিঘা জমির উপর তাঁহার ভবন নয় নম্বর লটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া চুঁচুড়ায় দশ নম্বর লটে আট বিঘা দশ কাঠা জমির উপর একটি বাড়ি, এগার নম্বর লটে ছয় বিঘা দশ কাঠার উপর বাড়ি, বার ও তের নম্বর লটে চুঁচুড়া চৌমাথার নিকট দুইটি বাড়ি এবং চোদ্দ নম্বর লটে চুঁচুড়ায় মিরের (Merare) নামক স্থানে বাড়ি ছিল।

চন্দননগরের একটি বিরাট বাগানবাড়ি পনের নম্বর লটের মধ্যে ছিল। কলিকাতা গেজেটে সমস্ত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ও চৌহদ্দি লিখিত আছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ তারিখে টুলো এন্ড কোম্পানী প্রাণকৃষ্ণের হুগলী ও ২৪ পরগণায় অবস্থিত আরো আটটি তালুক নিলামে বিক্রয় করে। এই নিলামের বিজ্ঞাপন উক্ত বৎসরের ৮ মার্চ তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। হুগলী জেলার তালুক-গুলির বিবরণ এইরূপঃ

লট নং ১ — তালুক তুরুফ জগদীশপুর; ইহার মধ্যে ১০৬টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ২ — তালুক বাহাদুরপুর ও নরোত্তমবাটী; ইহার মধ্যে ৪০টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ৩ — তালুক মহম্মদপুর; ইহার মধ্যে ২১টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ৪ — তালুক হারিট; ইহার মধ্যে ৪টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

প্রাণকৃষ্ণের বিলাসিতার কথা লোকস্মৃতিতে প্রবাহিত হইতে হইতে শেষে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। সুশীলকুমার দে বাংলা প্রবাদে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদটি এইঃ

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম নবীনচন্দ্র হালদার। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। দ্বীপান্তর সাধারণতঃ চৌদ্দ বৎসর হইত বলিয়া ৩৫৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার কারাবাস চৌদ্দ বৎসর লিখিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সাত বৎসরের জন্য দণ্ডিত হন। তাঁহার ভবন সম্বন্ধে হুগলীর রেভিনিউ কমিশনারকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে লোক্যাল এজেন্ট কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ী শীল বংশের নিকট হইতে ক্রয় করিতে উদ্যোগী হন, তখন প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত শীল বংশের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিনানুযায়ী এবং প্রাণকৃষ্ণের কারাবাসের জন্য অনুপস্থিতিতে উক্ত বাড়ী ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নিলাম করানো একরারনামা অনুসারে সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া তিনি আপত্তি করেন। বলাবাহুল্য তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। রেভিনিউ কমিশনারকে লিখিত পত্র এইরূপঃ

"Prankissen Seal, however, it would appear, instead of acting upon this agreement and exacting a deed of mortgage from Prankissen Halder sued him in the year 1834 upon the simple bond, obtained a judgement in his favour and had the two houses in Chinsurah put up at the Sheriff's sale in satisfaction of the debt."

কমিশনারকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্র দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ শীলের নিলাম করান ঠিক হয় নাই বলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াইজ সিদ্ধান্ত করেন যে দলিলে বিক্রেতা হিসাবে শীলদের সহিত হালদারদেরও সহি না করাইলে সরকার নিব্যূঢ়সত্ত্বে ইহা ক্রয় করিতে পারে না। সেই জন্য ডাঃ ওয়াইজ হালদার মহাশয়দের দলিলে সহি করিবার জন্য মত করান ও তজ্জন্য তাঁহারা বাড়ির জন্য দুই হাজার টাকা মূল্য পান। এই সম্বন্ধে হুগলী কলেজের ইতিহাসে লিখিত বিবরণ উদ্ধারযোগ্যঃ

To make the title safe, an attempt was made to induce the Haldars to join in the conveyance ; and, at length, early in 1839 Dr. Wise drew a bill for Co. Rs. 23,333-5-4 of which Rs. 21,333-5-4 (Sicca Rs. 20,000) were to go to Seals, and Rs. 2,000 to the Haldars.

॥ হুগলী আদালত ॥

প্রাচীনকালে মুসলমান আইন-কানুন অনুসারে কাজীগণ যাবতীয় বিচারাদি করিতেন। পরবর্তীকালে ফৌজদারগণ বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের বিচার নাজিমের দ্বারা সাধিত হইত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগেও এই নিয়মে কার্য হইত কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এই প্রথা বদলাইয়া দেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী বিচারের ভার অমিলদের হাতে দেওয়া হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজ বিচারকের হাতে জেলার ভার দেওয়া হয় এবং ফৌজদার পদ উঠিয়া যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুন্সেফ পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদিগকে বেতনের পরিবর্তে তখন কমিশন দেওয়া হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কমিশন দেওয়া রহিত করিয়া মাসিক একশত টাকা হইতে দেড়শত টাকা পর্যন্ত বেতন নির্দিষ্ট করা হয়। মুন্সেফদের বেতন কম থাকায় তাঁহারা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিতেন। সেইজন্য পরে তাঁহাদের বেতন দুইশত হইতে চারশত টাকা বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী, নওসরাই, মহানাদ, বৈদ্যবাটী, রাজপুর, দারহাট্টা, ক্ষীরপাই, বালী ও উলুবেড়িয়া এই নয় জায়গায় মুন্সেফী আদালত ছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবে বাংলা মাসের প্রচলন ছিল। কিন্তু আদালতসমূহে পারস্য ভাষা চলিত। হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে পারস্যভাষা সম্পূর্ণ রহিত হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলিত হয়। এই সময় রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবে ইংরাজী মাসের প্রচলন হয়। ডেপুটি-ক্যালেক্টার নিযুক্ত করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রার্থীগণের আবেদন সকলের আগে মঞ্জুর হইত। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি না পাওয়ায় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষকে ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রগণকে ডেপুটি-ক্যালেক্টার কিম্বা ইংরাজী বিভাগের অন্যান্য কার্যের জন্য মনোনীত করিয়া পাঠাইতে লেখা হইত। আবগারী কমিশনার মিঃ ডোনলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ছাত্রদের ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতার কথায় লিখিয়াছেনঃ

Native lads are much better acquainted with English than their own language.

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হইতে প্রেরিত হরচন্দ্র ঘোষ (আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) মথুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণীধর রায় (সেরেস্তাদার), যাদবচন্দ্র বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেস্কার নিযুক্ত হন।

॥ জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা ॥

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ একটি বড় মোকদ্দমা হুগলী আদালতে হইয়াছিল এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর মেদিনীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণের এই প্রকারের আর একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল।* এই মোকদ্দমাটি হুগলী জেলার নহে বলিয়া উহার বিবরণ দিলাম না। তখনকার দিনে প্রত্যেক লোকমুখে প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমার কথা হইত—তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইত। প্রায় শতকরা ৯৯ জন লোক প্রতাপের পক্ষে কথা বলিতেন। এই মোকদ্দমায় বড় বড় সাহেব, রাজা, জমিদার, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ সাক্ষী ছিলেন। এরূপ চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমা কেবল হুগলী জেলায় নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আর হয় নাই।

প্রতাপচাঁদ বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—নানকী মহারাণীর একমাত্র পুত্র। মহারাণী প্রতাপের শৈশবেই দেহত্যাগ করেন। প্রতাপের কতকগুলি দোষও ছিল—গুণের ভাগ অধিক ছিল। প্রতাপ কোন একটা মহাপাতক করিয়াছিলেন, সেই জন্য পণ্ডিতরা ব্যবস্থা দেন যে, ১৪ বৎসর অজ্ঞাতবাসই প্রায়শ্চিত্ত। প্রতাপ এই প্রায়শ্চিত্ত মানিয়া লইলেন। প্রতাপ বাড়ী হইতে পলাইলেন। কিন্তু মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহার সন্ধান পাইয়া রাজমহল হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। এইখানেই বলিয়া রাখি, প্রতাপ একজন হঠযোগী ছিলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিতে পারিতেন, এমন কি, মৃত্যুর ভাণও করিতে পারিতেন। ডাক্তার-কবিরাজ কিছুতেই উহা ভাণ কি সত্য ধরিতে পারিতেন না।

এক দিন স্নানান্তে প্রতাপ জ্বরের ভাণ করিলেন। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার-কবিরাজ আসিলেন, কেহই কিছু করিতে পারিলেন না—শেষ কালনায় গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল। মহারাজ সঙ্গে যান নাই। গঙ্গার ঘাট কানটে ঘেরা হইল। রাত্রিতে মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইল। প্রতাপ কিন্তু পলাইলেন। প্রতাপের পলায়নের পর মহারাজ প্রায়ই বলিতেন—"প্রতাপ আবার আসিবে।" লোকে বলিত, মহারাজ শোকার্ত হইয়াই ঐ কথা বলিতেছেন। প্রতাপ তখন পূর্ণযুবা।

১৪ বৎসর অতীত হইলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একজন সন্ন্যাসী বর্ধমানে প্রবেশ করিলেন। এইখানে গোপীনাথ ময়রা প্রথম তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। চারিদিকে কথা ছড়াইয়া পড়িল। মহারাজা ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজার শ্যালক

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" রাজা রুদ্রনারায়ণের মামলার বিবরণ আছে।

(এবং শ্বশুরও বটে, কারণ, শ্যালক-কন্যাকে তিনি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করেন) পরাণবাবু (পুরাতন সংবাদপত্রে প্রাণবাবু উল্লেখ আছে) লাঠীয়াল লাগাইয়া সন্ন্যাসীকে দামোদর নদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহারাজার মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ তেজচন্দ্র পরাণবাবুর নাবালক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাণবাবুই তাঁহার অভিভাবকরূপে কার্য চালাইতেছিলেন।

প্রতাপ বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট চলিয়া গেলেন—তিনি প্রতাপকে চিনিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। সেখানে ৩ মাস রহিলেন। রাজা পরামর্শ দিলেন, বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হুকুম লইয়া বর্ধমানে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রতাপ সন্ন্যাসিবেশেই বাঁকুড়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকবাংলোর কাছে একটি তেঁতুলতলায় সাহেবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এই সময় বাঁকুড়ায় জঙ্গলী লোকের একটি বিদ্রোহ হয়। সেজন্য ফৌজও আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বর্ধমান-রাজকুমার প্রতাপ দেশে ফিরিয়াছেন—রাজা ক্ষেত্রনাথ সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন। সুতরাং চারিদিক হইতে ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য জনতা হইতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়েট বলিলেন, ঐ ফকিরই 'আলেক সা' বিদ্রোহীর নেতা। ফৌজের কর্তা লিটিল সাহেব যুদ্ধে আসিলেন। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারের দরকার হইল না। প্রতাপকে জেলে দেওয়া হইল। লিটিল সাহেবের বীরত্ব সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল। এই ঘটনা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হয়। প্রতাপের দুর্ভাগ্যের এটি তৃতীয় পর্ব—প্রথম পর্ব সন্ন্যাসী হওয়া; দ্বিতীয় পর্ব বর্ধমান হইতে তাড়িত হওয়া।

কয়েকমাস জেলে থাকিয়া মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপ কলিকাতায় গেলেন। সেখানে বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নৌকাযোগে কোন আড়ম্বর না করিয়া প্রতাপ বর্ধমান যাইবেন। এই সময় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ ডেপুটি গভর্ণর আলেকজাণ্ডার রস্ সাহেবকে এক দরখাস্ত করেন যে, বর্ধমান যাইলে যেন তাঁহাকে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহার কোন বিপদ বা প্রাণহানি না হয়। কিন্তু ৫ই মার্চ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ফ্রেড্রিক হ্যালিডে (পরে ছোটলাট হইয়াছিলেন) ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। তবুও প্রতাপ ভগ্নমনোরথ না হইয়া বর্ধমান যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর খুব কমই হইল। তবুও ৪০।৫০ খানি নৌকা এবং ২।৩ খানি বজরা লইয়া তিনি প্রথম কালনায় (১৩।৪।১৮৩৯) তারিখে পেঁৗছিলেন। তাঁহার উকিল 'শ' সাহেব ও সিঙ্গুরের নবাববাবু (শ্রীনাথবাবু) স্থলপথে যাত্রা করিলেন। ইহা ২রা বৈশাখের ঘটনা। পরাণবাবুও ঐ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি প্যারীলাল নামে জনৈক ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইলেন। তাহার বন্দোবস্তে, প্রতাপ যখন কালনায় পেঁৗছিলেন (৮ই বৈশাখ), তখন প্রতাপের লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইল না। প্যারীলাল পুলিসকে হাত করিলেন এবং একজন দেশী খৃষ্টানকে হাত করিলেন। প্রতাপ যখন কালনায় অবতরণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন, তখন দারোগা মহিবুল্লা লোকজন লইয়া চলিলেন, হটো হটো শব্দে দিগন্ত কাঁপাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট, পাদরী আলেকজাণ্ডার সাহেবকে ঐ বিষয় জানিবার জন্য পত্র দিলেন এবং একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিলেন। পাদরী সাহেব তাঁহার

জনৈক খৃষ্টানকে ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে বলিলেন। ঐ খৃষ্টান (যাহাকে প্যারীলাল হস্তগত করিয়াছিল) যাহা বলিল, পাদরী সাহেব তাহাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন, প্রতাপ উন্মুক্ত অসি হস্তে এক শত অস্ত্রধারী, তাহার দ্বিগুণ লাঠীয়াল ও প্রায় ৪।৫ হাজার লোক লইয়া আইন-বিরুদ্ধ জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্মঠ দারোগা মহিবুল্লা উহাদিগকে বাধা দিয়াছে! এই সময় উকিল 'শ' সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রতাপ সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতাপকে ও শ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হইল। শুধু তাহাই নহে, প্রায় ৩।৪ শত অধিবাসীকেও ধরা হইল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণও বাদ পড়ে নাই। সকলেরই চালান হইল হুগলীতে। শ সাহেব, সাহেব বলিয়া অতি কষ্টে রেহাই পাইলেন। খবরের কাগজে উঠিল, কালনায় একটা মস্ত বিদ্রোহ হইয়াছিল—বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যামুয়েল সাহেব হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট—কিছুদিন পূর্বে বর্ধমানে ছিলেন। পরাণ-বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। প্রতাপ যখন প্রথম বর্ধমানে গিয়াছিলেন, স্যামুয়েল সাহেব তখন বর্ধমানে ছিলেন। পরাণবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, প্রতাপ একজন জুয়াচোর।* এখন প্রতাপকে হাতে পাইলেন। ইতিপূর্বে গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল নামে একজন জুয়াচোর ৪।৫ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। এখন সেই ব্যক্তিই জালরাজা সাজিয়াছে, অতএব সনাক্তের জন্য নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হালকোট সাহেবকে পত্র দিলেন। হালকোট সাহেব লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণলাল বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং পুনরায় চিঠি গেল। এবার সরকারী কর্মচারী-দিগকে পাঠান হইল। এই সময় কলিকাতার দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে স্যামুয়েল সাহেব এক পত্র দিলেন। তখনকার দিনে সাক্ষীর জবানবন্দী কাহাকেও শুনান হইত না। অনেক সময় আসামীর অনুপস্থিতে সাক্ষী লওয়া হইত। জালরাজার বিরুদ্ধের সাক্ষীদের জবান-বন্দী 'সমাচার দর্পণে' ছাপা হইত এবং গ্রামে গ্রামে পাঠান হইত; কিন্তু জালরাজার স্বপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী কোথাও পাঠান হইত না।

স্যামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর জালরাজার মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।" রাজা অবাক। ইহার কিছুদিন পূর্বে কালনায় তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া অন্যায় জনতার সৃষ্টি করা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল আর এখন জালরাজা! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, অপরাধ গুরুতর,—জামিন দেওয়া হইবে না—চারি মাস হাজতে কাটিল। আরও আশ্চর্য এই যে, প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি হইবে, তাহারা কেহ নালিশ করিল না, পরাণ-বাবু নালিশ করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের এত কি গরজ, এই কথা লোকে বলিতে লাগিল।

তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। ১ম জালরাজার সনাক্ত সম্বন্ধে, ২য় প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে, ৩য় জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না এই তিন চার্জ দিয়া দায়রা-সোপর্দ করা হইল। প্রতাপের সঙ্গে আরও কয়েক জনকে আসামী করিয়া গ্রেপ্তার করা

হইল, যথা—রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল (প্রতাপের মোক্তার), হাফেজ ফতেউল্লা, সাগরচন্দ্র ধর, কালী-প্রসাদ সিং, জমন খাঁ ও রাজা নরহরিচন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৬ মাস পূর্বে বিগনেল সাহেবকে ৫০০ টাকা বেতনে ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রেনসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। মটন সাহেব ও শ সাহেব আসামীর পক্ষে ছিলেন। মটন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করিলেন যে, তিনি আসামীর পক্ষে থাকিবেন, তাহাতে তাঁহার আপত্তি আছে কি না? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিগনেল সাহেব বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মটনের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। আদালতে চিনার (একজন ফরাসী চিত্রকর প্রতাপের চেহারা অঙ্কিত করিয়াছিল) অঙ্কিত প্রতাপের ছবি আনা হইল।

প্রথমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের লোকদের সাক্ষী পাঠাইলেন। সেক্রেটারী প্রিন্সেপ, দেওয়ানীর জজ হাচিসন, বোর্ডের মেম্বার প্যাটেল ঐরাবতী জাহাজে চড়িয়া হুগলী আসিলেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর নিজের ষ্টীমারে হুগলী আসিলেন।

সনাক্ত ঃ—গবর্ণমেণ্ট সাক্ষী দি, টি, ট্রাওয়ার বলিলেন, অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে; কিন্তু এ আসামী প্রতাপ নহে। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এই ব্যক্তির চক্ষু লাল।...কিন্তু ডাক্তার হ্যালিডে (তখন তিনি কাশীতে ছিলেন) বলিয়াছিলেন, এই আসামীই প্রতাপচাঁদ। দায়রায় বলিলেন, এই আসামী কখনই প্রতাপ নহে।

প্রিন্সেপ সাহেব (গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী) বলিলেন, প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। দায়রায় বলিলেন যে, জেনারেল আলার্ড (রণজিৎ সিংহের সেনাপতি) ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।

প্যাটেল সাহেব (James Patel) বোর্ডের মেম্বর বলিলেন, "এই ছবির সহিত আসামীর কোন সাদৃশ্য নাই।"

বিচার সাহেব (John Beacher) বলিলেন, "মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একইরূপ লম্বা। দায়রায় এই সাক্ষীকে সাক্ষী দেওয়া হয় নাই।

ওভারবিক (Overbeck) সাহেব ওলন্দাজ-গভর্ণর প্রতাপের ছবি দেখিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম,—ইনি আমার পূর্বপরিচিত ছোট রাজা...তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর বামভাগে মেহগ্নি রঙের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল। তিনি ঊর্ধ্বে চাহিলে সেটি দেখা যাইত। এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে।......

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সহিত আমার বড় বন্ধুত্ব ছিল...প্রতাপের ছবি আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, এই আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।

রাজা বৈদ্যনাথ বলিলেন, ইহাকে প্রতাপ মনে করিয়াছি, টাকা কর্জ দিয়াছি। ডাঃ হ্যালিডে জেনারল আলার্ড এইরূপই বলিয়াছিলেন—এই সেই প্রতাপচাঁদ।

গোপীমোহন দেব বলিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" পরাণবাব্র সকল সাক্ষীই বলিল—এ প্রতাপচাঁদ নহে।

সনাক্ত সম্বন্ধে আসামী প্রতাপচাঁদের সাক্ষীঃ ডাক্তার স্কট (মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রী) বলিলেন, "আমি ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানে ছিলাম।......... প্রতাপের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি, এই সেই প্রতাপচাঁদ।

মিঃ জন, রিডলি, বিবি হ্যারিয়েট, সফিয়াক্লেন, ফ্রানস্রয়া স্লিমান (ফরাসী), হাজী আব্ব তালেক, আমীর উদ্দীন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখন "হরকরা" কাগজে এই বিষয়ে অনেক কথা বাহির হয়।

পরাণবাব্র সাক্ষীদের কথায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করিয়া বলিলেনঃ

The proof here is of the strongest description of the witnesses.

পরাণবাব্র লোকরা প্রতাপের মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বলিয়া ছিল, কিন্তু তাহার বারো বৎসর পরে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যুর খবর বলিতে পারে নাই। প্রতাপ যে মৃত্যুর ভাণ করিতে পারিতেন তাহা অনেক বড় বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন। প্রতাপ বলিলেন, তিনি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন না। এই মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখন "হরকরা" কাগজে মামলা সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হয়।

নিজামত আদালতে প্রতাপ জামিন দিয়া খালাস চাহিলেন, সে হ্বকুমও হইল, কিন্তু কার্টিস সাহেব নিজামতের হ্বকুম শ্বনিলেন না। যাহারা জাল রাজার সঙ্গে জেলে গিয়াছিল, তাহাদের ৭ মাস পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মোকদ্দমার রায়ঃ—এই সময় হ্বগলীর জজ সাহেব জাল রাজার সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেষ করা হইল। জজরা বড় বিপদে পড়িলেন; ভাবিলেন, আসামীকে কি করিয়া সাজা দেওয়া যায়? শেষে কাজী সাহেব রক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আত্ম-উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদী ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন—হ্বকুম দিলেন যে, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদ্বরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলেকশা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা গেল এবং অনাদায়ে ছয় মাস কারাবাস হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে ম্বক্তি দেওয়া গেল। এই রায়ের উপর প্রতাপ দরখাস্ত করিলেন, নিজামত আদালত উহা অগ্রাহ্য করিলেন। নিজামত আদালত হ্বকুম দিলেন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা শ্বনা যাইবে না। দরখাস্তকারী ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা হইবে না। কেন না, বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে। এই হ্বকুমই প্রতাপের সর্বনাশের ম্বল। প্রতাপের সকল পথ বন্ধ হইল। প্রতাপ যে ফকির, সেই ফকিরই হইলেন। প্রতাপের মোকদ্দমা শেষ হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর।

শেষ যবনিকাঃ—প্রতাপ কিছ্বদিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন। তাহার পর কল্বটোলার গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে ২।৩ মাস ছিলেন। গোবিন্দ প্রতাপের জন্য সর্বস্ব

ব্যয় করিয়াছিলেন। পরে কিছুদিন শ্যামপুকুরে ছিলেন। ঐ সময় লাহোরে লড়াই বাধে। গভর্ণমেণ্ট প্রতাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তিনি অগত্যা ফরাসী চন্দননগরের বোড়াই চণ্ডীতলায় আসিয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীরামপুরে আসেন। তখন শ্রীরামপুর দিনেমারদের অধিকারে। এখানে ৬।৭ বৎসর ছিলেন। এই সময় তিনি ঠাকুর সাজিয়া সমস্ত দিন ঝারায় বসিয়া থাকিতেন। বেশ্যারা পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় আরাত্রিক করিত। প্রতাপ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ফরাসী ও রুশ রাজনীতি সকলকে বুঝাইতেন। বেদান্ত লইয়া পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন। লোকের ধারণা হইয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। এই সময় তাঁহার অনেক মন্ত্র-শিষ্যও হইয়াছিল। তিনিই বর্তমান "ঘোষপাড়ার দলের" সৃষ্টিকর্তা। মৃত্যুর আট মাস পূর্বে বরাহনগরে আসিয়া বাস করেন। ১৮৫২ কিম্বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ময়রাডাঙ্গার পল্লীতে দুই তিনটি লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রাক্তন কর্মফল শেষ হয়। তাঁহার শবযাত্রার সময় চোখের জল ফেলিবার কেহ ছিল না। তাই বলি, হে পুরুষকার, তুমি কিছুই নহ। তোমার আশ্রয় করিয়া মানুষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে, শেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে! তাই বলি "বিধিরহো বলবান্ ইতি মে মতিঃ!"

॥ পুরাতন সংবাদপত্রে প্রতাপের কথা ॥

"জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রে লেখে যে শ্রীযুত জেনারেল আলার্ড সাহেব* হুগলীর কারাগারে যাইয়া রাজা যিনি কারাগারে বদ্ধ আছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিলেন; অনুমান তিন ঘণ্টা বেলার সময়ে শ্রীযুত সৈন্যাধিপতি তত্রস্থ কয়েক জন সাহেবের সমভিব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিবাতে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সমাদর পূর্বক চৌকিতে বসাইলেন, পরে অনেক কথোপথন হইল, তাহাতে শ্রীযুত কহিলেন যে, তোমার দুর্ভাগ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং সাধ্যমত যদি কোন সাহায্য করিতে পারি, তবে করিব। অনন্তর বেলা ৪৷৷০টার সময়ে শ্রীযুত প্রস্থান করিলেন। ১১২১ সংখ্যা কলম ১৯, ৭ই জানুয়ারী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ "সমাচার দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত।

"জেনারেল আলার্ড ও বর্ধমানের রাজা"

"শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক মহাশয়েষু"

"শ্রীযুত জেনারেল আলার্ড সাহেব যে হুগলীর কারাগারে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, আপনি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয় নাই, অতএব আমি বিশেষ করিয়া লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞানান্বেষণে অর্পণ করিবেন।

ঐ শ্রীযুত জেনরল সাহেব কলিকাতাতে আসিয়া প্রথমে শ্রীযুত মহারাজের উকীলের বাসাতে লোক প্রেরণ করেন, তাহাতে উকিলবাবু শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল সাহেবের ঘরে গিয়া সাক্ষাৎ করিবাতে সাহেব রাজার সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, তুমি সন্ন্যাসীর

---

* পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান সেনাপতি। ইনি ফরাসী ছিলেন।

নিকট গিয়া আমার সংবাদ জ্ঞাপন কর এবং তিনি যদি পত্র লেখেন তবে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পরে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল ৬ই পৌষ হুগলীতে গিয়া শ্রীযুত মহারাজকে সংবাদ কহিবাতে শ্রীযুত মহারাজ তৎক্ষণাৎ সাহেবকে পত্র লেখেন, তাহারই পরে সাহেব হুগলীতে গমন করেন।

শ্রীযুত জেনরল সাহেব হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ সাহেবকে সমাদর পূর্বক গ্রহণার্থ রাধাকৃষ্ণ ঘোষালকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং শ্রীযুত সাহেব কারাগারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাজা আপন বাসগৃহের বাহিরে আসিয়া সাহেবকে গ্রহণ করেন। প্রথম সাক্ষাতে সাহেব রাজাকে অগ্রে সেলাম করিলেন, পরে মহারাজ শ্রীযুতের হস্তধারণ পূর্বক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আলিঙ্গন পূর্বক শিষ্টাচার করত গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বসিলেন, পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার এরূপ দুর্দশা কেন হইল? তাহাতে রাজা কহিলেন, 'আমার অসৌভাগ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? পাঞ্জাব হইতে আসিয়া কতক লোক সহিত আপন বাটীতে যাইতেছিলাম, এই অপরাধে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সঙ্গী লোকদিগের সহিত আমাকে কয়েদ করেন এবং সেইখানে ছয় সাত মাস কারাভোগ করিয়া দোষী লোকের ন্যায় ধৃত হইয়া হুগলীতে আসিয়াছিলাম, তাহাতে ভরসা ছিল, হুগলীতে আসিয়া খালাস পাইব; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত এখানেও ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদ হইয়াছি।"

শ্রীযুত রাজার ঐ সকল কাতরোক্তি শ্রবণে শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেব যে পর্যন্ত খেদ প্রকাশ করিলেন, আমি তাহা এ স্থলে বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি ঐ দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন শ্রীযুত রাজার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব এবং শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট যে পত্রাদি লিখিত হইবে, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, আমি আরও এক দিবস আসিয়া তাহা লইয়া যাইব।" সম্পাদক মহাশয়, ঐ দিবস শ্রীযুত জেনরল কারাগারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বাবধি কারাগারের চতুর্দিকে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং কারাগারের বাহিরে আসিবামাত্র ঐ লোকসমূহ সাহেবকে বলিতে লাগিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি শ্রীযুত মহারাজকে খালাস করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মহাশয় চলিলেন। অতএব আমরা নিরাশ হইয়া মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে রাজা খালাস হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন, আপনি অবশ্য তাহার চেষ্টা করেন। ...শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র এইক্ষণে বলিতেছেন, তিনি পঞ্জাবে থাকিতে শ্রীযুত শীকরাজ বর্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজকে যুবরাজের বিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ মহারাজ উত্তর লিখিয়া পঞ্জাব হইতে লালকবুতর আনিবার জন্য রণজিৎ সিংহের নিকট তিনজন আর্দালী পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বধূরাণীদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরে শীকরাজা লালকবুতর শব্দের সঙ্কেতার্থ বুঝিয়া শ্রীযুত যুবরাজের বিশেষ সমাচার লিখিয়া ঐ তিন আর্দালীকে বর্ধমান পাঠাইয়া দেন এবং ঐ পত্র আসিবামাত্রই বৃদ্ধ মহারাজ বধূরাণীদিগের সহিত আপস করেন এবং বধূরাণীরাও সেই

পত্রের মর্মার্থ শুনিয়া মুশহেরা পাইয়া চুপ করিয়াছিলেন, পরে বৃদ্ধ মহারাজ ঐ পত্র কোন গোপন স্থানে রাখিয়া যান; কিন্তু লোকেরা এই সকল গোপন বিষয় জানে না। শ্রীযুত যুবরাজ কহেন, ঐ পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পক্ষে সুবিচার করেন, তবে ঐ পত্র এবং আরও অনেক দলিল গবর্ণমেণ্টকে দেখাইবেন, আর যদি তাহা না করেন, তবে ফকির ভাবেই থাকিয়া দেখিবেন।

এইক্ষণে কতিপয় পুরাতন আমলা আসিয়া যুবরাজের শরণাগত হইয়াছেন এবং বৃদ্ধ মহারাজ শীকরাজার নিকট যে তিন জন আর্দালী পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও বর্তমান আছে। অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট সাক্ষ্যের অপেক্ষা করেন, তবে শ্রীযুত রাজার পক্ষে সাক্ষী অনেক পাইবেন এবং পূর্বে সন্দেহ ছিল, ছয় মাস কয়েদ উত্তীর্ণ হইলেও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র জামিন দিতে পারিবেন না। অতএব পুনরায় কয়েদ থাকিতে হইবেক, কিন্তু এইক্ষণে সে সন্দেহ দূর হইয়াছে, অনেক ভদ্র ভাগ্যধর লোক জামীন হইতে প্রস্তুত আছেন, আর এক মাস পরেই তাঁহার ব্যক্ত হইবেন, বিশেষতঃ শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেবের সুযোগে অনেক ইংগরেজরাও পক্ষ হইয়াছেন।" জ্ঞানান্বেষণ; (৩২) ১৪ জানুয়ারি ১৮৩৭।

ডেভিড হেয়ার বলেনঃ আমি আসামীকে নিতান্ত বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য তারিখের পূর্বে তাঁহার সংগে কখন কথা কহি নাই, আমি আসামীর নাসিকাতে একটা আশ্চর্য বিষয় দেখিলাম, তাঁহার নাসিকাতে ঘর্ম হইয়া থাকে। জেহেলখানায় অন্য কোন আসামীর এইরূপ ঘর্ম হয় না। (সমাচার দর্পণ, ১২ জানুয়ারী ১৮৩৯)

বংগদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়র 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রকাশিত হইলে সম্পাদক বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সরকারের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। অবিচারে রাজ্য পাইতেছেন না বলিয়া যে লোকে প্রতাপচাঁদের উপর সহানুভূতি দেখাইত কেবল তাহা নহে, তখন সত্য সত্য অনেকে বিশ্বাস করিত যে প্রতাপ শ্রীগৌরাংগ অবতার রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লোকে বলিত প্রতাপ গৌরাংগ আর মুর্শিদাবাদের নবাব নিত্যানন্দ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদের জীবদ্দশায় কাটোয়া শ্রীখণ্ড নিবাসী অনুপচন্দ্র দত্ত **"প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসংগ সংগীত"** নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি ১৭৬৫ শকে ১৩ই অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত হইয়াছিল এবং ম্লেচ্ছদলন করিবার জন্য যে প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল অথবা শ্রীহরি পুনরায় অবতার হইয়াছিলেন গ্রন্থে তাহাই সুললিত ভাষায় লিখিত আছে।

নিম্নে প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসংগ সংগীত হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

উগ্রাধিপতি শ্রীমান রণজিত রাজন।
বহু সৈন্য বেষ্টিত আছয়ে সেই জন॥
বর্ধমান রাজধানীর প্রাপ্তির বিলম্বে।
আনিবে সিংহের সৈন্য সেই অবিলম্বে॥
ম্লেচ্ছদলন হেতু সেই মহাজন।
সখা প্রিয়তম সংগে হইবে মিলন॥

॥ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ॥

ভারতের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যাণ্ডেলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (২০ এপ্রিল ১৯৬২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন। ইহা নির্মাণের ব্যয় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণস্বরূপ দিয়াছেন এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যাণ্ডেলের এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নির্মিত হইলে ইহা কলিকাতা ও উহার সমগ্র শিল্পাঞ্চলের বিদ্যুৎ সঙ্কটের অবসান করিতে সক্ষম হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত। এখানে একটি পাওয়ার হাউস ও পঁচাত্তর হাজার কিলোওয়াটের চারটি জেনারেটিং ইউনিট হইবে।

ব্যাণ্ডেলের পর পৌর এলাকার মধ্যে **কেওটা** নামে একটি পল্লী আছে। এই স্থানে হুগলীর জজ-ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ সাহেবের একটি বাগান-বাড়ী ছিল। তিনি এই বাড়ীতে ও এখানকার 'সার্কিট হাউসে' বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই ভবন নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বে বিচারপতিগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়া তথায় বাস করিতেন এবং বিচারকার্য সমাধা করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের নির্দিষ্ট বাড়ী থাকিত; ইহাও সেইরূপ একটি ভবন ছিল। সরকার কর্তৃক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ষোল হাজার টাকায় এই ভবন ক্রয় করা হয়। সাম্প্রতিক কালে হুগলীর অন্যতম সাধক শ্রীসীতারামদাস এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেওটার উত্তরে বাঁশবেড়িয়া পৌর এলাকার মধ্যে সাগঞ্জ বা সাহাগঞ্জ অবস্থিত। সাহাগঞ্জের বিবরণ বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

হুগলীতে মোগলটুলির গলির মধ্যে আর একটি **ইমামবাড়া** ছিল। এই ইমামবাড়া হাজি কারবালা নামক এক ধনী বণিকের দ্বারা নির্মিত হয়। পারস্যদেশে তাঁহার আদি বাড়ী ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হাজি কারবালা হুগলীর পশ্চিমাংশে কাশীমপুর ও বাঁশ-বেড়িয়া এই দুইটি লখেরাজ সম্পত্তি উহার জন্য দান করেন। মল্লিক কাশীমের নাম হইতে কাশীমপুর নামটির উদ্ভব হইয়াছে। রেভারেন্ড লং সাহেব এই নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে দিল্লীর সম্রাট পূর্বে বাংলাদেশকে 'দোজাক' অর্থাৎ নরক বলিয়া মনে করিতেন। কেহ গুরুতর অপরাধ করিলে সেই সময় তাহার শিরশ্ছেদ না করিয়া তাহাকে বাংলায় নির্বাসিত করা হইত। মল্লিক কাশীম একজন পদস্থ ওমরাহ ছিলেন, কোন গুরুতর অপরাধ করায় তাহাকে হুগলীতে পাঠান হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হুগলীর শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার নামে হুগলীতে একটি হাট আজও চলিতেছে। দান-ধ্যানের জন্য হুগলীতে তিনি খুব খ্যাতিলাভ করেন।

হুগলীতে **রাধাকৃষ্ণের** ঠাকুরবাড়ী ও শ্রীমদ্‌ **চতুরদাস বাবাজী** প্রতিষ্ঠিত বড় আখড়াও দ্রষ্টব্য স্থান। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে চতুরদাস বাবাজী হুগলীতে এই আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাংশ খামারপাড়ায় ইহার একটি শাখা আছে। **চতুরদাস বাবাজীর সমাধি** এই আখড়ায় সংরক্ষিত আছে। চুঁচুড়া মালাইটোলায় শ্রীশ্রীবলরামজীউর আখড়ায় সিদ্ধ **যাদবদাস বাবাজীর** সমাধি আছে। দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি এই স্থানে বাস করিতেন। এই দুইটি সমাধিকে সকলে খুব ভক্তি করে।

॥ সংকেত সূত্র ॥

.১ Captain Hamiltons Narrative
২ History of the Bengal Army By Malleson.
৩, ৬ Hooghly Past and Present By Shumbhoo Chunder Dey.
৪ সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু
৫, ৯ History of Hooghly College By K. Zachariah.
৭, ১৩ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সন ১৩৩৮
৮ বিশ্ববাণী, সন ১৩৩৭
১০ Calcutta Gazette 1787.
১১ শোভা সিংহের বিদ্রোহ—চারুচন্দ্র রায় (প্রবর্তক)
১২ দিগ্দর্শন, আগস্ট ১৮১৮
১৪ Hedges Diary, Vol III
১৫ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1807,
১৬ Statistical Account of Bengal, Vol III By W. W. Hunter.
১৭ Valentins Memoirs to Von-Den Brooke's Map.
১৮ Wilson's Early Annals of the English in Bengal.
১৯ Memoirs of the Moghul Empire By Eradut Khan.
২০ Government Orders dated 4th January 1871.
২১ Government Orders dated 2nd October 1833.
২২ Historical Sketches of Bengal.
২৩ Holwell's Interesting Historical Events.
২৪ Long's Selections.
২৫ Parker's Evidence.
২৬ বাংলার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ Long's Records
২৮ Akbarnama Translated By H. Beveridge.
২৯ Essay on Lord Clive.
৩০ Memoirs of the life and Correspondence of John Lord Teignmouth.
৩১ হুগলী ও মহারাজ নন্দকুমার—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী)
৩২ জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী)

॥ বংশবাটী ॥

বংশবাটী সপ্তগ্রামের অন্যতম প্রধান গ্রাম। বংশবাটী নামকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথীতীরে বহু বাঁশঝাড় ছিল এবং সেই বাঁশবন হইতেই বংশবাটী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বংশবাটীর অপভ্রংশ 'বাঁশবেড়ে' বলিয়াও বহু পুস্তকে উল্লেখ আছে। সপ্তগ্রামের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

কবিরাম রচিত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের 'কিলকিলা বিবরণে' হুগলীর নিকটে বংশবাটী প্রভৃতি গ্রাম, এই স্থানে খলাপী নদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। শ্লোকটি এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য :

"বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাজ্য বর্ত্ততে।
খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকান্তরে॥"

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধনী-কাব্যে' এই স্থানের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিলাম :

"পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর!
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এইস্থানে জন্মেছিলেন শ্রীধর রতন,
কথক কুলের কেতু কাঞ্চন বরণ।
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়।"

শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে বংশবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গীত বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। শ্রীধরকথক, শ্রীনারায়ণ ঘোষ-হাজরা ও পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের রচিত তিনজনের গীত একত্রে 'সঙ্গীত রত্নাবলী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীধর কথক রচিত একটি পদাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

আগমনী ॥ ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা

মনে হল এতদিনে—এলি মা ভবনে।
পিতামাতা আকুল তর দরশন বিনে॥
কুশল বল মা শুনি,
জুড়াক তাপিত প্রাণী,
কোলে আয় মা ভবরাণী, মা মা বলে বদনে॥
কুশলে বালকগুলি,
কেমনে আছে ত্রিশূলী,
বল মা তারা কেমন ছিলি হরের ভবনে॥
মা হয়ে মা নই মা আমি,

অচল হয়েছে স্বামী,
তাই শুধাতে পারি নে॥

শ্রীধর কথক অকালে কালকবলিত হইলেও তাঁহার বংশের অতুল ও গোপাল কথকতা করিয়া হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বর্তমানে পরিপাটী বংশবাটীর মনোহারিত্ব কালের কবলে যাইলেও এক সময়ে এই স্থান বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়া খ্যাত ছিল এবং যাহাদের গৌরবে এই স্থান গৌরবান্বিত, সেই প্রসিদ্ধ রাজবংশও বহু বৎসর যাবত রাঢ়ের বহুলাংশ শাসন করিয়াছিল।

বংশবাটী রাজবংশের আদিপুরুষ দেবদত্ত বঙ্গেশ্বর রাজা আদিশূর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া হরিদ্বারের অন্তর্গত মায়াপুরী নামক স্থান হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশে তিনি সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দত্তবাটীতে বাস করেন বলিয়া এই বংশ উক্ত স্থানে প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। অতঃপর এই বংশের একটি শাখা পাটুলিতে বসতি স্থাপন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশের উদয় রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ানন্দ রায়, সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে 'মজুমদার' উপাধি এবং 'কোট এক্তিয়ারপুর' পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে বঙ্গদেশে মাত্র ৩ জন মজুমদার ছিলেন, তন্মধ্যে সপ্তগ্রামের মজুমদার ছিলেন ভবানন্দ, সেই জন্যই তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত হন। বঙ্গের নবাব কাশীম খাঁ তাঁহাকে 'কানুনগো' নিযুক্ত করেন এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে পাঁচ পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন।

এই সম্বন্ধে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির তালিকায় লিখিত আছে নদীয়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ, সাবর্ণ চৌধুরীর আদি লক্ষ্মীকান্ত, এবং বাঁশবেড়িয়ার আদি জয়ানন্দ সম্রাটের নিকট হইতে মজুমদার উপাধি পান।

For their valuable services jagirs and titles were conferred by the Emperor on the three men concerned Bhabananda, Laksmikanta and Jayananda, all of whom were taken, into the services of the State as *Majumdars.*

১৬৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ হেজস পাটুলির ভূস্বামী 'উদয় রায়ের' সম্বন্ধে এবং 'রেউই' গ্রামের বিষয় তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়ার বহু গ্রাম তৎকালে পাটুলির অন্তর্গত ছিল এবং বংশবাটীর রাজাগণ পাটুলির রাজা বলিয়া সেই সময় আখ্যাত ছিলেন। উদয় রায়ের পুত্র জয়ানন্দ এবং তাহার পুত্র রাঘব রায় পাটুলি ত্যাগ করিলে, এই স্থান নদীয়ার রাজাগণ প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় এই স্থানে নদীয়ার রাজধানী স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে পাটুলি হইতে নবদ্বীপে নদীয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। উদয় রায় সম্বন্ধে উইলিয়ম হেজেস্ লিখিয়াছেনঃ

"Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee, a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by ye country people that he pays more than twenty lacks Rupees per annum to ye King, rent

for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperors lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarinds, well stored with peacocks and spotted deer like our fellow deer. We saw two of them near the river side on our first landing." (Hedges Diary. Vol I)

লালমোহন বিদ্যানিধি **"সম্বন্ধনির্ণয়ে"** বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ উদয়রায়কে মানসিংহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে যে ভূমিদান করেন, তাহা এই কবিতা হইতে জানা যায়ঃ

"মানসিংহ মহারাজ কাশীতে আছিল।
জীয়োর নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হল॥
রাজারে কহিল দ্বিজ, শুন বাপধন।
করিতেছ শুনি, তুমি বঙ্গেতে গমন॥
মম পুত্রে গিয়া তুমি, ঠিকানা করিবা।
সেই কার্য্য করি বাপ, মোরে বাঁচাইবা॥
বঙ্গেতে আসিয়া রাজা, সে কার্য্য করিল।
প্রথমতঃ ঐ কার্য্য, পশ্চাৎ সকল॥
পাটুলীতে হয় শুদ্রমণি জমীদার।
তাঁহাকে ডাকায়ে রাজা, কহে সমাচার।
রাজাজ্ঞা-মতেতে সেই ঠিকানা করিল।
গুরু-বাক্যে ঐক্য করি, ঠিকানা হইল॥
তারপর রাজা, গুরুপুত্র দরশন।
করিয়া, হইল অতি আনন্দিত-মন॥
শুদ্রমণি মহাশয়, করজোড় করি।
দেখেন, রাজার মনে আনন্দ লহরী॥
রাজা বলে, ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা।
তার পরিতোষ তুমি লহ এই বেলা॥
মহাশয় কহিলেন, আপন কৃপায়।
অভাব নাহিক কিছু, এই বাঞ্ছা হয়॥
ঈশ্বরীর তীরে মম তরণী ভিড়ান।
নিজ দেহ নিজ স্থানে পায় যেন স্থান॥
মধ্যে মধ্যে আছে মম গমনাগমন।
দুই চারি দিন করি, নীরে যে ভ্রমণ॥
তথাস্তু বলিয়া রাজা, তাহাই যে করিল।
গঙ্গার পশ্চিম তটে বহু স্থান দিল॥

জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘব ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে 'চৌধুরী' এবং পর বৎসর "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। রাঘব পিতার বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং সম্রাটও প্রচুর নিস্কর জমি ও আর্যা মালদহ, মামদানীপুর, সাহাপুর, জাহানাবাদ, রায়পুর, ঘোষালপুর প্রভৃতি একুশটি পরগণার জমিদারী স্বত্ত্ব প্রদান করেন। এই পরগণাগুলির পরিমাণ প্রায় সাতশত বর্গমাইল এবং সমস্ত পরগণা সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া, তিনি সুবন্দোবস্ত ও সুশাসনের জন্য পাটুলি ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামের উত্তর পূর্বে ভাগীরথী তীরের বাঁশবন পরিষ্কার করাইয়া বংশবাটীর ভিত্তিস্থাপন পূর্বক তথায় বসবাস করেন। পাটুলি সম্বন্ধে মগধরাজ বৈজলের সভাপণ্ডিত কবিরাম প্রণীত "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইরূপঃ

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পাটলিগ্রামবাসিনাম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ততে অধুনা নৃপ॥" ৬৯২

পাটুলি রাজ্যের অধীনে মোট একান্নটি পরগণা ছিল, রাঘব তাঁহার দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেবকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠত্বের সম্মানস্বরূপ রামেশ্বর দশ আনা (২।৩) এবং বাসুদেব ছয় আনা (১।৩) অংশ প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর হইতে বংশবাটী রাজবংশ এবং বাসুদেব হইতে সেওড়াফুলি রাজবংশ সমুদ্ভুত হইয়াছে। এই বংশের সহিত রাজা গণেশ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, দিনাজপুর রাজবংশ, ভাগলপুর মহাশয় বংশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা বংশগুলি রক্তসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

রামেশ্বর দ্বারাই বংশবাটীর মনোহারিত্ব সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। রামেশ্বর বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ৩৬০ ঘর কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং বিবিধ জলাচরনীয় হিন্দু এবং বহু সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বংশবাটীতে স্থায়ীভাবে বাস করান। বারাণসী হইতে ন্যায়, সাংখ্য, দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী বহু পণ্ডিতকে আনাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে বংশবাটীতে ৬০টি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। উক্ত চতুষ্পাঠীর যাবতীয় ব্যয়, রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে তিনি বারাণসী হইতে আনাইয়া তাঁহার সভা-পণ্ডিত করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পূর্বপুরুষের ন্যায় অধ্যাপনা পদে ব্রতী হইয়া আসিতেছেন।

॥ চতুষ্পাঠী ॥

বংশবাটীতে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন; এবং ন্যায় ও স্মৃতি চতুষ্পাঠী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের উইলিয়াম ওয়ার্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া, কলিকাতা, বংশবাটী, কাশী প্রভৃতি স্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপকবর্গ ছিলেন, তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন; নিম্নে তাহার "A view of the History Literature and Mythology of the Hindoos" নামক গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

"হুগলীর অনতিদূরে বাঁশবেড়িয়ায় ১২-১৪টি চতুষ্পাঠী আছে; সেখানে প্রধানতঃ ন্যায় শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা হয়। ত্রিবেণী, কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ায় এইরূপ ৭-৮টি চতুষ্পাঠী

আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর একটি বড় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। বেদেও তাহার কিছু কিছু অধিকার ছিল এবং বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ এবং বাংলাদেশের প্রাচীনতম ব্যক্তি বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে, মৃত্যুকালে তাহার ১০৯ (?) বৎসর বয়স হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে ৮টি করিয়া ন্যায় চতুষ্পাঠী আছে; আন্দুলে ১০।১২টি, বালী ও অন্যান্য স্থানে ২।৩।৪টি চতুষ্পাঠী আছে।"

বাঁশবেড়িয়াতে যে সকল চতুষ্পাঠী ছিল, সেই সকল চতুষ্পাঠীর কয়েকজন অধ্যাপকের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইলঃ রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন স্মৃতিশাস্ত্র, রামসুন্দর তর্কসিদ্ধান্ত স্মৃতিশাস্ত্র, মাধবচন্দ্র ন্যায়লঙ্কার, শিবরাম ভট্টাচার্য, কমল ন্যায় বাচস্পতি, পাটুলির শিরোমণি, রামরাম ভট্টাচার্য, গণেশ ন্যায়বাগীশ, ব্রহ্মাণ্ডদেব ন্যায়রত্ন, ভৈরব তর্কবাস্পতি ন্যায়শাস্ত্র, আত্মারাম ন্যায়লঙ্কার, ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন ন্যায়শাস্ত্র, ঢাকা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের অনেক ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। বাবুরাম চূড়ামণি স্মৃতিশাস্ত্র, নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ, ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ, কৈলাস সিদ্ধান্তবাগীশ ন্যায়শাস্ত্র, রামহরি তর্কবাগীশ ন্যায়শাস্ত্র, মদনমোহন তর্করত্ন ব্যাকরণরত্ন, হরনাথ তর্কসরস্বতী, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্যস্মৃতি রাধানাথ শিরোমণি, দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (ন্যায়শাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত) ইহার নিকট চোদ্দ-পনের বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ইহার অধিকাংশ ছাত্র বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে আসিত। বামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, রামচরণ ন্যায়লঙ্কার, ন্যায়-সাহিত্য ও ব্যাকরণ, কৃপারাম তর্কবাগীশ সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ও পরস্পর মীমাংসক ইহাদের উপর আর কেহ ছিল না। "বংশবাট্যাং রামরামঃ ত্রিবাণ্যাং রঘুরাঘবঃ।"

মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন (বাঁশবেড়িয়া রাজবাটীর সভাপণ্ডিত)। তারকনাথ তত্ত্বরত্ন (বর্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত) এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজপুরোহিত মহেশচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। মহেন্দ্রনাথের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত নৃসিংহনাথ সরস্বতী ও শ্রীনাথ তর্কলঙ্কারের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাঠীগুলি লোপ পাইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গে নানাকারণে বিশৃঙ্খলা ছিল, সেইজন্য জমিদারগণ সুযোগ, বুঝিয়া প্রাপ্য রাজস্ব যথাসময়ে দিতেন না। রামেশ্বর অন্যান্য জমিদারদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া তাহাদের জমিদারী দস্তগত করেন এবং যথাসময়ে রাজ-সরকারে রাজস্ব প্রেরণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদ্বেষী হইলেও রামেশ্বরের কার্যে বিশেষ প্রীত হন এবং ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে "পঞ্চপর্চা খেলাত সহ রাজা-মহাশয়" উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। এই সম্মানসূচক রাজোপাধি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিবার জন্য আর এক-খানি সনদ দ্বারা বংশবাটী গ্রামে ৪০১ বিঘা নিষ্কর ভূমি জায়গীর ও ১২টি পরগণা তিনি জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মিঃ এ, জি, বাওয়ার 'বাঁশবেড়িয়া রাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

We know of no family in India enjoying the title of "Rajah Mahasaya" except Bansberia Raj. (History of Bansberia Raj)

"রাজা মহাশয়" উপাধি সম্বলিত মূল সনন্দখানি পারস্য ভাষায় লিখিত এবং বঙ্গের

প্রাচীন রাজ-বংশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ হিসাবে উক্ত সনন্দ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের "ডকুমেন্ট গেলারী"তে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রক্ষিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত মিঃ হেনরী বেভারিজ মূল "রাজা-মহাশয়" সনন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, নিম্নে তাহার মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল:

SANAD

To Raja Rameswar Rai Mahasaya,
Paragana . rsha, Sarkar Satgaon
(Government of Satgaon).

As you have promoted the great interest of Government in getting Possession of Pargans and making assessment thereof; and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khelat of Punj Percha (five clothes *i.e.*, dresses of honour) and the title of 'Raja Mahasaya' are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family generation after generation, without being objected to by any one. 10 Safar 1090 Hijar.

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু ভূমি পরগণাগুলি অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং তোমাকে যখন যে কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা তুমি সযত্নে সুসম্পন্ন করিয়াছ, সেইজন্য তুমি পুরস্কার পাইতে পার। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ-পর্চা খেলাত এবং রাজা মহাশয় উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ এই উপাধি ধারণ করিবেন, ইহাতে কেহ কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ শফর ১০৯০ হিজরি।

রামেশ্বরের পর মামুদপুরের (যশোহর) সীতারাম রায়ও সাহসিকতার জন্য "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "সীতারাম" উপন্যাসে এই রাজার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটার রায় বাহাদুর বি, এ, গুপ্তে তাঁহার পুস্তকে আওরঙ্গজেবের পূর্বোক্ত রাজামহাশয় সনন্দ সম্বন্ধে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ শ্রীশ্রীঅনন্তদেবের মন্দির ॥

রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবত ছিলেন এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীতে এক বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারী গ্রন্থে এই কথা লিখিত আছে:

On the west of the temple of Hamsesvari, there is temple of Ananta Deva, which is said to be about 200 years old.

এই মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকে বহু দেব-দেবীর মূর্তি সুন্দরভাবে খোদিত আছে। বঙ্গদেশে কারুকার্য সমন্বিত এইরূপ মন্দির আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দিরকে ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। মন্দির-গাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :

"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংশুগণিতশকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরং॥ ১৬০১।"

মন্দির নির্মাণের সালটি এইভাবে পাওয়া যায়। মহী=১, ব্যোম=0, অঙ্গ=৬ এবং শীতাংসু মানে চন্দ্র=১। 'অঙ্কস্য বামা গতি' এই নিয়মে "১৬০১ শক" সাল অর্থাৎ ইংরাজি ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ এবং বাংলা সন ১০৮৬ সাল হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট সার জন উডবার্ন মন্দিরের ইষ্টকগুলিতে নানাবিধ কারুকার্য দেখিয়া বলেন যে, অঙ্কিত ইষ্টকগুলি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকখানির চিত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইলে গৃহের শোভা নিঃসন্দেহে বর্ধিত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুযায়ী ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু, এক মাস বংশবাটীতে থাকিয়া এই মন্দিরের প্রত্যেকটি ইষ্টকের চিত্র গ্রহণ করেন।

বংশবাটি রাজবাড়ির সংলগ্ন শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবীর মন্দির হুগলী জেলার সুবিখ্যাত দেবালয়। রথসদৃশ্য সুউচ্চ মন্দিরসৌধটি সহজেই লোকের ভক্তিবিনম্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু মন্দিরপ্রাঙ্গণে আর একটি মন্দির প্রায়ই সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, উহা শ্রীশ্রীঅনন্তদেবের দেউলবাটি। অবহেলায় সে আজ ম্লান, হতাদরে ভগ্নোন্মুখ, কিন্তু অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত হইয়া আজও সে দণ্ডায়মান আপন মহিমায়। দেউলগাত্রে যে সুচারুসুন্দর শিল্পকার্য খোদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে যে-কোন শিল্পরসিকই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইবেন। পোড়ামাটির ইঁটের ওপর এই মূর্তিগুলি খোদিত। এই ধরনের স্থাপত্য-শিল্পকে সাধারণতঃ বলা হয় টেরাকোটা শিল্প। অনন্তদেবের মন্দিরচিত্রও বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্পরীতির অনুসরণে চিত্রায়িত। ছোট ছোট খোদাই করা ইঁট একের 'পর আরেকটি সাজাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মন্দিরের স্থাপত্যসৌন্দর্য।

মন্দিরগাত্রে প্রধানত দেবদেবীর মূর্তিই অঙ্কিত। দুর্গা, কালী, শিব, শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা, নৌকাবিলাস, নারায়ণের অনন্তশয্যা ইত্যাদি মূর্তিগুলি নিখুঁত পরিস্ফুটন-নৈপুণ্যে, সুচারু রেখাবৈশিষ্ট্যে, চিক্কন-সজীবতায় এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। এ-ছাড়া, আনুষাঙ্গিক যে-সব চিত্র অঙ্কিত আছে, সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। অশ্বারোহী সৈনিক, যুদ্ধচিত্র, বাঘ, হরিণ ইত্যাদির প্রতিকৃতি বেশ বাস্তবানুগ। একটি চিত্রে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে রাজার দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী আছে। ইহা বৌদ্ধ-ধর্মপ্রচারের কোন ঘটনাকে বুঝাইতে পারে। তবে চিত্রটির প্রকৃত বক্তব্য কি তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় এক বিরাট নৌ-জাহাজের সমুদ্রযাত্রার চিত্র৷ জাহাজটি দুইতলা—সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনী রহিয়াছে তাহাতে—সিংহমুখী সেই সাগরযানের দাঁড় একজন নাবিক। এ চিত্র সহজেই অনুসন্ধিৎসু দর্শকের মনে জিজ্ঞাসা জাগায়—এই কি তবে প্রাচীন বাংলার সেই বিখ্যাত নৌবিতানের একটি খণ্ডিত চিত্র? বাঙালী যে আগে নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল এ-কথার সমর্থন বহু পুঁথিতে পাওয়া যায়। সাগরপ্রিয় বাঙালীর দুর্ধর্ষ নৌবাট সেইদিন সমগ্র ভারতমহাসাগর তোলপাড় করিত। কালিদাস 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 'নৌসাধনোদ্যত্তান্' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলাদেশ যে সেদিন রঘুরাজের সঙ্গে নৌযুদ্ধেও অবতীর্ণ হইয়াছিল এ-কথা মনে করা অন্যায় নয়।

অনন্তদেবের মন্দিরের এই ক্ষুদ্র ইষ্টক ফলকটি বাংলার সেই অতীত গৌরবের এক টুকরো স্মৃতিচিহ্ন। বাঙালীর সেই নৌবলের কথা এখন ইতিহাসের গল্প-কাহিনী—কিন্তু

এই নগণ্য চিত্রটিই সে যুগের নৌজাহাজ কি রকম ছিল তাহার একমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ আজও বর্তমান। বংশবাটির অনন্তদেবের অবহেলিত প্রাচীন মন্দির তাই তার অসংখ্য কারুকার্য-মণ্ডিত শিল্পসম্ভারের মাঝে একখানি মূল্যবান ইষ্টক ফলক নিয়ে অতীতের মৌন সাক্ষী। দুঃখের বিষয় অযত্নে অবহেলায় লোনা লাগিয়া মন্দিরটি ক্রমশই ধ্বংসপ্রাপ্ত—তাহার অপূর্ব কারুময় অঙ্গ ক্রমশ ধূলায় বিলীন—তাই পুরাতন শিল্পকাজগুলিকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইহার সংস্কার করা আশু কর্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটার বি, এ, গুপ্তে "এথনলজি ইন এনসিয়েণ্ট হিসটরিক্যাল ডকুমেণ্টস" গ্রন্থে বলেন:

It will be seen that in spite of ups and downs this eminent family of Bengal Kayasthas have been able to maintain the highest social position and that they have from time to time, received many high title. The last high title of 'Raja Mahasaya' has been socially recognised. The family has maintained this high position for nearly 100 years. The Bengal Kayasthas are loyal people, They have not fought any battles. Their strength lies in the manipulation of the pen. They are equal to Brahmins and Baidyas. They are not upstarts. They have not assumed grandiloquent name for their caste but they have steadily remained high literature. In official position there are among them Governor, High Court Judges, Member of the Board of Revenue, Member of the Council and Vice-Chancellors of the Calcutta University. They are equally prominent in other learned professions. Lord Sinha of Raipur is a Kayastha and the first Indian to enter the House of Lords. He became the first Indian Governor of a Province.

রাজা রামেশ্বর তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রঘুদেব বংশবাটীতে বাস করেন এবং অন্য দুই পুত্র জমিদারী বিভাগ করিয়া শিবপুর ও রাজহাটে বাস করেন। সেই সময়ে নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার; তিনি নানাস্থানে জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীন করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে সরকারী রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও, জমিদারদিগকে তিনি যেরূপ উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। মলমূত্রাদিপূর্ণ একটি পুষ্করিণীকে তিনি "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং যে হিন্দু জমিদার সময়মত রাজস্ব দিতে না পারিত, তাহাকে কুলি খাঁর প্রবর্তিত "বৈকুণ্ঠ" দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। মুসলমান রাজত্বকালে এই ধরণের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ তৎকালীন গ্রন্থাদি হইতেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত তাঁহার 'পদ্মপুরাণে' লিখিয়াছেন:

"ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥"

যাহা হউক, রাজা রঘুদেব নদীয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার বাকী খাজনার দায়ে 'বৈকুণ্ঠে' যাইবেন শুনিয়া, তাহার যাবতীয় বাকী রাজস্ব (কেহ কেহ বলেন একলক্ষ টাকা) নবাব সরকারে জমা দিয়া, তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

॥ বর্গীর অত্যাচার ॥

সেই সময় বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশ শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্গীগণ বঙ্গবাসীর উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। "মহারাষ্ট্র পুরাণ" নামক গ্রন্থে বর্গীর অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অন্যান্য বিবরণ সপ্তগ্রামের মধ্যে বিবৃত হইবে, নিম্নে কয়েক লাইনমাত্র এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বর্গীর ভয়ে সকলে পলাইল॥
কারু হাত কাটে, কারু নাক কাণ
একি চোটে কারুর বধয়ে পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়ে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলায়ে॥
একজন ছাড়ে তারে, আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে নারী ত্রাহি শব্দ করে॥"

মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী লুণ্ঠিত ধনরত্ন সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তিনি যাহারা এইরূপ লুণ্ঠনকার্যে বিশেষ পারদর্শী তাহাদিগকে কেবল পুরস্কৃত করিতেন না তাহাদের উচ্চ পদে দিতেন। ইংরাজ কবি লিখিত একটি কবিতা এইরূপঃ-

Then lands were fairly portioned ;
Then spoils were fairly sold ;
The "Burgees" were like brothers,
In the brave days of old.

একবার বর্গীরা বাঁশবেড়িয়া রাজের গড়বাটী অবরোধ করিয়াছিল। রাজা রঘুদেব নৈশযুদ্ধে বর্গীদের পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া দেন।. রাজবাড়ীর চারিদিকে পরীখার পরিধি প্রায় এক মাইল ছিল এবং ধনুর্বাণ ঢাল তরবারী ও বন্দুক লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। মাঝে মাঝে কয়েকটি কামানও রাখা হইয়াছিল। বর্গীরা ত্রিবেণী লুট করিতে আসিলে লোকেরা এই গড়ের ভিতর আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিত। এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব "ষ্ট্যাটিসটিক্যাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

It had a fort mounted with four pieces of cannon and surrounded by a trench when the Marhattas came near Tribeni the people fled hither for protection.

রাজা রঘুদেবের বদান্যতার কথা শুনিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম হইতে ধনরত্ন ও স্ত্রী পুত্রাদি সহ বহু লোক তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর একটি খাল, বাড়ীর চারিদিকে খনন করান এবং এই খালের সাহায্যে বহুবার তাঁহার সৈন্যগণ বর্গী বিতাড়ন করে। তিনি প্রায় একলক্ষ বিঘা নিষ্করভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া যান, অদ্যাপি উক্ত ভূমিগুলি তাহাদের বংশধরগণ

ভোগদখল করিতেছেন। রাজা রঘুদেবের একমাত্র পুত্র গোবিন্দদেবের পুত্র, রাজা নৃসিংহ-দেবরায় পিতার মৃত্যুর তিন মাস পর জন্ম গ্রহণ করেন।

॥ রাজা নৃসিংহ দেবরায় ॥

আলিবর্দী খাঁ সেই সময় বাংলার নবাব; বংশবাটীর রাজা গোবিন্দদেব নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করেন; ফলে বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াও তিনি সমস্ত জমিদারী হইতে এক প্রকার বঞ্চিত হন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

'সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতা অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারী সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালের মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে তালুহান্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বর্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না। অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাংলার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমন বেইনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই...ইত্যাদি। সন ১১৯৪ সাল।'

রাজা নৃসিংহদেব শৈশবে সেইজন্য সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। সেই সময় বঙ্গের সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল; বর্গীর হাঙ্গামা ও ইংরাজ বণিকের সহিত মনোমালিন্য নবাব আলিবর্দী খাঁকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন; কিন্তু অল্পদিনের পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের পর বঙ্গদেশে কোম্পানীর রাজত্বের প্রবর্তন হয়। সংহদেবের বয়স সেই সময় সতের বৎসর হইয়াছিল; তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করিবার জন্য দরখাস্ত করেন। হেস্টিংস এই বিষয়ে তদন্ত নৃসিংহদেবের যতটুকু জমিদারী চব্বিশ পরগণার মধ্যে ছিল তাহা তিনি প্রত্যার্পণ ন, কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৎকালে কেবল এই প্রদেশের দেওয়ানী স্বত্বে স্বত্ববান হলেন এবং চব্বিশ পরগণা ব্যতীত অন্য কোন স্থানের ভূমি দিবার তাঁহার হাত ছিল না। ঃপর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তিনি আরও তিনটি পরগণা প্রাপ্ত হন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় সাধু সন্ন্যাসীদের সাহায্যে তান্ত্রিক মতে যোগশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। সেই সময় ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত হইতে জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেন; এই সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ

"মনে করি কাশীখন্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
মিত্রশত চৌদ্দশকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুর্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
তাঁহার করেন রায় তর্জমা খসড়া।
মুখুর্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব গ্রন্থের প্রচার॥"

রাজা নৃসিংহদেব সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ব্যতীত তিনি সংস্কৃত হইতে 'উড্ডীশতন্ত্র' বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশী যাইবার পূর্বে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীতে তিনি "স্বয়ম্ভরা-মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছেঃ

"আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎস্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহসদেবদত্ততঃ॥"

॥ হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির ॥

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেব কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহাকে অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বিলাতে কোর্ট-অফ-ডিরেক্টারগণের নিকট আবেদন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার পূর্ব মত বদলাইয়া যায় এবং সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বিলাতে বিপুল ব্যয় করিয়া আবেদনের পরিবর্তে, মানবের দেহমধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিনী নামক যেরূপ পাঁচটি নাড়ী বিদ্যমান আছে, সেইরূপ পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনার বিশিষ্ট একটি সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুন্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনি সঙ্কল্প করেন এবং পরে ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্দিরের দ্বিতীয় তোলা গাঁথা হইবার সময় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। নৃসিংহদেবের আরব্ধকার্য তাঁহার স্বাধ্বী স্ত্রী রাণী শঙ্করী দেবী সুসম্পন্ন করেন এবং স্বামীর নির্দেশানুযায়ী উক্ত মন্দির মধ্যে তিনি পরাশক্তির বিকাশস্বরূপ শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়

এবং এইরূপ মন্দির বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই, এমন কি ভুবনেশ্বরের মন্দিরও ইহার নিকট প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

স্থাপত্যশিল্পে বঙ্গদেশে এই হংসেশ্বরী মন্দির একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহার কারুকার্যও অতুলনীয়; বহু ব্যক্তি এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য বংশবাটীতে সমবেত হইয়া থাকেন। হান্টার সাহেব তাঁহার স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল (পৃষ্ঠা ৩০৩) নামক গ্রন্থে এই মন্দিরের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বাঁশবেড়িয়া রাজ (শ্রীশম্ভুচন্দ্র দে কৃত), মহাপুরুষ মহারাজজীর কথা (স্বামী শিবানন্দ), ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (A Short Account of the Sudramani Rajas—By A. C. Mukherjee, The Family History of Bansberia Raj—By A. G. Bower) এই মন্দিরের বিষয় উল্লিখিত আছে। নিম্নে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লিস্ট অফ এ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্ট নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

Temple of Hamsesvari—This temple is situated in the District of Hooghly about a mile from the Trisbigha station* East Indian Railway in the village of Bansberia. The image of the goddess is made of black stone. She represents a form of *Kali* with her hair unbraided. The God Mahadeva is lying on a *Trikonajantra* and the goddess *Hamsesvari* is placed on the lotus, that has sprung from the navel of the aforesaid deity.

The temple is made of stone and has thirteen minarets. It possesses architectural beauty of the high order and it may be considered as one of the finest Hindu temples of Bengal, if not of India. The temple was erected 88 or 90 years ago, (Pages 46-48)

সরকারী গ্রন্থে দুইটি ভুল দৃষ্ট হয়। প্রথম হংসেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ কাল প্রস্তরের নহে; ইহা নিমকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত এবং রং নীল বর্ণ। আর দ্বিতীয়, মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার কতক প্রস্তর এবং কতক ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। হংসেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করিতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী শঙ্করী দেবী ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত এবং অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন। তাঁহার ন্যায় মহীয়সী মহিলা এদেশে বিরল; তিনি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিতেন এবং প্রজাবৃন্দের কল্যাণসাধনে সর্বদাই যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দ্বারদেশে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি খোদিত আছেঃ

"শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বারচতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরীবিরাজিতং।

---

* ত্রিশবিঘা স্টেশনের নাম স্বর্গীয় বলাইচাঁদ আঢ্যের চেষ্টায়, পরিবর্তিত হইয়া 'আদিসপ্তগ্রাম' হইয়াছে এবং বংশবাটী নামক একটি রেলওয়ে স্টেশনও বর্তমানে হইয়াছে।

ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে॥
শকাব্দা ১৭৩৬।"

বঙ্গানুবাদ ঃ চতুর্দশ মোক্ষদ্বার রূপী (চতুর্দশ) শিবের সহিত হংসেশ্বরী কর্তৃক বিরাজিত গৃহ এই শ্রীমন্দির যাহা কৃতি নৃসিংহদেব ভূপাল কর্তৃক আরব্ধ হয় তাহা ১৭৩৬ শকাব্দে তাঁহার আজ্ঞানুগা পত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মাণ করিয়াছেন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ জন আলেকজাণ্ডার চ্যাপম্যান হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির দেখিয়া যে কবিতা রচনা করেন, নিম্নে তাহা উল্লেখ্যঃ

BANSBERIA TEMPLE

One who had seen Bansberia *raj* cut down
By stronger neighbour, and had sought in vain
Justice at home, must forth to London town,
And seek it there, Cornwallis said. So pain
First was his lot ; for how such vast expense
(Only to tell a just man of one's plaint,
Only to speak ont that which common sense
May judge of—why only with so much taint
Of fees extortionate can that be done ?)
Was he to meet ? He knew. "Let me" he said,
"Go live at Kasi till the seventh year's sun
Ripens my paddy ; let me make my bed
So long among the beggars ; let seven years'
Revenue be stored up." So forth he sailed
To holy Kasi : there abode ; no tears
Dimming his eyes ; no murmur, nothing wailed.

And then a wonder. Kasi sang to him
No song of earth sun-kissed at dawn, and dim
At evening ; one of birth, and growth, and death,
And change, and fleeting as the mist that breath
Leaves on the glass but of a *tantra* true,
Ever-abiding. So his passion grew
Still for enlightement—until it came.
Then what was gain worth ? Let it feed the flame.
Let others plead and wrangle, pay their cash.
He had seen something greater—in a flash,
In flash on flash had the eternal been
Shown to his soul. Henceforth would truth be queen
Of all his steps. He cried : "Let what be done
Be worthy." And then set the seventh year's sun .

What did he do ? He built a temple. Still
It stands, and I have seen it ; but too ill

Would words of mine describe it. Inside, out,
Silent on earth, in pinnacled air a shout,
It doth reveal what to the initiate
Figures pure thought. So unto them a gate
Is opened to deliverance. I outside,
Alien but not unmoved, untouched, abide.

রেভারেন্ড লং সাহেব "কলিকাতা- রিভিউ" পত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

On the occasion of the festival of the Goddess to whom the temple is dedicated the Rani used to invite Pundits from all the neighbouring countries.

হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ারে হংসেশ্বরী মন্দির হুগলী জেলার সর্বোত্তম সুডৌল ভবন ও বাংলা দেশের মধ্যে সৌন্দর্যে অনুপম বলিয়া লিখিত আছে।

The temple of Hamsesvari at Bansberia, is the handsomest builing in the district, and are of the finest in Bengal.

১২২৬ সালে হংসেশ্বরী মন্দির হইতে দেবীর যাবতীয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়; এই সম্বন্ধে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপঃ

চুরি।—মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহ দেবরায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণ-রৌপ্যাদিঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে। (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২০)।

প্রাচীনকালে বংশবাটী গ্রামে অসংখ্য দেবস্থান ছিল। এখনও তাহাদের মধ্যে শ্রীধর কথক বংশের কালীমাতা, আনন্দময়ী, পঞ্চানন ঠাকুর, গঙ্গাতীরস্থ ছয়টি শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ হিন্দুজীবনে সততা ॥

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত হিন্দুজীবনে একটা সততা এবং লোভহীনতা ছিল, যাহা আজকের দিনে কল্পনাতীত। "মেমোয়েরস্ অফ আলেকজাণ্ডার ডাফ" "মেমোয়েরস্ অফ ওয়ারেন হেস্টিংস" প্রভৃতি ইতিবৃত্ত হইতে আমরা ভারতীয় জীবনের অনেক ঘটনার সন্ধান পাইতে পারি। আমি আপনাদের নিকট দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। অযোধ্যার নবাবের মিত্রভুক্ত কাশীর মহারাজ চেতসিং-এর নিকট পরাজিত হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস নৌকায় করিয়া পলায়ন করেন এবং সন্তোষ ব্রাহ্মণ (Brahmin Santosh এই ভাবেই তিনি উল্লিখিত আছেন), যিনি গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট আসেন। সন্তোষ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মুদির নিকট নিয়া যান। কান্তমুদি ওয়ারেন হেস্টিংসকে আশ্রয় দেন। মুসলমানগণ অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলে ওয়ারেন হেস্টিংস ৩।৪ দিন পরে কাশীমবাজার ইংরেজ কুঠীতে ফিরিয়া যান। কান্তমুদি প্রভূতরূপে পুরস্কৃত হন। সন্তোষ ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিতে চাহিলে তিনি পুরস্কার নিতে

অস্বীকার করেন। 'আমি ব্রাহ্মণ, আশ্রয় চাহিয়াছ, আশ্রয় দিয়াছি, এই পর্যন্ত ব্যাপার, পুরস্কার লইব না।' হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চ্যাটার্জী বাস করেন। সন্তোষ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রপিতামহের পিতামহ। "Brahmin Santosh" এই বলিয়া পূর্বোক্ত ইতিবৃত্তে দুইটি পাতায় সন্তোষ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।

সন্তোষ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন পণ্ডিত রামনাথ তর্কবাচস্পতি। বর্ধমান জমিদারী রেকর্ড হইতে আমরা অবগত হই যে তাঁহার ছেলের নাম ছিল দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। পিতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন, পুত্রেরও বয়স হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী হওয়ার অভিপ্রায়ে একজন দ্রাবিড় পণ্ডিত ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি বর্ধমান রাজসরকারে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কেহ এই দ্রাবিড় পণ্ডিতকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, বর্ধমানের মহারাজা তাঁহাকে আর্শা পরগণা (শেওড়াফুলি হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত?) দিতে প্রতিশ্রুত হন। দ্রাবিড় পণ্ডিত বঙ্গদেশীয় অনেককে পরাস্ত করিলেও রামনাথ তর্কবাচস্পতির নিকট পরাস্ত হন। মহারাজা আর্শা পরগণা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে দিতে চাহিলে তিনি তাহা লন নাই, বলেন—জমিদারী পাইলে উচরাধিকারিগণ বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে। তিনি একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে বলেন, এবং পূজা অর্চনাদি যাহাতে চলিতে পারে তদুদ্দেশ্যে নয়বিঘা মাত্র জমি তাঁহার পৌত্রগণের জন্য চাহিয়া নেন। শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। লোভহীনতার এইরূপ আরও কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কাহারও ধনে লোভ করিবে না—ইহাই ভারতবর্ষে নৈতিক জীবনের মূলকথা।

রাজা নৃসিংহ দেবের পরলোকগমনের পর, তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা কৈলাস দেব উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তাঁহার মাতা রাণী শঙ্করী দেবী স্বয়ং জমিদারী কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাণীর জীবদ্দশায় ১২৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, রাজা কৈলাসদেব লোকান্তরিত হন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা দেবেন্দ্রদেব বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।

রাজা দেবেন্দ্রদেবও রাণীর জীবদ্দশায় ১২৫৯ সালের বৈশাখ মাসে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেবের সেই সময় আট বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি অল্প বয়স হইতে জমিদারী পরিদর্শন করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া সরকারের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

১২৫৯ সালের আশ্বিন মাসে রাণী শঙ্করী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশন রাণীর কালীঘাটস্থ ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তার নাম "রাণী শঙ্করী লেন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ (রাজা পূর্ণেন্দুদেবের পুত্র) অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করেন। এই বংশের কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনে ২য় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেস ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদান করিয়া যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন, গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ উহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন। বাঙ্গলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রবর্তক। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি থাকাকালে বাঁশবেড়িয়ার

তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়ও বাংগলাদেশের প্রগতি-শীল প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত নিযুক্ত থাকিয়া দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন।

॥ ইংরাজী শিক্ষা ॥

বর্তমানে বংশবাটীর পূর্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই; যে স্থান এককালে শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, আজ তাহার নিদর্শন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তামার ও পিতলের কাজের জন্যও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য স্থাপিত টোলগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইলে ঐ স্থানে ইংরাজী বিদ্যার অভ্যুদয় হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়ের চেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে লিখিত আছে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সর্বপ্রথম বংশবাটিতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে আসিতেন এবং ছাত্রগণকে ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বংশবাটির রাজা দেবেন্দ্রদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং উভয়ে সেইজন্য 'সখা' পাতাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়টিতে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত; কিন্তু বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায়, স্থানীয় ব্যক্তিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেন; ফলে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। শিক্ষা-প্রসংগে বংশবাটীর বিদ্যালয়ের বিষয় ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হান্টার সাহেব "স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ বেংগল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

The Tatwabodhini Sabha formerly had a flourishing English School, containing two hundred pupils at Bansberia which was established in 1843, but some of the boys embracing Vedantism, their parents became alarmed lest they should forsake Puranism and withdrew many of them.

অতঃপর রেভারেন্ড ডক্টর ডাফ্ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিন্ধু প্রদেশ জয় করিলে সেনাপতি স্যার জেমস্ আউটরামকে বহু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়। তিনি সেই "রুধিরাক্ত অর্থ" স্পর্শ করেন নাই এবং উক্ত অর্থ তিনি ডক্টর ডাফ্‌কে বংশবাটির বিদ্যালয়ের বাটি নির্মাণের জন্য দান করেন। এই সম্বন্ধে ডক্টর স্মিথ কৃত 'ডাফ সাহেবের জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যাহা লিখিত আছে তাহার বংগানুবাদ করিয়া কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

"ওয়েস্টমিনিস্টার সমাধি মন্দিরের চির-বিশ্রাম স্থান টেমস নদীর বাঁধের উপর এবং কলিকাতা ক্লাবসমূহের পুরোভাগে শিল্পী ফলি নির্মিত অশ্বারোহী মূর্তি জেমস্ আউটরামের পারস্য বিজয় ও লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে; কিন্তু জীবন্ত মর্মর বা স্থায়ী প্রস্তরফলকে অঙ্কিত বা লিখিত না থাকিলেও কেহ যেন সিন্ধু প্রদেশের রুধিরাক্ত মুদ্রা এবং বংশবাটি বিদ্যালয়ের কথা বিস্মৃত না হন।"

ওয়্যালী সাহেব এই বিদ্যালয়ের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

His work was not confined to Calcutta. He carried education into the interior, his aim being to evangelize rural areas by means of catechists and converts trained in mission schools. He started schools with this object at Kalna and Ghoshpara. Another was opened at Bansberia in the Hooghly district with funds provided by Sir James Outram. Outram had protested against the annexation of Sind and refused to touch the prize money awarded to him, which he declared was blood money. History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule—L. S. S. O' Malley.

ডাফ সাহেবের স্কুলে প্রায় এক হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং তারাচাঁদ নামক একজন বাঙ্গালী পাদরীর অধীনে বংশবাটিতে বঙ্গদেশের প্রথম ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে রেভারেন্ড প্যারীমোহন রুদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পুত্র মিঃ এস, রুদ্র দিল্লীর সেন্ট জন্স কলেজ-এর বহু বৎসর যাবত প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে বংশবাটির জন-সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। প্রাসাদোপম বিরাট ভবন শিবপুরের জমিদার রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ খরিদ করিয়া 'শ্রীবাস' নামকরণ করেন; বর্তমানে কায়স্থ-কুলভাস্কর কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় উক্ত ভবন উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

॥ নীলের চাষ ॥

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ হয় এবং বংশবাটিতেও একটি নীলকুঠি ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ব্রিচ সাহেব এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে টেম্পল সাহেব বংশবাটিতে নীলকুঠির কুঠিয়াল ছিলেন; টেম্পল সাহেব বিঘাপ্রতি বার্ষিক এক টাকা খাজনায় ১৭৮০ বিঘা জমি জমা লইয়া নীল চাষ করেন। নীলকরদিগের ঘোরতর অত্যাচারে বাংলার কৃষককুলের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রেভারেন্ড লং সাহেবের উক্ত পুস্তকের ভূমিকা ইংরাজীতে অনুবাদ করায় তাঁহার কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। প্রথমে সরকার যে নীলকরদিগকে সাহায্য করিতেন, নিম্নের কয়েক লাইন হইতে তাহা প্রমাণিত হইবেঃ

নীলকরদিগের অত্যাচার ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উদাসীনতা

প্রদেশবাসি নীলকর জমিদারেরা আপনাপন কার্যোদ্ধার নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি সময়ে সময়ে অত্যাচার করিয়া থাকেন, এবিষয় প্রমাণ করিবার বড় অপেক্ষা নাই, প্রদেশীয় বিচারালয়ে যে সকল মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ আছে। সপ্তম এবং পঞ্চম এই উভয় আইন তাঁহারদিগের সেই অত্যাচার করিবার ক্ষমতা স্বরূপ হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগের অনুমতি অমান্য করে এবং অল্প বেতনে কার্য করণে অসম্মত হয় তবে তাঁহারা সেই ব্যক্তির প্রতিকূলে কালেক্‌টার কাছারি হইতে পঞ্চম আইন অনুসারে পরওয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে বিশেষরূপে অপমানিত এবং প্রহার করিয়া কারাবন্ধ

করেন, পঞ্চমের মোকদ্দমা যথার্থ বিচার হয় না, জমিদার ও নীলকর সাহেবেরা এই আইনের দ্বারা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনে বিলক্ষণ পারগ হইয়াছে, জমিদারদিগের অপেক্ষা নীলকরদিগের অত্যাচার অধিক হয়, তাহারা রাজার জাতি ও রাজার জ্ঞাতি বলিয়া অভিমান ভরে প্রদেশ মধ্যে এক প্রকার স্বেচ্ছাচারি হইয়াছে, ম্যাজিস্ট্রেট কি পুলিস সংক্রান্ত অন্য কোন কর্মচারি কাহাকেও ভয় করেন না। তাহারদিগের কুঠিতে প্রজাদিগকে কয়েদ করিবার ভিন্ন ভিন্ন কারাগার আছে মেং আর্থর সাহেবের মোকদ্দমা বিবরণেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ হপ্তম অথবা পঞ্চম আইন মান্য করে না, এক স্থানের কুঠির নিকটে একজন প্রজাকে ধৃত করিয়া কিছু দিবস তাহাকে তথায় কারাবদ্ধ রাখিয়া অন্য স্থানের কুঠিতে প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগের আদেশানুসারে অনুচরেরা সর্বদা প্রহারাদি করে, তাহাতে অল্পদিবসের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এই অত্যাচার নিবারণের কোন সদুপায় করিতে পারেন না।...

(শীতল তরফদারের যে প্রকার দুরবস্থা হইয়াছিল,) প্রদেশীয় নীল কুঠিতে অনেক প্রজা এইরূপ পিড়া প্রাপ্ত হইয়া নিধন পাইতেছে, মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের বক্ষের উপর প্রতি দিবস এইরূপ ভয়ানক কান্ড হইতেছে, কি আশ্চর্য তাঁহারা পরিপূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বে ইহা নিবারণ করণের কোন সদুপায় করিতে পারেন না। অতএব নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিকার না হইলে প্রদেশীয় পুলিসের অবস্থা সংশোধন হইবেক না।

—দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কল্পতরু (পৌষ ১২৩৩ সাল) কর্তৃক সংকলিত।

সেই সময় বঙ্গদেশের সর্বত্র নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য এই প্রবাদটি প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলো এবার ছারখার,
হায়রে ভাই প্রজার এবার
প্রাণ বাঁচানো বিষম ভার।"

বংশবাটীর নীলকুঠি দেখিয়া নীলবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' প্রণয়ন করেন। তিনি বংশবাটীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সার জন পিটার গ্রান্ট এবং লর্ড ক্যানিং-এর চেষ্টায় এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং মহানুভব পাদ্রী লং সাহেবের আন্দোলনে নীলচাষ উঠিয়া যাওয়ায় বংশবাটীর নীলকুঠি, উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়, মেসার্স ম্যাকিনন্ ক্যাটেনডেন কোম্পানীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। বর্তমানে এই বাটি গ্যাঞ্জেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লইয়া, মিল করিবার জন্য তাহা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। হুগলী জেলায় নীলচাষের বিষয় ১২০-১২৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

॥ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ॥

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাহারা সকল জাতির একত্র ভোজন

ও সকল জাতির ধর্ম পুস্তক একত্র পাঠের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের উক্ত কার্যের জন্য বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন হইলেও, ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের এই নিভৃত পল্লী হইতে যে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা রহিত কল্পে আন্দোলন হইয়াছিল, ইহাই গর্বের বিষয়। এই সম্বন্ধে ১৬ই ফাল্গুন, ১২৩৭ সালের 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"বাঁশবেড়িয়া নিবাসিনঃ ৺মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুক্ত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু। এই কয়েকজন বাবু একত্র হইয়া মোং কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টক নির্মিতা বেদি তদুপরি চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্বক পরমসুখে পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন পূর্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিতলের থাল সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন।"

কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পালদিগকে কর্তারূপে স্বীকার না করিয়া রামবল্লভ নামক একব্যক্তিকে শিবস্বরূপ স্বীকার করেন এবং বংশবাটীতে **"রামবল্লভী সম্প্রদায়"** স্থাপন করেন। সর্বশাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাগণকে অভিন্ন জ্ঞান করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি বৎসর রামবল্লভী সম্প্রদায়ীরা শিবচতুর্দ্দশীর দিনে পাঁচঘরা গ্রামে প্রবর্তকের উদ্দেশে একটি উৎসব প্রতিপালন করিতেন এবং উৎসবে ভাগবতগীতা কোরাণ ও বাইবেল পঠিত হইত। উৎসবের পর সর্বজাতীয় লোক একত্রে ভোজন করিত। এই সম্প্রদায়ের প্রার্থনা ঃ "হে পরমেশ্বর, তোমার দাসের এই প্রার্থনা যে তোমার আজ্ঞাপালনে সকলে যেন সক্ষম হয়; ইহাতে আপনার যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।" রামবল্লভী সম্প্রদায়ের একটি সংগীতের কয়েক লাইন এইরূপ ঃ.

কালীকৃষ্ণ গাড খোদা, কোন নামে নাহি বাধা।
বাদীর বিবাদ দ্বিধা তাতে নাহি টলো রে।
মন কালীকৃষ্ণ গাড খোদা বল রে॥

কৃষ্ণকিংকরের পৌত্র গোপীরমণ এই সম্প্রদায়ের বংশবাটীতে শেষ সভ্য ছিলেন। গোপীরমণ নানা সদগুণে ভূষিত ছিলেন তন্মধ্যে প্রতিমাগঠন বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

॥ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ॥

বাঁশবেড়িয়ায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হইতেছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই স্থানে মাতামহাশ্রমে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান

মিরর' নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে তিনি "পার্লামেণ্ট অফ রিলিজন" নামক মহাসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া আমেরিকাবাসীকে মুগ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। অন্যান্য যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি বিবিধ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হন তাঁহাদের নাম ঃ বীরচাঁদ গান্ধী (বোম্বাই) জৈন ধর্ম, এইচ ধর্মপাল (সিংহল) বৌদ্ধধর্ম, বি, বি, নগরকার (বোম্বাই) ভারতীয় সংস্কৃতি ও ব্রাহ্ম সমাজ, অধ্যাপক সি, এন, চক্রবর্তী (এলাহাবাদ) থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, মিস্ জেনি সোরাবজী (বোম্বাই) ভারতীয় খৃষ্টীয় সমিতি, সিন্ধুরাম (পাঞ্জাব) মুসলমান, নরসিংহচারী (মাদ্রাজ) হিন্দু বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ দর্শন, লক্ষ্মীনারায়ণ (লাহোর) কায়স্থ সভার সম্পাদক, এম, এন, দ্বিবেদী (গুজরাট) ব্রাহ্মণ সভা। প্রতাপচন্দ্র ধর্মসভায় "এ্যাডভিসরি কমিটির" একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় চারিটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মসভা তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা ও প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন। ধর্মসভার অধিবেশনের তৃতীয় দিনে (১৩ সেপ্টেম্বর) প্রতাপচন্দ্রকে সভা আরম্ভ ও পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়। ডঃ ব্যারোস "ধর্মসভার ইতিহাসে" (১ম খণ্ড) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

"When the successor of Ram Mohan Rai and of Keshab Chandra Sen came forward to speak of the Brahmo Samaj, he was greeted with loud applause······At the conclusion of the address, the multitude rose to their feet and led by Theodore F. Seward sung the hymn "Nearer my God to Thee."

প্রতাপচন্দ্রের ধর্মজীবন অতীব পবিত্র ও উন্নত ছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "ফিমেল নর্মাল স্কুল" স্থাপন করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনা করিতেন। "স্ত্রী-চরিত্র সংগঠন" নামক পুস্তক তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের নিদর্শন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রতাপচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবার তাঁহার অপূর্ব দক্ষতা ছিল। শেষে জীবনে "ইনটারপ্রিটার" নামক ইংরাজী পত্র তিনি সম্পাদনা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৭ মে তাঁহার দেহান্ত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র "সাণ্ডে মিরর" পত্রে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ম্যাক্সমুলার সাহেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন। বিদেশে ঠাকুরের মহিমা মনীষী প্রতাপচন্দ্রই প্রথম প্রচার করেন।

বংশবাটীতে কত যে সতীদাহ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে (Papers relating to East India Affairs viz, Hindoo Widows and Voluntary Immolations) সতীদাহের সংখ্যা ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখিত

আছে। নিম্নে সমাচার দর্পণ পত্র হইতে বংশবাটীর দুইটি সহমরণ সংবাদ উদ্ধৃত হইল :

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটী নিবাসী পঞ্চানন বসু নামক একব্যক্তি বর্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জ্বরবিকারে অসুস্থ হইয়া ৩রা চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে স্ত্রী তৎসহ-গামীনী হইয়াছেন। (৩০শে চৈত্র ১২৩০)।

সহমরণ।—শুনা গেল যে বংশবাটী নিবাসী গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছে তাঁহার স্ত্রী তৎসহ গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন। (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৩১)

পুস্করিণী খনন করিবার সময় বাঁশবেড়িয়া হইতে অসংখ্য প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রাচীন নিদর্শনগুলি এই এলাক হইতে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ নিদর্শন যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেই দিকে পৌরকর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২ জানুয়ারী মিলনপল্লী নামক স্থানে একটি বিদ্যালয়ের জন্য প্রাপ্ত জমির মাটি খনন কালে পাথরের উপর খোদিত একটি শ্যামা মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালীঘাটের কালীমাতার ন্যায় দেখিতে অস্পষ্ট সিন্দুর, চন্দন লেপিত উক্ত শ্যামামূর্তিটি এতদ অঞ্চলের শত শত কৌতুহলী ভক্ত অধিবাসীর কৌতুহলের বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু মূর্তিটি এখন কোথায় আছে তাহা জানা যায় নাই।

বংশবাটী হইতে **"আয়ুর্বেদ পত্রিকা"** নামে সাপ্তাহিক পত্র ও **"পূর্ণিমা"** মাসিকপত্র বহুদিন যাবত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুইটি পত্রিকার বিবরণ ৫২০ ও ৫৩৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

॥ বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি ॥

ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে হুগলী জেলায় যে এগারটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাহার মধ্যে বাঁশবেড়িয়া উত্তরাংশের শেষ মিউনিসিপ্যালিটি এবং জনসংখ্যায় দ্বাদশটি পৌর-সভার মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ইহা চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এক নম্বর ওয়ার্ড খামার-পাড়া ও মিরের হাট, দুই নম্বর ওয়ার্ড বাঁশবেড়িয়া, তিন নম্বর ওয়ার্ড বাঁশবেড়িয়া শিব-পুর ও সাহাপুর এবং চার নম্বর ওয়ার্ড ত্রিবেণী। বাঁশবেড়িয়া মগরা থানার অন্তর্গত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৭,৮৬১ জন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৭,০৩১ জন, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৬,৭৮৩ জন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬,৪৭৩ জন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৬,১০৮ জন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬,৩৮২ জন, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৪,২২১ জন, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ২৩,৭১৬ জন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ৩০,৬২২ জন, এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ৪৫,৫১০ জন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ১৫০টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মৃত্যুর আধিক্য হিসাবে বাঁশবেড়িয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিলে এই স্থানে প্রতি হাজারে ৪০ জন লোকের মৃত্যু

হয়। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জনসংখ্যার তালিকা ১ম খণ্ডে ৬১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্করী ম্যালেরিয়া বংশবাটীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। এই ব্যাধি 'বর্ধমানের জ্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাক্তার এলিয়ট সাহেব এই জ্বরের অনুসন্ধান কার্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে মহম্মদপুরে দেখা দেয়; তারপর যশোহর, নদীয়া হইয়া এই মহামারী শান্তিপুরে আসে. তারপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে এই মড়ক হালিসহর হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া, শত শত লোকের জীবন নাশ করে। বর্ধমান জ্বরের বিবরণ ৪৮ পৃষ্টায় লিখিত আছে বলিয়া আর লেখা হইল না।

মহামারীর পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝড় বংশবাটীর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস করে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মৃণীন্দ্র দেবরায়ের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক জলের কল প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে পিচের রাস্তা, সিনেমা, ইলেক্‌ট্রিক আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা হইলেও, পূর্বেকার বংশবাটীর সে শ্রী আজ আর নাই। যাত্রা, তর্জা, কবির লড়াই, কথকতা, ভাগবত পাঠ প্রভৃতি বঙ্গের আনন্দবিধায়ক নিজস্ব জিনিষগুলির পরিবর্তে বর্তমানে পাটকলের অ-বাঙ্গালী কুলীদের ভজন গান শুনিয়া, বংশবাটীকে আজ পশ্চিমের কোন ক্ষুদ্র সহর বলিয়া ভ্রম হয়। যে সকল দেবালয়ে প্রত্যহ উৎসব লাগিয়া থাকিত, আজ সেই সকল দেবালয়ের দেবতা পর্যন্ত ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। সে স্থান একদিন ভাটপাড়া প্রসিদ্ধ হইবার পূর্বে গভীর জ্ঞানপূর্ণ তর্কবিচারে মুখরিত ছিল, আজ তথাকার সংকীর্ণতাময় দ্বন্দ্ব-কোলাহলে জর্জরিত গ্রামবাসিগণ, দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। এক কথায় বর্তমান বংশবাটীকে ভূতপূর্ব বংশবাটীর প্রেতমূর্তি বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কবে আবার বঙ্গের গ্রামগুলির শ্রী ফিরিবে, স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে, পরশ্রী-কাতরতা বিদূরিত হইবে, বিদ্যাচর্চা, কৃষি, বাণিজ্য ও ললিতকলার উন্নতি হইবে, বাঙ্গালী আবার স্বধর্মনিষ্ঠ, কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান হইয়া জগৎ সভায় মাথা উঁচু করিয়া পূর্বের ন্যায় দাঁড়াইতে পারিবে, তাহা কে জানে!

॥ সাহাগঞ্জ ॥

ব্যাণ্ডেলের পর সাহাগঞ্জ বা সাগঞ্জ ইংরাজ আমলের পূর্বে মোগল আমলে এই অঞ্চলের মধ্যে একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রামটি বৈশিষ্ট্যশূন্য হইলেও প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম বলিয়া হই বাঙ্গলার শাসনকর্তা আজিমওস্মান সা-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার নামযুক্ত হইয়া এই গ্রাম সা-আজিমগঞ্জ নামে পরিচিত হয়। পরে এই নাম সংক্ষেপিত হইয়া সা-গঞ্জ বা সাহাগঞ্জে পরিণত হইয়াছে। নবাব আজিমওস্মান সা সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে আজিমওস্মান বাঙ্গলার শাসনকর্তা ছিলেন।

এই স্থানের নন্দীবংশ এক সময় খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শিবমন্দির, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, রথপ্রতিষ্ঠা, পুস্করিণী খনন প্রভৃতি যাবতীয় সৎকার্যের দ্বারা

বীরেশ্বর নন্দী এই অঞ্চলে এবং সমগ্র তিলি সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। লোকে তাঁহাকে বীরুনন্দী বলিত। শম্ভুচন্দ্র দে-র 'হুগলী পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট' এবং পঞ্চম বর্ষের 'তিলি বান্ধব' পত্রে সা-গঞ্জের তিলি জাতির বিবরণে তাঁহার কথা লিখিত আছে। বাঙলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত **জামগ্রামের নন্দী** পরিবারও এই বংশের সহিত যুক্ত।

বীরেশ্বর নন্দী তাঁহার পিতা তিলকরামের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় কাঁচড়াপাড়ার নিকট কেউটিয়া হইতে সা-গঞ্জে আসেন এবং রামরাম ঘোষের সহিত ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। হরিহর শেঠ লিখিয়াছেনঃ তিনি স্বতন্ত্রভাবে মুর্শিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ, আটয়ারী, পচাগড়, বালিগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে ব্যবসা এবং বান্দাপাড়া, গরুটি, রায়নপুর প্রভৃতি স্থানে লবণের কারখানা স্থাপন দ্বারা বিস্তর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মির্জা রসনআলি নামক সুপ্রসিদ্ধ জমিদারের তিনি দেওয়ান ছিলেন। এই মুসলমান জমিদারের মূল্যবান জমিদারী ক্রয় করিয়া পরবর্তীকালে তিনি বিশেষ লাভবান হন।

বর্তমানে ডানলপ রবার কোম্পানীর সুবৃহৎ কারখানা সাহাগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের খুব উন্নতি হইয়াছে। এত বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আর নাই। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত। সাহাগঞ্জের অন্যতম পল্লী **মিরকালা ও খামারপাড়া** পিতল কাঁসার বাসনের জন্য প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ছিল। খামারপাড়ার কুণ্ডু বংশের ভুবনচাঁদ কুণ্ডু লবণের ব্যবসা করিয়া বহু ধনসম্পত্তি করেন এবং দানধ্যানে ও পূজাপার্বণে তাহা ব্যয় করেন।

খামারপাড়ায় একটি আখড়া আছে; হুগলীর চতুরদাস বাবাজীর বড় আখড়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। খামারপাড়ার আখড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীমদ ভিখারীদাস। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন সকালে ভিখারীদাস যখন দাঁত মাজিতেছিলেন তখন ত্রিবেণীর দরাফগাজী বাঘের পিঠে চড়িয়া তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভিখারীদাস যে দাওয়ায় বসিয়াছিলেন, সেই দাওয়ায় হাত দিয়া আঘাত করিয়া দাওয়াকে আগাইয়া যাইতে বলিলেন। দাওয়া আগাইয়া যাইলে ভিখারীদাস দরাফগাজীর সম্মুখস্থ হইলেন এবং উভয়ে নামিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পর দরাফগাজী সংস্কৃত ও হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। দরাফগাজী ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

॥ বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার ॥

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার বলিয়া খ্যাত। গঙ্গাতীরে ইহার মনোরম নিজস্ব ভবন আছে। কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় এই গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বহু দুঃষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন পুস্তক এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পৌরসভা গ্রন্থাগারে অর্থ সাহায্য করে।

॥ সপ্তগ্রাম ॥

সপ্তগ্রাম ভারতের একটি সুপ্রাচীন স্থান; এই বিখ্যাত অংশ পূর্বে 'সাতগাঁও' নামে পরিচিত ছিল। হিন্দুশাসন সময়ে সপ্তগ্রামে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সপ্তগ্রাম শহর পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্বে সরস্বতীর বিশাল বক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাণিজ্যতরীগুলি বিরাজ করিত। ইউরোপীয় লেখকগণ এই সরস্বতী নদীকে **"সাতগাঁ রিভার"** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী নদী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ মুখে আদমজুড়, আমতা, তমলুক প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বাণিজ্যপোতগুলি দেশ-বিদেশের রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রাম বন্দরে বহন করিয়া আনিত। মূল সরস্বতী নদী শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেনের কিছু নীচে শাখরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। প্রাচীনকালে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া ইহা বিপুলকায়া ও বেগবতী ছিল। ডি-ব্যারোসের মানচিত্রে (পৃষ্ঠা ৭১) সরস্বতী গঙ্গার ন্যায় গভীর ছিল বলিয়া দেখা যায়। রেনেলের মানচিত্রে (পৃষ্ঠা ৮৮) গঙ্গা সরস্বতীর একাংশ ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যতোয়া প্রাচীন সরস্বতী নদী ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় মজিতে আরম্ভ করে এবং চারিশত বৎসর ধরিয়া মজিতে মজিতে বর্তমানে ইহা একপ্রকার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলা যায়। এবং স্থানে স্থানে সেইজন্য চাষও হয়। সরস্বতী ও সপ্তগ্রামের প্রাচীন গৌরবের অসংখ্য পরিচয় বিবিধ গ্রন্থে পাইলেও আজ সেই সব ইতিবৃত্ত স্বপ্নকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে। নদনদী আলোচনা প্রসঙ্গে সরস্বতীর বিষয় (৭৮-৮১ পৃষ্ঠা) চারিটি প্রাচীন নক্সার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক ইতিহাস আছে। সুদূর অতীতে কাণ্যকুব্জে প্রিয়বন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান্, সবন ও ভব্য নামে সাতটি পুত্র ছিল। তাঁহারা গৃহাশ্রমী না হইয়া নির্জন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাতখানি বিভিন্ন গ্রামে তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সপ্তঋষির তপঃস্থল বলিয়া উক্ত স্থান সপ্তগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। যে সাতখানি গ্রামে তাঁহারা তপঃশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামগুলির নাম বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুরে দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা। এই সাতটি গ্রামের অস্তিত্ব এখনও আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া এখন আর প্রাচীনকালের তাহাদের কোন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার নিকট 'প্রাসিই' এবং 'গঙ্গারিডয়' এই দুইটি রাজ্যের সংবাদ আসিয়াছিল। ইহার পরে গ্রীক দূত মেগাস্থিনাস্ পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনিও মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী 'প্রাসিই' অর্থাৎ মগধ এবং উহার পূর্বদিকে স্বাধীন 'গঙ্গারিডয়' রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত সাতগাঁ নামে অভিহিত এবং সপ্তগ্রাম এই বিভাগের রাজধানী ছিল। বর্তমান হুগলী

জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের সমীপ-দেশে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের 'আদি-সপ্তগ্রাম' নামক স্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম শহর অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি হুগলী শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় চার মাইল এবং কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে অক্ষাংশ ২২°৫৮´ ২০´´ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২৫´১০´´ পূর্বে অবস্থিত।

ভারতের প্রাচীনতম শহর সপ্তগ্রাম সমগ্র ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্য-তরী সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া সরস্বতীর বক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি করিত এবং সরস্বতীর বিশাল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সপ্তগ্রামের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে ইহা একটি **তীর্থ** বলিয়া গণ্য হইত। আদি-সপ্তগ্রাম স্টেশনের নিকটেই প্রাচীন সপ্তগ্রামের শেষ ধ্বংসাবশেষ একটি **মসজিদ** দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়াছিলেনঃ

That the ships near the Godaveri sailed from thence to Cape Palimerous thence to Tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni.

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লীনির সময় হইতে পর্তুগীজদের আগমনকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম **"রয়েল পোর্ট"** অর্থাৎ রাজকীয় বন্দর ছিল।

সপ্তগ্রাম-মহানগরে যেমন বহু লোকের বাস ছিল, সপ্তগ্রামের তলদেশ-বাহিনী সরস্বতী বক্ষেও সেইরূপ বহু অধিবাসী পোতপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। বাণিজ্যালয়, ধনী-দিগের বিরাট প্রাসাদ, ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের ধর্মমন্দির, বিস্তৃত রাজপথ এবং রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ সপ্তগ্রামের শ্রী ও সজীবতা রক্ষা করিত এবং এই স্থানের বণিক সম্প্রদায় শতসৌত চূড়ায় সে বিভবচ্ছট, বিকীর্ণ করিয়া ভারতের জয়গান ঘোষণা করিত। প্রাচীন রোম প্রভৃতির বৈদেশিক বণিকেরা সপ্তগ্রামের সূক্ষ্ম বস্ত্র 'মসলিন' এখান হইতে লইয়া যাইত এবং উক্ত মসলিন রোমের রাণীরা পরিধান করিতেন। সপ্তগ্রামকে "গ্যাঞ্জেস রেজিয়া" নামে তাঁহারা অভিহিত করিতেন।

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস তাঁহার 'মনসামঙ্গল' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্বগুণ ধাম॥
জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি ঋষিমুনি সেবে তথি
তপজপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর॥
দেখিব ত্রিবেণী-গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কূলেতে চাপায় মধুকর।

আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥
তীর্থকার্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন সুবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা॥"

পরবর্তীকালে স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাঁহার "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে" লিখিয়াছেন—
"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতে খ্যাতঃ।"

বিজয় সেন 'সেনরাজ বংশের' প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম রাঢ় দেশে রাজত্ব করেন এবং সেই সময় সপ্তগ্রাম তাহার রাজধানী ছিল। পরে তিনি পাল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া গৌড় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ত্রিবেণীর নিকটে নিজ নামানুসারে "বিজয়পুর" নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ধোয়ী রচিত '**পবনদূত**' নামক দূতকাব্যে লিখিত আছে।

বিজয় সেনের পর তাহার পুত্র বল্লাল সেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করেন। বল্লালের সময়ে কোন্ হিন্দু রাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না, তবে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুরারি শর্মা রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন এবং সপ্তগ্রাম তাহার রাজধানী ছিল।

মুরারি শর্মার পর রাজা শত্রুজিৎ সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণরাম তৎপ্রণীত "ষষ্ঠীমঙ্গল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

"সপ্তগ্রাম যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক॥
শত্রুজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরয়ে কত গুণ বলিতে না পারি॥
নির্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন॥"

রাজা শত্রুজিতের বংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন; সপ্তগ্রামে বিজয়ের পর মুসলমানগণ বহু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন! ত্রিবেণীতে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির এবং সপ্তগ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরকেও মসজিদে পরিণত করা হয়। সপ্তগ্রামজয়ী জাফর খাঁ

১৩১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাহাকে ত্রিবেণীর রূপান্তরিত মসজিদে সমাহিত করা হয়। স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে জাফর খাঁ হিন্দু রাজা ভূদিয়ার সহিত যুদ্ধে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ কাফেরদিগকে তরবারী ও বল্লম দ্বারা বিতাড়িত করিয়া ঈশ্বরের নামে সপ্তগ্রামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ত্রিবেণীর একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ তুরস্ক জাতীয় ছিলেন; বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। পূর্বে জাফর খাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্বে ইনি দেওকোটের শাসনকর্তা ছিলেন। গায়সুদ্দীন বুলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন কৈফায়স সাহ যখন বঙ্গদেশ শাসন (১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০২ খৃষ্টাব্দ) করিতেছিলেন, সেই সময় জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ইহার পূর্ণ নাম নিম্নলিখিতরূপে লিখিত আছেঃ

"উলাঘ-ই-আজম্ হুমায়ুন জাফর খাঁ বরহাল ইংসিল।"

১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং উক্ত বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধিও ত্রিবেণীতে আছে। জাফর খাঁর পর ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইজুদ্দীন খাঁ "আজম-উল-মুলুক" উপাধি ধারণ করিয়া সপ্তগ্রাম শাসন করেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সৈয়দ ফকরউদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। হিজরী ৭২৯ অব্দে অর্থাৎ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে প্রথম টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। হিজরী ৯৫৭ অব্দ অর্থাৎ ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শের শাহের পুত্র ইসলাম শা'র রাজত্বকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রামে টাকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে মুদ্রিত শের শাহ, হুসেন শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান নরপতির নামাঙ্কিত যে সমস্ত মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা "ক্যাটলগ অফ কয়েনস ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম" নামক পুস্তকের বহু স্থানে (নং ৭৪, ৮২, ২২৪, ২৭৭ ইত্যাদি) উল্লিখিত আছে। ৫৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রার কথায় সপ্তগ্রামের মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

কতিপয় শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ইকরার খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে তরবিয়ৎ খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মজলিশ খাঁ, ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে উলাঘ খাঁ এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রুকুনুদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।

আকবর যখন ভারত সম্রাট তখন এই সপ্তগ্রামের মুকুন্দরাম শেঠ নামধেয় এক বৈশ্য বণিক তাঁহার বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে হুগলীর নিকটস্থ সপ্তগ্রামে নিজ বাস্তুভিটা তুলিয়া দিয়া বর্তমান বড়বাজার অঞ্চলে তৎকালীন জলাভূমির মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তুলা হইতে সুতা ও বস্ত্র তৈয়ারীর বিপুল আয়োজন করেন। তাহার ফলে, তাহাদের বহির্বাণিজ্য পূর্বে ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা প্রভৃতি দেশে এবং পশ্চিমে পারস্য, আরব ও লোহিত সাগরের পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত উপকূল ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ইটালীর বণিকেরা আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজের মধ্যে উটের ডাক প্রচলন করিয়া ভূমধ্য-

সাগরের উত্তরাংশেও বাংলার কাপড় বেচিতে আরম্ভ করিল। শেঠ বণিকদের নৌকা শেষে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া লণ্ডনের বুকের উপর গিয়া রাণী প্রথম এলিজাবেথকে মসলীন কাপড় বেচিয়া আসিয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ভবের তাহাই প্রধান কারণ। স্পিনিং-উইভিং যন্ত্রের উদ্ভাবনা, সুয়েজখাল খনন প্রভৃতি ইহার অনেক পরের কথা।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শেঠ তাঁহাদের বাস্তুদেবতা গোবিন্দজীউর মূর্তি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এবং তাহা নিজ বাসস্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বাস্তু গৃহদেবতার নামে গোবিন্দপুর নাম প্রচলিত হইয়া আসে। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ (সপ্তদশ হইতে বিংশতিতম পর্যন্ত) এখনো স্থায়ীভাবে সুখে কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। ষ্ট্রাণ্ড রোড ও কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত "মেটকাফ হল" যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে শেঠ বংশীয়গণের পূর্বপুরুষ বাস করিতেন বলিয়া ক্যাপ্টেন উইলসনের মানচিত্রে চিহ্নিত আছে।

গৌড়াধিপ প্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে সপ্তগ্রামের নাম "হুসেনবাদ" রাখা হয়। গৌড়ের প্রসিদ্ধ নৃপতি সুলেমান কররানি যখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করিতে উদ্যোগী হন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ উড়িষ্যারাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সাহায্য গ্রহণ করেন। মুকুন্দদেবের জ্ঞাতিভ্রাতা বিখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ ও উড়িষ্যার সম্মিলিত সেনাবাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য আক্রমণ-পূর্বক সপ্তগ্রামে আসিয়া সুলেমানের সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কর্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকৃত হয়। সুলেমান সপ্তগ্রাম পুনরাধিকারের জন্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু উপর্যুপরি চারবার তাহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর তিনি রুদ্রনারায়ণকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া তাহার সহিত সন্ধি করেন ও সপ্তগ্রাম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে রূপা বা পরম ভট্টারক শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ নামে বাগদী জাতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; ইনি সপ্তগ্রামে একটি বিহার বা সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেনের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বর্ণিত আছে।

চণ্ডী-রচয়িতা পরাশরপুত্র সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা তীরে ন্যানপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্ধন দাস সপ্তগ্রামের অধিকারী বা শাসনকর্তা ছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাদের নিকট হইতে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ গ্রন্থে রঘুনাথ সম্বন্ধে শ্রীহরিদাস দাস লিখিয়াছেন ঃ প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্বতীরেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান। এইখানেই রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধনদাস মজুমদারের প্রাসাদ ছিল। ই-আই-রেলের আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া দেড় মাইলের

মধ্যে পাটবাড়ী। দেবমন্দিরে এক জোড়া কাষ্ঠপাদুকা এবং একখানি পুরাকালের পাথর আছে। শুনা যায়, উহার উপর শ্রীরঘুনাথ প্রভু উপবেশন করিতেন।

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ তোগলক বঙ্গদেশকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন, যথা (১) লক্ষ্মণাবতী, (২) সাতগাঁ, এবং (৩) সোনারগাঁ। উক্ত তিনটি শহর তখন তিন বিভাগের রাজধানী হইয়াছিল।

বাদশাহ মহা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে, সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন সেইসময় সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ইজুদ্দীন ইয়দ খাঁ এবং লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কাদর খাঁ ফকরউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ফকরউদ্দীন প্রথমে পরাস্ত হন, কিন্তু কাদর খাঁর সৈন্যগণ অর্থলোভে ফকরউদ্দীনের পক্ষে যোগদান করিলে, তিনি জয়ী হন এবং সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। সৈয়দ ফকরুদ্দীন, তাহার পত্নী ও একটি খোজাকে সপ্তগ্রামে সমাহিত করা হয় এবং তাহাদের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সৈয়দ ফকরউদ্দীনের সময়ে ইবনু বটুটা নামক বিখ্যাত পর্যটক ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রাম বন্দরে আসিয়া নামিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপঃ

॥ ইবন বটুটার বিবরণ ॥

"আমরা মালদ্বীপপুঞ্জের সাহাই দ্বীপ হইতে ৪৩ দিন সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হই। দেশ অতি বিস্তীর্ণ, এখানকার সকল পণ্যই সুলভ কিন্তু বায়ুমণ্ডল সর্বদাই তমসাচ্ছন্ন। আমরা সর্বাগ্রে সাতগাঁ দর্শন করি। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ইহা একটি প্রকাণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগর। ইহার নিকটেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। অনেক হিন্দু তথায় তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। গঙ্গাবক্ষে বহুতর সজ্জিত সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশবাসীরা লক্ষ্ণৌতিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই সময় বাঙ্গলার সিংহাসনে সুলতান ফকরুদ্দীন অধিরূঢ় ছিলেন। দেশের শাসনভার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইনি আপনার পুত্র মুই-জামুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু পরে তাহারই বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিয়াছিলেন; উত্তরকালে পিতাপুত্রে গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে সকল বিরোধ মিটিয়া যায়।

"সপ্তগ্রামে এক রৌপ্য দিরামে পঁচিশ রিখল (অর্থাৎ এক মণ তিন পোয়া) চাউল বিক্রয় হইতে দেখিলাম। একটি রৌপ্য দিরাম প্রায় দশ পয়সা; আমাদের দেশের রৌপ্য দিরাম ও বঙ্গদেশের দিনারের মূল্য সমান। আমি নিজে তিন রৌপ্য দিনারে (তিন টাকা বার আনা) একটি পয়স্বিনী গাভী বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এখানকার বলদ ঠিক মহিষের ন্যায় বলশালী। এক দিরামে আটটি করিয়া হাঁস ও মুরগী এবং পনেরটি পায়রা বিক্রয় হইত। একটি মোটা-সোঁটা ভেড়া দুই দিরামে (পাঁচ আনায়), এক রিখল শর্করা তিন দিরামে, এক রিখল গোলাপ জল আট দিরামে, এক রিখল ঘৃত (সাত পোয়া), চার দিরামে (দশ আনা) এবং এক রিখল সরিষার তৈল দুই দিরামে কিনিতে পাইয়াছিলাম।

"সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত ত্রিশ হাত লম্বা অতি উত্তম মসলিন বস্ত্র দুই দিরামে

আমার চোখের সামনে বিকাইয়াছে। একটি পরমাসুন্দরী ক্রীতদাসীর মূল্য এক স্বর্ণ দিরাম। আমি ঐ মূল্যে লাসুয়া নাম্নী একটি পরম রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী বালিকা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার একজন সঙ্গী লুলু নাম্নী একটি সুরূপা যুবতীকে দুই স্বর্ণ দিরামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

"ফকরউদ্দীন ফকিরদিগকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সইদা নামে এক ফকির সাতগাঁর শাসনকর্তা হন। সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্য অন্যত্র গমন করিলে, সইদা তাহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান তাহা অবগত হইয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন, সইদা পলায়ন করে, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হয়। আমি সাতগাঁয়ে পৌঁছিয়া সেখানকার সুলতানকে দেখিতে পাই নাই—কারণ এই সময়ে তিনি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাতের ভাবী ফলে আশঙ্কিত হইয়া, আমি তাড়াতাড়ি সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া কামরূপ যাত্রা করি।"

ইবন বটুটার বিবরণ হইতে পরিস্কার বোঝা যায় যে তিনি সপ্তগ্রাম বন্দরে নামিয়াছিলেন, কারণ সমুদ্রগামী বড় বড় বাণিজ্যপোত তখন সপ্তগ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত করিত। অনেকে ইবন বটুটা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া আসেন লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কারণ ইবন বটুটা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে "সাতগাঁ" এই স্থানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ হয়। এই সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারও লিখিয়াছেন যে **"সাতগা"** কখন **"চাটিগাঁ"** হইতে পারে না। তাঁহার বর্ণনা এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য:

> That the Ganges and the Jamuna united near Satagaon and not near Chittagong is borne out by Abul Fazal. Again, Chittagong was situated inland, off the sea-coast and could not obviously be the base from which Fakhruddin sailed out in summer with his flotilla for an attack upon Lakhnawati as stated by Ibn Batuta. So, the contention of Sudkawan being Chatigaon holds little water.

বঙ্গে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) সপ্তগ্রামের এলাকায় মালাধর বসু নামক একজন অতিশয় ধার্মিক ধনী ও বিদ্যানুরাগী সুবিখ্যাত কায়স্থ বাস করিতেন। তিনি বহু সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে নিজ বাসগ্রামে আনিয়া বাস করান এবং তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন; তদবধি উক্ত গ্রাম 'কুলীন-গ্রাম' নামে পরিচিত হইয়াছে। পরম বৈষ্ণব মালাধর বসু বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কারণ তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামে খ্যাত। তজ্জন্য হোসেন শাহ তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দান করেন। তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৫ শকে) রচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে (১৪০২ শকে) ইহা সুসম্পন্ন করেন।

কুলীনগ্রাম জৌগ্রাম স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের পরম বৈষ্ণব বসুবংশের খ্যাতি বৈষ্ণবসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। গুণরাজ খাঁর পুত্র সত্যরাজ খাঁ (প্রকৃত নাম লক্ষ্মীকান্ত বসু) ও তাহার পুত্র বসু রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের

অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। বলা বাহুল্য বসুবংশের এই তিন কীর্তিমান পুরুষ হইতেই কুলীনগ্রাম তীর্থের গৌরব অর্জন করিয়াছে। কুলীনগ্রাম "বসু রামানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাঠ" নামে প্রসিদ্ধ। রামানন্দ একজন পদকর্তা ছিলেন।

আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে মালাধর বলিয়াছেনঃ

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

হরিদাস ঠাকুর বহুদিন কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে এই গ্রামে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছেঃ

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥

অনেকেরই ধারণা যে ভারতবর্ষ অনায়াসেই মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ইহা সমর্থন করে না। এবং এ-কথাও সত্য মুসলমানেরা কোনোদিনই সমগ্র ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সর্বকালেই ভারতের বৃহত্তম অংশ হিন্দু-রাজগণের শাসনাধীন ছিল। অবশ্য হিন্দুদের চরমোন্নতি ঠিক এক শতাব্দী কাল স্থায়ী ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, ইংরেজ হিন্দুদের নিকট হইতেই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল, মুসলমানের নিকট হইতে নয়। আমাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে হাণ্টার সাহেবের মন্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধার করি।

The popular notion that India fell an easy prey to the Mussulmans is opposed to the historical facts. Muhomedan rule in India consists of a series of invasions and partial conquests, during eleven centuries from Usman's raid in 636 to Ahmed Shah's tempests of invasion in 1761 A. D. They represent in the Indian History the overflow of the nomad tribes of Central Asia to the south-east ; as the Huns, Turks and various Tartar tribes disclose in early European annals the westward movement of the same great breading-ground of Nations. At no time was Islam triumphant throughout all India. Hindu dynasties ruled over a large area. At the height of the Mahomedan power, the Hindu princes paid tribute and sent agents to the Imperal Court. But even this modified supremacy of Delhi lasted for little over a century (1608-1707). Before the end of that period the Hindus had again begun the work of reconquest. The native chivalry of Rajputana was closing in upon Delhi from the south east, and the religious confederation of the Sikhs was growing into a military power in the north-west. The Marathas combined the fighting power of the low castes with the statesmenship of the Brahmans, and subjected the Muhamedan kingdoms throughout India to tribute. So far as can now be estimated, the advance of the English power at the beginning of the present (19th) Century, alone saved the Mughal-Empire from passing to the Hindus * * * *The British won India not from the Mughals but from the Hindus.* —W. W. Hunter's History of the Indian people.

হুসেন শাহের সময়ে গোবর্ধন ও হিরণ্য দাস নামক দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রামের "অধিকারী" বা রাজা ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার উপর ছিল। হিরণ্য দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণবজগতের চির সম্মানিত ষটগোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাঠ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার পূতচরিত কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইল।

॥ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তঠাকুর ॥

১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দের বিবাহে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দিরে নিত্যানন্দ স্বহস্তে একটী মাধবীলতার বৃক্ষ রোপণ করেন; উক্ত মাধবীলতাকুঞ্জ এবং উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন; তাঁহার ফুল-সমাধি আদি সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্তের মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্যমান আছে।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময় হইতেই সুবর্ণবণিক সমাজে বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তি প্রবর্তিত হয়।

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তরিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকের দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥

উদ্ধারণ দত্তের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত ও মাতার নাম ভদ্রাবতী। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' মতে তিনি ছিলেন ব্রজের সুবাহু গোপাল; তাই শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। **প্রেমবিলাস** গ্রন্থে উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

স্বর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।
যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভোজন॥

উদ্ধারণ দত্তের প্রকৃত নাম দিবাকর দত্ত ও তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া। তাঁহার পুত্রের নাম প্রিয়ঙ্কর। পত্নীর পরলোকগমনের পর ২৬ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ইনি দেশময় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের সহায়ক ছিলেন। ১৪২৯ শকে

বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দরিদ্রগণকে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে শ্রীমদ নিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করিয়া তাহাদের বৈষ্ণব করাইয়াছিলেন। অন্নসত্রের রসুইশালার জন্য ত্রিশবিঘা ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে সেই জন্য গ্রামের নাম **ত্রিশবিঘা** হয়। ত্রিশবিঘা নামে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল, বর্তমানে উহার নাম **আদি সপ্তগ্রাম** হইয়াছে।

কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে নবহট্টের নৈরাজা নামক বণিক রাজার তিনি দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার নামানুসারে 'উদ্ধারণপুর' গ্রামের নাম হয়। অদ্যাপি এই স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের মূর্তি প্রত্যহ পূজিত হয়। এই মন্দিরের পশ্চিমে দত্তঠাকুরের সমাধি আছে। হুগলীতে জগমোহন দত্তের দেবমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের একটি খোদিত প্রতিমূর্তি আছে। বিপুল ঐশ্বর্য ও পুত্র পরিত্যাগ করিয়া ইনি শ্রীমদ প্রভু নিত্যানন্দের সেবক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' লিখিত আছে—

উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাঁহার অধিকার॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সুবর্ণবণিকগণের প্রেমভক্তি দেখিয়া শ্রীমদ্ নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেনঃ

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক-সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুণি যোগেশ্বরে॥

মন্দিরের মধ্যে "দক্ষিণে নিত্যানন্দ বামে গদাধর—মধ্যে ষড়ভুজ মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর" এবং নিম্নে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি পিতলের মূর্তি আছে।

শ্রীমদ উদ্ধারণ দত্তঠাকুর সমিতি কর্তৃক এই স্থানে একটি পাঠশালা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ইহা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মন্মথনাথ মল্লিকের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার পুত্রগণের দানে ও সহযোগিতায় এই স্থানে দত্ত ঠাকুর সমিতির উদ্যোগে হাসপাতাল ভবন নির্মিত হইয়াছে।

হুগলী জেলায় ত্রিশবিঘার (বর্তমান নাম আদি সপ্তগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন) অনতিদূরে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের শ্রীপাট; এইস্থানে যে মন্দির স্থাপিত আছে, তাহা সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইয়া পড়ে; দেব-সেবারও তৎকালে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া হুগলী-নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ বলরাম মল্লিক মহাশয় সর্ব প্রথম এই শ্রীপাটের সংস্কার-কার্যে অগ্রণী হন। তিনি ১২ই পৌষ ১৩০৬ সালে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সুবর্ণবণিকগণকে লইয়া একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভা হইতেই শ্রীপাট সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হয়। শ্রীপাটের সংস্কার, দেব-সেবার স্থায়ী বন্দোবস্ত ও শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে বার্ষিক মহোৎসব পালন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে বলরাম মল্লিক মহাশয়ের নেতৃত্বে সমিতির সদস্যগণ নানা স্থানের সুবর্ণবণিকগণের মধ্যে প্রচারকার্যের ফলে ও দত্ত-ঠাকুরের মাহাত্ম্যে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসবের সময় সপ্তগ্রামে বহু সুবর্ণবণিকের সমাগম হইত। সমবেত সুবর্ণবণিকগণকে লইয়া ১৩০৭ সালের ৪ঠা পৌষ একটি সভার অধিবেশন হয় এবং এই সভাকে সুবর্ণ বণিক স্বজাতি সম্মিলন নামে অভিহিত করা হয়। সেই বৎসর হইতে

প্রতিবৎসর শ্রীপাটে এইরূপ সুবর্ণবণিকগণের 'স্বজাতি সম্মিলন' হইতে থাকে। সম্মিলনীতে কলিকাতা এবং হুগলী চুঁচুড়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজারের অধিক সুবর্ণবণিক যোগদান করিতেন এবং তাহাতে শ্রীপাটের সংস্কার ভিন্ন সুবর্ণবণিক জাতির উন্নতিবিধান ও সমাজ-সংস্কারকল্পে বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। উত্তরকালে কলিকাতা সহরে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত জাতীয় সভা-সমিতি গঠিত হইতে থাকে তাহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল সপ্তগ্রামের এই স্বজাতি-সম্মিলন হইতে। কলিকাতায় সুবর্ণ-বণিক-সমাজ স্থাপনেরও প্রথম অনুপ্রেরণা আসে শ্রীপাট সপ্তগ্রাম হইতে।

অন্যতম ট্রাষ্টী কুঞ্জবিহারী সেন এবং তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র সেন এই বার্ষিক মহোৎসবে ও স্বজাতিসম্মিলনীতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রামচন্দ্র সেন মহাশয় একজন কবি; তাঁহার রচিত কবিতা গাহিয়া তখনকার দিনে স্বজাতি-সম্মিলনীর উদ্বোধন হইত। রামচন্দ্র সেন মহাশয় যে গান রচনা করিতেন, তাহা কলিকাতা সুরতিবাগান নিবাসী সুবর্ণবণিক যুবকবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে গাহিত। রামচন্দ্র সেনের একটি গানের কিয়দংশ এইরূপঃ

"বণিক এখন কেন ঘুমে অচেতন
'উদ্ধারণ'-আশীর্বাদ
পুরাবে মনের সাধ
ওঠ, জাগ, বুক বাঁধ, বহিয়া যায় লগন।"

শ্রীপাটের দেবসেবা ও অতিথি সৎকারের জন্য শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের সপ্তগ্রাম সেবা ফণ্ড স্থাপিত হয়। এই ফণ্ডের ৫ জন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন, ১। প্রসাদদাস বড়াল, হুগলী, ২। কুঞ্জবিহারী সেন, কলিকাতা, ৩। অমূল্যধন আঢ্য, কলিকাতা, ৪। হরিচরণ মল্লিক, হাওড়া এবং ৫। কালীকুমার দত্ত, হুগলী। শ্রীপাঠের বর্তমান ন্যাসরক্ষকগণের নাম ঃ —সর্বশ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী, নারায়ণচন্দ্র শীল, করুণাময় পাইন, কাশীনাথ মল্লিক, মাণিকলাল লাহা; সভাপতি—কুমার শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়, সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে।

সপ্তগ্রামে যাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদি আমদানী করিতেন, তাঁহারা সুবর্ণবণিক আখ্যা লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে এই স্থানে একটী সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়া ছিলেন। উক্ত সম্প্রদায় কেবলমাত্র বাণিজ্যব্যবসায়াদি ঐহিক বিষয়েই যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পারত্রিক পরমার্থিক বিষয় চিন্তনেও তাঁহারা অগ্রগামী ছিলেন। প্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল, রাজা রাজেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের পূর্বপুরুষগণ সপ্তগ্রামে ব্যবসায়াদি করিতেন এবং এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সুবর্ণবণিকদের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন ঃ

"সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥"

সপ্তগ্রামের সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় লিখিয়াছেনঃ

"সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সংকীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নূতন সৌষ্ঠবে তাহরা প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল। কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।"

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ১২৯৬ সালে সপ্তগ্রামের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইঃ সপ্তগ্রাম এখন বিজন-কানন বলিলে অত্যুক্তি হয় না;—কয়েক ঘর মাত্র লোকের বসবাস আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর হুগলী এবং মগরা এই ষ্টেশন দ্বয়ের মধ্যবর্তী ত্রিশ বিঘা ষ্টেশনের কাছেই বিঘা কয়েক জমী পরেই, বর্তমান সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের শেষচিহ্ন,—কঙ্কালাবশিষ্ট বিদ্যমান, প্রান্তর বা ইষ্টক নির্মিত অতি প্রাচীন গৃহের ধূলিসাৎ ধ্বংস ব্যাপার এখনও সেখানে অতি কষ্টে ইষৎ দেখা যায়, মহাকালের কি বিচিত্র লীলা আজ ত্রিশ বিঘার নামে সপ্তগ্রামের পরিচয় করিতে হইল। যে সপ্তগ্রাম একদিন ভারতের সর্ব প্রধান নগর ছিল। তৎকালের ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ স্থানের অধিষ্ঠিত রোমীয় বণিকগণ যে সপ্তগ্রামে অর্ণবপোত লইয়া বাণিজ্য আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হইত; ভারতের সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য যে সপ্তগ্রামে স্তূপীকৃত হইত; সুন্দরতটসালিনী জাহাজ মালবিভূষিতা স্রোতস্বতী, যে সপ্তগ্রামের একদিন অবিরত পাদপদ্ম বিধৌত করিত; বিদ্যা, ধন বল যে সপ্তগ্রামের একদিন একচেটিয়া ছিল, সে সপ্তগ্রাম আজ শ্মশান, শৃগাল কুক্কুর শূকর সর্পের আবাসভূমি—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রিশ বিঘার নামে সুপরিচিত আছে। বসুন্ধরা সেইরূপই পতিত বিস্তৃত কিন্তু সে সপ্তগ্রাম আর নাই। কবি বলিয়াছেনঃ

কাল সৃষ্টি, কাল স্থিতি কাল করে লয়।
সুখ দুখ সব সেই অতিক্রম্য নয়॥
কাল নিদ্রা জাগরণ কাল জল স্থল।
কাল স্বর্গ কাল মর্ত্ত্যসুধা হলাহল॥
কাল বাপ কাল সাপ ভিক্ষুক ভূপতি।
সংসারের সার সেই নাহি অন্যগতি॥

মুসলমান বাদসাহের আমলে মন্ত্রিবর তুদরমল্ল সপ্তগ্রামকে এক প্রধান "সরকারে" বিভক্ত করেন। তখন তথায় কেল্লা, গড় নবাবের বাড়ী ছিল, ট্যাকশাল করিয়াছিল। সেই 'সপ্তগ্রাম সরকারের' এলাকা ছিল আধুনিক হুগলী, বর্ধমান, হাওড়া, কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণা। প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া এক-

মাত্র রন্ধ্রে বিলীন হয়। সেই শস্য-শ্যামল, সৌধমালা-সুশোভিত সুবিস্তৃত সপ্তগ্রাম আজ যেন অতিসূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া কয়েক বিঘা মাত্র জমিতে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইল সরস্বতী নদীতে বালি পড়িতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে সপ্তগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার ব্যাঘাত জন্মিল, বালুকাস্তূপে নদী ক্রমশই ভরাট হইতে লাগিল। ক্রমে নৌকার গতায়াতও বন্ধ হইল ভাগীরথীর প্রবল-প্রতাপ এই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল। তৎকালে ইউরোপীয় সওদাগরগণ মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহারা সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হুগলীতে বন্দর খুলিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠিয়া আসিয়া হুগলীতে বাস করিলেন ১৫৩৭ অব্দে, ৩৫২ বৎসর পূর্বে এ-ঘটনা ঘটে। (কালাচাঁদ)।

আকবরের রাজত্বের পূর্ব হইতেই সন্দ্বীপের অধিবাসী ফিরিঙ্গীগণ সাতগাঁয়ের প্রায় এক ক্রোশ দূরে বাঙ্গালী রাজার নিকট হইতে কিছু জমি বন্দোবস্ত করিয়া, বাঙ্গালী ধরণের গৃহ নির্মাণ-পূর্বক তাহারা ব্যবসায়াদি করিত। তখন সপ্তগ্রামে সংঘাত ও বিরোধের পর্ব যে শেষ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পঞ্চদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে বাঙ্গালী রাজার অধীনে সুখে বাস করিত বলিয়া দেশী ও বিদেশী বণিকসম্প্রদায়ের কাছে সপ্তগ্রাম প্রধান আকর্ষণকেন্দ্র ছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হান্টার সাহেব হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"While Bengal was governed by its own princes a number of merchants resorted to Hugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage."

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই জন্য সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইতে থাকে। জলপথে সরস্বতীর সাহায্যে সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া পর্তুগীজগণ আকবরের নিকট হইতে গঙ্গার ধারে হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করিবার আদেশপ্রাপ্ত হয়। পর্তুগীজগণ হুগলীতে কোন্ বৎসরে আসেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাম্প্রায়ো নবাবের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করেন বলিয়া "হুগলী পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু ওম্যালী সাহেব ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররনির রাজত্বকালে হুগলীতে প্রথম পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

সিজার ফ্রেডারিক নামক জনৈক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন,—সপ্তগ্রামে বহু বণিক সমবেত ও সমাগত হয়। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথী তটে বেতড় নামক গ্রাম; জোয়ারের সময় বেতড় হইতে নৌকাপথে গমন করিলে অতি অল্পক্ষণেই সপ্তগ্রামে পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানি বাণিজ্য-তরী চাউল কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, তৈল এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া দেশান্তরে যাইত।

॥ র‍্যালফ ফীচের বিবরণ ॥

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফীচ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল ঃ

"একশত আশীখানি নৌকার সহিত আমি বঙ্গদেশের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানের প্রধান বণিকগণ মুসলমান ও হিন্দু—উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এই দেশে অনেকগুলি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণগণই ইহাদের পুরোহিত। ইহারা জলমধ্যে আসিয়া নানারূপ আচার সহকারে গলদেশে সূত্র স্থাপন এবং উভয় হস্তে জল নিক্ষেপ করে। ঐ সূত্র প্রথমে দুই হস্ত দ্বারা এবং পরে এক হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করে। এই সকল হিন্দুগণ কখনও মাংসাহার বা প্রাণিহত্যা করে না। ইহারা তণ্ডুল, মাখন, দুগ্ধ ও ফল খাইয়া জীবনধারণ করে। শীত বা গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই তাহারা অবগাহন স্নান করে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জলমধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় প্রার্থনা করে এবং উলঙ্গ হইয়া মাংস রন্ধন করিয়া আহার করে। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইহারা মাটির উপর শয়ন করে এবং গাত্রোত্থান করিয়া ত্রিশ কি চল্লিশবার সূর্যের দিকে হস্ত উঠাইয়া এবং পরে হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিয়া এবং বাম পদের পূর্বে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পৃথিবীকে চুম্বন করে। যখনই তাহারা শয়ন করে তখনই তাহারা সীমা নির্দেশার্থ অঙ্গুলীদ্বারা মৃত্তিকায় চিহ্ন স্থাপন করে। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কপালে, কর্ণে এবং গলদেশে পীতবর্ণের মৃত্তিকা লেপন করে। ইহারা এই মৃত্তিকা চূর্ণ করে এবং প্রত্যহ প্রাতে ঐরূপ লেপন করে। ইহাদের কয়েকজন বৃদ্ধ ঐরূপ পীতবর্ণের মৃত্তিকা আধারে করিয়া রাজপথে গমন করে এবং যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের মস্তকে ও গলদেশে লেপন করে। ইহাদের পত্নীগণ দশ, কুড়ি কি ত্রিশজন একত্রে দলবদ্ধ হইয়া নদীতীরে গমন করে এবং তথায় স্নান ও অন্যান্য আচার সমাপনান্তে কপালে এবং মুখে চিহ্ন করে এবং কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া গান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করে। দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই ইহাদের কন্যাগণ বিবাহিতা হয়। পুরুষগণের সাতটি স্ত্রী থাকিতে পারে। ইহারা ইহুদীগণ অপেক্ষা ধূর্ত্ত।"

সপ্তগ্রাম মুসলমানদের অধিকৃত একটি সুন্দর নগর; সকল দ্রব্যই এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে এক স্থান বা অন্য স্থানে একটি করিয়া হাট আছে। এই হাটগুলিতে তাহারা "চাণ্ডো" বলে। অধিবাসীদের 'পেরিকোস'* নামে বৃহৎ নৌকা আছে। তাহারা এই নৌকায় করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া চাউল ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে। এই সকল নৌকায় ২৪ কি ২৬টি দাঁড় আছে। ইহারা প্রচুর ভার বহন করিতে পারে। কিন্তু এই নৌকার কোন আচ্ছাদন নাই। এই স্থানের অধিবাসীরা গঙ্গাজলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ইহাদের নিকটে কূপের পানীয় জল থাকিলেও, ইহারা দূরবর্তী গঙ্গা হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করে। যদি পান করিবার উপযুক্ত গঙ্গাজল না থাকে, তবে অন্য জলের সহিত গঙ্গাজল ছিটাইয়া উহা পান করে এবং এইরূপ করাকে তাহারা পবিত্র জ্ঞান করে।

*হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমানে 'কোস' নামে নৌকা পাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর পর্তুগীজগণ বেতড় নামক স্থানে বহুসংখ্যক খড়ের অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিত। যতদিন বেতড়ের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীতে বাণিজ্যপোতসকল ভাসমান থাকিত, ততদিন এই স্থান বহু লোকজনপূর্ণ একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইত। আবার পর্তুগীজ বণিকগণ যখন জাহাজ লইয়া ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে চলিয়া যাইত, তখন তাহারা এই সমস্ত গৃহে অগ্নিদান করিয়া দিয়া যাইত। কিছুকাল এইরূপ অস্থায়ীভাবে বাণিজ্য করিবার পর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে আকবরের ফারমানের বলে পর্তুগীজগণ হুগলীতে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্বে পর্তুগীজগণ কেবল বর্ষাকালে এখানে থাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিত; বর্ষা শেষ হইলেই তাহারা গোয়া নগরে চলিয়া যাইত।

পর্তুগীজগণ বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গায় মোহনায় প্রবেশ করতঃ হুগলী ও সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিত। বঙ্গদেশীয় বণিকগণ স্বদেশী দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে নানাবিধ মশলা, গন্ধদ্রব্য, মুক্তা, প্রবালাদি আনয়ন করিত। পর্তুগীজ জলদস্যুগণের উৎপাতে এ দেশীয় বণিকগণের বহির্বাণিজ্য এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সপ্তগ্রাম ও হুগলীর নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত, লেখনীতে তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। তাহারা জোর করিয়া দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিত এবং দাসরূপে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিত। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না।

They carried off Hindus and Moslems . threw them one after another in the decks of their ships and sold them to the Dutch, English and French merchants at the ports of the Deccan. Sometimes they brought the captives to sell at a high price to Tamluk and the port of Balasore (*Shihabuddin Talish* J. A. S. B. 1907).

সপ্তগ্রামের ধারে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করায় সমস্ত পণ্যবাহী নৌকার নিকট হইতে মাশুল আদায় করিয়া লইত। এতদ্ব্যতীত গৃহে অগ্নিদান, নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা তাহাদের ভয়ে সব সময় ভীত থাকিত। অধিকন্তু ফৌজদার মির্জা নজৎ খাঁ উড়িষ্যা রাজ্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, দামোদর নদের পশ্চিম তীরে সেলিমবাদের নিকট পলাইয়া যান, তিনি পরে পর্তুগীজদের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করেন। পর্তুগীজগণ ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তৎকালে ভাগীরথীর নাম **'দস্যু নদী'** ছিল।

তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের অত্যাচারের জন্যই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। র‍্যালফ ফিচ নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ পরিব্রাজক ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তির জন্য সোজা পথে না যাইয়া নির্জন স্থান দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা এইরূপঃ

"We went through the wilderness because the right or direct way was full of thieves." History of Bengal, Bihar & Orissa under British rule.

আকবরের সময় সপ্তগ্রাম 'বালঘকখানা' অর্থাৎ 'দস্যু স্থান' বলিয়া পরিচিত ছিল।

সেই সময় সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইউরোপীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া 'আইন-ই-আকবরিতে' লিখিত আছে।

In Akbar's time Satgaon was known as 'Balghak Khana' the house of revolt. There are two emporiums a mile distant from each other, one called Satgong and the other Hooghly, with its dependencies, both of which are in the possessions of the Europeans.

আকবরের শাসনকালে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে আফগানগণ আসিয়া সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে এবং সপ্তগ্রামের অনেক প্রাচীন নিদর্শন সেই সময় নষ্ট হইয়া যায়।

সাজাহান ভারতসম্রাট হইয়া প্রজাগণকে পর্তুগীজদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সাজাহানের আদেশে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তৎকালীন শাসনকর্তা কাসিম খাঁ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তিন মাস যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য হুগলী অধিকার করিয়া পর্তুগীজ বালকবালিকাদিগকে ক্রীতদাসরূপে এবং সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহের অন্তঃপুরে লইয়া আসে। হুগলী অধিকার করিবার পর সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় অফিসাদি হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সময় হইতে হুগলী মোগলদের রাজকীয় বন্দর হয়। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাংলা দেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঃ

"All the public offices were withdrawn from Satgaon, which soon declined into a mean village, now scarcely known to Europeans."

পর্তুগীজগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইবার পর ওলন্দাজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে। বাঙ্গলাদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজ বণিকগণ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস রোর সাহায্যে একবার চেষ্টা করেন; তৎপরে হিউজেস্ ও পার্কার নামক দুইজন ইংরাজ বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন: কিন্তু উভয়েই অকৃতকার্য হন। অবশেষে ডাঃ বাউটন্ সম্রাট সাজাহানের অগ্নিদগ্ধা কন্যাকে আরোগ্য করিলে সম্রাট তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চান। * কিন্তু বাউটন্ পুরস্কারের পরিবর্তে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিবার সনন্দ চান এবং সম্রাট সাজাহান সেইজন্য অনুমতি দেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। হুগলীতে বণিক দলের অধ্যক্ষ জব্ চার্ণকের সহিত [illegible] মনোমালিন্য হয় এবং হুগলীতে ফৌজদারের সহিত পরে যুদ্ধ হয়। হুগলীতে ঝগড়া করিয়া বসবাস করা অসুবিধা বুঝিয়া ইংরাজ বণিকগণ আওরঙ্গজেবকে দেড় লক্ষ টাকা পূজা দিয়া সুতানটীতে কুঠী স্থাপন করেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, ঠগীদের অত্যাচার প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুতানটীর কুঠী দুর্গে পরিণত হইল এবং সপ্তগ্রাম ও হুগলীর ধনী, বিদ্বান সমর্থ ব্যক্তিগণ বাসস্থান ছাড়িয়া ইংরাজদের সুতানটীর দুর্গের নিকটে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

---

* ডাঃ বাউটন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় আসেন। সাজাহানের কন্যা জাহানারা অগ্নিদগ্ধা হন ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং বাউটনের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প ঐতিহাসিকগণ লিখিলেও উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। যে ডাক্তার জাহানারাকে সারাইয়াছিলেন তাঁহার নাম ডাঃ উইলিয়ম বুটন।

॥ বর্গীর অত্যাচার ॥

মুসলমানদের অত্যাচার, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব এবং শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন অত্যাচার এবং সর্বোপরি মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদের পাশবিক অত্যাচারের জন্যই সপ্তগ্রাম ও হুগলীর আজ এই দুর্দশা। বর্গীগণ যদি শুধু রাজস্ব আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে লোকে দেশ ছাড়িয়া পলাইত না। এইরূপ নির্মম অত্যাচার কাহিনী পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়-হিন্দুগণের নিকট হইতে যদি বঙ্গীয় হিন্দুগণ কিছু সাহায্য ও সহানুভূতি পাইত, তাহা হইলে বাঙলা ও ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত, কিন্তু হিন্দুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দুগণই বিধর্মীর শরণাপন্ন হইয়া জীবন ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিল। ইংরাজ বণিকগণ মহারাষ্ট্র খাত (Marhatta Ditch) খনন করিয়া কলিকাতায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ভাগীরথীর দক্ষিণ-পশ্চিম তীরস্থ অধিকাংশ নরনারী সর্বকিছু ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল, পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানের আকার ধারণ করিল।

বর্গীদের অত্যাচার কিরূপ হইত তাহা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগীর ভয়ে সকলে পলাইল॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
এই মতে বরগী কত পাপ কর্ম্ম করিয়া।
সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাড়িয়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাঁধায়ে।
বড় বড় ঘরে আইল আগুনি লাগায়ে॥
বাঙ্গলা চৌআরি যত বিষ্ণু মণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আছি পোড়াইল সব॥
এই মতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে বরগী বেড়ায় লুটিয়া॥
কাহাকে বাঁধে বরগী দিয়া পিট মোড়া।
চিৎ করিয়া মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া॥
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পুকুরে ডুবায়ে।
ফাঁফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায়ে॥
এই মতে বরগি কত বিপরিত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
যার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগীরে।
যার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥"

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত সন্দর্ভে বাঙলায় বর্গীর হাঙ্গামার যে প্রাচীনতম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ঃ বর্গীরা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই, যাহারা দীন—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে' স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। সমস্থ ধন হরণ করে। সাধবী স্ত্রীদিগকে লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাদের প্রধান বল—ছোট ছোট ঘোড়া। তাহাদের বেগ অপরিসীম।

বর্গীদের এরূপ স্বভাব-চরিত্র দেশময় রাষ্ট্র ছিল। তাহারাই আবার মিলিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের রোধ করা অতি কঠিন। তাহাদের সৈন্য সাগরের মত। এই কথা ভাবিয়া গৌড়ের প্রজারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যেহেতু তাহারা স্বভাবতঃই ভীরু এবং অল্পেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল—কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়; কোথায় থাকা যায়, কি উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে। হা দেবতা! তুমি এ কি অতি নিষ্ঠুর কার্য করিলে. মনে হইল যেন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গন্ডশৈল-সকল খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইতেছে। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর পর্বতকে মন্থনদন্ত করিয়া দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিতেছে; মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তাহাতে দশদিক পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের মাধ্য অন্য শব্দ গ্রহণের অবসরও দিতেছে না।

সকলেই পলায়নপর। কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ হাতীতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে। যানবাহন দিনরাত চলিতেছে। উটগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই; যেন দশদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান ভরিয়া দিতেছে। অথচ যাহারা পলাইতেছে, তাহারা দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের ধনজন, সব সঙ্গে রহিয়াছে। সুতরাং ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে। মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের ঘরের যত কিছু মূল্যবান বস্তু, সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ যাইতেছেন—তাহাদের কেউ চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা ঝোলান, পৃষ্টে সঞ্চিত নানাবিধ পুথির বিষম বোঝা;—দেহ এই প্রকার নানাভারে পীড়িত, মনটী ও এতদিনে সঞ্চিত পুথিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে এই চিন্তায় সন্তপ্ত। স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন; কেহবা গর্ভভারহেতু, কেহবা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু মন্থরগমনা;—পথে এখানে কাদিন ওখানে কুশাঙ্কুর, সেখানে কণ্টক—এই ভয়ে পদে পদে শিহরিয়া উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সঙ্গের ছেলেপুলেরা যথাসময়ে পানাহার না পাওয়ায় কাতরভাবে আর্তনাদ করিতেছে. তাঁহারা নিজেরাও ব্যাকুল হইয়া অতি করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন,—তাঁহাদের মন হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীই বর্গীপূর্ণ। এইরূপ নানাবিধ আর্তনাদ ও বিলাপে সমস্ত পৃথিবী যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

যখন স্বয়ং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন "অন্যে পরে কা কথা।"

ব্যবসা-বাণিজ্য সপ্তগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করা হইলেও ইংরাজগণ চাকলা-সাতগাঁর অন্তর্গত ইউরোপীয় কুঠীসমূহের নিকটস্থ ৩৭টি বাজার ও গঞ্জের জমির খাজনা ও হুগলী বন্দর দিয়া যে সমস্ত মালপত্র যাতায়াত করিত তাহার শুল্কের আয় 'চাক্লা-সাতগাঁ' হইতে বাণিজ্যের শুল্ক ও বাজারের ভাড়া বাবদ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দেও প্রায় তিন লক্ষ টাকা জমা দৃষ্ট হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কার্য-বিবরণীতে সয়ার (Sayer) খাতে যে টাকা জমা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখা আছে :

"**Buksh Bunder or Hooghly**—The ground rent of 37 markets and gunges chiefly in the vicinity and dependent on the European settlement in the Chuklah of Satgaon together with the customs levied on goods paying that grand emporium of foreign commerce in all Rs. 3,43,708 ; deduct from which already included under the head of Calcutta Rs. 45,767 making net Rs. 2,97,941." —Fifth Report of the Select Committee of House of Commons in the affairs of the East India Company, Vol. I, Page 265.

॥ জাফর খাঁ গাজী ॥

জাফর খাঁ গাজীর দরগার (ত্রিবেণী) উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ "সীতা বিবাহ," "খরত্রিশিরসোর্বধ", "শ্রীরামেণ রাবণবধঃ", "শ্রীরামাভিষেকঃ" প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন। মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োযুদ্ধ", "চানুর বধঃ", "কংস বধঃ", "শ্রীকৃষ্ণবানাসুরেয়োযুদ্ধম্" প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। এইরূপ হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদেও আছে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মনি সাহেব ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়া বঙ্গাক্ষরে খোদিত এই লিপিগুলির সন্ধান পান। পরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনি সাহেবের পাঠ কিছু সংশোধন করেন। এই লিপিগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে, জাফর খাঁ গাজীর দরগা সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগে কারুকার্যখচিত একটি সুবৃহৎ বিষ্ণু মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে মন্দিরের পাদপীঠ অক্ষুন্ন রাখিয়া এই সমাধিস্তম্ভ করা হয় এবং মন্দিরের দেবগৃহকে সমাধিকক্ষে রূপান্তরিত করা হয়। মনি সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :

There are also near the northern and eastern entrances of some of the Hindu Gods, such as Narasinghee, Varaha, Rama, Krishna, Lucshmi etc., most of them much defaced...it is clear that the building is not now in its original state, and that formerly it must have been Hindu temple.

মুসলমানেরা এই মন্দিরের উপর অংশ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী দেখিতে

পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্তি আছে, এই মূর্তিগুলি বৌদ্ধ মূর্তি। ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিও এই দরগায় আছে।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে গৌড়, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমান শাসনকর্তাগণ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; এই সকল মসজিদে প্রস্তরফলকে শাসনকর্তার নাম, কার্যাদি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত আছে এবং উক্ত প্রস্তরফলক মসজিদের প্রাচীরে রক্ষিত আছে। সপ্তগ্রামে এইরূপ একটি মসজিদ আছে; এই সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ইষ্টকে বিরচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য সমলংকৃত। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরে একটি "কুলুঙ্গী" আছে, উহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ইহাও একটি হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল। এই মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলি দেখিয়া বোধ হয় এইগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিলে দুইধারে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের দুইটি পাঁচ ফুট লম্বা গম্বুজ দৃষ্ট হয়, ইহার উপরিভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিত্রে মধ্যস্থলের একটি "কুলুঙ্গী" এবং প্রবেশপথের দক্ষিণে প্রাচীরে রক্ষিত একখানি শিলালিপি দেখা যায়। শিলালিপিখানি আরব্য অক্ষরে লিখিত, উক্ত শিলালিপির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, যাহারা ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হন—কেবল তাহারাই মসজিদ নির্মাণ করিয়া থাকেন। যাঁহার গৌরব চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হয়, যিনি মুক্তহস্তে সকলের উপকার করেন—তিনিই বলেন, মসজিদ সকল ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং আল্লা ব্যতীত কাহারও শরণাগত হইও না। মহম্মদের উক্তি এই যে, যিনি মসজিদ নির্মাণ করেন—তাহার উপরে তাহার গৃহের এবং তাহার সঙ্গীদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা সংরক্ষিত হয়। যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, তাহার জন্য ঈশ্বর স্বর্গে একটি বাটী নির্মাণ করেন। * * * নসীরউদ্দীন ওয়াদিল আবুল মজফর মহম্মদ শাহ রাজা; ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। তাহার অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তরবিয়ৎ খাঁ খুব উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন। হিজরী ৮৬১।" (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭)।

মসজিদের বহির্দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তার দিয়া বেষ্টিত একটি স্থান আছে; এই স্থানে তিনটি সমাধি দৃষ্ট হয়। এই তিন স্থানে সৈয়দ ফকরউদ্দীন, তাহার পত্নী এবং একটি খোজার মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে। এই স্থানে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এই লিপির সহিত সমাহিত ব্যক্তিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। ফকরউদ্দীনের সমাধি স্তম্ভের গাত্র সংলগ্ন প্রস্তরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কোথা হইতে এই শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে, কিন্তু লেখাগুলি বড়ই অস্পষ্ট। বর্তমানে মসজিদের খাদিম (মোহান্ত) ফতেমা

বিবি, বয়স ৮০ বৎসর এবং তাহার ধর্মপুত্র জব্বর খাঁ মসজিদে বসবাস করে। তাঁহাদের দুইজনের আলোকচিত্র অন্যত্র দেওয়া হইল।

ফকরুদ্দীনের সমাধির উপর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ যে লিপি আছে, তাহা এত অস্পষ্ট যে, তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। চারিখানি প্রস্তরলিপিমধ্যে দুইখানি সপ্তগ্রামের পূর্বোক্ত মস্‌জিদ সম্বন্ধীয়। দুইখানিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানি বেশী লম্বা—সেখানি ফকরুদ্দীনের সমাধির দেওয়ালে বক্রভাবে রক্ষিত। খোদিত লিপি আরবী ভাষায়। তাহার মর্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

[১]

"পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে শুক্রবারে উপাসনা-শব্দ শুনিবামাত্র ত্বরিতপদে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে যাইবে। যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হইবে। দ্রব্য অপহরণ করিও না মহাপুরুষ (ভগবৎকৃপা তাঁহার উপর অক্ষুন্ন থাকুক) বলিয়াছেন—যখন তুমি বাটী হইতে বহির্গত হও, সে দিন যদি শুক্রবার হয় তাহা হইলে তুমি একজন মুহাজির (মহম্মদের প্রস্থানের সঙ্গী), আর যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তুমি উচ্চতম স্বর্গে গমন করিবে। মহাপুরুষ আরও , যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক মসজিদ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে, সে স্বীয় তা মাতা এবং ভগ্নী-গমনের পাপে পতিত হয়। মস্‌জিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। (অস্পষ্ট)

তাঁহার মুখজ্যোতি পুনরুত্থানের দিবস পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। (পারস্য ভাষায়) হাসানের বংশধর হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান্ এবং আদর্শ সুলতান মোজাফার সুলতান নাসরা সার রাজত্বকালে জুম্মা মস্‌জিদ নির্মিত হয়। ভগবান তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ববিধান করুন। ৯৩৬ হিজরী রমজান মাসে (মে, ১৫২২ খৃঃ) আমুল নগরনিবাসী সৈয়দদিগের আশ্রয়রূপ সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন এই মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। মোল্লা এবং জমীদাররা দেবোত্তর অপহরণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করেন। সে জন্য যাহাতে এরূপ না ঘটে, শাসনকর্তা এবং কাজীদিগের সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য, তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিবস তাঁহারা এই কুমর্মের সহায়তার জন্য দণ্ডিত হইবেন না।"

[২]

অপর প্রস্তর-ফলকখানিতে এইরূপ লিখিত আছে—"পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এবং অন্তিম দিবসকে বিশ্বাস করে, দৈনিক উপাসনা করে এবং ধর্মানুমোদিত দান-ধ্যান করে এবং পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই ব্যক্তি ভগবদুদ্দেশে মস্‌জিদ নির্মাণ করিবার অধিকারী। যাহারা ভগবৎকৃপায় চালিত কেবল তাহারাই এই সকল কার্য করিতে পারে।

মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের জন্য ইহজগতে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করে, ভগবান তাহার জন্য স্বর্গে ৭০টি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাখেন। হাসেনের বংশধর সুলতান হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান নৃপতি আবুল মোজাফার নৌস্‌রা সাহ সুলতানের রাজত্বকালে

টাহাবংশের গৌরব, সৈয়দদিগের আশ্রয়রূপ, আমুল নগরনিবাসী সৈয়দ ফকরুদ্দীনের উপযুক্ত পুত্র সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন কর্তৃক ৯৩৬ হিজরী শুভ রমজান মাসে (মে, ১৫২২ খৃঃ) এই জুম্মা মস্‌জিদ নির্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রাখুন!"

অপর দুইখানি প্রস্তরলিপির মধ্যে একখানিতে ৮৬১ হিজরী (১৪৫৭ খৃঃ) মামুদ সাহর রাজত্বকালে তরবিয়ৎ খাঁ কর্তৃক এবং আর একখানিতে ৪ঠা মহরম ৮৯২ হিজরী (১৪৮৭ খৃঃ) ফাত সাহর রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি ও উজীর উলুগ্ মজিলিস নুর কর্তৃক নির্মিত মস্‌জিদ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মসজিদ দুইটি কোন্ স্থানে ছিল, তাহার উল্লেখ প্রস্তর-ফলকে নাই এবং কি প্রকারে এগুলি ফকরুদ্দীনের সমাধির নিকট স্থান পাইল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। এগুলি ভিন্ন সপ্তগ্রামের প্রাচীন নিদর্শন আর কিছু দেখা যায় না। অপর প্রস্তরফলক দুইখানির মর্মানুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল

[৩]

"মহম্মদ বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসস্থাপন করে, দৈনন্দিন উপাসনায় যোগদান করে এবং ধর্মানুযায়ী দান করে এবং ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, কেবল সেই ব্যক্তিই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহারা ভগবানের করুণালাভের অধিকারী, তাহারাই এই মহৎ কার্য আরব্ধ করিতে সমর্থ। যিনি নিজের গৌরবেই গৌরবান্বিত এবং যাঁহার পরহিতৈষণা বিশ্বব্যাপী, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, মসজিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিও না। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন, যিনি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্মাণ করেন, স্বর্গে ভগবান্ তাঁহার জন্য গৃহ-নির্মাণ করিয়া রাখেন। (এই স্থানে দুইটি ছত্র ভাঙিগয়া গিয়াছে এবং এত অস্পষ্ট হইয়াছে যে পাঠ করা দুষ্কর)।

যিনি প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের দ্বারা বলীয়ান, ইসলামধর্ম এবং মুসলমানদিগের আশ্রয়স্বরূপ, সুলতান নাসীরুদ্দীন আবুল মোজাফার সাহ, ভগবান তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁহার পদগৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন। এই মসজিদ সেই মহামহিম মহিমান্বিত তরবিয়ৎ খাঁ উপাধিধারী খাঁ সাহেব কর্তৃক নির্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার অপার করুণা দ্বারা তাঁহাকে অন্তিম কালের ক্লেশ হইতে রক্ষা করুন।" ৮৬১ হিজরী বর্ষে (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) উপরিউক্ত লিপি আরবী ভাষায় একখানি পাতলা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে খোদিত এবং ফকরুদ্দীনের সমাধিস্তম্ভের উপরের দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট আছে।

[৪]

"মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, যাহারা ভগবানে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসী, দৈনন্দিন প্রার্থনা করে এবং দান-ধর্ম প্রতিপালন করে, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও ভয়ে ভীত হয় না— কেবল সেই ভক্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে মসজিদ উৎসর্গ করিবার অধিকারী ঈশ্বরের কৃপাভাজনগণই এই সকল সৎকার্য করিতে পারে। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্মাণ করে, স্বর্গে

ভগবান্ তাহার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাখেন। সুলতান মামুদের পুত্র ন্যায়বান্ এবং সদাশয় নৃপতি জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ সুলতানের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধান করুন।

হাদিগড় জিল ও মহলের (পরগণা?) শাসনকর্তা এবং লাওবলা ও মিরবক থানার অধ্যক্ষ, সাজিলা মানকবাদ এবং সিমলাবাদ নামক সহরের শাসনকর্তা এবং উজীর, অসি এবং লেখনীর অধিপতি উলুগ মজিলিসনুর এই সুবৃহৎ মসজিদের নির্মাণকর্তা। ভগবান্ তাঁহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ৪ঠা মহরম ৮৯২ সাল (১লা জানুয়ারী ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ।) দাসানুদাস আখন্দ মালিক কর্তৃক লিখিত।"

একখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে আরবী ভাষায় এই লিপি অঙ্কিত ইহাও ফকরুদ্দীনের সমাধিস্থানের উত্তরের দেওয়ালের নিম্নে রক্ষিত।

এখন আমরা এই সংক্রান্ত দুই একটি কথার আলোচনা করিব।

১। জিলা সার্জিলা মানকবাদ, ২। জিলা হাদিগড়, ৩। থানা লাওবলা ও মিরবক, ৪। সহর সিমলাবাদ। এই কয়েকটি স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। থানা লাওবলা, সম্ভবতঃ লাওপাল্লা। ত্রিবেণীর ৫ ক্রোশ পূর্বে ভাগীরথীর অপর পারে যমুনার নিকট লাওপল্লা নামক একটি স্থান আছে। লাওপল্লা এবং তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান।

প্রস্তরলিপিগুলিতে যে তিন নরপতির নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার ইতিহাসে কোনও উল্লেখ আছে কি না দেখা কর্তব্য।

১। নসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সা (৮৬১ হিজরী)

২। মামুদের পুত্র জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ (৮৯২ হিজরী)

৩। আলাউদ্দীন হাসেন সার পুত্র নাস্‌রা সাহ (৯৩৬ হিজরী)

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তৃতীয় মুসলমান নরপতি নাসির সাহেব উল্লেখ আছে। তিনি ৮৩০ হইতে ৮৬২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সাহ ইতিহাসে নাসির সাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নামের শেষে পদবী ধরিয়াই নৃপতিগণের নামকরণ হওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। ইতিহাসে নাসির সাহেব নাম প্রথম হাসেন সাহ দেওয়া উচিত ছিল। ইতিহাসে নাসরা সাহেব পিতা জালালউদ্দীন বলিয়া উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাঁহার নাম দ্বিতীয় হাসেন সাহ দিলে এত গোল হইত না।

বঙ্গদেশের পঞ্চম মুসলমান নরপতি ফাত সাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মার্সডেন এবং লেডলী বলেন, ফাত সাহ মামুদের পুত্র, সুতরাং বারবাক্ সাহের ভ্রাতা। মার্সডেন ৮৭৩ হিজরী বারবাক্ সাহেব নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বারবাক্ সাহ ৮৬২ হইতে ৮৭৯ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সামসুদ্দীন আদ্দুল মোজাফার য়ুসুফ সাহ রাজত্ব করেন। গৌড়ের ক্ষোদিত লিপিতে ৮৬০ হইতে ৮৮৫ য়ুসুফের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, রারবংশের সিকন্দর সাহ নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন। য়ুসুফ সাহেব খুল্লতাত ফাত সাহ সিকন্দরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সপ্তগ্রাম হইতে স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কতকগুলি কারুকার্য খচিত ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন; ইষ্টকগুলি পরিষদের প্রত্নশালায় রক্ষিত আছে। নিম্নে তিনখানি ইষ্টকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :

১। ইষ্টকখানির আকার ৯১/৪"×৫১/২" ইষ্টকখানির মধ্যে একটি খিলান এবং তাহার উপর একটি ফুলের কিয়দংশ অঙ্কিত আছে। প্রথম খিলানের দক্ষিণে আর একটি খিলানের অর্দ্ধাংশ আছে; দ্বিতীয় ইষ্টকের বামদিকে এইরূপ অর্দ্ধেক খিলান আছে। দুইটি ইষ্টক একত্রিত করিলে একটি সম্পূর্ণ খিলান হইবে।

২। ইষ্টকখানির আকার ৬১/২"×৮" কাল্পনিক লতাপাতা আলোচ্য ইষ্টকে উৎকীর্ণ আছে। উপরের দিক হইতে চিত্রটি নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত সরু হইয়া গিয়াছে। চিত্রের পরিকল্পনা মধ্যযুগের আরবদেশের ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

৩। ইষ্টকখানির আকার ৬"×৫১/২" প্রথম ইষ্টকখানির ন্যায় ইহার মধ্যে দুইটি খিলানের অর্দ্ধাংশ আছে এবং প্রথম ইষ্টকখানির পার্শ্বে এইখানি স্থাপন করিলে পূর্বোক্ত ইষ্টকখানির খিলানের অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ খিলানে পরিণত হইবে।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তগ্রাম হইতে একটি ভগ্ন প্রস্তরময়ী সরস্বতী মূর্তি সংগ্রহ করেন; মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় এক ফুট এবং দ্বিভঙ্গ বামে বীণা হস্তে তিনি দণ্ডায়মান আছেন। ইহা বিষ্ণু মূর্তির সহিত ছিল, কিন্তু বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া যায় নাই। সাহিত্য পরিষদে উক্ত সরস্বতী মূর্তিটি রক্ষিত আছে।

হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত আটশখানি বিবিধ চিত্র শোভিত ইষ্টক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রত্নশালায় রক্ষিত আছে। নিম্নে স্বর্গীয় জানকীনাথ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত একখানি ইষ্টকের চিত্রবিবরণ উল্লিখিত হইল :

আলোচ্য ইষ্টকখানিতে রামচন্দ্র বনমালা পরিধান পূর্বক তাঁহার ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং রাবণও তাহার দক্ষিণ হস্তের তরবারী দ্বারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন ইহাই চিত্রে উৎকীর্ণ আছে। রামচন্দ্রের দুই ধারে দুইটি বানর আছে এবং তাহারাও রাবণের উদ্দেশ্যে কিছু নিক্ষেপ করিতে যাইতেছে, এইরূপ মনে হয়। রাক্ষসরাজ রাবণের পশ্চাতেও তাহার এক সঙ্গী আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকখানির আকার লম্বায় ৮১/২ ইঞ্চি এবং মধ্যস্থলের উচ্চতা ৫১/২" ইঞ্চি। ইহার বৈশিষ্ট্য যে, উচ্চতা বাম দিক হইতে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে।"

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, সপ্তগ্রামে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে একটী কূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, উক্ত কূপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। ইষ্টকগুলি পরীক্ষা করিয়া উহা যে মোগল যুগের, তাহাই ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদীর উপর পুল হুগলীর তৎকালীন জজ্ ডেভিড, সি স্মিথের চেষ্টায় নির্মিত হয়। তিনি হুগলী জেলার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ১৮২৭ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলীর জজ ছিলেন। এই সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে "সমাচার দর্পণ" পত্রের সংবাদ উল্লেখ্য :

"লৌহময় সেতু।—পরম্পর শুনা গেল যে জিলা হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব

হুগলী শহরের শোভার সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনা গমণের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলীর কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক লোহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলায় ঐ জজ সাহেব আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করত কর্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।"

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সময় ভারী লরি যাতায়াতের সুবিধার্থে স্মিথ সাহেবের চেষ্টায় নির্মিত পুলটি পরিত্যক্ত হইয়াছে; তদস্থলে 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' ঘুরাইয়া লইয়া একটি মজবুত পুল নির্মিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়াছি যে সপ্তঋষি সাতটি গ্রামে সাধনা করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া এই অঞ্চল সপ্তগ্রাম বলিয়া খ্যাত হয়। সেই সাতটি গ্রামের অস্তিত্ব এখনও আছে। কিন্তু গ্রামগুলির নাম লইয়া এন, এল, দে-মহাশয় তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে (The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India) যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বিভ্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ তিনি খামারপাড়া, দেবানন্দপুর ও ত্রিশবিঘা এই তিনটি গ্রামের পরিবর্তে নিত্যানন্দপুর, সাম্বাচোরা ও বলদঘাটি এই নূতন তিনটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা এইরূপঃ

Formerly Saptagram implied seven villages—Bansberia, Kristapur, Basudevapur, Nityanandapura, Sibpur, Sambachora and Baladghati.

পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান জলস্রোত সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত। প্রাচীন কালে পশ্চিমবঙ্গ, গৌড়, বিহার, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে সমুদ্রে গমন করিবার জন্য, সরস্বতী নদীই সহজ ও সরল পথ ছিল। সেইজন্য স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথেই সমুদ্রযাত্রা হইতে এবং সপ্তগ্রাম মহানগর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সরস্বতী তীরে বহু নগর ছিল—শিয়াখালা, জনাই, চণ্ডীতলা, বাকসা, বেগমপুর, ঝাঁপড়দহ, মাকড়দহ, বেগড়ী, আন্দুল, মৌড়ি প্রভৃতি স্থানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশীয় বণিকগণ ভাগীরথী তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই গ্রামগুলিই সুবৃহৎ শহর ছিল এবং ধনী ও বিদ্বানের পীঠস্থান ছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই সরস্বতী নদীর তীরেই সিংহপুর রাজ্য (বর্তমান সিঙ্গুর) বর্তমান ছিল এবং সিংহবংশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন এবং উক্ত স্থান জয় করেন। চণ্ডীভক্ত সুপ্রসিদ্ধ বণিকচাঁদের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর নামানুসারে চণ্ডীতলা গ্রামের নামকরণ হয়। গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত এবং হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও মুসলমানদের অত্যাচার, মগেদের উপদ্রব এবং বর্গীদের উৎপীড়ন এই কয়টির মহাসম্মেলনে জগদ্বিখ্যাত মহানগর সপ্তগ্রামের ধ্বংস ও পতন হয়।

এখন আর সরস্বতীর সে বিশাল জলরাশিও নাই, আর ভারতের প্রাচীনতম শহর

সপ্তগ্রামের সে কোলাহলও নাই; সমস্তই মহাকালের কবলে লুপ্ত হইয়াছে। কালচক্রে সকলই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগর এক্ষণে ত্রিশখানি কুঠির লইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে, আর ক্ষীণতোয়া সরস্বতী সেই অতীত গৌরব কাহিনী গাহিতে গাহিতে অতি ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, বোধ হয় ভবিষ্যতে আর ইহার চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। যে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত ট্রয়, বাবিলন প্রভৃতি শহর এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, যে সর্বগ্রাসী কালের বশবর্তী হইয়া গৌড়, পাণ্ডুয়া, সিংহপুর, ভুরশুট, মহানাদ প্রভৃতির গৌরব-সূর্য অস্তাচলে চির-নিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে সপ্তগ্রাম এবং সরস্বতীও অব্যাহতি লাভে সমর্থ হয় নাই।

॥ নিত্যানন্দপুর ॥

ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া লাইনের ট্রেনে প্রথম স্টেশন বংশবাটী, দ্বিতীয় ত্রিবেণী এবং তৃতীয় স্টেশন হইতেছে নিত্যানন্দপুর। কলিকাতা হইত দূরত্ব ৩৩ মাইল। ষ্টেশন হইতে উত্তরে আসাম রোড পার হইয়া কুন্তী নদীর তীরে নিত্যানন্দপুর গ্রাম অবস্থিত। প্রাচীন-কালে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর এইস্থানে আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য গ্রামের নিত্যানন্দপুর নামকরণ করেন। এই গ্রামের লোকসংখ্যা মাত্র ৪ শত ১২ জন। দুই শতাব্দী পূর্বে এই বৈশিষ্ট্যহীন ক্ষুদ্র গ্রামে একজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। তিনি নবাব সরফরাজ খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র শঙ্করনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক কুন্তী নদী তীরে নির্মিত ঈশানেশ্বর ও ত্র্যম্বকেশ্বর নামক জোড়া শিবমন্দির এই গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরগাত্রের প্রস্তরফলক হইতে ইহার নির্মাণের তারিখ "১৭০৫ শকাব্দ" বলিয়া জানা যায়। মন্দিরে পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের কারুকার্যের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোগল এই তিন রকমের শিল্প বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। শতদল পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম. চক্র প্রভৃতি হিন্দুযুগের নিদর্শন এবং প্রাচীনকালের বহু অলঙ্কারের মৎরূপ ইহার গায়ে খোদিত আছে। ইহা ছাড়া মোগল আমলের জাফরি ও কল্কা এবং বৌদ্ধযুগের বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে ধ্যানস্থ পদ্মনাভ মূর্তিও মন্দিরের শোভাবর্ধন করিয়াছে। কালের নির্মম আঘাতে এই সমস্ত পোড়ামাটির শিল্পসমন্বিত ইঁটগুলি একটুও ম্লান হয় নাই। চিন্তামণি দে এই মন্দিরের শিল্পী ছিলেন। নিত্যানন্দপুর বলাগড় থানার অন্তর্ভুক্ত। স্টেশনের নিকট কুন্তী নদী আছে বলিয়া সম্প্রতি স্টেশনের নাম "কুন্তীঘাট" হইয়াছে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রথম ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজার নিবারণচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় নিত্যানন্দপুর স্টেশন হইয়াছিল। গ্রাম্য দলাদলির জন্য নিত্যানন্দের নামের সহিত জড়িত এই স্টেশনটির নাম বদলান আমরা সমর্থন করি না।

নিত্যানন্দপুরে বিড়লা ব্রাদার্স "সিনথেটিক ফাইবারস্" প্রস্তুতের বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। কেশোরাম রেয়নস ও ত্রিবেণী টিসু ফ্যাক্টরী নামক দুইটি কারখানা স্থাপিত হওয়ায় এই স্টেশনের যাত্রীসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। সরকারী সাহায্যে মহিলা সমিতি কর্তৃক বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পারুল ভট্টাচার্যের চেষ্টায় হুগলীর একটি আদর্শ সংস্থা।

॥ দেবানন্দপুর ॥

সুদূর অতীতকালে বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা এই সাতটি স্থানে সপ্তঋষি তপঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া যে পরিচিত হয় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; দেবানন্দপুর সেই সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম। বর্তমানে কোদালিয়া ও দেবানন্দপুর এই দুইটি গ্রামের নামানুসারে একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কোদালিয়া দেবানন্দপুর ইউনিয়নের মধ্যে কৃষ্ণপুর, ঈশ্বরবাহা দেবানন্দপুর, মানসপুর, কাজীডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, নারায়ণপুর, কোদালিয়া, কানাগড়, আকনা, বেনাভারুই, এবং শিমলা এই বারটি গ্রাম আছে। সপ্তগ্রামের যখন স্বর্ণযুগ তখন এই গ্রামগুলি সব সময়েই জনকোলাহলে মুখরিত থাকিত। কিন্তু নদীমুখাপেক্ষী সপ্তগ্রাম নদীর গতি পরিবর্তনে সভ্যতার কলরবশূন্য সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইবার পর উপরোক্ত গ্রামগুলিও অবলুপ্ত হইয়া যায়। এই সব গ্রামের অতীত ইতিহাসের নিদর্শন সরস্বতীর প্রাচীন গর্ভে বিলীন। সদর মহকুমায় চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত কোদালিয়া-দেবানন্দপুর একমাত্র ইউনিয়ন বোর্ড। এই প্রাচীন স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পরবর্তীকালে যাঁহাদের গৌরবে এই স্থান পুনরায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল সেই 'মুন্সী' বাবুদের কীর্তি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

দেবানন্দপুরের মুন্সী বাবুদের পূর্বপুরুষ কামদেব দত্ত এই স্থানে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণপ্রসাদ দত্ত, নবাব সরকারের কার্য করিয়া দিল্লীতে উচ্চ পদ এবং 'মুন্সী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র রামরাম দত্ত-ও রাজকার্যে কৃতিত্ব এবং পারস্য ভাষায় অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য, সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১১৫১ সালে বংশানুক্রমে 'মুন্সী' পদবী ব্যবহার করিবার অনুমতি এবং বহু জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় এই গ্রামে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল হয় এবং বাংলার প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ভূরিশ্রেষ্ঠ* বা ভুরশুট পরগণা হইতে বাল্যকালে দেবানন্দপুর গ্রামে রামরাম দত্ত মুন্সী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতিপূর্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

॥ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় কর্তৃক তিনি হৃত-সর্বস্ব হইলে, বালক ভারতচন্দ্র বাটী হইতে পলায়ন করেন। তিনি যে কবিত্ব রত্নের আকর তাহা পূর্বে কেহ জানিত না। একদিন দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণদেবের সিন্নি উপলক্ষে ভারতচন্দ্র পাঁচালী পাঠ করিবার জন্য আদিষ্ট হন।

---

* 'ভূরিশ্রেষ্ঠ' নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানের প্রাচীন বিবরণ বর্ণনা করা হইবে।

কিন্তু তিনি অন্যের রচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া, স্বয়ং ত্রিপদী ছন্দে এক নূতন পাঁচালী রচনা করিয়া সভা মধ্যে পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কাব্য রচনা; এই পাঁচালী শুনিয়া সভাস্থ নর-নারী ভারতচন্দ্রের অলৌকিক কবিশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য এই পাঁচালীর শেষভাগে দেবানন্দপুর গ্রামকে তিনি দেবের আনন্দধাম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালের সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন—"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচারিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।" নিম্নে উক্ত পাঁচালী হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

দেবানন্দপুর গ্রাম,
দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়,
দয়া কর মহাশয়,
নায়েকেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হল,
সবে হরি হরি বল,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

ভারতচন্দ্রের কবিশক্তির বিষয় রামরাম দত্ত মুন্সীর কর্ণগোচর হইলে তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং ইহার কিছুদিন পরে পুনরায় সত্যনারায়ণ দেবের সিন্নি দিবার ব্যাপার উপস্থিত হইলে, রামরাম দত্ত তাঁহাকে পাঁচালী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্র তাহার পূর্ব রচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদীছন্দে হিন্দী মিশ্রিত আর একটি কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থলে পাঠ করেন। ইহার শেষভাগে দেবানন্দপুরের মুন্সী-বাবুদের কথা এবং তাঁহার নিজ পরিচয় কিঞ্চিত লিখিত আছে। উহার কিয়দংশ এইরূপঃ

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম-রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়ে, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠির সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়।
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌণ্ডণা॥"

অতঃপর ভারতচন্দ্র তাঁহার জমিদারী পুনরুদ্ধারকল্পে ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় যাইয়া, তথায় বর্ধমান রাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি কটকে মহারাষ্ট্র সুবাদার শিব ভট্টের আশ্রয় লন, পরে বিভিন্ন স্থান গৈরিক বস্ত্রে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়া গোন্দলপাড়ায় ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বাস করিতেন, পরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাল্য জীবনের কিছু অংশ উক্ত ভবনে অতিবাহিত করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া ফরাসীদের গৃহে কাজকর্ম করিলে, তাঁহার প্রকৃত গুণের প্রকাশ পাইবে না বলিয়া. তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় কর্তৃক ভূরসুট পরগণা গ্রহণ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব লিখিতেছেনঃ

"Kirtti Chandra Rai inherited the ancestral Zamindari and added to it the Parganas of Chetwa, Bhursut, Barada and Monohar Sahi. He was bold and adventurous and fought with the Rajas dispossessed them of their kingdoms."

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে নিজ সভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই স্থানে তিনি রাজার অনুমত্যানুসারে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডী' কাব্যের ন্যায় 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনা করিয়া তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহের উপাখ্যান কৌশল সংযোজিত করিয়া দেন। ইহার পর তিনি 'রসমঞ্জুরী' নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে, তিনি যে-স্থানে বাস করিতেন, তথায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত একখানি প্রস্তরফলকে তাঁহার সহিত দেবানন্দপুর মুন্সীবাবুদের সম্বন্ধের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সাহিত্য প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৬) ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

পুণ্যশ্লোক রামরাম দত্ত মুন্সীর অন্যতম অধঃস্তন বংশধর রায় শ্যামচন্দ্র দত্ত মুন্সী একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "সদর-আলা" অর্থাৎ প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং মধ্য ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা পোলিটিক্যাল এজেন্ট পদে উন্নীত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং দেবানন্দপুর গ্রামে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি উক্ত মন্দিরগুলি তাঁহার পুণ্যকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিলেও কালের নির্মম আঘাতে মন্দিরগুলি ভগ্ন হইয়াছে।

শ্যামচন্দ্রের পৌত্র মোহিনীমোহন দত্ত মুঙ্গেরের সাব্‌জজ ছিলেন; তেজস্বী, সত্য-নিষ্ঠ ও সুবিচারক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং অবসর গ্রহণ করিয়া বহু বৎসর যাবত তিনি কলিকাতায় অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কার্য করেন; এতদ্ভিন্ন বিহারের গঠনকর্তা গুরুপ্রসাদ সেনের অনুরোধে তিনি "বিহার হেরাল্ড" নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু

ছিলেন এবং তাঁহার বহু রচনা তৎকালীন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সমস্তিপুর হইতে বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন; পরবর্তীকালে উক্ত পুঁথি সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুত্রের নাম শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত।

এই গ্রামের **ঈশানচন্দ্র দাস** একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে তিনি এলাহাবাদে যান এবং তথায় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হিসাব-রক্ষকের কার্য করিতেন। প্রবাসে তাঁহার ন্যায় সুনাম অর্জন খুব অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এরূপ বাঙ্গালী প্রীতি ছিল যে, তিনি এলাহাবাদ স্টেশনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কোন নবাগত বাঙ্গালী আসিলে, তাঁহার বাড়িতে প্রথমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীদের জন্য তাঁহার বাড়ি সর্বসময় উন্মুক্ত থাকিত। অদ্যাপি তাঁহার নামে এই প্রবাদ এলাহাবাদে প্রচলিত আছে—"বাবু তো ঈশান বাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নেহি হোগা।"

॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

দেবানন্দপুর গ্রাম বর্তমানে ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিলেও, বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী, বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের লীলাভূমি হিসাবে এই স্থান বঙ্গবাসীর নিকট পূর্ব হইতে পরিচিত থাকিলেও, বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের জন্মস্থান বলিয়া, এই ক্ষুদ্র গ্রাম আজ সর্বজনপরিচিত। এই স্থানের চট্টোপাধ্যায় বংশে ১২৮৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র নিজের জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ছিলেন খুব জ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী; ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনায় মতিলাল চট্টোপাধ্যায় হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার রচনা পাঠ করিয়াই শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস রচনায় প্রথম প্রেরণা আসে। তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া, বাল্যকাল তাঁহার বহু বিপত্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ভাগলপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে চলিয়া যান এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তেজনারায়ণ কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। এই কলেজে তিনি এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষার পূর্বে, তাঁহার মাতৃদেবী গতায়ু হওয়ায়, এই স্থানেই তাঁহার লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় আসেন, কিন্তু এই স্থানে তাহার বিশেষ সুবিধা না হওয়ায়, সকলের অগোচরে তিনি একদিন রেঙ্গুন চলিয়া যান।

রেঙ্গুনে যাইয়া তিনি সওদাগরী অফিসের হিসাব বিভাগে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থান হইতেই তাহার সাহিত্যসেবা আরম্ভ হয়। যতদূর জানা যায়, 'কাশীনাথ'

শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা এবং সেই সময় তাহার বয়স কুড়ি বৎসরের অনধিক ছিল। তাহার পর 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়: বড়দিদি বেনামীতে 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইলে, সাহিত্য-জগতে বেশ সাড়া পড়িয়া যায় এবং এই শক্তিমান লেখকের খোঁজ পড়িতে থাকে। ইহার পর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেও, তখনও তিনি বঙ্গদেশে আসেন নাই। ১৩২০ সালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। এই সম্বন্ধে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি কল্পনাও করিনি যে সাহিত্য সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে দাঁড়াবে। প্রায় বছর দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।"

তাহার পর বাঙ্গালী চরিত্রের অলোক-চিত্র স্বরূপ তাঁহার 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', প্রভৃতি উপন্যাসগুলি কিভাবে পাঠকসমাজকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে ইতিকথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম যে ভাবে তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাকে তিনি আপনার মনের বেদনা ও মাধুরী দিয়া এরূপ ভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেইরূপ সৃজনীশক্তি অন্য কোন লেখকের রচনায় সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেই জন্য তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, মনে হয় যেন আমাদের একান্ত পরিচিত কোন নরনারীর সহিত আমাদের পুনঃ পরিচয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে তিনি যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সাহিত্য প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৫৯) করা হইয়াছে।

বাল্যে দেবানন্দপুর গ্রামেই গল্প-রচনায় তাঁহার হাতেখড়ি। পরে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে সাহিত্য-সাধনা বিশেষ অগ্রসর হয়। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ব্রহ্মপ্রবাসে। গল্প ও উপন্যাস-রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি কথাসাহিত্য-সম্রাট্ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" গল্প। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত "বড়দিদি" গল্পের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। পরে 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লী-সমাজ', "চন্দ্রনাথ", "বৈকুণ্ঠের উইল", "অরক্ষণীয়া", 'শ্রীকান্ত' (১ম-৪র্থ পর্ব), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন', "দত্তা", "গৃহদাহ", "দেনা-পাওনা", 'হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', "বিপ্রদাস" প্রভৃতি তাঁহার অনেক গল্প উপন্যাস বাহির হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয়তা কেহ লাভ করেন নাই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে দেবানন্দপুর ও তার আশেপাশের বহু গ্রামের ছবি অঙ্কিত আছে। "সেকালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টার বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দেশ করিতেন...তাহারা প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত।...

এমন দিন ছিল না যেদিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে ন্যাড়া বটতলায় একত্র না হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত।...জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘরা গ্রাম হইতে, আর বনমালী ও রাসবিহারী আসিত দুইখানি পাশাপাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে।" দত্তার সুরুতেই যে গ্রামগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আজও তাহা বিদ্যমান আছে। দেবানন্দপুর হইতে হুগলীর পথে "মুড়া অশত্থতলা" এখনও আছে। যাহাকে তিনি "ন্যাড়া বটতলা" বলিয়াছেন। এই গ্রামের দত্তমুন্সীদের গলায় দড়ের বাগান (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব) খাঁয়েদের গলায় দড়ের বাগান বলিয়া এবং কৃষ্ণপুরের "আখড়াবাড়ী" মুরারিপুরের আখড়া-বাড়ী বলিয়া উল্লিখিত আছে। দেবানন্দপুর গ্রাম তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা তাহারই প্রমাণ। কৃষ্ণপুরের আখড়াবাড়ী অর্থাৎ রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠে তিনি প্রত্যহ বৈকালবেলা যাইতেন এবং কীর্তন শুনিতেন।

তাঁহার সর্বজন সমাদৃত উপন্যাসগুলি নাটক ও বাণীচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য "ডি-লিট" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। দেবানন্দপুরে তাঁহার বাস্তু ভিটার প্রতি বিশেষ দরদ ছিল এবং প্রায়ই তিনি জন্মভূমি দর্শন করিতে যাইতেন। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ তিনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে একটি বিশিষ্ট স্থানে তাঁহার শেষকৃত্য সমাধা হয়। কিন্তু অদ্যাপী তথায় তাহার কোন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থের লেখক দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য "যুগান্তর" পত্রে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) যে আলোচনা করেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ কলিকাতায় দেহ রক্ষা করেন। বিংশ শতাব্দীতে তাঁহার ন্যায় শক্তিমান লেখক ও দরদী ঔপন্যাসিক বাংলা দেশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম যেভাবে তাঁহার লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনি আপনার মনের বেদনা ও মাধুরী দিয়া মানুষের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা এরূপ জীবন্তভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আমরা আমাদের সুপরিচিত কোন নর-নারীর সুখ-দুঃখের অংশ ভাগী হইয়াছি। শরৎচন্দ্রের নশ্বর দেহ তরুছায়া সমাচ্ছন্ন পুণ্যতোয়া আদিগঙ্গা তীরে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়। যে স্থানটিতে তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল ঠিক তাহার উত্তরে অনশনে আত্মত্যাগী যতীন দাস, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং দক্ষিণে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, দানবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের শ্মশান-শয্যাও একদিন রচিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় ক্ষীণতোয়া ভাগীরথীর ছায়াসমাচ্ছন্ন এই নির্জন স্থানটিতে ইঁহারা যেন এক শয্যায় শয়ন করিয়া চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। প্রত্যেকের শ্মশান-শয্যার উপর শ্বেত প্রস্তরের এক একটি সমাধি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় বাঙ্গলার এই দরদী কথাশিল্পীর শ্মশানশয্যার উপরে সমাধি মন্দিরের পরিবর্তে কলিকাতা কর্পোরেশন সেই স্থানটির উপর

সাধারণের যাতায়াতের জন্য পাথর দিয়া একটি সুন্দর রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ অসংখ্য শ্মশানযাত্রী সেই পবিত্র স্থানটির উপর দিয়া চলাচল করিয়া তাঁহার চির-নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেছে। শরৎচন্দ্র আজ নিন্দা-স্তুতির বাহিরে গিয়াছেন—তাঁহার হয়ত শত শত পদরজেঃ কোন ক্ষতি হইতেছে না—কিন্তু বাঙলার এই মরমী সাহিত্যিকের প্রতি বাঙলার প্রত্যেক নরনারীর শ্রদ্ধা আছে। তাই এই পবিত্র স্থানটি সংরক্ষণের জন্য আমি তাহাদের আবেদন জানাইতেছি। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে দুইটি স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়াছে। একটি তাঁহার জন্মস্থান দেবানন্দপুরে আর একটি তাঁহার মৃত্যুস্থান কলিকাতায়—তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি একবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পড়ুক ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি স্মৃতিমন্দির হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভাকে অক্ষয় ও অম্লান করিয়া রাখিবার জন্য দেশের কৃতি মনীষীগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেন। ১৩৫২ সালের ১৩ই মাঘ, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ইহাতে একটি সভাগৃহ একটি পাঠাগার স্থাপিত আছে এবং একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শরৎ স্মৃতি মন্দিরে অবস্থিত পাঠাগারের নাম "শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার"। এই পাঠাগারের শরৎচন্দ্র স্বয়ং এক আলমারী পুস্তক দান করিয়া যান। শরৎস্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরে তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই মন্দিরে শরৎস্মৃতি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় আছে। শরৎস্মৃতি মন্দির শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও অতুল্য ঘোষের চেষ্টায় এবং দেশবাসীর অর্থ-সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র যে বৈঠকখানায় বসিয়া পড়াশুনা করিতেন, শ্রীকান্তে যে বৈঠকখানার কথা উল্লেখ আছে—আজ শরৎচন্দ্রের স্পর্শধন্য সেই বৈঠকখানা সংস্কার অভাবে ধ্বংসের পথে যাইতেছে। অবিলম্বে যদি এই ধ্বংসোন্মুখ বৈঠকখানাকে মেরামত না করা হয়, তবে শরৎচন্দ্রের স্পর্শধন্য একটি স্মৃতিকে দেশবাসী চিরদিনের জন্য হারাইবে।

তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন সেই গৃহের বাহিরের দেওয়ালে, হুগলী জেলা বোর্ড "এই গৃহে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন" এই কথাগুলি একটি মর্মর প্রস্তরে লিখিয়া গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন এবং রাস্তার উপর বাটির সম্মুখস্থ ময়দানেও একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া, প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন ঃ

"বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী
প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক
ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এই ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।
জন্ম—৩১ ভাদ্র ১২৮৯
মৃত্যু— ২ মাঘ ১৩৪৪।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরলোকগমনে যে শোকসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত সেই সংগীতের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি॥

১২ মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার সম্বন্ধে যে সংগীত রচনা করেন, তাহা এইরূপ ঃ

সেদিনও দেখেছি আকাশের শোভা শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্য গগন বিষাদ মগন সে তিলক মুছি দিল কে॥
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তার প্রতি ভবনে।
তেজ-প্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে॥

কালীকৃষ্ণ সেন ঃ খ্যাতনামা সাংবাদিক কালীকৃষ্ণ সেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাস করিয়া তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রে যোগদান করেন এবং তাহার মধ্যে যে প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল, তাহা সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার নির্ভিক, স্বাধীন দেশ-হিতৈষণাপূর্ণ লেখাগুলি তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত! ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এডভান্স' পত্রের সম্পাদক রূপে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পত্রেই যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। ইহার এক পুত্রের নাম অধ্যাপক সুশীলকৃষ্ণ সেন।

শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ঃ দেবানন্দপুরের দত্তমুন্সী বংশোদ্ভব মোহিনীমোহনের পুত্র কলিকাতার প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নী এস এম দত্ত রূপে পরিচিত শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত দেবানন্দ-পুরের যাবতীয় কার্যে অগ্রণী হইয়া দেশের ও জাতির সেবা করিতে কখনও বিমুখ হন নাই। দেবানন্দপুর পল্লীসেবক সমিতির সভাপতি রূপে এবং কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর শ্রীপাঠ সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভারও তিন বৎসর যাবৎ তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সজ্জন ও উদারচেতা ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি

হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে ব্রতী আছেন। দেবানন্দপুরে পাকারাস্তা নির্মাণ ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহার অর্থানুকূল্যে ও চেষ্টায় হয়। তাঁহার পুত্র অশোককুমার দত্ত-ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অঘোরনাথ দত্তের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজে অধ্যাপনা করিতেন পরে ছোট আদালতে ওকালতি করেন। দেবানন্দপুর গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে পল্লীসংস্কার কার্যে তিনি প্রথম অগ্রণী হন। পল্লীসেবক সমিতি ও স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির তিনি পরিচালক ছিলেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য থাকিয়া গ্রামে নলকূপ স্থাপন ও দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করান। গ্রামে এই সকল জনহিতকর কার্যের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পান। কলিকাতা ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির তিনি ডিরেক্টর ছিলেন।

দত্তমুন্সী বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এ্যাডিশানাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দাশরথি দত্ত, আলীপুর জেলের জেলার রায়সাহেব গুরুচরণ দত্ত, ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্ত, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর অতুলচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার পুত্র ডাঃ হিরণকুমার দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব অর্থশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দেশের প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকাগুলির সংস্কার করেন না বলিয়া বর্তমানে ধ্বংসোন্মুখ।

॥ ভারতচন্দ্রের গুণাকর উপাধি লাভ ॥

কবি ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে কিভাবে "গুণাকর" উপাধি পান, সেই সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজ, সেই গ্রন্থপাঠে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "ভারতচন্দ্র আপনি যথার্থই ভারতের চন্দ্র"। ইহা শুনিয়া সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি ভারতের চন্দ্র হইতে পারি, কিন্তু এই সমগ্র ত্রিভুবনে যদি কোন অপরূপ চন্দ্র থাকে, তবে সে স্বয়ং আপনি!" এই কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটী রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই শ্লোকটী উপহার পাইবার পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্রকে **"গুণাকর"** উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই ঃ

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনী প্রাণবল্লভঃ।
চতুঃষষ্টিকলঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ভাতি সদা ভুবি॥

ব্যাখ্যা ঃ আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাজ-ভয় আছে ও পদ্মিনীর (পদ্মিনী -নামক পুষ্পের) সহিত অপ্রণয় আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্ক নাই, কোন রূপ ভয় নাই, এবং তিনি পদ্মিনীর (পদ্মিনী-জাতীয়া রমণীর) প্রাণপ্রিয় ধন। আকাশের চন্দ্রে ষোড়শ কলা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার হ্রাসও আছে; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ এবং তাহার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কি দিন কি রাত্রি, কি শুক্লপক্ষ ও কি কৃষ্ণপক্ষ, সকল সময়েই বিরাজমান আছেন। আকাশের চন্দ্র আকাশে থাকায় সকলেরই দুর্লভ, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকায় সকলেরই সুলভ।

॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ॥

সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম **কৃষ্ণপুর** বর্তমানে একটি সামান্য স্থান হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটি তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুণ্যতোয়া বিশালকায়া সরস্বতী নদী এই অঞ্চলের নিম্ন দিয়া কুলু কুলু স্বরে প্রবাহিত হইত এবং বিদেশীয় বাণিজ্যপোতগুলি তখন পৃথিবীর রত্নরাজি এই দেশে বহন করিয়া আনিত। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো [De-Burros] লিখিয়াছেন "বাণিজ্য-তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রাম অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ এবং সপ্তগ্রাম একটি শ্রেষ্ঠ সহর।" কৃষ্ণপুর বর্তমানে কোদালিয়া-দেবানন্দ-পুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞাত অখ্যাত বৈশিষ্ট্যহীন একটি ছোট গ্রাম। কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তগ্রামের সহিত কৃষ্ণপুর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল রাজস্ব-নির্ধারণ কল্পে বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। উক্ত সময়ে সপ্তগ্রাম 'সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত হইত এবং ইহার মধ্যে ৫৩ পরগণা ছিল; লিকাতা, শালকিয়া, বারাকপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানগুলি সপ্তগ্রামের অন্তর্ভু ছিল এবং ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১ শত টাকা 'সরকার সাতগাঁও' হইতে সম্রাটকে রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য শাসনকর্তাকে দিতে হইত।

বাঙ্গলাদেশের প্রথম সাময়িকপত্র "দিগ্‌দর্শন" নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম ভাগে 'বাঙ্গলার প্রধান নগর বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে "সাতগাঁ হুগলীর উত্তর পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের কারণ গতায়াত ছিল সে এই শহরে এবং সেই সময়ে সরস্বতী নদী এমত আয়তা ছিল যে অল্প বোঝাই জাহাজ চলিত।"

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কোন সময়ে কোন রাজা এই স্থানের অধিপতি ছিলেন তাহার পূর্বাপর ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও শত্রুজিৎ নামক এক রাজা যে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা কবি কৃষ্ণরাম কৃত ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত "ষষ্ঠীমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। কালপ্রবাহে ভারতের এই প্রাচীনতম সহর কিভাবে অবলুপ্ত হয় তাহা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

১২৪২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল না এবং হিন্দু রাজা স্বাধীন-ভাবে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন:

Saptagram was still unsubdued and the district of Nadia was strewn with semi-independent Hindu Rajas.

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীর বাদশার অধীন, এক শাসনকর্তার দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত, পরে রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার একত্রে সপ্তগ্রামের শাসনকার্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁহারা এই স্থান শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই 'মজুমদার' বংশ ধনে মানে তৎকালে যে প্রধান ছিল তাহারও বহু

প্রমাণ আছে। রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারী, ধার্ম্মিক ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গাতীরবর্তী বহু পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি দানের বহু নিদর্শন পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সকলেই এই কায়স্থ পরিবারের বৃত্তিভোগী ছিল। (শান্তিপুর পরিচয়—১ম, পৃঃ ১৯৮) তাঁহাদের সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক আয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল এবং তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। এই সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছিঃ

"হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥"

রাজা হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাসের ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম রঘুনাথ। রাজবংশের একমাত্র পুত্র বলিয়া উভয় ভ্রাতারই এই শিশু বিশেষ আদরের ছিল। 'রাধাকৃষ্ণ' রাজ বংশের কুলদেবতা ছিল এবং গোবর্দ্ধন মহাসমারোহের সহিত নবজাত পুত্র হওয়ায় বিগ্রহের একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এই দুই ভাই ধার্ম্মিক এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহাদের অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ইহাদের দানশীলতার কথা "সঙ্গীত মাধব নাটকে" উল্লিখিত আছে ঃ

"পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।"

গোবর্দ্ধন দাসের বদান্যতায় বাংলা দেশে বহু ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিত এবং সহস্র সহস্র দীনদুঃখীও তাঁহার অপার কৃপায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি উল্লেখ্য ঃ

"মহৈশ্চর্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥"

ইহাদের শাসনকালে পর্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য বঙ্গদেশে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগমন করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'সাজাহান' নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল তখন ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য জমি খরিদ করিবার অনুমতি একদল বণিক পাইয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব হুগলীতে যে হিন্দু রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার বলিয়া নির্দ্ধারণ [illegible]; কারণ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ প্রথম

বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং উক্ত সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্যতীত আর কেহ হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। রঘুনাথ ঐশ্বর্যের ও বিলাসের ক্রোড়ে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা হিরণ্য দাস রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ পন্ডিত শ্রীমদ্ বলদেব আচার্যকে নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ অতিশয় মেধাবী ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন এবং তাহার শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ বলদেব আচার্যও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। রঘুনাথ ব্রজের রসমঞ্জরী,, কেহ কেহ ব্রজের রতিমঞ্জরী আবার কেহ কেহ বা তাঁহাকে ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিন জনের ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে বলদেব আচার্যের গৃহে অতিথি হন। রঘুনাথ হরিদাস ঠাকুরের অসাধারণ ভগবদ্ প্রেম দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

কিছু দিন পরে, যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন সেই সংবাদ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, এবং রঘুনাথ নারায়ণের অবতারকে সেই সময় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব হইতেই হরিদাস ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ করিয়া অবধি, তাঁহার শ্রীচরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্যের আলয়ে যখন মহাপ্রভু পদার্পণ করেন, তাঁহার বাটীতে যাইয়া তিনি সর্বপ্রথম তাহার প্রেমময় মূর্তি অবলোকন করিলেন। এই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার আর ঘর-সংসার ভাল লাগিল না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেনঃ "রঘুনাথ এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া গৃহে যাও, যখন চঞ্চল হৃদয় যথার্থ স্থির বৈরাগ্যের উপযোগী হইবে তখন স্বয়ং ভগবানই তোমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ আত্মহারা হইতেন যে তাহার জনক ও জ্যেষ্ঠতাত তাহা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে একবৎসর কাটিল, তাঁহার পিতামাতা রঘুনাথের সহিত এক সুন্দরী কন্যার বিবাহের স্থির করিলেন। রঘুনাথ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে মন পলাইতে কৈল॥
রাত্রে উঠি একলা চলিল পালাইয়া।
দূরে হইতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥"

রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া সর্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার তীব্র অনুরাগ কিছুতেই বাধা মানিতে চাহিল না। জ্যেষ্ঠতাত, পিতামাতা প্রত্যেকেই রঘুনাথের জন্য বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গৃহাশ্রয়ী করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক রূপলাবণ্যবতী সর্বগুণালঙ্কৃতা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন।

পার্থিব ভোগবিলাসে রঘুনাথকে আকৃষ্ট করা গেল না, বরং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে রাজ ঐশ্বর্য ও অপ্সরার মত স্ত্রী যাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই, দড়ির বন্ধন তাঁহাকে কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥"

রঘুনাথ এই সময় পানিহাটী গ্রামে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রঘুনাথ আমি আজ তোমাকে দণ্ডিত করিব; তুমি আমার শিষ্যগণকে চিঁড়াদধি ভোজন করাও। রঘুনাথ প্রেমে গদ গদ হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রভু এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রভু বলিলেনঃ শীঘ্র তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করিবেন। ইহার পর তাঁহার গৃহত্যাগের সুযোগ হইল। আজও পানিহাটী গ্রামে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চিঁড়া-দধি মহোৎসবের স্মৃতি স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ 'দণ্ডমহোৎসব লীলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

"পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে॥"

পানিহাটীতে গঙ্গার ধারে বটবৃক্ষ তলে শ্বেতপাথরে এই কথাগুলি খোদিত আছেঃ

প্রেমের অবতার দয়ারসাগর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক
১৪৩৮ শকে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে
এই স্থানে
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর
কৃপাদণ্ড মহোৎসব লীলা

অতঃপর রঘুনাথ প্রতিদিন ষোল ক্রোশ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ দিনে পদব্রজে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। নীলাচলে যাইতে তাঁহাকে হিংস্র

জন্তুসমাকুল নিবিড় বন ও প্রান্তর এবং মকর ও নক্র বিশিষ্ট নদী সকল সন্তরণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ প্রেমের একাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথকে ভক্তির উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন এবং সাধ্য সাধনতত্ব প্রণালী শিক্ষা দেন। রঘুনাথ যে অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন মার্গের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি স্নান, আহার ও নিদ্রার জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রাখিয়া, প্রতিদিন একুশ ঘণ্টা হরিনাম সংকীর্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্য অর্থাদি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ছত্রে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোল বৎসর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

"তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥"

এই সময় রঘুনাথের শোকে তাঁহার মাতা ও পত্নী লোকান্তরিতা হন। নীলাচল হইতে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত এক সাক্ষাৎ মোহন মুরলীধারী শিলারূপী মদনমোহন বিগ্রহ লইয়া একবার সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরে, তিনি উক্ত মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন রঘুনাথ আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবগণ আসিয়া হরিনাম সংকীর্তনে সপ্তগ্রামকে মাতাইয়া তুলিল। শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভুও সপ্তগ্রামে আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন; সপ্তগ্রামের দেবালয় বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান রঘুনাথও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বিদ্যমান আছে; কিন্তু সাড়ে-চার শত বৎসর পূর্বে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কয়েকটী জলাভূমিকে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন। রঘুনাথ সেই স্থানটীকে ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার মানসিক বলে একটী আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন রঘুনাথের ইচ্ছা হইল যে, কি উপায়ে এই পুণ্য জলাশয় দুইটীকে পূর্বের ন্যায় বিশালকায় করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় বহু ধনরাশি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন যে, বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর আদেশে

তিনি ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, যে, শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট যাইয়া এই ধন রত্ন অর্পণ করিয়া বলিও যে, তিনি যেন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দেন। রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ পুলকে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অচিরে কুণ্ড দুইটী স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত হইল। রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনের কৃষকদের নিকট হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের যে সকল জমি খরিদ করেন তাহার পাঁচখানি দলিল বরাহনগরে শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্যের পাঠবাড়িতে সংরক্ষিত আছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে তিনি এরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লোপ পাইল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ পুনরায় সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লন এবং এই স্থান মুসলমান শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন স্থানের যাবতীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল। আকবরের সময় এই স্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে. তৎকালীন লেখকগণ এই স্থানকে "দস্যুস্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রামের তৎকালীন অবস্থার কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এইস্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

মুসলমান রাজত্বে রঘুনাথের বাড়ী ধ্বংস হইল এবং মন্দির অপবিত্র হইবার পূর্বেই মন্দিরের পূজারী-ব্রাহ্মণ 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'মদনমোহনের' বিগ্রহগুলি মন্দিরের পার্শ্বে সরস্বতী নদীর তীরে প্রোথিত করিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন; রাজবাড়ীর কুল-দেবতার মন্দির ধ্বংস হইল। সম্প্রতি এই গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণপুর হইতে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের কারুকার্য-খচিত একখানি ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ১৩৬৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখের **"যুগান্তর"** পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইঁটে কারুকার্য ॥ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার 'হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র উত্তরায়ণ মেলা উপলক্ষে কৃষ্ণপুরে গিয়া ইটের স্তূপ হইতে কারুকার্যখচিত চতুষ্কোণাকার একখানি মন্দিরের ইট আবিষ্কার করিয়াছেন। ইটখানিতে একটি সুন্দর পদ্মফুল খোদিত আছে এবং দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে উহার আয়তন নয় বর্গ ইঞ্চি। শ্রী মিত্র কারুকার্যখচিত এই ইটখানি শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের অন্যতম ইট বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধনদাস মজুমদার কর্তৃক শাসিত হইত। এই রাজবংশে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করিলে নবজাত পুত্রের মঙ্গল কামনায় কৃষ্ণপুরে তৎকালীন সপ্তগ্রামের অধিপতি রাধাকৃষ্ণের এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রঘুনাথ গোস্বামী মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সপ্তগ্রাম রাজ্য মুসলমানগণ অধিকার করে এবং তাহারা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া দেয়। পরবর্তীকালে এই মন্দিরের বিগ্রহগুলি সরস্বতী নদী হইতে উদ্ধার করিয়া একটি গৃহে সংরক্ষণ করা হয়। রঘুনাথ দাসের এই মন্দিরের কথা ইতিহাসে লেখা থাকিলেও কোন নিদর্শন এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। তিনি আরও বলেন যে, সপ্তগ্রাম

এলাকাস্থিত এই প্রাচীন স্থানগুলি খনন করিলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে। এই রাঢ় অঞ্চল হইতে প্রাচীন কোন দ্রব্য যাহাতে অপসারিত না হয় সেই দিকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলিয়া শ্রী মিত্র মন্তব্য করেন। তিনি ইটখানিকে বরাহনগর পাটবাড়ীর বৈষ্ণব প্রত্নশালায় অর্পণ করিবেন বলিয়া জানা যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার **সম্পাদকীয় স্তম্ভে** (৯ মাঘ ১৩৬৮) এই স্থানে প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিবার জন্য যে আবেদন এই সম্পর্কে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এইঃ

ইতিহাসের লিখিত গ্রন্থে সপ্তগ্রামের নানা প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে। রাজনীতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বে সপ্তগ্রাম একদিন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের দুর্ভাগ্য, ধর্মদ্বেষী আক্রমণকারীর অভিযান তাহার স্থাপত্যগৌরবের অজস্র নিদর্শন ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির স্থাপিত ছিল, তাহা খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতকেই আক্রমণকারীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের কোন চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু এরূপ চেষ্টা হইলে শুধু পঞ্চদশ শতকের হিন্দু মন্দিরটির সম্পর্কে নহে, সপ্তগ্রামেরই প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্কে নানা বাস্তব তথ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। কৃষ্ণপুরের ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে এমন ইষ্টকখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে যাহাকে প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের ইষ্টক বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সপ্তগ্রামের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহা অবশ্যই সুবিবেচিত উদ্যম বলিয়া প্রশংসিত হইবে। এই সংবাদের আলোকচিত্র ২০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে রচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটী 'কুলুঙ্গি' আছে। উহা হিন্দু মন্দিরের খিলানের ন্যায়—দেখিতে অতি সুদৃশ্য। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দুর্দ্দশার বিষয় ধ্যানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণকিঙ্কর গোস্বামীকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, সপ্তগ্রামে যাইলেই তিনি যাবতীয় বিষয়ে অবগত হইবেন এবং বিগ্রহগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যেন যথাস্থানে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথের কথানুযায়ী তদীয় শিষ্য সপ্তগ্রামে আসিয়া বিগ্রহগুলিকে নদীর তীর হইতে উদ্ধার করিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া পূর্বোক্ত স্থানেই খড়ের ঘরে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহী বর্তমান গৃহ এবং যে স্থানে বিগ্রহগুলি প্রোথিত ছিল, সেই স্থান ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তথায় একটী ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে এরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন যে, আহার নিদ্রা তাঁহার একপ্রকার লোপ পাইল। অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তিনি সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইলেন এবং ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের (১৫০০ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন রঘুনাথের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পুরুষে লীন হইয়া গেল। শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর যে পথ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পরম পবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। মহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র কায়স্থ হইয়াও মহাপ্রভুর কৃপায় এবং নিজ চরিত্রবলে তিনি ব্রাহ্মণ-সদৃশ সর্ববর্ণের পূজনীয় ও প্রণম্য হইয়াছিলেন।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেনঃ

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥"

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে নিম্নোক্ত ভনিতাটি লিখিত আছেঃ

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় গ্রন্থের **'অন্ত্যলীলা'** মধ্যে অতি মধুর ও লোকপাবনী ভাষায় বর্ণিত আছে। রঘুনাথ যে সমস্ত অমূল্য ভক্তিমূলক ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় মুদ্রিত হইলেও, এখনও বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি কীটদষ্ট হইতেছে। উক্ত অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিলে কেবল যে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া, দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক মানব কুলোজ্জ্বলকারী রঘুনাথেরও কীর্তিস্তম্ভ সংরক্ষিত হইবে। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪০৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ঃ শ্রীস্তবাবলী শ্রীদানচরিত (দানকেলি-চিন্তামণি) ও শ্রীমুক্তাচরিত। পদকল্পতরু গ্রন্থেও তাঁহার কয়েকটি পদ আছে।

সপ্তগ্রামের এই প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের দেবালয় ও রঘুনাথের সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আজও ভক্তগণের হৃদয়ে রঘুনাথের দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। যে মহাত্মা এই জাতিকে প্রেমময় নামের দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত স্থানের দুর্দশা দর্শন করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়।

আমাদের উদাসীনতায় ও অবহেলায় বিগ্রহের সেবা পর্যন্ত প্রতিদিন হয় না এবং দেবালয়টীও বর্তমানে যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে ইহা ধূলিসাৎ হইতে আর দেরী নাই।

বর্তমান মন্দিরটী "রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট" বলিয়া খ্যাত এবং ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের" বিগ্রহ আছে ইহা ছাড়া যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসিয়া রঘুনাথ সাধনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়ও (খড়ম) যত্নের সহিত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ভগবদ্ভক্ত স্বগীয় মতিলাল শীলের পিতামহী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইবার পর, ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য স্বগীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এবং রাজর্ষি বনমালী রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ সাহায্যে, মন্দিরের সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল। পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার সদগোপ-বংশীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ নামক জনৈক ভক্ত পুনরায় মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়া দেন। কৃষ্ণপুর শ্রীপাঠের মোহান্ত শ্রীগৌরগোপাল দাসঅধিকারী, অর্থাভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঠাকুরের সেবা করা অসম্ভব হইলে, তিনি শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজীর নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং ১৩৫০ সাল হইতে, রামদাস বাবাজীর অর্থসাহায্যে, বিগ্রহের সেবা কিছুদিন চলে। শ্রীবিজয় চক্রবর্তী বর্তমানে এই শ্রীপাঠের সেবায়েত।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুগণ মুসলমানদের অত্যাচারে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান এবং বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউ আজও জয়পুরে আছেন, তাহা সকলে জানেন।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যান তখন ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ও উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাঁহার সহিত শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তত্রস্থ কয়েকটি জলাভূমিকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু তারপর অন্যত্র চলিয়া যাইলে, রঘুনাথ সেই জলাভূমি ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের এই পুণ্য জলাশয় দুইটিকে পূর্বের ন্যায় বিশালাকায় করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে জলাভূমিগুলিকে মহাপ্রভু শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন, সেই সকল জমি তখন অন্যলোকের তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন রঘুনাথের কানে কেবল ঝঙ্কৃত হইত :

"শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন।"

রঘুনাথ যদিও সপ্তগ্রামের রাজপুত্র ছিল, তথাপি গৃহ ত্যাগের পর তিনি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। প্রথমে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে "অযাচক-বৃত্তি' অবলম্বন করেন, পরে অযাচক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 'মাধুকরী-ভিক্ষা' স্বীকার করেন।

রঘুনাথ 'মাধুকরী-ভিক্ষা' করিতেছেন শুনিয়া মহাঃ আনন্দিত হইয়া বলেন "সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাগময়ী সেবায় রঘুনাথের রুচী দেখিয়া তিনি তাঁহার নিজের গুঞ্জমালা গোবর্দ্ধনশিলা তাঁহাকে দান করেন। ইহার পর হইতে রঘুনাথ কেবলমাত্র পথে পরিত্যক্ত ও বাসি মহাপ্রসাদ জলে ধুইয়া গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রঘুনাথের নিকট হইতে সেই বাসি মহাপ্রসাদ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া তাহা আস্বাদন করেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী অতঃপর বৃন্দাবনের জমিগুলি যাহা অপরের হাতে ছিল, তাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় তাহা খনন করাইয়া স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত করিলেন।

মহাপ্রভুর ছয়জন পরিকরের মধ্যে অন্যতম শ্রীরঘুনাথের চেষ্টায় বৃন্দাবন আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে বৃন্দাবন কুসুমসরোবরবাসী গোয়ালিয়র মন্দিরের মোহান্ত শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ দাস বাবাজী রঘুনাথ দাস কর্তৃক ক্রীত ছয়খানি দলিল আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম দলিলখানি আশি টাকার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খানি ত্রিশ টাকার, চতুর্থখানি কুড়ি টাকার পঞ্চমখানি চৌদ্দ টাকার ও ষষ্ঠখানি চৌষট্টি টাকার। দলিলগুলি উর্দু ভাষায় লিখিত। স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যধন রায় ভট্ট উক্ত দলিলগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই দলিল-গুলি শ্রীরাধারুষ্ণ বসু সম্পাদিত উড়িয়া সাপ্তাহিক পত্র "ধর্ম্ম সমাচারে" (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাকুণ্ড বিষয়ক প্রাচীন দলিলের কপি বরাহনগর পাটবাড়ী "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে" সংরক্ষিত আছে।

পাটবাড়ি 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে'র গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী রঘুনাথের সমস্ত দলিলগুলি আমায় দেখিতে দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একখানি দলিল এবং উক্ত জমির দখল লইয়া যে মামলা হয় তাহার বিবরণ এবং রঘুনাথ কর্তৃক শ্রীজীবগোস্বামীকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রের দলিল কিরূপ ছিল তাহা এই স্থলে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ডু উদ্ধারের পূর্বে উহা কৃষকদিগের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঐ সমুদায় কৃষিক্ষেত্র ৬ কিতা দলিল দ্বারা ২০৮৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। নিম্নে ঐ দলিলগুলির মধ্যে প্রথমটির হুবহু নকল প্রদত্ত হইল।

১ম দলিল

খাদিম

সরাহা রসুল

মুতাহিন কুতবুদ্দিন

তমসুকত্ত্ব মোহর সরিয়াত সাহা কাজি বদরুদ্দিন একরারসেত্ত্ব তাং ৯ জফর সন ৯৯৬ হিজিরা গরজইষ লেখকে ব্রহেকি মুসমিয়ান কাহাত্ত্ব লদ কানরো সলুয়া-ত্ত্ব-দুশা অধীরাত্ত্ব-মুকসা, মজা-ত্ত্ব কাল্লি কুজ্জাত্ত্ব অসুয়া গোবিন্দা ত্ত্ব চৌহিয়া, ভূরিয়া ত্ত্ব কনকা। সা-মৌ অরটি উরক রাধাকুণ্ডু অমনা পরগণা সহর কেহে'। যো কি যমিন্ মজকুর। বা কৃষ্ণকুণ্ড তরফ উত্তর

করীল বড়া কুআঁ গোবিন্দা তরফ পূরব নাল ত্ত দরখৎ হিস্ ত্ত তরফ দক্ষিণ দেত্তালা মহাদেব। আপনি খুসিসে মোবলিক আশি (৮০) রূপিআ শিক্কা হাল মাঃ রঘুনাথ দাস যদি বদস্ত্র জীব গোসাই কোঁ ফরোকত কিয়া রূপিয়া অপনে খরচ মে লায়া। অগর কোই দাবোদার হোত ঝুটা সমঝা যায়।

বঙ্গানুবাদ

কস্য তমসুকত্ত মোহর মুসলমানী আইনানুসারে সাহাকাজী বদরুদ্দি রেজিস্টারী করিতেছেন। তারিখ ৯ই সফর, সন ৯৯৬ হিজরি। দাতা কাঁহা পিতা কলরু, শুনিয়া পিতা দুশা, অধরা পিতা মুকসা, মজা পিতা কম্নি, কুজ্জা পিতা অসুয়া, গোবিন্দ পিতা চোহরা, ভুরিয়া পিতা কনকা। সর্ব সাং অরিট ওরফে রাধাকুণ্ডু, পরগণা অমলা, সহর কে'হে ভূমির তপসিল চৌহদ্দি। উত্তরে কৃষ্ণকুণ্ডু ও গোবিন্দের বড় পুষ্করিণী। পূর্বে লাল জমি ও বৃক্ষ। দক্ষিণে মহাদেবের দোতলা বাড়ী।

আমরা সং নগদ ৮০৲ (আশি) টাকা রঘুনাথ দাসের মারফত বুঝিয়া পাইয়া জীব গোঁসাইকে উক্ত চৌহদ্দিস্থিত ভূমি সজ্ঞানে অন্যের বিনানুরোধে স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ নিজ ইচ্ছায় হস্তান্তর করিলাম। যদি ভবিষ্যতে আমরা কিম্বা আমাদের কোন উত্তরাধিকারী অন্য কোন উত্তরাধিকারী বা অন্য কেহ কোন প্রকারের ওজর-আপত্তি কিম্বা দাবী-দাওয়া করে, তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।

এক সময়ে নাথরাম নামক জনৈক মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের কতক জমি বেদখল করিবার চেষ্টা করায় ও শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী বৃক্ষলতাদি বলপূর্বক ছেদন করায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর অনুগত শ্রীযুক্ত গোপী দাস নামক জনৈক মহাত্মা ঐ সময়ে বাদসা সরকারে নালিশ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। নালিশের দরখাস্ত ও রায়ের নকল এই ঃ

দরখাস্ত

বাদসাহ মহম্মদ শাহাকা

ত্তখত ফিদবী সয়দ

গইরসরেইয়া বাহাদুর

সিজাত দস্তগা মহম্মদ হইয়াত লগায়ত উমেদবার হেকি গোপীদাস সাং কসবা বৃন্দাবনে দরবার কিআ কি মেরে বড়োনে মৌঃ রাধাকুণ্ড অমনা পরগণা শহরমে যমিন্ খরিদি তলাউ অওর বাগিচা বনায়ে। ইন দিনো নাথোরাম সাং কসবা মথুরা চাহ তা হে অওর জবরদস্তি যমিন পর কবজা করতো হে। লিহাজা অরজ হে কি ইস মোকদ্দমেমে গৌর ফরমা কর দাদরসি করে। অওর উসকো মদাখিলত বেজা সে মনা কিআ যায়। তাং ১৭ সিবান সন ৫২।

বঙ্গানুবাদ

গোপীদাস সাং কসবা, বৃন্দাবন এই বলিয়া অভিযোগ করিতেছে যে অমলা পরগণার অন্তর্গত রাধাকুণ্ডু গ্রামে যে ভূমি খরিদ করিয়া পুষ্করিণী এবং বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই ভূমি বর্তমানে কসবা মথুরা নিবাসী নাথারাম নিজের বলিয়া দাবী করিয়া উক্ত ভূমি দখল করিয়াছেন। প্রার্থনা এই যে বিবাদীকে তলব করিয়া সুবিবেচনা পূর্বক ইহার সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ১৭ রিক সাবন সন ৫২।

উক্ত মোকদ্দমার রায়ের বঙ্গানুবাদ

ফৌজদারী হাল ও ইস্তাকনা পরগণা ইসনামাবাদ। মথুরা বদানদ। নবাব কুতুবুদ্দিনের মোহরযুক্ত ১৭ই সিবান সন ২০। আমি ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বৃন্দাবন নিবাসী গোপীদাস অরিট ওরফে রাধাকুণ্ডু গ্রামে ভূমি খরিদ করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী খনন ও বাগান তৈয়ার করিয়াছে। কসবা নিবাসী নাথারাম দাস নামক এক ব্রাহ্ম অন্যান্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া যোগসাজাসে ঐ ভূমির কিয়দংশ দখল করিয়া লইয়াছে। আমি অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই জমির একমাত্র দখলকার জীব গোঁসাই। ইহার অন্য কোন অংশীদার নাই। বিবাদী ইহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিবে। হিজরি সন ৫২। উক্ত জমিগুলি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে যে হেবা-নামা (দানপত্র) প্রদান করেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইলঃ

কস্য দানপত্র মোহর মুসলমানী আইনানুসারে কাজি বদরুদ্দিন রেজেষ্টারী করিতেছেন। তারিখ ৭ই রিক, রজব মাস, সন ৯৯৬ হিজরী।

আমি গোঁসাই রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে মৌজা অরিট পরগণা অমলা সহর বমজীব অন্তর্গত যে ছয় খণ্ড ভূমি দুইশত স্বত্ব টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম, তাহা সজ্ঞানে স্বেচ্ছা-পূর্বক আপন ইচ্ছাতে জীব গোঁসাই পিতা বল্লব গোঁসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম এবং স্বত্ব টাকা নগদ বুঝিয়া পাইলাম। ঐ জমি সংক্রান্ত যে সকল দলিলপত্রাদি আমার নিকট ছিল, তাহাও গোঁসাই মহাশয়কে দিয়া দিলাম। যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি ও দাবী না করিতে পারে।

তপসিল চৌহদ্দি

(১) উত্তর-পূর্ব তমসুখ মোবারক খাঁ ২১ রজব সন ৯৫৪ হিজরী।

(২) উত্তর গোবিন্দের কদলী বৃক্ষের বাগান, নন্দমা—দক্ষিণে মহাদেবের দ্বিতল গৃহ। ৯ই সফর সন ৯৬০ হিজরী মূল্য ৮০ টাকা।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিম—মোবারক খাঁর জমি ১৭ সওয়াল হিজরী ৯৫৩। মূল্য ৩০ টাকা।

(৪) দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব—তমসুখ মোবারক খাঁ ১৭ই সওয়ান হিজরী ৯৫৩। মূল্য ৩০ টাকা।

(৫) দক্ষিণ—ঘাট ও বৃক্ষ মোবারক খাঁ। ১৫ জমাদিয়াসানি সন ৯৮৫ হিজরী। মূল্য ২০ টাকা।

(৬) উত্তর—মোবারক খাঁর জমি। ১১ সফর ৯৮৫ হিজরী। মূল্য ১৪ টাকা।

(৭) উত্তর—মোবারক খাঁর কলাগাছ ও নিমগাছ। ৯ই সফর সন ৯৮৫ হিজরী। মূল্য ৬৪ টাকা।

কালক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পুনরায় জঙ্গলাবৃত হইলে বৈষ্ণবকুলতিলক লালাবাবু উক্ত কুণ্ডদ্বয় পুনরায় সংস্কার করিয়া উভয় কুণ্ডের মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দেন। কান্দী রাজবংশের এই মহাত্মা অনাবৃত অবস্থায় শ্রীরাধা-কুণ্ডের তীরে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন। এই সম্বন্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এইরূপঃ

শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থস্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি [লালাবাবু] সে দুই স্থান পুনর্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন। লোকে কহে তাহাতে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

॥ একটি অপপ্রচার ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'অগ্নিপুরাণে' লিখিত বলিয়া একটি কাল্পনিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি রঘুনাথকে শূদ্র বলিয়া লিখিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমের ১ম সংস্করণে ঐ শ্লোকটি আবির্ভূত হয়। কিন্তু এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে অগ্নিপুরাণের যতগুলি পুঁথি আছে কোথাও এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় না। রঘুনাথ তথা সমগ্র কায়স্থজাতিকে হেয় করিবার জন্য 'অগ্নিপুরাণ' হইতে গৃহীত বলিয়া যে কল্পিত বচনটি রাধাগোবিন্দবাবুও উদ্ধার করিয়াছেন উহা কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথও তাঁহার পত্রে (স্তবকুসুমাঞ্জলি, ১৬৩) "কায়স্থ যে শূদ্র তা অগ্নিপুরাণে স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে" বলিয়া উল্লেখ করায় বাংলার মহান কায়স্থ সমাজ তাঁহার অনৈতিহাসিক, অশাস্ত্রীয় ও অশোভন উক্তিতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফরিদপুর আর্যকায়স্থ সমিতির সম্পাদকদের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসের "আর্যকায়স্থ প্রতিভা" পত্রে (পৃষ্ঠা ২৯১—২৯২) প্রকাশিত হয়। রঘুনাথ সম্বন্ধে হীন উক্তির প্রতিবাদকল্পে রাজা রাজেন্দ্রলালের সেই অবিস্মরণীয় পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

8 Maniktollah Road, Dec. 13th, 1890.

Babu Brajendrakumar Ghose Barma and Babu Chaitanyakrishna Nag Barma
Arya Kayastha Samiti, Furridpore.

Dear Sirs,

Owing to ill health, I have not been able to answer your querry of the 4th Sept. last. I have now examined the Agnipurana and find that the slokas you have cited are not found in any standard M. S. in fact I have not seen them anywhere, and the onus of proving their authenticity lies with your antagonist and not with you. It is easy enough to write out Sanskrit anustop verses on any conceivable subject, but citations of such questionable character are not worth refuting. **They cannot be subject of proof.** Yours truly.

(Sd) Rajendra Lall Mitra.

বঙ্গানুবাদ ঃ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আপনাদের বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পত্রে যে জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, তাহার উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হই নাই। এখন আমি 'অগ্নিপুরাণ' পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, আপনাদের উদ্ধৃত বচন কোন সর্বমান্য হস্তলিখিত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ কোন গ্রন্থেই প্রাপ্তব্য নহে। সুতরাং উক্ত বচনের প্রকৃততা সপ্রমাণ করিবার ভার আপনাদের প্রতিপক্ষের উপর অর্পিত আছে—আপনাদের উপর নহে। কোন্ চিন্তনীয় বিষয়ে সংস্কৃত অনুষ্টপ ছন্দে শ্লোক রচনা করা অতি সহজ বটে কিন্তু এই প্রকার উদ্ধৃত বচন কখনই প্রতিবাদের যোগ্য নহে। **ঐ সকল শ্লোক প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না।**

কবি নাভাজী হিন্দীভাষায় **'ভক্তমাল'** গ্রন্থ রচনা করেন; উহাতে ভারতের প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তবৃন্দের জীবনী লিখিত আছে। লালদাস বাবাজী নাভাজী কৃত হিন্দী ভক্তমাল হইতে বঙ্গভাষায় প্রথম 'ভক্তমাল' রচনা করেন। উহাতে **রঘুনাথ-প্রসঙ্গ** পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ঃ

শ্রীমান রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী। প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ পরকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে। দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল। পিতার যে রাজ্যাম্পদ তাহে ঘৃণা হৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত। বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥
সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে। যাইয়া প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে॥
নিকষিয়া যায় পুন পুন ধরি আনে। পিতামাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥
নবলক্ষের রাজ্যাম্পদ সোঁপিল তাহারে। অপ্সরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥
তথায় রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে। সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়ভয়ে ভাগে॥
অনেক পহরা চৌকি বাঁধিয়া হারিল। শেষে রজ্জু দিয়া হাত বাঁধিয়া রাখিল॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠিত গৌরাঙ্গ বলিয়া। উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া॥
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ। নির্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ॥
এ হেন ঐশ্বর্য আর এ যুবতী নারী । হেন রজ্জু ছিন্দে যেই তারে হরি হরি॥
পট্টরজ্জু দিয়া কি বাঁধিয়া রাখা যায়। কেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায়॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজ জন। অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্রন্দন॥
তেঁহো হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে। গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে॥
লোক চৌকি রাখি সভে সতর্ক রহিল। রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥
অতি উৎকণ্ঠিতা মন উন্মত্তের প্রায়। দিগ্‌বিদিগ নাহি ফিরিয়া তাকায়॥
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা। নাহি মানে যায় মাত্র বাউলের পারা॥
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম। তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান চৈতন্যচরণে। পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে॥
হে নাথ হে প্রভো হে করুণা নিধন। কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন। কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥
শ্রীচরণতলে পড়ি ধূলায় ধূসর। স্তুতিনতি করে অতি কাতর অন্তর॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল। মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেমভক্তি দিল। নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল॥
শ্রীমান দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত। পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত॥
সিংদম্বারি থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি। কথোদিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি॥
শড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে। ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষা কাজে। বিষয় সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হঞা। প্রসংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোস্বামিঞ মহান। কথো দিনে কৈল বৃন্দাবনেরে গমন॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস। দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত। সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর। দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
নিদ্রাহার নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
দাস গোস্বামীর পূর্বাপর যত লীলা। কহিতে নারি এ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে"র ১।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীরঘুনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ *শ্রীরঘুনাথ দাসোনাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ ইত্যাদি।*

রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠে বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহার অধিকাংশ নষ্ট অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে। এইস্থানে একখানি প্রাচীন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথি আমি দেখিয়াছি; উহার শেষে এই কথাগুলি লিখিত আছেঃ

"শাকেসিন্ধগ্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোক্ষসিত পঞ্চমাংগ্রন্থোয়ং পূর্ণতাংগতঃ।
শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেবতুষ্ঠয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্তেত চৈতন্যচরিতামৃতং।

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং দোসনাসকং। শ্রীমাধবদাসস্য, সাং গাড়াঘাটা।" ইহা হইতে ১৫৩৭ শকাব্দে উক্ত গ্রন্থ শ্রীমাধব দাস কর্তৃক নকল করা হইয়াছিল জানা যায়।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি বাংলার জাতীয়-গৌরব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ বাংলা দেশকে পবিত্র করিয়াছেন? রঘুনাথ প্রবর্তিত পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উপকূলে প্রতি বৎসর যে **উত্তরায়ণ মেলার** (১লা মাঘ) অনুষ্ঠান আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার সংবাদই বা কয়জন জানেন?

জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা বিস্মৃত হওয়া যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীভগবানের অংশ সম্ভূত রঘুনাথ জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য নরাকারে যে স্থানে এবং যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানের রক্ষাকল্পে, যদি আমরা সচেষ্ট না হই—আমাদের অবহেলায় ও উদাসীনতায় যদি **মানবকুল** উদ্ধারকারী প্রেমময় মহাত্মার নাম এবং **মানব জাতি** ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূর্ত-প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যে কোন আশা নাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কৃষ্ণপুরে বর্তমানে ২০ ঘর হিন্দু ও ৩০ ঘর মুসলমানের বাস আছে। অবস্থাপন্ন লোক গ্রামে কেহই নাই। সম্প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সপ্তগ্রাম হইতে কৃষ্ণপুরের শ্রীপাট পর্যন্ত যে এক মাইল কাঁচা রাস্তা আছে, উহার নাম রঘুনাথ দাসগোস্বামী রোড। এই রাস্তাটি পাকা করিলে যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়। গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় নুড়ি ইঁট ও শিবলিঙ্গের ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উহা হইতে এই গ্রাম যে এক সময় বর্ধিষ্ণু ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। সরকারী উদ্যোগে পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যদি অন্বেষণ করেন তবে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি এই গ্রন্থের লেখক এই স্থান হইতে একখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর কারুকার্যখচিত ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার বিবরণ ৭৫৯—৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপুরে বাঁশবন ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি জোড়া শিবমন্দির আছে। উহা "১৭২০ **শকাব্দে**" প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গ চামচিকির মলত্যাগে আবৃত হইয়া আছে। পূজাও বহুদিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সরকার বংশীয়গণ। তাঁহাদের বাস্তুভিটা দেখিলে মনে হয়, একদা তাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল। শ্রীপুর গ্রামের শ্রীরাখাল সরকার এই বংশের লোক ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কৃষ্ণপুরের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে এই জোড়া শিবমন্দির সংরক্ষিত হওয়া উচিৎ। গত লোক গণনায় কৃষ্ণপুরের জনসংখ্যা ২৭৯ জন ছিল।

কালিদাস মজুমদারঃ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরজে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। ইনি সাক্ষাতভাবে বা কৌশলে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই পদরজঃ ও অধরামৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু উপহার লইয়া তিনি বৈষ্ণব গৃহে যাইতেন। তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবের জাতিবিচার ছিল না। এক সময়ে তিনি ভূমি-মালী জাতীয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুরের গৃহে একটি ঠোঙগায় করিয়া কতকগুলি আম লইয়া গিয়াছিলেন। যাইয়া ঝড়ুঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কতক্ষণ কৃষ্ণকথার আলাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহার অনুগমন করিয়া কতদূর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহারই অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি চক্ষুর অন্তরালে যাইলে যে স্থান দিয়া তিনি যাতায়াত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন এবং জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী কৃষ্ণ-নিবেদিত আম খাইয়া চোষা আটি ও বল্কল আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে আস্তাকুড় হইতে সেই চোষা আটি-আদি লইয়া চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে নিষ্ঠার ফলে, যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া প্রথমে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তার পরে মন্দির প্রাঙ্গণে যাইতেন। প্রভুর এই পদজল কেহ যেন পর্শও না করে—এইরূপই ছিল গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ। একদিন প্রভু পাদ-প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সাক্ষাতে কালিদাস ক্রমে ক্রমে তিনঅঞ্জলী পাদোদক গ্রহণ করিলেন, প্রভু তাঁকে নিষেধ করিলেন না; তিনঅঞ্জলী গ্রহণের পরে নিষেধ করিলেন। ইহার পরে প্রভু নিজেই গোবিন্দদ্বারা তাঁহাকে নিজের ভুক্তাবশেষও দেওয়াইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন পুলিন্দতনয় মল্লী।

যদুনন্দন আচার্যঃ সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত। রঘুনাথ দাসগোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ইনি নিজের অজ্ঞাতসারেই দাস-গোস্বামীর গৃহত্যাগের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের সেবক—ব্রাহ্মণ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি দণ্ড-চারি রাত্রি থাকিতে রঘুনাথ দাসের নিকটে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আনিবার জন্য রঘুনাথকে বলিলেন; সেবার জন্য আর কোনও ব্রাহ্মণ ছিল না। রঘুনাথের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্প্রীতি ছিল। তখন রঘুনাথের প্রহরীগণ নিদ্রিত। আচার্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। আচার্যের গৃহের নিকটে আসিলে রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন। আমি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব। আমাকে অনুমতি করুন।' রঘুনাথ যে কৌশলক্রমে নীলাচলে যাওয়ার অনুমতিই চাহিলেন, যদু-নন্দন আচার্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রঘুনাথকে অনুমতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথও নীলাচলের দিকে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হইলেন।

॥ শিমলা ॥

হুগলী মহকুমার চুঁচুড়া থানার কোদালিয়া-দেবানন্দপুর ইউনিয়নে অবস্থিত **শিমলা** একটি বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের জনসংখ্যা ১৭৬৪ জন। গ্রামস্থ 'জটিলেশ্বর লিঙ্গবিগ্রহ বহুকালের পুরাতন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও এখানে পার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম হইতে তৎকালীন ব্যাপক ম্ফীতপ্লীহা ম্যালেরিয়ার দৈব ঔষধ ও 'দাগা' লইতে রোগী সমাগম হইত। সম্ভবতঃ জটিল পীড়া নিরাময়কারী হিসাবেই মন্দিরস্থ বিগ্রহের নাম **'জটিলেশ্বর'।** এখনও প্রতি বৎসর অক্ষয়তৃতীয়ায় জটিলেশ্বরের রথযাত্রা উৎসব হয়। পূর্বে এখানে বহু সং বাহির হইত। বহুদিন হইতে এখানে পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের অপেশাদার শিল্পীদের একটি থিয়েটার ক্লাব ছিল। বর্তমানে তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে একটি অপেশাদার যাত্রাদল। শিমলা গ্রাম সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রের একটি অংশে ইংরাজ আমলে চুঁচুড়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র এবং পরে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অধুনা উহা কৃষিমহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত সরস্বতী একদা পণ্যবাহী পোত গতায়াত করিত। আজ সংস্কারাভাবে মজিয়া যাওয়া দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। কবিবর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "সরস্বতী" কবিতা পাঠ করিলে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ পথে উদিত হয়। এই গ্রামটিকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে তারক পালিত রোড অধুনা চুঁচুড়া-তারকেশ্বর রোড।

হুগলী জেলার অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র সেওড়াফুলীর বিকাশের ক্ষেত্রে এই গ্রামেরই সন্তান হরিচরণ ঘোষের অবদান এবং পরবর্তীকালে এই বাণিজ্যকেন্দ্র সেওড়াফুলীতে যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনে হরিবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিচরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিমলার দরিদ্র সদ্গোপ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা, কনিষ্ঠের নাম ভোলানাথ। যুগের অবস্থা ও দারিদ্র্য, এই দুইয়ের প্রভাবে তাঁহার শিক্ষা পাঠশালার প্রথম পর্যায়েই শেষ হইয়া যায়। নিজ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতাবলে সেওড়াফুলী পাটের বাজারের প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন ও প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ভেড়ী অঞ্চলের জমিদারী ক্রয় করিয়া পরে তিনি সেখানকার প্রজারঞ্জক জমিদাররূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার চেষ্টা ও আনুকূল্যে শিমলা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে পাটচাষের বিস্তৃতি ঘটে এবং এখানকার পাট ও কলা সেওড়াফুলী হাটে বিক্রয়ের স্থান পায়। কলিকাতা আমপোস্তায় এতদঞ্চলের আম্র প্রেরণ ব্যাপারেও তিনি স্থানীয় উৎপাদকদের পথপ্রদর্শক। চন্দননগরের বিপ্লবী নেতা ও ফরাসী আমলের মেয়র ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত স্বীয়পুত্র সতীশের বিবাহ দিয়া তিনি এই দেশপ্রেমিক পরিবারটির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর ঘটে। সরস্বতীসৈকতের সন্নিকটে 'হরিচরণ স্মৃতিমন্দির' আজিও শ্রদ্ধা জানায় দাতা, পরোপকারী, দরিদ্র ও বিপন্নের বন্ধু হরিচরণের উদ্দেশ্যে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্রের অকালবিয়োগ ঘটে এবং কনিষ্ঠপুত্র জ্যোতিষচন্দ্র পল্লীভবন শিমলাতেই অবস্থান করেন এবং তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

॥ ত্রিবেণী ॥

বর্তমানে ত্রিবেণী একটি সামান্য স্থান হইলেও সুদূর অতীতকাল হইতে ইহা ভারতের একটি প্রধান বন্দর এবং হিন্দুদিগের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর মিলনস্থান বলিয়া ইহা ত্রিবেণী নামে পরিচিত— "ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তা বা যত্র।" এলাহাবাদেও গঙ্গা, যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলিত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত স্থানও ত্রিবেণী বলিয়া অভিহিত; তবে উহাকে **'যুক্তবেণী'** বলে এবং এই স্থানে নদী তিনটি মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহাকে **'মুক্তবেণী'** বলে। প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই 'ত্রিবেণী' নামে উক্ত হইয়াছে।

"ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী।
ন তীর্থরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগত্রয়ে।" (ব্রহ্মপুরাণ)

অর্থাৎ মাধব সদৃশ আর দেবতা নাই, গঙ্গা সদৃশ আর নদী নাই এবং ত্রিজগতে ত্রিবেণী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর কোথাও নাই। রঘুনন্দও তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে' লিখিয়াছেনঃ

"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা,
দক্ষিণা দেশে ত্রিবেণী খ্যাতঃ।"

সাধক কমলাকান্ত ত্রিবেণী সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"তীর্থভ্রমণ দুঃখ-গমন, মন-উচাটন হয়ো নারে।
আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥"

ত্রিবেণী-স্নানের অর্থ নিদ্রিতা শক্তি কুন্ডলিনীর জাগরণ; ত্রিবেণীস্নান মূলাধার পদ্মে হয়। মূলাধারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ি একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। মধ্যে সুষুম্না সরস্বতী হিসাবে কল্পিত, বামে ইড়া যমুনা ও দক্ষিণে পিঙ্গলা গঙ্গা। এই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল হইতেছে মূলাধার। সেই জন্য ত্রিবেণীতে স্নান করিলে সাধকের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয় ও জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং স্নানার্থী অপার্থিব শান্তি লাভ করেন। তাই ত্রিবেণীতে স্নান পরম পবিত্র বলিয়া এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইড়া বাসস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয়॥ সাধকরঞ্জন

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ত্রিবেণীর যে বিবরণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদরাজা মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপায় মধুকর।

আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভরে পূজে মহেশ্বর॥
তীর্থ কার্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥"

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ত্রিবেণীকে—ত্রিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী. ত্রিপণী তিরপুণী ত্রিপিনা প্রভৃতি বহু নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে রেভারেন্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন ঃ "The Portugese, Ptolemy and the natives now call it Tripina but incorrectly." Calcutta Review. অর্থাৎ পর্তুগীজগণ, টলেমি এবং দেশীয় ব্যক্তিগণও এই স্থানকে অশুদ্ধভাবে ত্রিপিনা বলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাযাত্রা' নামক কবিতায় ত্রিবেণীকে "তিরপুর্ণি" বলিয়া একটি পল্লী বালকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বালক গঙ্গায় একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার মায়ের নিকট বলিতেছে যে, যদি সে ঐ নৌকাখানি পায়, তাহা হইলে সে বহু স্থানে বেড়াইতে যাইবে এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কোলে শুইয়া সেই সমস্ত গল্প তাঁহাকে বলিবে। নিম্নে 'নৌকাযাত্রা' হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

"দুপুরবেলা তুমি পুকুর ঘাটে
আমরা তখন নূতন রাজার দেশে!
পেরিয়ে যাব তিরপুর্ণির ঘাটে
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠে
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।"

চিত্রধর্মী ছড়ার মধ্যেও ত্রিবেণীর নাম আছে যেমনঃ

"যমুনাবতী সরস্বতী আজ যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা॥
নাচতো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপুর্ণির ঘাট॥
ত্রিপুর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে॥

তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দে॥
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুপুরবেলা॥"

প্রাচীনকালে ছড়ার মধ্য দিয়াই শিশু সাহিত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়; আর এই সমস্ত ছড়ার রচয়িত্রী ছিলেন, মূলতঃ আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকারা অর্থাৎ ঠাকুরমা দিদিমা প্রভৃতি। হুগলী জেলার মধ্যে যে কত শত ছড়া প্রচলিত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত একটি প্রসিদ্ধ ছড়ার উল্লেখ করিতেছি, ইহার মধ্যে তীর্থস্থান ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

"পানকৌড়ী পানকৌড়ী ডাঙ্গায় ওঠ হে।
তোমার ভাসুর বলে গেছে বেগুন কোট সে॥
বেগুন হোল ফালা ফালা,
বউ পালাল দুপুর বেলা,
ও বেগুনটি কুটো নাক ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদম্বের ফুল ফুটেছে॥
কদম কুড়াতে কদম কুড়াতে পেয়ে গেলাম মালা।
দাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে তুলারামের খেলা॥
নাচ ত ভাই তুলারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল খেতে দোব টোপর ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হোল কাঠ।
কতক্ষণে যাবরে ভাই ত্রিপুর্ণির ঘাট॥
ত্রিপুর্ণির ঘাটে রে ভাই বালি ঝক ঝক করে।
যেন চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে কিরণ ফেটে পড়ে॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার 'চন্ডীতে' ত্রিবেণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ভে বসে শিবপূজা করে কোন জন।
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জনা দেয় ধূপ দীপে॥"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থে শ্রীমন্তের নৌ-যাত্রার বিবরণে ত্রিবেণীকে 'ত্রিপণী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সারদামঙ্গলের বর্ণনা এইরূপঃ

ইন্দ্রাণি সফরি বাহে কুমুদপুরা জায়ে।
ললিতপুর নবদ্বীপ বাহিল ত্বরায়ে॥

ডিঙ্গা ছাপান দিল ত্রিপিণীর ঘাটে।
স্নান দান করে সাধু সেই গঙ্গার তটে॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'ও ত্রিবেণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সফল ভুবনে।
সর্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব-বৃন্দে॥

'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের কিলকিলা বিবরণে ত্রিবেণীর বিষয় উল্লেখ আছে :

"অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ॥
ডমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসন্তিং কৃতবান মুদা। ৬৮১।
পশ্চিমে যোজনান্তে চ সপ্তগ্রামস্য মধ্যতঃ।
নৃপে ভূত্বা বেঘ জাতিং..... ...পপালহ॥ ৬৮৩।"

অর্থাৎ অহিশাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকটে চক্রদ্বীপ ও ডমুরদহের মধ্যে আসিয় বাস করিতে থাকেন; তিনি কিলকিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয় 'বেঘ' জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুমে' ত্রিবেণীর পরিচয় সূে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

"প্রদ্যুম্নস্য হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা॥"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "আমরা" নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় ত্রিবেণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে;
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোলভরা যার কনকধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে—শত তরঙ্গ ভঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

'আইন-ই-আককবরী'র লেখক আবুল ফজল ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে উইলি হেজেস এবং ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস্ ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডু বারো এবং ব্যালেভ তাঁহাদের মানচিত্রে ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন দ্বাদশ শতাব্দীতে
এবং 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থেও ত্রিবেণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সপ্তগ্রামের সহিত ত্রিবেণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; সপ্তগ্রাম ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজসকল সপ্তগ্রাম যাতায়াত কালে ত্রিবেণীতে নোঙর করিত, তাহা প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রামের মধ্যে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও পরবর্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতেও ইহা জানিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যস্থান ছিল; কিন্তু ১২৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হয় এবং সেই জন্য সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ করে। সেইজন্য সরস্বতী তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভেও ত্রিবেণীর খ্যাতি যে যথেষ্ট ছিল তাহা নিম্নের কয়েক ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"Tribeni retained its fame in the early Muslim period and is still one of the most sacred spots of Bengal."

পশ্চিম বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পূর্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, ও ত্রিবেণী এই চারিটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল; এই চারিটি স্থানকে তৎকালে চারিটি সমাজ বলিত। ত্রিবেণীতে যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্দ্রে ত্রিশটির অধিক টোল ছিল। প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে মকরসংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু সংক্রান্তি, দশহরা, বারুণী, অর্ধোদয় যোগ, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি হিন্দুপর্বে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত এবং তদুপলক্ষ্যে মেলা বসিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের কোন একটি যোগে একমাত্র উড়িষ্যা হইতেই ত্রিশ হাজার যাত্রী ত্রিবেণীতে সমাগত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ত্রিবেণী মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মুসলমান শাসন-কর্তাদের মধ্যে জাফর খাঁ সর্বপ্রথম রাজত্ব করেন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাফর খাঁ সপ্তগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ ত্রিবেণীতে নির্মাণ করেন। এই মসজিদের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরে জাফর খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণের সমাধি দৃষ্ট হয়। যে স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন, সেই স্থানে পূর্বে একটি মন্দির ছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্তমান মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের মধ্যে আটখানি শিলালিপি আছে। উক্ত শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর বহু মূর্তি আছে। আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ তুর্কীজাতীয় ছিলেন, বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। এই শিলালিপির বিবরণ সপ্তগ্রামের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

জাফর খাঁ পাণ্ডুয়ার গো-হত্যা ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহা সুফির পিতৃব্য হইতেন।

জাফর খাঁর সহিত ভূদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়। এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে, তাঁহার নির্মিত মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বরখান গাজী ও হুগলীর রাজকন্যার সমাধিও এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। মসজিদটি দুইটি প্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের প্রথম প্রাচীরটি সুবৃহৎ বাসাল্ট Basalt Stone প্রস্তরে নির্মিত এবং হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া যে পাথরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গার ধারে প্রাচীরগাত্রের পাথরগুলিতে বহু হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্তি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপাদির মূর্তি অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে প্রায় আট ফুট ঊর্ধে একটি লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে—উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্রের হাতল ছিল; উক্ত লৌহদণ্ডকে "গাজীর-কুড়ুল" বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ-দণ্ডটি নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায় না বলিয়া "গাজীর কুড়ুল নড়ে-চড়ে পড়ে না" বলা হয়।

"কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডেও ত্রিবেণীর মসজিদ যে পূর্বে হিন্দু মন্দির ছিল তাহা লিখিত আছে। মোগল আমলের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন একমাত্র ত্রিবেণীতেই আছে। বাঙলার আর কোথাও এমনকি গৌড়েও এত প্রাচীন ভবন নাই।

Curiously enough, however, it is not at Gaur, but at Tribeni in the Hughli District, that the oldest remains of Muslim buildings have survived. These are the tomb and mosque of Zafar Khan Ghazi. The former is built largely out of the materials taken from a temple of Krishna, which formerly stood on the same spot but is now so mutilated as to have lost most of its architectural value.

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই:

About an hour before we came to Terbonee, we entered another wood, into which having advanced a little, we met with an ancient building, of larges square stones, which seemed as hard as iron ; for whatever pains we took, we could not, with a hammer break any pieces off, The building was an oblong square 30 feet in length and 20 in breadth. The walls were 13 or 14 feet in height. It had no roof, and within it were three (?) tombs, four feet above the ground, made of a blackish kind of stone and polished, with here and there some Persian character engraved upon them. About 40 paces further was a large but very ruinous building, the roof of which consisted in fine domes or cupolas which has been adorned with sculptured imagery, but which was much obliterated.

প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে কুড়ি ফুট লম্বা ও তের ফুট চওড়া একটি বেদীর উপর চারিটি সমাধি আছে, কিন্তু ষ্ট্রাভোরিনাস তিনটি সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ একটি সমাধি তাঁহার পরিদর্শনের সময় জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া, তিনি দেখিতে পান নাই। এই সমাধি-গুলির মধ্যে প্রথমটি জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজীর এবং অন্য দুইটি বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র, রহিম খাঁ গাজী এবং করিম খাঁ গাজীর। এই স্থানে একটি স্ত্রীলোকেরও সমাধি আছে কিন্তু উহা যে কাহার সমাধি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যেও চব্বিশ ফুট লম্বা ও পনর ফুট চওড়া একটি বেদীর উপর জাফর খাঁ গাজী, তাঁহার দুই পুত্র জয়েন খাঁ গাজী ও গায়েন খাঁ গাজী এবং বর খাঁ গাজীর হিন্দু স্ত্রীর (হুগলীর রাজকন্যা) সমাধি আছে। সমাধির উপর আরবী ভাষায় লিখিত একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলালিপি রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দৃষ্ট হয়। শিলালিপিখানি পূর্বে দেওয়ালের সহিত গাঁথা ছিল, বর্তমানে উক্ত দেওয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বোধ হয় উহা এই সমাধির উপর রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বেষ্টনীর মধ্যে "সীতা বিবাহঃ", "শ্রীরামাভিষেকং", "চানূর বধঃ", "কংস বধ", প্রভৃতি সংস্কৃত লিপি পাথরে খোদাই করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংস্কৃত লেখা গাঁথুনির সময় উল্টাইয়া গাঁথা হইয়াছিল বলিয়া আজও লিপিগুলি উল্টা ভাবে আছে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডি, মনি নামক একজন পরিব্রাজক ত্রিবেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও জাফর খাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পান। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, একটি হিন্দু মন্দিরকে "জাফর খাঁ গাজীর দরগা"য় পরিণত করা হয়। দরগার যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, সেই অংশ একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে, যে, উহা একটি হিন্দু মন্দিরের অন্তরালভাগ। প্রত্যেক দ্বারের উপরের খিলানে অর্ধ চন্দ্রকারে বহু কারুকার্য খোদিত আছে, তন্মধ্যে বহু মূর্তি দৃষ্ট হয়! দক্ষিণ দিকের দ্বারে মূর্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে— কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মূর্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট আছে। সমাধি কক্ষে যে সকল সংস্কৃত শিলা-লিপি আছে তাহা মহাভারত ও রামায়ণের দৃশ্যগুলির পরিচয়জ্ঞাপক বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। দরগার উত্তর পূর্বে ও উত্তর পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ "সীতা বিবাহঃ" শ্রীরামেন রাবণ বধঃ", "খরত্রিশিরসোবধ", "শ্রীরামাভিষেকঃ", "ভরতাভিষেকঃ", "শ্রীসীতা নির্বাসঃ", প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন। সপ্তগ্রামের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্" "চাণূরবধঃ" "কংসবধ" প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই হিন্দু-মন্দিরের উপরিভাগ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি বৌদ্ধমূর্তি, ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকনুদ্দিনশাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহার সম্মুখদিকে পার্শ্বনাথের মূর্তি দৃষ্ট হয়। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত হিন্দু মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ মুসলমানদের নিকট আপত্তিজনক হয় নাই বলিয়া দরগার শোভা বর্ধনের জন্য থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দরগার সম্মুখে একটি প্রস্তরের উচ্চ মিনার ছিল, মিনারটি বর্তমানে পড়িয়া গেলেও তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে পাথরখানি পড়িয়া আছে, তাহা দৈর্ঘে আট ফুট, এবং প্রস্থে তিন ফুট; ইহা ছাড়া একখানি

গোল ঢাকনার ন্যায় পাথর (পরিধি চার ফুট) লম্বা মিনারটির সম্মুখে পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ মিনারটির উপর পূর্বে উক্ত গোল পাথরখানি রক্ষিত ছিল। হান্টার সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া ব্লকম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

The first which lies near the road leading along the bank of the Hughli, is built of large basalt stones, said to have been taken from an old Hindu Temple, which Zafar Khan destroyed. Its east wall, which faces the river shows clear traces of mutilated Hindu idols and dragons and fixed into it, at a height of about six feet from the ground, is a piece of iron said to be the handle of Zafar Khan's battle-axe. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1870).

সম্রাট্ আকবরের শাসনকালে সোলেমান কররাণী বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মির্জা নজৎ খাঁ সপ্তগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বাঙ্গলার পাঠানদিগের সহিত মোগল সম্রাট্ আকবরের বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিচরণ মুকুন্দদেব রাজত্ব করিতেন। তিনি আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাঠান রাজত্ব কিছুকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গবিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গার উপর তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। ত্রিবেণীতে রাজা মুকুন্দদেব কর্তৃক নির্মিত বিস্তৃত ঘাট অদ্যাপি তাঁহার পুণ্যকীর্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে। এতগুলি সোপানবিশিষ্ট ঘাট কাশী ব্যতীত বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকে রাজা মুকুন্দদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে. 'হিন্দু রাজ্য-চিহ্নের' জন্য ত্রিবেণীতে এই ঘাট নির্মাণ করা হইয়াছে। নিম্নে 'কালাপাহাড়' হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"তিনশত বর্ষ বঙ্গ বিধর্মীর করে।
দেবতার বরে অর্দ্ধ-বঙ্গ আজি পুন
হিন্দু অধিকারে. হিন্দু রাজ্য চিহ্ন এই
সোপান নির্মাণ। রম্য দেবস্থান শুভ
দিন আজি, তাই কল্পতরু সুরধুনী—
তীরে. আমি উড়িষ্যার স্বামী অর্দ্ধবঙ্গ-
ভূমি অধিকারী আজি হউক প্রচার।"

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' ত্রিবেণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ

কাঁদিলেন ভাগীরথী ভগিনী-বিরহে,
নয়নে সলিল-ধারা অবিরত বহে;
জ্বালার উপর জ্বালা নগবালা পায়
'সরস্বতী' এই স্থানে নিবেদিল পায়—
"রেখে যাও ত্রিবেণীতে আমায় জননী
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্ডিতের খনি।

এই স্থানে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন,
বেদাচির প্রমাবন্ত যেন দ্বৈপায়ন,
করেছেন ডান দান শাস্ত্রের বিচার,
সুশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার;
অপূর্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান,
শুনিয়ে ইংরাজী বলা তাহার প্রমাণ,
যেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে,
প্রফুল্ল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে।"

যদুনাথ সর্বাধিকারী ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পর্যটন করিয়া 'তীর্থভ্রমণ' নামক পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন ঃ "নসরাইয়ে বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে ঝাউতলাতে বাজার। মুক্তবেণী—দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব মুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছেন। এখানে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।"

জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং গঙ্গার স্তবমালার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে যে স্তবটি আছে তাহা জাফর খাঁ (ওরফে দরাফ খাঁ) রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। জাফর খাঁর গঙ্গা-ভক্তির কারণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী হুগলীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজকন্যার গঙ্গাভক্তির জন্যই জাফর খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণ গঙ্গাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হুগলীর রাজকন্যা গঙ্গার আরাধনা করিয়া বহু অলৌকিক কার্য করেন, তাহা দেখিয়া জাফর খাঁও গঙ্গাদেবীর পূজা করিতেন। তাহার রচিত স্তবের আরম্ভ এইরূপ ঃ

"যৎত্যক্তং জননী-গণৈর্ষদাপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
যস্মিন পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে তৈ স্মর্যতে শ্রীহরি।
স্বাঙ্কে নস্য তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসু ভাগীরথী।"*

প্রাচীনকাল হইতে ত্রিবেণী হিন্দুদিগের নিকট একটি মহাতীর্থরূপে পরিচিত ছিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ কাশী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির ন্যায় এই স্থানের যাবতীয় বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের উপাদান হইতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র বেণীমাধবের মন্দির অবশিষ্ট আছে। ত্রিবেণীর ঘাটের অনতিদূরে অবস্থিত এই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে, ভাস্তাড়ার জমিদার ছকুরাম সিংহ ১১৪৮ বঙ্গাব্দে উক্ত মন্দিরটিকে সংস্কার করিয়া উহার দুই দিকে তিনটি করিয়া আরও ছয়টি

* এই স্তবটি দরাফ খাঁ সর্বদা পাঠ করিতেন বলিয়া, ইহা তাহার দ্বারা রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা বেদব্যাস রচিত গঙ্গাষ্টক।

শিবস্থাপনা করিয়া উহাদের জন্য শিব-মন্দির নির্মাণ করেন। বেণীমাধবের পূর্বদিকে তিনটি মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীশশিশেখর, শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর, শ্রীশ্রীরামেশ্বর এবং পশ্চিমদিকের তিনটি মন্দিরে শ্রীশ্রীযোগেশ্বর, শ্রীশ্রীগঙ্গাধর ও শ্রীশ্রীচণ্ডীশ্বর অবস্থান করিতেছেন। উক্ত ছয়টি মন্দিরের গাত্রে "শকাব্দ ১৭৬৩—২ মাঘ" এই তারিখটি উৎকীর্ণ আছে, সুতরাং ঐ তারিখেই শিবস্থাপনা করা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ছকুরাম সিংহের বিষয় ভাস্তাড়ার মধ্যে লেখা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যে ত্রিবেণীতে দরাফ খাঁ গাজীকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেনঃ

"পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভি খাঁ পীরে।
দফর খাঁ গাজিরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে॥"

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে **জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন** ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। তাহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জগন্নাথ পিতার নিকট হইতে অল্প বয়সেই মুখে মুখে শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকায় শ্রুতিধর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না বলিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র তাঁহার অধ্যয়ন করিতে আসিত। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাজা, মহারাজা ও জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রণয়নের বিশেষ ভার তিনি লইয়াছিলেন। ইঁনি 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ' এবং 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে বহু অর্থ পুরকার-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ইংরেজ বিচারকের পার্শ্বে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার কার্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে 'জজ-পণ্ডিত' বলিত। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে ১১১ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।* তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৭৮৫ পৃষ্টায় লিখিত হইয়াছে।

ত্রিবেণী মুকুন্দদেবের ঘাটের উত্তর দিকে সে শ্মশানটি আছে তাহা ত্রিবেণী মহাশ্মশান নামে পরিচিত। এ মহাশ্মশান সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা লোক পরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তম্মধ্যে একটি গল্প এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্বে ত্রিবেণীতে বহু চতুষ্পাঠী বা টোল ছিল। ত্রিবেণী সরস্বতী তীরে অবস্থিত বলিয়া তখনকার দিনে অধ্যাপক ও শিষ্যমণ্ডলী গর্ব করিয়া বলিতেন যে, তাঁহারা মা সরস্বতীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন। সরস্বতী পার হইয়া কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যাইবার যো ছিল না; সরস্বতীকে কেহ কি ডিঙ্গাইয়া পণ্ডিত হইতে পারেন?

*তাঁহার ভবনে পরবর্তীকালে যে প্রস্তরফলক লাগান হইয়াছে, উহাতে তাঁহার জন্ম ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ ও মৃত্যু ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে।

॥ সাধক জগন্নাথ ॥

তখন বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে যে পণ্ডিত দিগ্বিজয় করিতে পারিতেন তিনি "দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত" আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ত্রিবেণীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মিবার বহু পূর্বে সাধক জগন্নাথ নামে এক মহা পণ্ডিত ছিলেন। একবার ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ নামে এক পণ্ডিত ত্রিবেণীতে বিচার করিতে আসেন। তিনি সাধক জগন্নাথকে বিচারে আহ্বান করেন। মুকুন্দ দেবের ঘাটের উপর বিচার আরম্ভ হয়। তখন বিচার-কালে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত—এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল। দুই দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত বিচার চলিল, উভয়ে বিচারে উন্মত্ত, আহার নিদ্রা বন্ধ। ব্রাহ্মণদ্বয় দুই দিন ধরিয়া উপবাসী শুনিয়া বাঁশবেড়িয়ার দেবদ্বিজভক্ত রাজা গোবিন্দদেব রায় মহাশয় বিচারস্থলে আসিয়া একরূপ জোর করিয়া বিচার বন্ধ করিয়া দিলেন ও পণ্ডিতদ্বয়কে স্নান আহার করিতে বাধ্য করিলেন ও পরবর্তী বিচার আহার নিদ্রার অবসরকালে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সাতদিন বিচারের পর অপরাহ্নে জগন্নাথ পরাজিত হইলেন। ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ জয়লাভের পর অপর পণ্ডিতগণের অধিক মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া সরস্বতী পার না হইয়া বর্ধমানাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, জগন্নাথ বাটীতে প্রত্যাগমন না করায় তাঁহার ভৃত্য রামদাস চণ্ড তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আসিল। জগন্নাথের পরাজয় সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। জগন্নাথ বিষণ্ণ বদনে ঘাটে বসিয়াছিলেন—পরাজয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মর্মান্তিক কষ্ট হইয়াছিল। তিনি রামদাসকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি আর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন না, সেইখানেই প্রয়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন—আর জনসমাজে তিনি মুখ দেখাইবেন না! তারপর প্রভুভক্ত রামদাসকে শপথ করাইয়া তাহাকে একটি গুরু কার্যের ভার দিলেন। রামদাস তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, সে তাঁহার অভিলাষ মত কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাঁহার আদেশে রামদাস গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে তিনি তাহার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখ রামদাস, আজ হইতে আমি গুরু ও তুমি শিষ্য। বিচারে হারিবার কারণ আমি গণেশ সিদ্ধ, আর কণ্ঠাভরণ মহাবিদ্যা তারা সিদ্ধ, গণেশ মা অপেক্ষা বড় হইবে কি করিয়া? কাজেই আমার পরাজয় হইল। ইহার প্রতিশোধ না লইলে আমার তৃপ্তি হইবে না। তুমি জান আমার ব্রাহ্মণীর গর্ভাবস্থা তাহার পুত্র সন্তান হইবে। তুমি সেই পুত্রকে মানুষ করিবে, তাহার উপনয়নের পর, আমি যে মহামন্ত্র তোমায় দিলাম, সেই মহামন্ত্র তাহাকে উপদেশ দিবে। পরে উপযুক্ত সময়ে ত্রিবেণীর এই মহাশ্মশানে ঐ মন্ত্রবলে উত্তর সাধক হইয়া আমার পুত্রকে মহাবিদ্যা কালীসিদ্ধ হইবার জন্য শব সাধনা করাইবে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমরা দুই জনেই সিদ্ধ হইবে। আমার আত্মা সতত তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ভগবতীর নিকট বরলাভের পর, কণ্ঠাভরণকে এই ত্রিবেণীর ঘাটে আহ্বান করিয়া আনিবে। আমার পুত্র বিচার করিয়া যে দিন সেই পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবে, সেই দিন আমার আত্মার শান্তি হইবে, তৎপূর্বে নহে।" এই বলিয়া জগন্নাথ রামদাসের কর্ণে কর্ণে আরও কত কি কথা বলিলেন। গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন।

জগন্নাথ পরদিন প্রাতে সংকল্প করিয়া প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। যথাকালে তাহার আত্মা জড় দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত লোকে চলিয়া গেল।

রামদাস গুরুর আদেশ পালনে যত্নবান হইল। শিশু জন্ম গ্রহণের পর হইতে সে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিল। সে শিশুকে লইয়া এই শ্মশানে খেলা করিত, শিশু বড় হইলে সে শ্মশানে উপুড় হইয়া শুইত; অন্ধকার রজনীতে শিশুকে পৃষ্ঠে বসাইয়া কালীনাম জপ করাইত। সে এইরূপে শিশুর তরুণ হৃদয়ে শ্মশানভীতি স্থান পাইতে দিল না। উপনয়নের পর রামদাস বালককে মহামন্ত্র দিল! তার পর রামদাস বার তিথি নক্ষত্রাদি অনুকূল দেখিয়া এক অমাবস্যা নিশা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। সেদিন উভয়ে উপবাস করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর আকাশ ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। ক্রমে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইল। অশনি সম্পাতে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ঘোরান্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। সেই তমিস্রাময়ী ঘোরা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া রামদাস চণ্ড পূজার দ্রব্যাদি ও বালককে লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে আকাশে নীল বিদ্যুৎ চমকাইল, সাধক জগন্নাথের মত একটি ছায়া রামদাসের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া, রামদাস শাস্ত্রমত যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিল। তাহার পর সে উপুড় হইয়া শুইল, বালককে পিঠে বসাইয়া মহামন্ত্র জপ করিতে বলিল ও তাহাকে নানারূপ উপদেশে উৎসাহিত করিয়া, তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রয়োগে স্বীয় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া ফেলিল। শোনিত ধারায় শ্মশান ভূমি রঞ্জিত হইল। রামদাস তখন শব—চন্ডালের শব। বালক একাগ্রচিত্তে মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল। রামদাসের শব দুলিতে লাগিল বালককে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—বালক দৃঢ় হইয়া বসিল। তারপর সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, বটুক ভৈরব, যোগিনী প্রভৃতি দেখা দিয়া বালকের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

"বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ করে ঢাল।"

শূন্যে হইতে স্তূপাকার রমণীর কেশরাশি পতিত হইল! কোথা হইতে পর্য্যুষিত শব মাংস পতিত হইল, দুর্গন্ধে বালককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বালককে মাতৃরূপে ধারণ করিয়া কে যেন তাহাকে জপ করিতে নিষেধ করিল, বাড়ী ফিরিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, বালক রামদাসের উপদেশ মত সেদিকে দৃকপাত করিল না। কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিল। ক্রমে রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইল; শুকতারা উঠিবার সময় হইয়া আসিল। সহসা পূর্বদিক অরুণোদয়ের মত উজ্জ্বল হইল, মৃদুমন্দ পবন বহিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী বসন্ত সমাগমের মত রূপ ধারণ করিলেন। দূরে পিক ধ্বনি ও নিকটে ভ্রমর গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বালক দেখিতে পাইল পূর্বাকাশে একখানি গাঢ় নীল কাদম্বিনী প্রকাশিত হইল। সহসা কাদম্বিনীর মধ্যস্থল হইতে কোটী সূর্য সমুজ্জ্বল অথচ কোটী চন্দ্র সুশীতল অপরূপ মনোরম জ্যোতিঃ সাগরে ভাসমানা মহাকালী মূর্তি ধীরে ধীরে প্রকটিত হইল। বালক তখন দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, চৈতন্য দেহ লাভ

করিয়াছে! সে উঠিয়া মায়ের পদতলে গড়াগড়ি দিল। বালকের আনন্দাতিশয্যে কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। জগজ্জননী তখন বালককে বর লইবার জন্য আদেশ করিলেন। বালক তাহার রামদাদাকে বর দিবার জন্য বলিল। জগদম্বা বলিলেন সে যে মরিয়াছে, কেমন করিয়া বর লইবে। তখন বালক রামদাদাকে বর না দিলে সে বর লইবে না জানাইল। জগদম্বা বালকের দৃঢ়তা দেখিয়া রামদাসের মস্তক শিব বাঞ্ছিত বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন ঃ

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ঘোরনিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্য মে পরমং রূপং যথেপ্সিতং বরং বৃণু॥

রামদাস উঠিয়া জগন্মাতাকে দেখিল—আনন্দ নীরে তাহার বক্ষস্থল আপ্লুত হইল। সে ভূতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মায়ের স্তব করিতে লাগিল। তারপর বালক মাতার নিকট সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও বিচারে অজেয় হউক এই বর চাহিয়া লইল। মা তথাস্তু বলিয়া নব ব্রহ্মচারী অষ্টম বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হরিহর ব্রহ্মা, যাহা সর্বদা বাঞ্ছা করেন, বালক সেই স্তন্য পীযুষ পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিল। মা তখন আশীর্বাদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেলেন। জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়া উভয়কে আশীর্বাদ করিলেন।

তারপর রামদাস, ভোলানাথ কণ্ঠাভরণের নিকট গিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া বালকের সহিত বিচার করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিল। ভোলানাথ বালককে দেখিয়া বলিলেন "বিচারে কার্য কি, আমি পরাজয় পত্র লিখিয়া দিতেছি।" অবশেষে নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি বালকের তুষ্টির জন্য ত্রিবেণীতে আসলেন। যথাকালে সেই মুকুন্দদেবের ঘাটে আবার বিচার আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ এবার বিচারে পরাজিত হইলেন। এতদিনে জগন্নাথের আত্মার তৃপ্তি সাধিত হইল।

॥ মাধবাচার্য ॥

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তারকেশ্বরের নিকটে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি চণ্ডী রচনা করিয়া বাঙ্গলাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, কবিকঙ্কনের পূর্বে ত্রিবেণীতে **মাধবাচার্য** নামে এক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৫০১ শকে) ত্রিবেণীতে বসিয়া 'চণ্ডীমঙ্গল' বা দুর্গামাহাত্ম্য রচনা করেন। কবি মাধবাচার্যই সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় চণ্ডী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন হিসাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধি বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।

যাগ-যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥"

ত্রিবেণীর পাঁচ মাইল দূরে সপ্তাতপুর নামক একটি জনপদ ছিল এবং বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের রাজবংশধর কৃষ্ণচাঁদ এই স্থানে প্রাচীনকালে এক রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। কৃষ্ণচাঁদের পুত্র সুখচাঁদ, সুখচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ, গোপীচাঁদের পুত্র হরিচাঁদ এবং হরিচাঁদের পুত্র নবচাঁদ এই স্থানে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে এই স্থানে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। এই রাজবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে যাইবার পর রাজবংশের পতন হয়।

ত্রিবেণীর সন্নিকটে কোনা নামক গ্রামে বঙ্গের অলোকসামান্যা দানশীলা মহিলা দেবী রাণী রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। কোনা গ্রামের মাহিষ্যবংশোদ্ভূত রামকৃষ্ণ দাস ও তাহার পত্নী রামপ্রিয়া দাসীর তিনি একমাত্র কন্যা ছিলেন। তাহার পিতা মাতা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনিও বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণানুরক্তির অনুকরণ করিতেন এবং পরবর্তীকালে এই ধর্মভাবের জন্যই তিনি লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৩৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৭ সালের ৯ই ফাল্গুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালীসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যামা-বিষয়ক রামপ্রসাদী-গান বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক "প্রভাকরে" সর্বপ্রথম ইহার জীবনী ও বহু অপ্রকাশিত গান বাহির করেন। সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বহু অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে; নিম্নে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য হইতে একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত হইল। কথিত আছে যে, রামপ্রসাদ একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া বাটি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মাতা কহিলেন 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া দেখ।' রামপ্রসাদ দেওয়ালের লেখাগুলি পড়িয়া দেখিলেন যে কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন; দেখা না পাইয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "কাশীতে যাইয়া আমাকে গা শুনাইয়া আইস।" রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আর্দ্রবস্ত্রেই মাতাকে লইয়া 'মন চলরে বারাণসী' গাহিতে গাহিতে কাশী যাত্রা করিলেন।

ত্রিবেণী গিয়া সে রাত্রি অবস্থান করিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, আর তোমার কাশী যাইতে হইবে না, এই স্থানেই আমায় গান শুনাও। রামপ্রসাদ ত্রিবেণীতে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কত গান যে গাহিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে ত্রিবেণীতে রামপ্রসাদের রচিত ও গীত একটি গান উদ্ধৃত হইল ঃ

"আর কাজ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
ফেলে মার চরণ কাশী সেই কালো চরণ ভালবাসী
কাশী মোলে হয় মুক্তি বটে সেই শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার কেনা দাসী।"

বঙ্গের প্রাচীনতম ভজনালয়—ব্যান্ডেল (পৃষ্ঠা ৬৭১)

বিশ্বাস বাটী—দশঘরা (পৃষ্ঠা ৮২০)
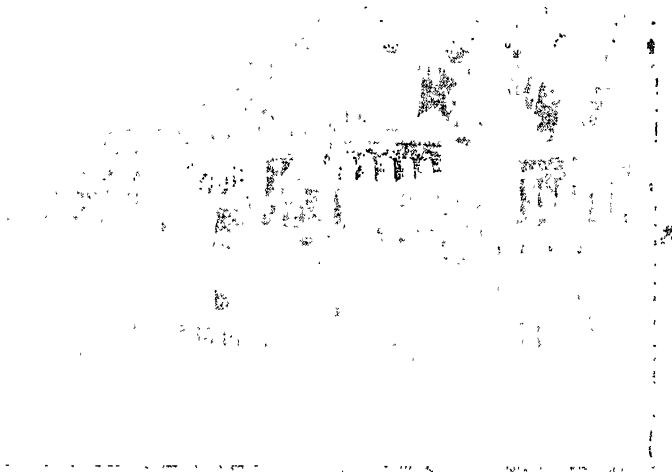
বিপিন রায়ের ঘড়িওলা বাড়ি—দশঘরা (পৃষ্ঠা ৮২২)
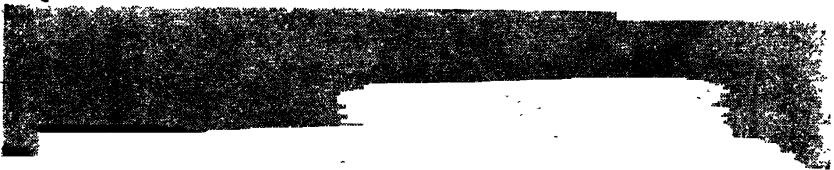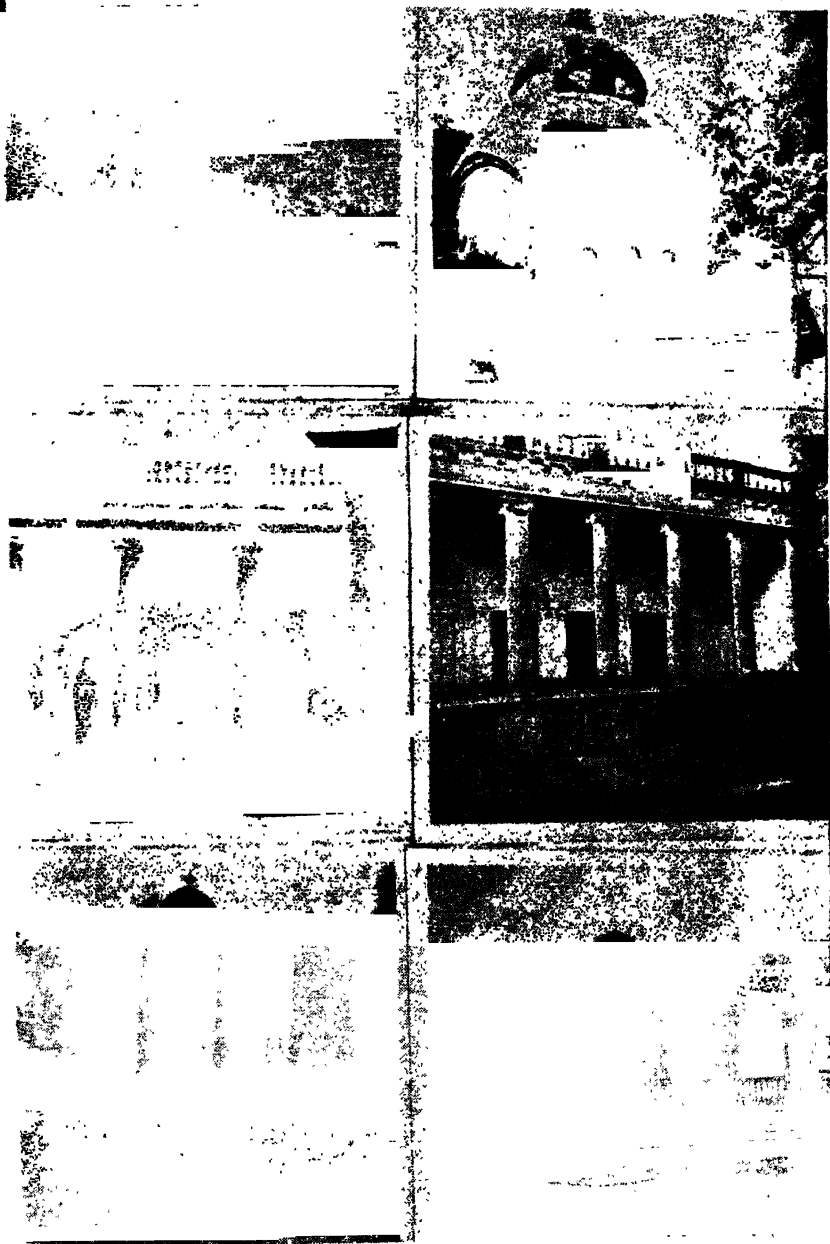
১—ত্রিকোণ জামিতিক স্তম্ভ, নবাসন; ২—[illegible] মন্দির কাঁকড়াকুলি,
[illegible]ঃ ৮০৩) ৩—শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউর মন্দির, আমনান (পৃঃ ৮৭৪); ৪—
[illegible]াকান্তজীউর মন্দির, বসদ্রা (পৃঃ ৮০৭); ৫—মদনমোহনের মন্দির, রুদ্রাণী (পৃঃ ৮০৭)
৬—বসদ্রার বংশের ঠাকুরবাড়ি, বেলমাঁড় (পৃঃ ৮০৫)।

আর্মেনিয়ান গির্জা—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬০০)

পাণ্ডুয়ার প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (পৃষ্ঠা ৮৭৮)
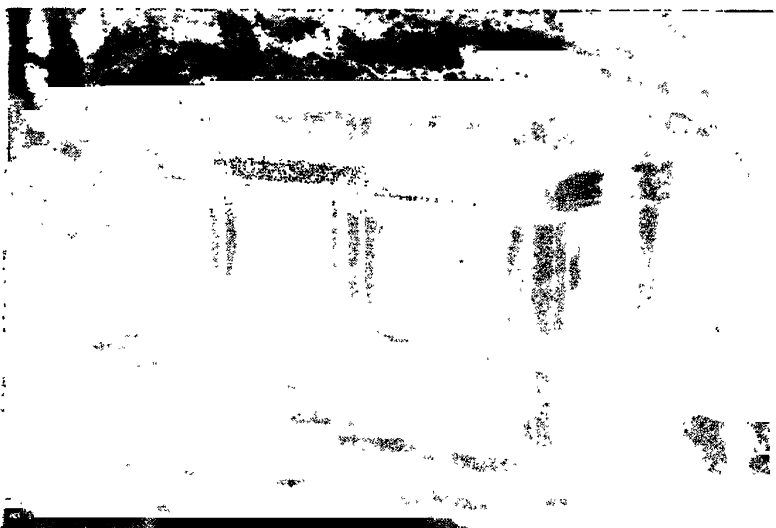
ষণ্ডেশ্বরজীউর মন্দির—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬০৮)

বঙ্গের দীর্ঘতম অট্টালিকা—চুঁচুড়া ব্যারাক (পৃষ্ঠা ৫৯৯)

লক্ষ্মীনারায়ণজীউর দোলমঞ্চ—তারকেশ্বর (পৃষ্ঠা ১১২৪)
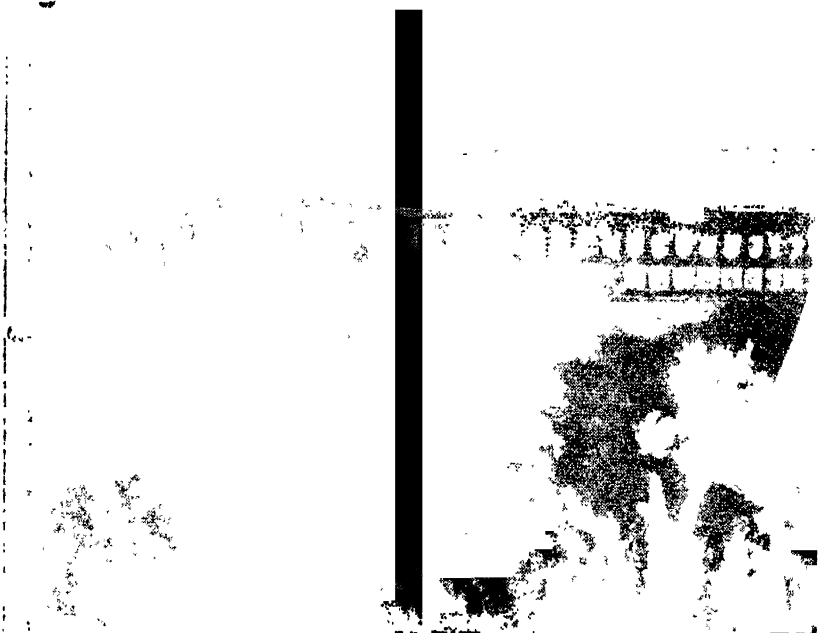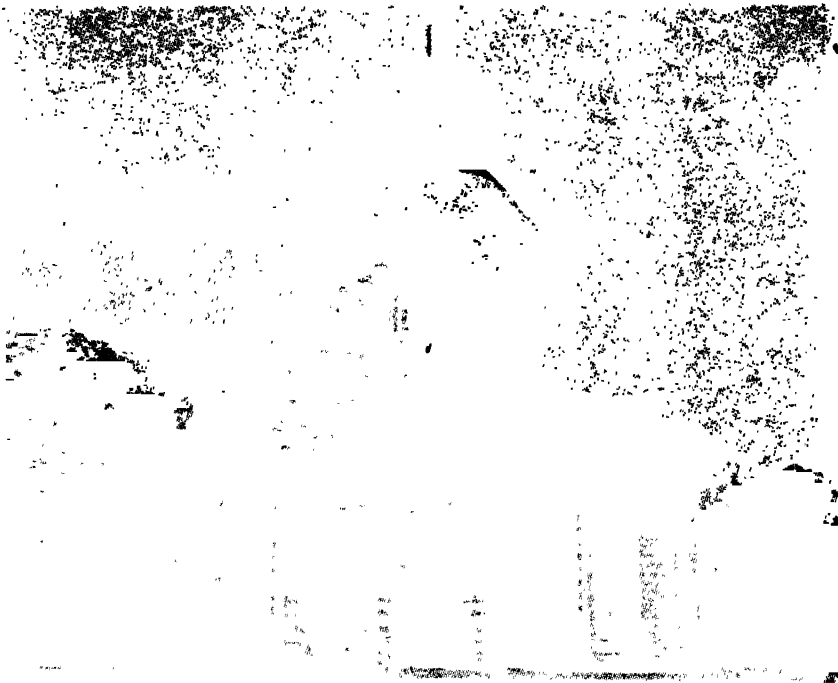
অনন্তদেবের মন্দির, বাঁশবেড়িয়া (পৃষ্ঠা ৭০১)
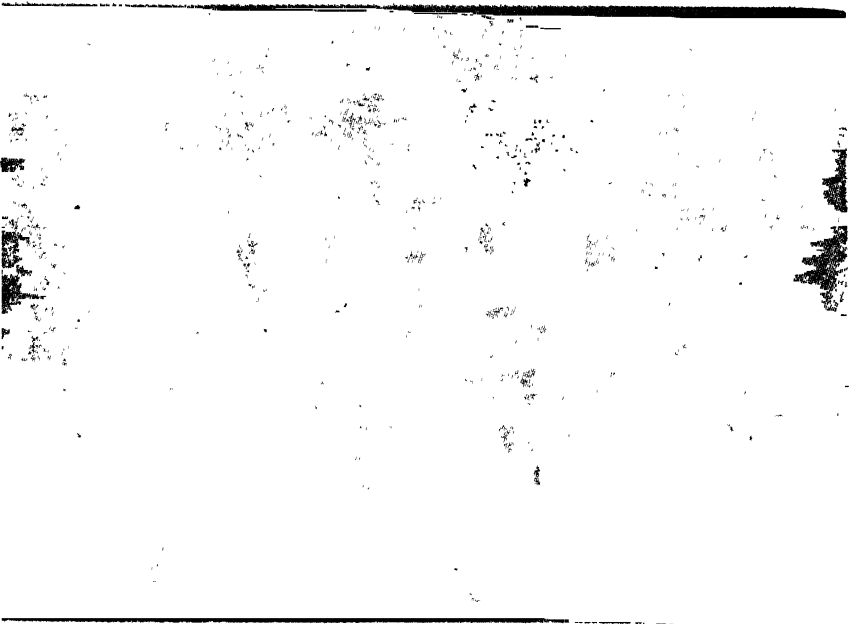
হংসেশ্বরী মন্দির—বাঁশবেড়িয়া (পৃষ্ঠা ৭০৬)
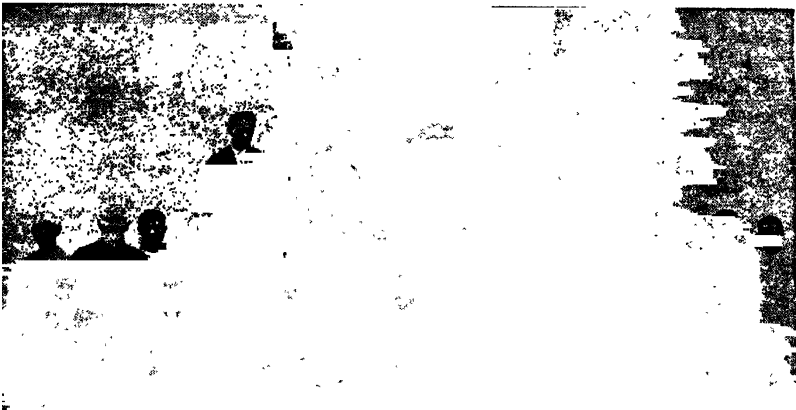
হুগলী জেলা পর্ষদের সদস্যদের প্রাচীন চিত্র (পৃষ্ঠা ৬২০)
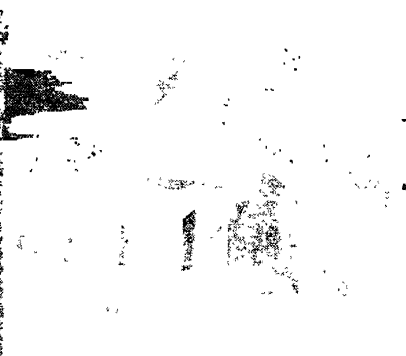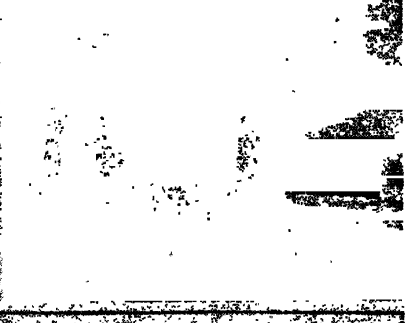
১। শ্যামসুন্দরের মন্দির, সোমসপুর (পৃঃ ৮০১); ২। শিবমন্দির, পাউনান (পৃঃ ৮৬৫); ৩। শিবমন্দির, ধনিয়াখালি (পৃঃ ৭৯৪); ৪। বুড়োশিবের মন্দির, ধনিয়াখালি (পৃঃ ৭৯৪); ৫। শিবমন্দির, সোমসপুর (পৃঃ ৮০১) ৬। বিশালাক্ষীর মন্দির, ইনাথনগর (পৃঃ ৮০২)।
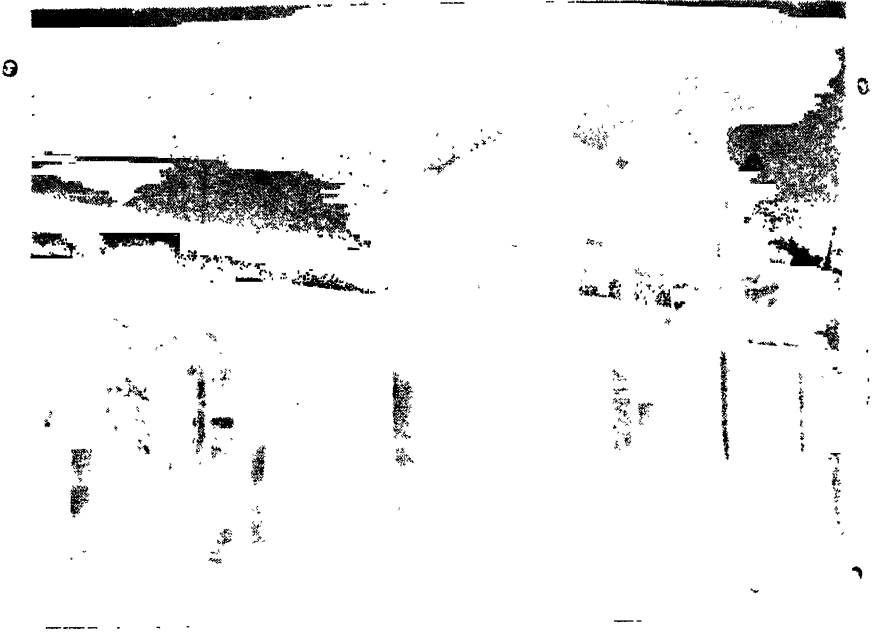
শ্রীরাম মন্দির—দিগসুই (পৃষ্ঠা ৯২৬)

চন্দ্রশেখর ও ভুবনেশ্বরের জোড়া মন্দির—মহানাদ (পৃষ্ঠা ৮৩৮)
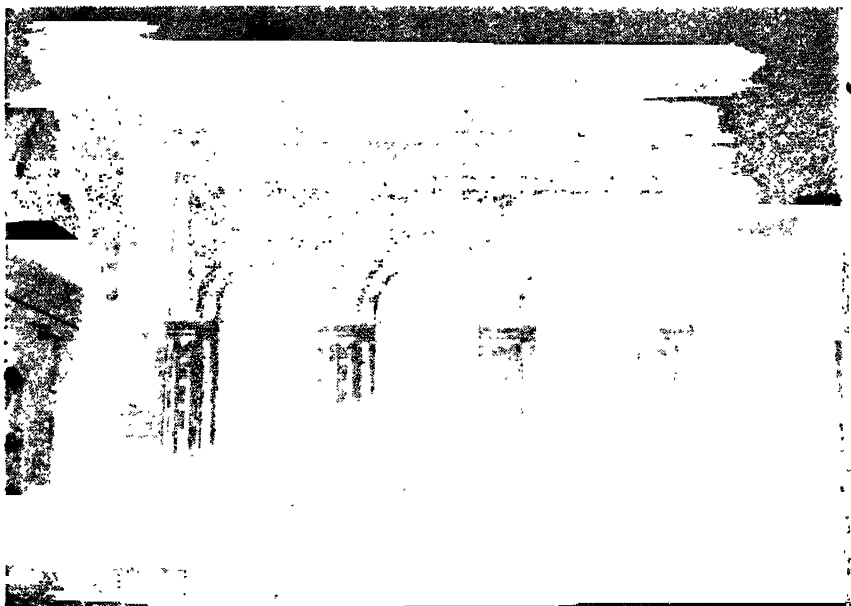
ঘোষ বংশের ঠাকুর দালান—জেজুর (পৃষ্ঠা ১০৯৪)
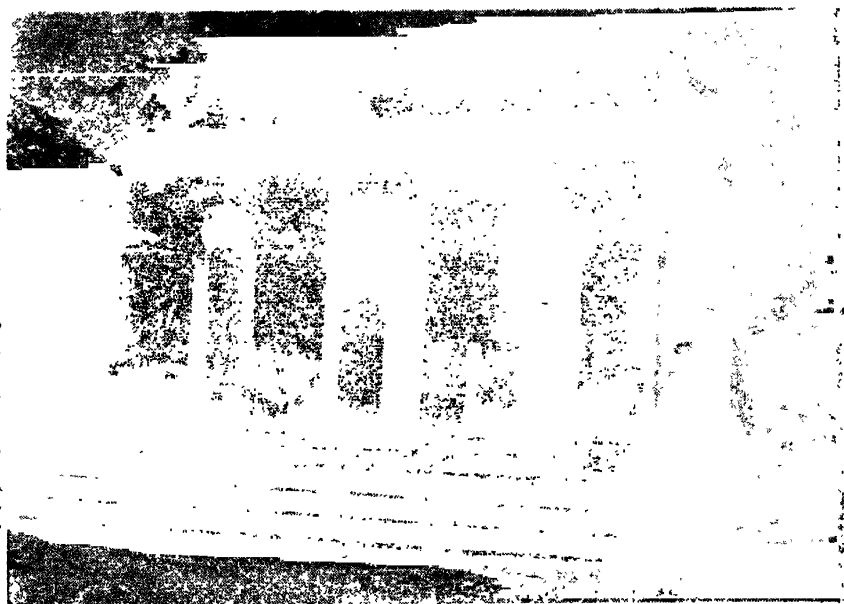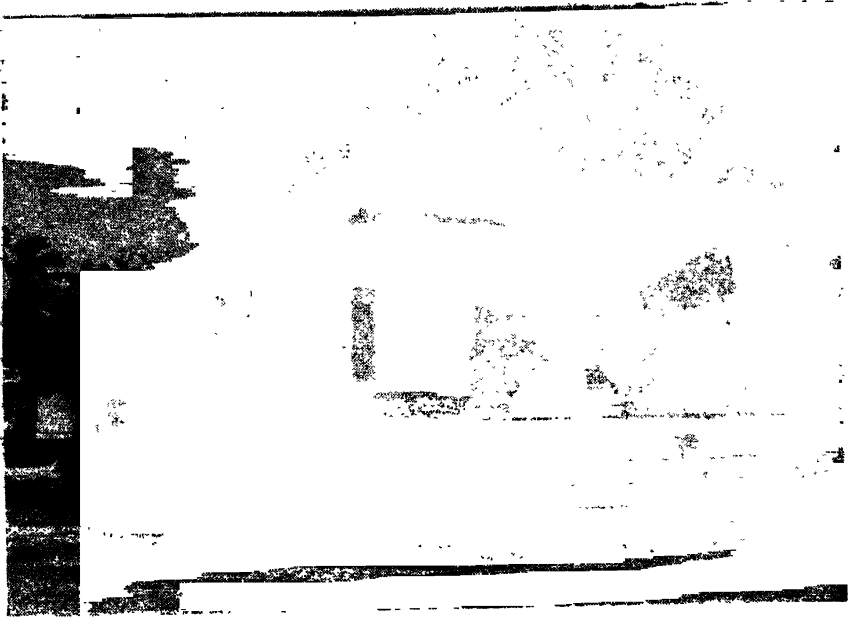
লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির—জেজুর (পৃষ্ঠা ১০৯৪)

প্রাচীন কালীমন্দির—জেজুর (পৃষ্ঠা ১০৯৪)
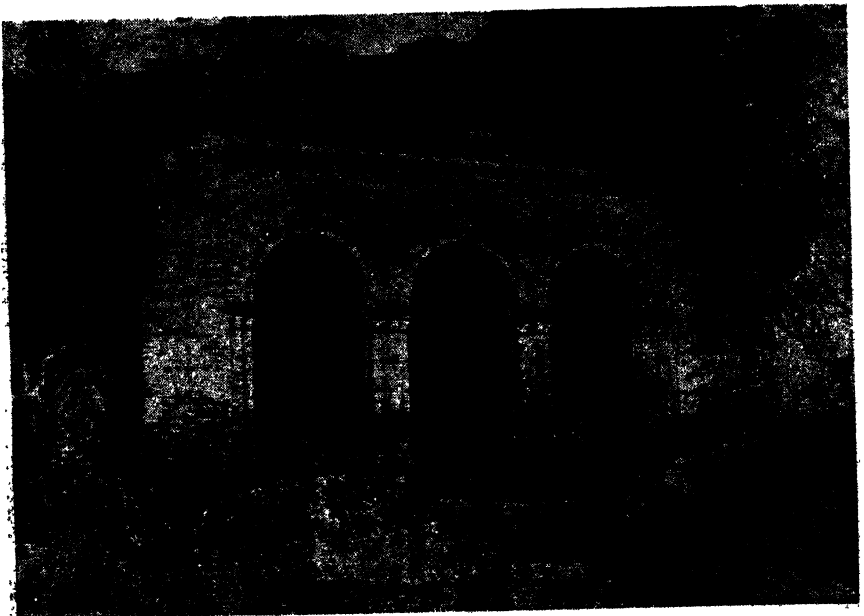
বসু বংশের ভগ্ন দুর্গাপূজার ঠাকুরদালান—জেজুর (পৃষ্ঠা ১০৯৪)

শ্রীশ্রীপতিদুর্গা—পলাশী (পৃষ্ঠা ৮০৬)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর বিগ্রহ, চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬১১)
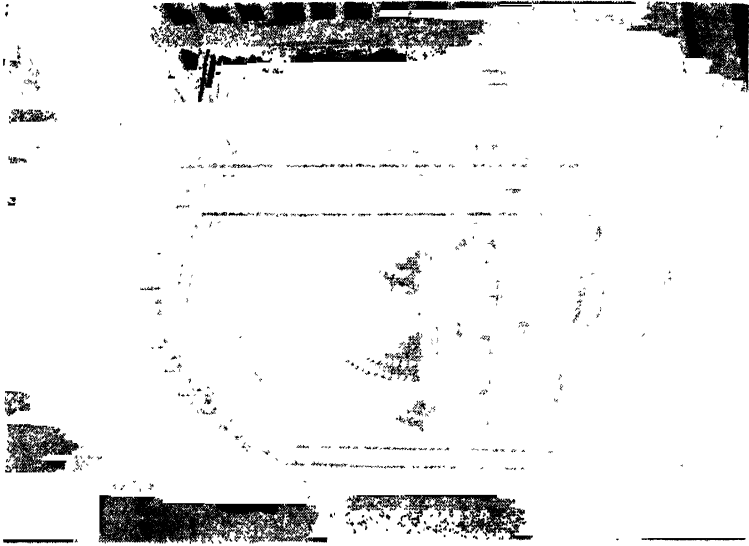
রাধাগোপীনাথ মন্দিরের সম্মুখভাগ—দশঘরা (পৃষ্ঠা ৮২১)
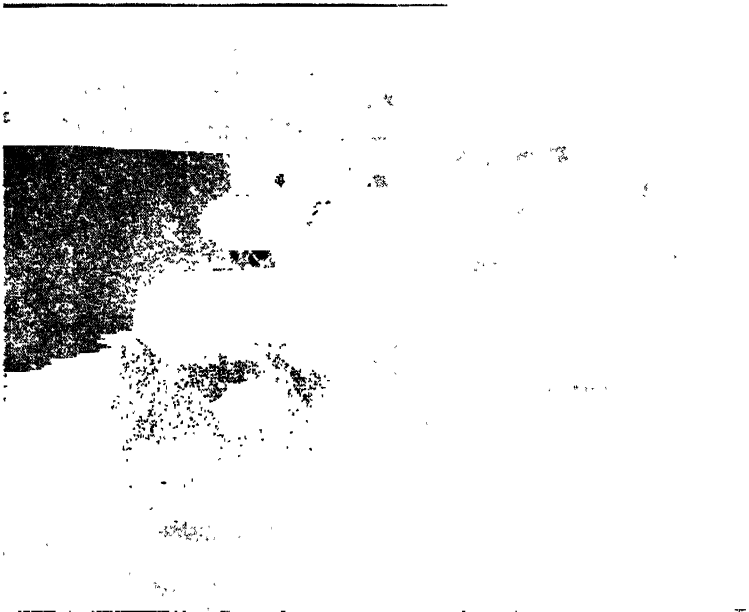
নবরত্ন মন্দির—দিগসুই (পৃষ্ঠা ৯২৫)

রামচন্দ্রের মন্দির—গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ১৪৬)

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখভাগে কারুকার্য—গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ১৪৫)
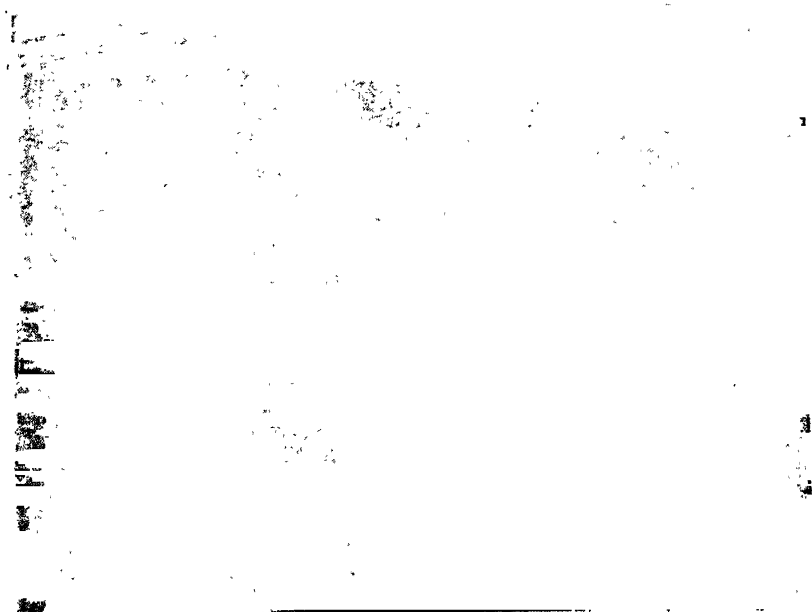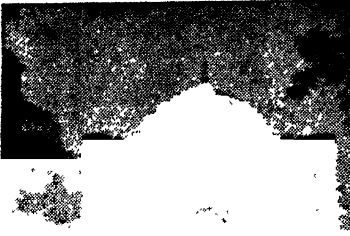
একগম্বুজ মসজিদ—হরাল (পৃঃ ৯০৪)
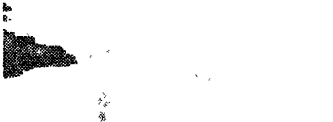
ঈদগাহ—নমাজগ্রাম (পৃঃ ৯০৭)
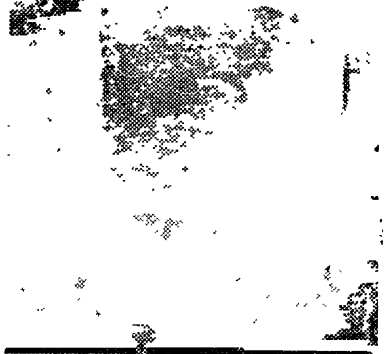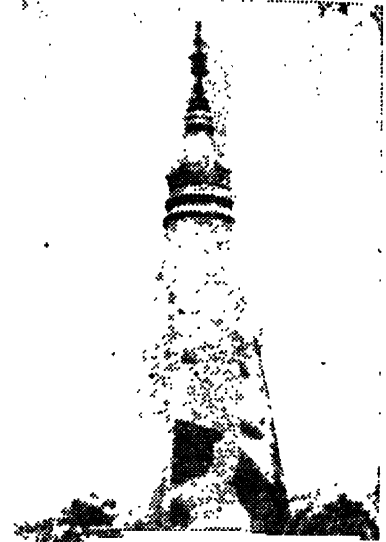
শ্রীশ্রীলালজীউর মন্দির—মহানাদ (পৃষ্ঠা ৮৩৮)

বাহির পয়নালার সেতু—ভুইমোহান ৯০৯)
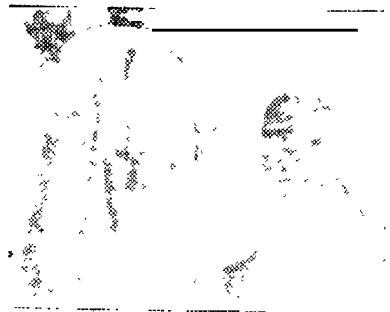
একপাদ ভৈরব ও মকরদণ্ডের অগ্রভাগ

॥ যোগাচার্য স্মৃতিমন্দির ॥

ত্রিবেণীতে করুণাময় চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সাধক পুরুষ ছিলেন; তিনি স্বামী যোগাচার্য বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত। ১২৬৬ সালের ২৮শে কার্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮শে পৌষ ১৩৩৭ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন। বংশবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার সহধর্মিণী শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সালে স্বামী যোগাচার্যের যোগাবস্থায় আসীন একটি পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়া দেন এবং তাহা প্রত্যহ মহাআড়ম্বরের সহিত মন্দিরে পূজিত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় রাধাচরণ পালের সহধর্মিণী শ্রীমতী মহারাণী দাসী ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সালে বহু অর্থব্যয়ে যোগাচার্য স্মৃতি মন্দির এবং তদসংলগ্ন একটি মনোরম নাটমন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। কয়েকজন সন্ন্যাসী এই মন্দিরে অবস্থান করেন। মন্দির গাত্রে ও মর্মর-মূর্তির পাদদেশে দাতার নাম উৎকীর্ণ আছে। ২৮শে পৌষ স্বামী যোগাচার্যের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্যের সমাগম হয়।

॥ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ॥

বাঙ্গালী হিন্দু আজ যে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা অনেকাংশে আত্মকৃত অপরাধের ফল সন্দেহ নাই। যে দেশে প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের সমুচিত সমাদর লোপ পাইতে বসিয়াছে সে দেশের কৃষ্টিসংরক্ষণের মৌখিক আড়ম্বর অনেক সময়ে এক বিরাট উপহাস বলিয়া মনে হয়। ১৫০ বৎসর পূর্বে যিনি বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন, ত্রিবেণী নিবাসী সেই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম সম্প্রতি বিশিষ্ট সমাজেও উল্লেখ করিয়া কেবল বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির বিচিত্র রূপ দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছি। আজ পর্যন্ত সাহেবের সার্টিফিকেট সম্বল করিয়া যে সকল বাঙ্গালী কার্যক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে গিয়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং জোন্স-পত্নী "আবাং ম্লেচ্ছৌ" বলিয়া জগন্নাথের চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। আজ আমরা তৎকালীন সরকারী দলিল হইতে জগন্নাথের কীর্তি ক্ষেপন করিতে বিরত থাকিলাম। বাঙ্গালী নিজে তাঁহাকে কি চোখে দেখিতেন একবার জানা যাক।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বৎ-সেবী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে "নবরত্ন" সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত "মাধব-মালতী" গ্রন্থে নবকৃষ্ণের "নবরত্ন" সভার বর্ণনা এই :

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।

তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসপুরে স্মার্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥

সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথ যে সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে খ্যাতিলাভ করেন, অন্যান্য রত্নদের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র এখন পরিস্ফুট হইবে না। দ্বিতীয় রত্ন মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—চিত্রচম্পু, রহস্যামৃত মহাকাব্য, চন্দ্রাভিষেক নাটক ও বহু খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। তাঁহার বিবরণ আমরা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃঃ ৪৩-৫৪)। চিত্রচম্পু মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর কীর্তিরক্ষায় বাঙ্গালী চিরকালই পরাঙ্মুখ, নতুবা খাঁটি বাঙ্গালীর উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনার নিদর্শনস্বরূপ চিত্রচম্পুর অংশবিশেষ আমরা বাংলার বিবিধ সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠমধ্যে দেখিতে পাইতাম। তৃতীয় রত্ন 'নদের শঙ্কর' অর্থাৎ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ। ১২২৩ সনে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। এক সময়ে ইঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রায় ৩০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত, অথচ ইনি নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। নব্যন্যায়ের চর্চা বাংলা হইতে এখন লোপ পাইয়াছে, ছাত্রাভাবে লুপ্তাবশিষ্ট নৈয়ায়িকগণ এখন কাব্যশাস্ত্র কিম্বা আয়ুর্বেদ চর্চায় রত হইয়াছেন। কালে হয়ত কাশী কিম্বা মান্দ্রাজে গিয়া বাঙ্গালীকে নব্যন্যায় পড়িতে হইবে। "নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক" পদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিগ্রহ করিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ একান্তভাবে অসমর্থ। চতুর্থ ও পঞ্চম রত্ন বলরাম তর্কভূষণ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি কামালপুরের ভট্টাচার্য বংশীয় এবং চিরবিলুপ্ত কুমারহট্ট নৈয়ায়িক সমাজের নেতা ছিলেন। এক সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে কুমারহট্টের শিবের গলির নৈয়ায়িকগণের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথাটা হয়ত গভীর পরিহাস বলিয়া অনেকে এখন মনে করিবেন। শিবের গলি এখন শৃগালাকীর্ণ একটি অরণ্যমাত্র। ষষ্ঠ রত্ন গদাধরের পরিচয় অজ্ঞাত। সপ্তম রত্ন শিশুরাম তর্কপঞ্চানন পূর্বোক্ত বলরামের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নৈয়ায়িক। জগন্নাথ হইতে শিশুরাম পর্যন্ত সকলেই প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন। অষ্টম রত্ন হুগলী জেলার পসপুর নিবাসী স্মার্ত কৃপারাম তর্কবাগীশ। ১২১০ সনে ১১০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। নবম রত্ন শান্তিপুর নিবাসী নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য। নব রত্নের মধ্যে তিনিই বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ১২৩০ সনেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও তিনি তখন অতিবৃদ্ধ। রাজা রামমোহন রায় জগন্নাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

Jagannath was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandan.

অর্থাৎ—জগন্নাথ তাঁহার সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন বং তাঁহার প্রামাণ্যগৌরব প্রায় স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের সমান ছিল।

জগন্নাথের জনৈক ছাত্র একটি ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রতিলিপিতে জগন্নাথের স্তুতি লিয়াছেন,—"বিদ্যাবিত্তবয়ঃকুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং"। অর্থাৎ জগন্নাথ বিদ্যায়, অর্জনে, বয়সে এবং কুলমর্যাদাদিতে "অদ্বিতীয়" ছিলেন। জগন্নাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পর কটি "অমৃতী" মাত্র সম্বল করিয়া সংসার আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক কা এবং বহু সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। কুলাংশে তিনি স্বয়ং সিদ্ধশ্রোত্রিয়" ছিলেন এবং তিন কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হার এক জামাতার নাম রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে একটি কারিকা াওয়া যায় ঃ

আধুনিক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।
তার সুতা লইয়াছিলেন গোপাল ভাজন॥

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৮০৫ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরে পরলোকগমন রেন। কলিকাতার সাহেবরা সভা করিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। দনুসারে গাজীপুরে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরমধ্যে কর্ণওয়ালিসের স্তরক্ষোদিত দক্ষিণাভিমুখী মুখাকৃতির (Medallion bust) সম্মুখে এক ব্রাহ্মণের ও শ্চাতে এক মুসলমানের দণ্ডায়মান অধোমুখ পূর্ণ প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চলিত প্রবাদ অনুসারে এই ব্রাহ্মণই বাঙ্গালী শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ক্ষোদিত লিপিতে কিম্বা সরকারী কাগজপত্রে ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই বটে, কিন্তু স্ম-প্রকাশে এক পত্রলেখক নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে উহা জগন্নাথের মূর্তি বলিয়াই লিখিয়াছেন। মূর্তিগুলির ক্ষোদিতার নাম মিঃ ফ্ল্যাক্সম্যান বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর ভাগের লেখক মিঃ ফিসার তাঁহার গ্রন্থে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন।

জগন্নাথের চরিতকার প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানিয়া জগন্নাথের শরীরের বর্ণনা রিয়াছেন—"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গৌরাঙ্গ ছিলেন না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও লোমশ, বাহু দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং ক্ষু উজ্জ্বল ছিল। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "লোমশ মুনি" আখ্যা দিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র শ্রীমান্ বসন্তদেব আমাদের অনুরোধে গাজীপুর গিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থিত মূর্তির ছবি কৌশলে তুলিয়া আনিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। উক্ত ছবি ১৩৫৪ সালের আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও সেই ছবির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

জগন্নাথের জীবনী কালীময় ঘটকের প্রথম চরিতাষ্টকে, উমাচরণ ভট্টাচার্য রচিত গ্রন্থে ১৮৮০, পৃঃ ৬০), রজনীগুপ্তের চরিত কথায়, বিশ্বজীবন পত্রিকায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৭২৯-৩৫) এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৪৯, পৃঃ ১-১৪) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৭৮৯ সালে সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ "Fatal Ring" নামে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত আছে যে নাটকখানা জগন্নাথের কণ্ঠস্থ ছিল— "The venerable Compiler of the Hindu Digest, who is now in the eightysixth year has the whole play of Sacontala by heart as he proved when I last conversed with him to my entire satisfaction." এতদনুসারে জগন্নাথের জন্ম হয় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যুকালে বয়স হয় ১০৩ মাত্র—ইহা সমস্ত বিবরণের বিরোধী। জোন্স ৯৬ স্থলে ভ্রমক্রমে ৮৬ লিখিয়াছেন। কারণ ১৭০৪ সালে অশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীর সহিত তুলারাশির সংযোগ ছিল না—জগন্নাথের রাশ্যাশ্রিত নাম 'রাম রাম' তুলারাশি সূচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পুত্র গঙ্গাধরের জন্ম সন ১১৬৪ সালের পরে নহে, কিঞ্চিৎ পূর্বে—ঐ সনে সম্ভবতঃ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, গঙ্গাধর নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমি পাইয়াছিলেন (নদীয়ার ২২৮০২ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথের প্রথম পৌত্রের জন্মকালে সুতরাং তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৪৫—দরিদ্র ভট্টাচার্য বংশে ইহা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাসের জন্ম ১৭৯৯ সনে কি কিছু পূর্বে এবং একপুরুষের গড়পড়তা হয় ২৪ বৎসরেরও কম—ইহাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ভ্রম-সংশোধন পূর্বক ১৬৯৪ সনেই (১৬৯৫ নহে) তাঁহার জন্ম-সন নির্ণীত হইল (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃঃ ২-৩)।

১১০১ সালের আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে (ইংরাজী ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষের পরিচয়াদি প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য। দুই-একটি নূতন সম্বাদ এই স্থানে লিখিতেছি। এই বংশ ত্রিবেণী-সমাজের মৌলিকবংশ নহে। জগন্নাথের আদিপুরুষ "দীননাথ ঠাকুর" যশোহর হইতে এখানে আসেন। "ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবৌ" প্রবাদ-বাক্যে ত্রিবেণীর দুই জন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম আছে, ইহারা জগন্নাথের বংশ নহেন। রঘুনাথ সার্বভৌম ও রাঘব সার্বভৌম উভয়েই জগন্নাথের পূর্ববর্তী ছিলেন—রাঘবের বংশ এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথের অলৌকিক প্রতিভায় ত্রিবেণীর প্রাচীন বংশগুলি অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগন্নাথের পিতা ও জ্যাঠা অপেক্ষা পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ পিতামহ (চন্দ্রশেখর বাচস্পতি) অধিক প্রতিভাশালী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের পিতা অপেক্ষা পিতামহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে জগন্নাথের পুত্রাপেক্ষা পৌত্র ঘনশ্যাম এবং ঘনশ্যামেরও পৌত্র রামদাস প্রতিভার অবতার ছিলেন।

বাল্যে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পিতার নিকট পড়িয়া জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়াস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন "একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর স্পতি প্রণীত প্রসিদ্ধ দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিগ্রন্থ জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন; বহু চিন্তাতেও এক স্থানে আর্থিক-আপত্তির উপপত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এই স্থানটি জেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।" অদূরবর্তী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের জেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।"

দ্বৈতনির্ণয় স্মৃতিশাস্ত্রের কূট বিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ এবং তাহার দুরূহ পঙ্ক্তি

বিশেষের অর্থসংগতি করা সহজ নহে। জগন্নাথের ন্যায়গুরু ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি, ইনি কামালপুরের ভট্টাচার্য বংশের তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক এবং ত্রিবেণীতে তাঁহার টোল ছিল। ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করার এক বৎসর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন (উমাচরণ, পৃঃ ১২-১৫)। রমাবল্লভ-দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কলঙ্কারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (পৌত্র নহে)।

জগন্নাথ ২৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর অতি নিঃস্ব অবস্থায় তিনি টোল করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাহা হইতে বিরত হন। অর্থাৎ পূর্ণ ৯০ বৎসর (১৭১৮-১৮০৭ সন) তিনি অবাধে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। জগতের সারস্বত ইতিহাসে এই বিস্ময়কর ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে ঘটে নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল "ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্বেদ" তন্মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে তৎকালে এই সকল শাস্ত্রের পৃথক অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে বর্ধমান-রাজ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির পোষকতায় তিনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন এবং পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও নবদ্বীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দেন। নবদ্বীপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিতে বাঁশবেড়িয়া, কুমারহট্ট প্রভৃতি সমাজ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র জগন্নাথই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে কতটা কৃতিত্ব সূচিত হইযাছে শিক্ষিত বাঙালী আজ তাহা বুঝিতে অসমর্থ। বাংলার ও নবদ্বীপের সারস্বত ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী তাহার বিরাট অজ্ঞতা দূর করিতে সমুৎসুক নহে। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে ৫০০ বৎসরে (১৪০০-১৯০০ সাল) যত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ভারতে সর্বাধিক। বাংলায় শাস্ত্রচর্চার এই বিস্ময়কর প্রসার জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। অলৌকিক প্রতিভা, অদ্ভুত মেধা ও সুদীর্ঘজীবনবলে জগন্নাথই প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া লক্ষাধিক পণ্ডিতের শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়া ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তেজস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথ সমাজভ্রষ্ট এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া "বাজপেয়" যজ্ঞের পনের দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানকালে জগন্নাথকে বাদ দিয়া নানাদেশীয় বহুতর পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন। সুবৃহৎ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া জগন্নাথ অনিমন্ত্রিত অবস্থায়ই যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে এক শত ছাত্রসহ রাজবাটীতে গমন করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বব্যয়ে অবস্থান করেন। যজ্ঞশেষে কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রশ্ন করিলেন "যজ্ঞ কিরূপ হইল?" জগন্নাথ উত্তর করিলেন "যাহাতে জগন্নাথ রবাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?" পরে জগন্নাথের সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে "গলদেশে স্বর্ণ-কুঠার বন্ধন পূর্বক" জগন্নাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

যৌবনে জগন্নাথ "রামচরিত" নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা লোপ

পাইয়াছে। তাঁহার নব্যন্যায়ের উপরি পত্রিকাও এখন দুষ্প্রাপ্য। ফলতঃ গ্রন্থরচনায় তিনি কমই কালক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র "বিবাদভঙ্গার্ণব" রচনা করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে ৪ বৎসর (১৭৮৮-৯২ সাল) লাগিয়াছিল এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ সমাপ্তিকালে জগন্নাথের বয়স ছিল ৯৮। রাজা রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগারে ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭০। বাঙ্গালী প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সুরক্ষিত হওয়া কর্তব্য।

॥ জগন্নাথের মৃত্যু ॥

১২১৪ সনে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জন দেখিয়া জগন্নাথ আর গৃহে গমন করেন নাই। ৯ দিন গঙ্গাবাস করিয়া আশ্বিনী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় গঙ্গালাভ করেন, (৪ কার্তিক—১৯ অক্টোবর) তখন তাঁহার বয়স সৌরমানে ১১৩ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া কিঞ্চিদধিক এক মাস হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের চিত্র অতি বিস্ময়কর। তিনি অন্যূন ৫০ বৎসর বিপত্নীক ছিলেন। কথায় বলে, "নাতির নাতি স্বর্গের বাতি"—জগন্নাথ বহুবারই স্বর্গে বাতি জ্বালাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালের ৬ চৈত্র (১৮০৩ খৃঃ) তিনি ভূসম্পত্তির যে বিবরণ প্রদান করেন তন্মধ্যে দখলকার স্থলে ৩০ জনের নাম আছে—তিনি স্বয়ং, এক পুত্র রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতি (বুঝা যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তখন স্বর্গী হইয়াছেন) ১০ পৌত্র, ১৫ প্রপৌত্র ও ৩ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। তাঁহার জীবনের বাকী চারি-পাঁচ বৎসর প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছিল। ইহাদের পত্নী ও কন্যা সন্তানসহ টোলের ছাত্র ও ভৃত্যাদি স্বজনের সমষ্টি ৩০০ ব্যক্তি প্রতিদিন একান্নে আহার করিত। দুই মাসে ছয় দিন করিয়া এক এক নাতবৌয়ের রান্নার পালা ছিল। বৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আবশ্যক হইত না, তিন পুরুষ একত্র বসিয়া আহার করিতেন! বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতির উপনয়ন সংস্কারে জগন্নাথ স্বয়ং অন্যূন ১১০ বৎসর বয়সে "আচার্য" পদে বৃত হইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতা ও প্রগতির যুগে একান্নভুক্ত পরিবারের এই উজ্জ্বল চিত্র স্বপ্নের অগোচর হইয়াছে। ১৯ কিম্বা ২০ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলে জগন্নাথ শতবর্ষজীবী হইতে পারিতেন না, সাংসারিক চিন্তায়ই তাঁহার আয়ুক্ষয় হইত। ১১৩ বৎসর বয়সেও নব্যন্যায়ের কুটপ্রশ্ন সমাধান করার শক্তি জগন্নাথের ছিল। বর্তমানে এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব স্বপ্নেরও অগোচর হইয়াছে কেন, ভাবিবার বিষয়।

জগন্নাথের সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দুই-একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গল্প এখানে সংকলন করিলাম।

(১) রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র লাভের জন্য জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত কবি কবিচন্দ্রকে জগন্নাথের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। কবিচন্দ্র নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত (মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র) চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরিতে উপদেশ করেন। পণ্ডিতটি বলিলেন এ ব্যাপারে চতুর্ভুজের হাত নাই। কবিচন্দ্র উত্তর করিলেন ঃ

"চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি।" (পুরীর জগন্নাথ নির্ভুজ) রামগতি ন্যায়রত্নের গোষ্ঠীকথা, ৫৬ গল্প।

(২) নবদ্বীপে প্রবাদ আছে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একক্ষণের জন্যও নবদ্বীপে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন! শুনিয়া জগন্নাথ বলিলেন, ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ। শ্লেষ অলঙ্কারদ্বারা সরস্বতীপদে নদীকে বুঝাইতেছে। (ঐ, ৯৬ কথা)

(৩) জগন্নাথের কৃপণতার খ্যাতি ছিল। ডাকাত-সরদার শ্যাম মল্লিক এক প্রাতে রীতিমত দক্ষিণা দিয়া জগন্নাথের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন, "লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কি না? জগন্নাথ স্বত্ব আছে বলিয়া লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়! আমরা "বিবাদভঙ্গার্ণব" হইতে এই অতি বিস্ময়কর অথচ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

পাশ্বিকদ্যূতচৌর্যাদি প্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃৎস্নং সমুদাহৃতম্॥

ইতি বচনেন চৌর্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তদ্দ্রব্যস্য ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি।"

১২০৯ সনের তায়দাদে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন "আমারদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পাড়িয়া কাগজপত্রাদি ও পুস্তক তছরূপ হইয়াছে।"

উপসংহারে আমরা জগন্নাথের অধঃস্তন বংশের শ্রেষ্ঠপুরুষগণের নামকীর্তন করিলাম। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের ধারায় ন্যায়শাস্ত্র এবং কনিষ্ঠ রামনিধির ধারায় স্মৃতিশাস্ত্র পূর্বাপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌম বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় স্বয়ং জগন্নাথকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহার-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং বিবাদভঙ্গার্ণব রচনায় জগন্নাথের অন্যতম সহকারী ছিলেন। ১৮০১ সনে সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথম বাঙ্গালী পণ্ডিত নিযুক্ত হন রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। রাধাকান্তের মৃত্যুর পর ১৮০২ সনে কোলব্রুক সাহেবের অনুরোধে ঘনশ্যাম উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৬ সনে ঘনশ্যামের পরলোকগমনের পর উক্ত পদে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকে অবগত নহেন, সতীদাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঘনশ্যামই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে ইহা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। ৪।৩।১৮০৫ তারিখে প্রেরিত নিজামত আদালতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোর্ট-পণ্ডিতরূপে ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা সতীদাহের বিরুদ্ধে যাহা বলেন তাহা ২০৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। ঘনশ্যামের পৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতি (মৃত্যু ১২৭৫ সন) তাঁহার সময়ে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। ত্রিবেণীর শেষ নৈয়ায়িক রামদাসের পুত্র অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ১৩১৯ সনের চৈত্রমাসে স্বর্গীয় হন।

রামনিধির মধ্যম পুত্র স্মার্ত গঙ্গাধর তর্কভূষণও বিবাদভঙ্গার্ণব রচনায় সহকারী ছিলেন! ১৭৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি নদীয়ার জজ R. Rockeসাহেব কর্তৃক নদীয়ার জজ-পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৭ সনে জগন্নাথের পূর্বেই তিনি

স্বর্গীয় হন। তিনিও অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। সর্বোপযুক্ত পৌত্র ঘনশ্যাম ও গঙ্গাধরের অকালমৃত্যু জগন্নাথের পরম দুঃখের কারণ হইয়াছিল, নতুবা হয়ত তিনি শাস্ত্রোক্ত ১২০ বৎসরই পরমায়ু লাভ করিতে পারিতেন।

আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী (অর্থাৎ বোধনের পূর্বদিন) জগন্নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে, কিম্বা আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে ত্রিবেণীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়া উচিত। আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও প্রবৃত্তির অভাব হইবে না।*

তাঁহার অলৌকিক জীবন-কাহিনী বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং তল্লিখিত "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামক সুবৃহৎ পুস্তক সংরক্ষণের জন্য প্রকাশ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি। জগন্নাথ যে ভবনে বাস করিতেন, তথায় একটি প্রস্তর ফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

In this house lived
Pandit
JAGANNATH TARKAPANCHANAN
Eminent Jurist and Scholar
Born 1695, Died 1806.

যখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাগর্ভে রাখিয়া তাঁহাকে গঙ্গা-নাম শ্রবণ করান হইতেছিল, তখন তাঁহার সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! বহুসংখ্যক ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়াইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহা এপর্যন্ত এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই।" তখনও তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রশ্নটী শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া শিষ্যকে উত্তর দান করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। যিনি জন্মের মত সংসারের মায়া কাটাইয়া অন্তিমের একমাত্র আশ্রয় সেই গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহার পক্ষে সেই পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী ভিন্ন আর কি অন্য ঈশ্বর থাকিতে পারে।

নরাকারং লদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ. নারাকারাম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে॥

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর এই শ্লোকটীর কবিতায় এইরূপ ভাবানুবাদ করিয়াছেন ঃ

ঈশ্বরকে কেহ কেহ বলে নরাকার,
কেহ বা বলিয়া থাকে, তিনি নিরাকার।
বসতি করিয়া যাঁর তীরে সর্বক্ষণ

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত "ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন"—প্রবাসী

এ-দীর্ঘ সম্বন্ধ মোর জন্মেছে এখন,
কিবা 'নরাকার' আর কিবা নিরাকার
এই দুয়ে 'দীর্ঘ'-স্বর করিয়া সঞ্চার,
'নারাকারা' 'নীরাকারা' যে মূর্তি পাইব,
তাহারেই দিবানিশি হৃদয়ে রাখিব।
তাঁহারেই মনে মনে গণিব ঈশ্বর,
তিনিই আমার সেই পূজ্য পরাৎপর।
আমাকে যাঁহার গর্ভে রেখেছ এখন,
তিনি ভিন্ন কেবা আর ব্রহ্ম সনাতন!

॥ আকনা ॥

হুগলী জেলার সদর মহকুমার পোলবা থানায় আকনা একটি অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম হইলেও প্রাচীনকালে ঘোষবংশীয় কায়স্থগণের ইহা একটি বিশিষ্ট সমাজস্থান ছিল এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে আকনার-ঘোষ প্রখ্যাত বংশ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় কায়স্থদের এই প্রসিদ্ধ সমাজস্থান সপ্তগ্রামের পতনের সহিত লুপ্ত হয় এবং গ্রামের ধনীব্যক্তিগণ কি জন্য গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যান তাহা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রামের বিরাট অট্টালিকাগুলি আজ সমস্তই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে এই গ্রামের লোকসংখ্যা মাত্র ১,১৪৩ জন। দক্ষিণরাঢ়ীর কুলীন কায়স্থদের মধ্যে আকনার ঘোষ মাহীনগরের বসু এবং বড়িশার মিত্র বিশেষ মর্যাদাশীল বংশ বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করে বলিয়া প্রবাদেও ইহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই ঃ

আকনাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু।
বড়িশা রহিলা মিত্র দুঃখ রহে কিছু॥

আকনা গ্রামে "বীরেশ্বর স্টাডি সেণ্টার" নামে একটি গ্রন্থাগার ও পোস্ট অফিস আছে। আকনা ইউনিয়ন হাই স্কুল পোলবা থানায় একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত।

॥ রামচন্দ্র ঘোষ ॥

আকনার ঘোষ বংশীয় রামচন্দ্র ঘোষ নবাবের নিকট হইতে মুসলমান রাজত্বকালে তাঁহার কৃত বহু সৎকর্মের জন্য "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিবস্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ এবং কলিকাতায় কুমারটুলিতে একটি ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎকালীন সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশে বলরাম মজুমদারও একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে।

চুঁচুড়া থানার মধ্যে কোদালিয়া দেবানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের নাম আক্‌না আছে। এই গ্রামে উল্লেখ্য কিছু নাই। জনসংখ্যা মাত্র ১৬০ জন।

॥ ধনিয়াখালী ॥

হুগলী জেলার সদর মহকুমায় ধনিয়াখালী থানা আয়তনে পাণ্ডুয়ার পরে হইলেও জনসংখ্যায় ইহা প্রথম। গত লোকগননায় ধনিয়াখালীর জনসংখ্যা ছিল ৯৭ হাজার ৪ শত ৩১ জন। এই থানায় বারোটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। উহাদের নাম গুড়বাড়ী, গুড়ুপ, ভাস্তাড়া, খাজুরদহ-মেলকী, ধনিয়াখালি, সোমসপুর, দশঘরা, পারাম্বুয়া-সাহাবাজার, গোপীনাথপুর, ভাণ্ডারহাটি, বেলমুড়ি ও মান্দড়া। ধনিয়াখালি থানার অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা ২১৪। পূর্বে ৩৭ পটি লইয়া ধনিয়াখালীর অবস্থান ছিল।

ধনিয়াখালী একটি ঈতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। এখানকার তাঁতের শাড়ী কাপড় বিখ্যাত। সারা ভারতব্যাপী ইহার খ্যাতি আছে। বিদেশের বাজারেও ইহার সমাদর আছে। এখানে ইংরাজ আমলে বা তৎপূর্বে একটি গঞ্জ ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামের চারিদিকে খাল, গড় ও দ' বা দহগুলি ইহার প্রমাণ দেয়। এককালে বহু দূর দেশ হইতে সওদাগরগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে আসিতেন এবং ধনসমাগম হইত প্রচুর। ধনিয়াখালী নামের সার্থকতা মনে হয় এই সব বিষয় হইতে পাওয়া যায়। এখনও ইংরাজ আমলের নীলকুঠি এখানে বিরাজিত। এখানের একটি প্রাচীন মসজিদও এই তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে বিরাজিত। এখানে যে এককালে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাস করিতেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় এই অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত বহু প্রাচীন মন্দির হইতে।

এখানে বুড়ো শিবের মন্দির সন ১১১০ সালে স্থাপিত। এই মন্দিরই এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সংস্কার করেন।

নিত্যানন্দ রক্ষিত একটি শিবমন্দির ১১৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমন্দিরও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য হিসাবে এখনও বিরাজিত। সম্প্রতি এই মন্দির রক্ষিত বংশের উত্তরাধিকারিগণ সংস্কার করেন।

ভগবানদাস বাবাজী নবদ্বীপ আসিয়া এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এক বিরাট দহ ছিল। উহা এখনও গৌরাঙ্গের দ' বা দহ নামে খ্যাত।

আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্ব হইতে রুদ্রাণীর মদনমোহন ধনিয়াখালী গ্রামে আসিতেছেন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়। রথযাত্রার দিন তাঁহাকে মহাধুমধামের সহিত বসুয়া গ্রামের সিংহ বংশের লোকেরা আনেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরে রাত্রে ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, ভোগরাগ গ্রহণ করিয়া ধনিয়াখালী গ্রামে আসেন এবং পুনর্যাত্রার দিন আবার রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে যান এবং সেখান হইতে রুদ্রাণীতে আদি নিবাসে ফিরিয়া যান। এই উপলক্ষে ধনিয়াখালিতে বহুকাল ধরিয়া এই সাতদিন বারোয়ারী চলে। এক একদিন এক এক ভক্ত পালাক্রমে এখানে ভোগ দেন এবং যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং খুব জাঁকজমক হয়! এই অঞ্চলের ইহা একটি প্রসিদ্ধ উৎসব।

ধনিয়াখালী মহামায়া বিদ্যামন্দির ১৯২৮ সালে স্থাপিত। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁহার মাতা মহামায়া দেবীর নামে। পূর্বে ইহা মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয় ছিল। ১৯৪৮ সাল হইতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় হওয়ার জন্য পদক্ষেপ করিতেছে। বিদ্যালয়টি অল্পদিনের মধ্যে এই অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে। সুরভি পাঠাগারটিও একটি বিখ্যাত সাধারণ পাঠাগার। সন ১৩৫৫ সালে শ্রীরাধাশ্যাম ভড় ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সম্পাদক শ্রীকানাইলাল দত্ত। যদিও এই পাঠাগারের বয়স অল্প তবুও ইহার সুখ্যাতি প্রচুর—সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। ধনিয়াখালীর বাজার একটি বিখ্যাত বাজার। দশ পনের মাইল দূর হইতে চাষী ও ব্যবসায়িগণ সপ্তাহে সোম ও শুক্রবার স্থানীয় হাটে বেচাকেনা করিতে আসেন। দশ বৎসর হইল এখানে একটি পশুহাটও হইয়াছে।

এই গ্রামে সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, ল্যান্ড রিফর্ম অফিস, জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক অফিস, পোস্ট অফিস, পুলিস স্টেশন, ডাকবাংলা, কৃত্রিম গোপ্রজনন কেন্দ্র, থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি অফিসসমূহ হিমঘর প্রভৃতি এই গ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ধনিয়াখালী শাড়ীর জন্য বিখ্যাত। এখানে পূর্বে সুশি ও শিশকর নামে একপ্রকারের লুঙ্গি জাতীয় রেশমের কাপড় তৈয়ারী হইত। এই কাপড় লাক্ষা দ্বীপ ও মালদ্বীপে চালান যাইত এবং তখন ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগম হইত। বর্তমানে শুশি ও শিশকর কাপড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

ধনিয়াখালীতে পূর্বে খইচুর নামক একপ্রকার খই-এর তৈয়ারী বিখ্যাত মিষ্টান্ন পাওয়া যাইত। ধনিয়াখালী এই মিষ্টান্নের জন্যও বিখ্যাত ছিল। প্রায় ৫০ প্রকারের মশলা সহযোগে এই মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই মিষ্টান্ন খাইয়াছিলেন। এখন আর এই মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। এই মিষ্টান্ন যাহাতে পুনরায় তৈয়ারী করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ধনিয়াখালি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৮৯৮৫ জন।

ধনিয়াখালীর বঁড়শীও বিখ্যাত। এখনও এই বঁড়শী পাওয়া যায় এবং ইহার প্রসিদ্ধি আছে। রথযাত্রা ও রাসযাত্রা উপলক্ষে এই গ্রামে মেলা হয়।

এই গ্রামের উপকণ্ঠ দিয়া একটি মিটার গেজ রেল লাইন (বি পি আর) ছিল। ১৩০১ সালে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহা উঠিয়া গিয়াছে। এই রেল ত্রিবেণী হইতে তারকেশ্বর ও কালনা জামালপুর হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেল পথের ধনিয়াখালী একটি স্টেশন ছিল। এই রেল পথের বিবরণ ৩২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামগুলি তন্তুবায় প্রধান। এখানের প্রসিদ্ধ দেবালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি বেশীর ভাগ তন্তুবায় জাতির ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে বহু পূর্বে শিক্ষা বিষয়েও অগ্রণী হইয়াছিলেন তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা।

এখানে আর একটি প্রসিদ্ধ মেলা হয়—স্নানযাত্রার মেলা। জগন্নাথদেবকে স্নানযাত্রার দিন ধনিয়াখালী বাজারে স্নান পিঁড়িতে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী হইতে আনা হয়। এই উপলক্ষ্যেও উৎসব হয়। জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তি দেখিতে খুব সুন্দর।

ঘনরাজপুর গ্রামটি ধনিয়াখালী গ্রামেরই একটি পটি। এখানে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা বিখ্যাত। দেবী খুব জাগ্রতা। বারমাস নিত্য সেবা হয়। দেবী মৃন্ময়ী। দেবীর চিন্ময়ী মূর্তি গ্রামের অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেবীর কল্যাণে এই গ্রাম

মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পায়। এই গ্রামে পূর্বে সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ছিল। বর্তমানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শ্রীকানাইলাল দত্তের চেষ্টায় ইহার নিজস্ব ভবন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির ও বিরাট মূর্তি গ্রামের শ্রীমতি তারকবালা দাসী নিজ ব্যয়ে নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তবু তিনি পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখেন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত মরু রয়ে গেল অগোচরে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ক্ষুদ্র হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াও যেন মনে হয়, এখনও হুগলীর অনেক কিছু "রয়ে গেল অগোচরে।" হুগলী জেলার এক একটি গ্রামের মধ্যে অসংখ্য ভগ্ন প্রাচীন মন্দির আর জনমানবহীন প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলি যখন দেখি তখন স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যাই। এই সব গ্রামের স্মৃতি আর যাঁহারা এই সব কীর্তি সযত্নে একদিন স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ জাগে, প্রাণ ব্যাকুল হয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সঠিক কোন বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। তথাপি বিভিন্ন গ্রামের যে ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্য নির্ধারণ পূর্বক এইস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

॥ চোপা ॥

গড়বাড়ী ইউনিয়নের ঠিক মধ্যস্থলেই হইতেছে **চোপা**। এই গ্রামে বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়, হেলথ সেণ্টার, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সমস্তই আছে, কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার জন্য গ্রামটি যথোচিত উন্নতির অন্তরায় হইয়া আছে।

১৯৫৪ অব্দে চোপায় মুকুন্দবল্লভ অম্বিকাচরণ হাই স্কুল স্থাপিত হয়। পূর্বে ইহা প্রাইমারী স্কুলরূপে গড়বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে গ্রামবাসীদের অক্লান্ত চেষ্টায় চোপায় নিজস্ব ভবনে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। গ্রামের চিকিৎসক ডাঃ অভয়পদ ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

গড়বাড়ী ইউনিয়নের মধ্যে জরুল গ্রামের ডাঃ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী নরেশনন্দিনী দেবী চোপা গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনার্থে দশ হাজার টাকা দান করেন। তিনি চোপাগ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দশ হাজার টাকা ও ছয় বিঘা জমিও দান করেন। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিজস্ব কয়েকটি বাড়ি হইয়াছে।

প্রাচীনকালে চোপা একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামের মজুমদার বংশের সুবৃহৎ ভবন ও অসংখ্য দেবালয় দেখিলে এক সময় মজুমদার বংশ যে কিরূপ অর্থশালী ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মজুমদার বংশের কৌলিক উপাধি "ব্রহ্ম"। এই বংশের কোনও ব্যক্তি পূর্বে নবাব সরকারে কার্য করিতেন এবং সেই সূত্রেই ইঁহারা মজুমদার উপাধি পান। বঙ্গাব্দ ১১০০ সাল হইতে ইঁহাদের চোপায় বসতি আরম্ভ।

এই বংশে রামদেব মজুমদার কীর্তিবান পুরুষ ছিলেন; গ্রামের অসংখ্য শিবমন্দির ও

তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০৪ নং টাইটেল সুটে হুগলী কোর্টের মুন্সেফ রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার রায়ে বলেন :

In 1168 B.S. Tilack Chand Bahadur the then owner of Burdwan granted certain Debutter and Mahatran lands for the worship of those idols and appointed Ramdeo Majmdar as the shebait. These Lands were included in Taidad no 9153.

গোপীনাথের মন্দির, দুর্গাপুজার দালান এবং চারিটি শিবমন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু অন্যান্য কীর্তি আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র ও প্রসিদ্ধ আইনজীবী ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের আদি নিবাস এই গ্রামে ছিল। চিত্রাভিনেতা রবীন মজুমদার চোপার সন্তান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার বাস্তুভিটা পর্যন্ত আজ ইঁটের স্তুপে পরিণত। বর্তমানে তিনজন বিধবা মহিলা ব্যতীত এই মজুমদার বংশের আর কেহ গ্রামে বাস করেন না। শ্রীগুণেন্দ্রকুমার মজুমদার এই বংশের প্রবীণ ব্যক্তি, তিনি কলিকাতায় ভবানীপুরে থাকেন, মধ্যে মধ্যে দেশে যান।

মুখোপাধ্যায় বংশের বহু কীর্তি চোপায় আছে। তন্মধ্যে দুইটি শিবমন্দির ও ঢাকেশ্বরী মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে ইঁহাদের পূর্বপুরুষ কার্যোপলক্ষ্যে হুগলীতে আসিয়া এই গ্রামে বসবাস করেন। ইঁহাদের কুলদেবতা ঢাকার প্রসিদ্ধা ও জাগ্রতা শ্রীশ্রীঢাকেশ্বরী। পিতলের সুন্দর বিগ্রহ, মূর্তি দুর্গার। ইঁহাদের দৌহিত্র বংশ হইতেছেন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ—গ্রামের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুইটি শিবমন্দির ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

চোপা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় বারোয়ারী কালীপূজা খুব প্রাচীন বলিয়া শুনিলাম। মন্দির দেখিয়া প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের উপরিভাগ পড়িয়া যাওয়ায় উহা খড় দিয়া ছাউনি করা হইয়াছে। ১০১৫ সালে কণাদ সিদ্ধান্ত এই পূজার প্রবর্তন করেন। গ্রামটি সদ্গোপপ্রধান হইলেও মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ঘোষ, বসু, মজুমদার, মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ এবং দুলে, বাগ্দী কর্মকার প্রভৃতি লোকের বাস আছে।

চোপার দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম এই অঞ্চলে সর্বত্র শুনা যায়। একজন ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গীয় রাখালদাস মুখোপাধ্যায় আর একজন সদ্গোপ বংশীয় স্বর্গীয় ডাঃ ভূপতিচরণ ঘোষ। রাখালবাবুর নামে কলিকাতা ভবানীপুরে "রাখাল মুখার্জী রোড" নামে একটি রাস্তা আছে। রাখালবাবু কৃতি ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও পিতার ন্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। আশুবাবুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গিরিজাভূষণ ওকালতী করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভুজঙ্গভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন ও রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ইঁহাদের বংশধরগণ রাখাল মুখার্জি রোডে অদ্যাপি বাস করেন। আর ভূপতিবাবু গ্রামে ডাক্তারী করিতেন, তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ও দরিদ্রের বান্ধব ছিলেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহ অতিথি-অভ্যাগতদের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। গ্রামে বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার ৩ পুত্র পিতার আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সর্বদাই যত্নবান। পিতার আতিথেয়তা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও বিনাপয়সায় চিকিৎসা

করা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি পুত্রদেরও বর্তাইয়াছে। ভূপতিবাবুর পিতামহ শ্রীমন্ত ঘোষ গায়ক ও পালাকীর্তন রচয়িতা হিসাবে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার রচিত বহু পালা ছিল; আমি **"নন্দ-বিদায়"** নামক একটি পালাগান উহাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি। নিম্নে "নন্দ-বিদায়" হইতে কয়েক লাইন উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"নন্দ নিরানন্দ মনে,
মুকুন্দে করিছেন স্তুতি।
চরমে চরণে স্থান,
দিও হে কমলাপতি॥
অজ্ঞানে অপরাধ,
ক্ষম' হে মুরারি।
জেনেও না জেনেছি,
তুমি গোলকবিহারী॥
মথুরেশো হৃষিকেশ
কংসানিসূদন।
শিবসুখে নারদ আদি
হৃদয়রতন॥
ব্রহ্মার দুর্লভ হরি
কে পায় তব অন্ত।
অপার মহিমা তব,
অব্যয় অনন্ত॥
দেখো হে নিদানো দীনে
দীনবন্ধু এই মিনতি।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে
কম্পিত শ্রীমন্ত॥"

॥ গুড়বাড়ী ॥

গুড়বাড়ী গ্রাম হুগলী জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরই বর্ধমান জেলার সীমানা সুরু হইয়াছে। গুড়বাড়ী ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ৭৭৬৬ জন। ইহাতে যতগুলি গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে দুইটি গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি গুড়বাড়ী আর একটি চোপা। গত সেন্সাসে গুড়বাড়ীর জনসংখ্যা ৫৪০ ও চোপার ৮২৮ জন বলিয়া লেখা আছে।

চোপার এক মাইল দূরে **গুড়বাড়ী** গ্রাম। গুড়বাড়ীর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর বিরাট মন্দির ও দোলমঞ্চ একটি দর্শনীয় বস্তু। ১৭১১ শকে রামনারায়ণ চৌধুরী ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা কাঁক্‌সা বংশ, জাতিতে সদ্গোপ। ইহাদের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর মহাদেব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বের নিকট সেনপাহাড়ী গ্রাম হইতে ইঁহারা এইস্থানে আসিয়া বসবাস করেন। এই বংশের নিধিরাম রায় সম্রাট আকবরের নিকট হইতে প্রথমে চৌধুরী উপাধি পান। ইনি চার-পাঁচটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া যান।

ইঁহাদের দুর্গাপূজার বিরাট দালান বর্তমানে ভাঙিয়া গিয়াছে। চৌধুরীদের দুইটি বাড়ীতে দুইটি বড় বড় মন্দির। বড় বাড়ীতে রামনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ ও ছোট বাড়ীতে ইন্দ্রনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণের। এই দুই ঠাকুরের বহু ভূসম্পত্তি ছিল। উহা হইতে অতিথি সেবা দেব-সেবা হইত; মন্দিরগুলি মধ্যে মধ্যে সংস্কার করার দরুণ এখনও বেশ ভাল আছে।

গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গুড়বাড়ীতে সদ্গোপ ও ব্রাহ্মণদের বাস অধিক। চৌধুরী বংশের বৈভব কি ভাবের ছিল, তাহা তাহাদের মন্দিরাদি ও সুরম্য ভবন না দেখিলে ঠিক বুঝা যাইবে না। সম্প্রতি গুড়াপ স্টেশন হইতে খানপুর পর্যন্ত এই ছয় মাইল একটি পিচের রাস্তা নির্মিত হইতেছে। এই রাস্তাটি নির্মিত হইলে গুড়বাড়ী যাতায়াতের বিশেষ

সুবিধা হইবে। তখন এই স্থান হইতে দশঘরা এবং দশঘরা হইতে বর্ধমান বা তারকেশ্বর অনায়াসেই যাওয়া যাইবে। ধনিয়াখালী হইতে রোহিয়া পর্যন্ত আর একটি পাঁচ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। এই রাস্তাটি হুগলী জেলাবোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে "প্রফুল্ল চ্যাটার্জী রোড" নামে পরিচিত। ইহা পাকা হইলে চোপা হইতে ধনিয়াখালী দিয়া চুঁচুড়া বা হরিপাল পর্যন্ত সহজে যাওয়ার খুবই সুবিধা হয়।

গুড়বাড়ী ইউনিয়নের মধ্যে বেলগাছিয়া ও রোহিয়া নামক দুইটি গ্রাম ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম গ্রামে মহম্মদ ইয়াকুব নামে একজন মুসলমান ১টি মসজিদ করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুদের এখানে একটি ছোট মন্দির আছে। উহাতে শীতলা ও মনসার বিগ্রহ আছে। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৪৪২ জন।

রোহিয়া গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও সিংহরায় বংশ এইস্থানের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। এই বংশের মুকুটরাম সিংহরায় বাহিরগড় হইতে রোহিয়ায় আসিয়া বাস করেন। মধ্যসত্ত্বভোগী জমিদার-বংশ বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। বর্তমানে শ্রীপুরঞ্জয় সিংহরায় ও শ্রীধনঞ্জয় সিংহরায় এই দুই ভাই গ্রামে বাস করেন। গ্রামে মাহিষ্য ও গোয়ালার সংখ্যা বেশী। ব্রাহ্মণ আছেন মাত্র এক ঘর, কায়স্থ কেহ নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে দুলে, বাগ্দী ও কিছু সাঁওতাল আছে। রোহিয়া গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র ২১১ জন।

॥ গুড়াপ ॥

গুড়াপ সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি কায়স্থপ্রধান গন্ড-গ্রাম। কর্ড লাইনে গুড়াপ হুগলী জেলার শেষ স্টেশন। এই স্থানের দূরত্ব হাওড়া স্টেশন হইতে ছত্রিশ মাইল। গুড়াপ নামটি বহু স্থানে গুড়ুপ, গুড়োপ বলিয়াও লিখিত আছে।

গুড়াপে অসংখ্য দেবালয় আজও বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে রামদেব নাগ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনন্দলাল জীউর বিরাট মন্দির ও মন্দির গাত্রে ইটের কারুকার্য একটি দর্শনীয় জিনিষ। মন্দিরের রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, নাটমন্দির এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণে গোপেশ্বর শিব অদ্যাপি বিরাজিত।

নন্দদুলালের বিগ্রহ কাল কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং রাধারাণীর বিগ্রহ অষ্টধাতু নির্মিত। নন্দদুলাল ও রাধারাণীর বিগ্রহ দুইটি দেখিতে এত সুন্দর যে, একবার দেখিলে ভক্তের মনে ভাবের সঞ্চার হয়; নন্দদুলালের দক্ষিণে নাড়ুগোপাল ও বামে বালগোপালের মূর্তি আছে। প্রতিষ্ঠাতা রামদেব নাগের কন্যা বালগোপালের বিগ্রহ স্থাপনা করেন। কালীপূজার পরদিন প্রতিপদের অমাবস্যায় প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত নন্দদুলাল জীউর অন্নকূট উৎসব হয়। এই উৎসবে দেশ-দেশান্তর হইতে পূর্বে অসংখ্য যাত্রী সমাগম হইত।

নন্দদুলালের নাটমন্দির ১৩৫০ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীকরুণাময় নাগ তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মাণ করিয়া দেন। এই বিষয়ে একটি পাথরে লেখা আছে ঃ

পরমারাধ্য পিতৃদেব (অন্যতম সেবাইত)
স্বর্গীয় রমণীকান্ত নাগ মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থে
এই নাটমন্দির নির্মিত হইল।

করুণাময় নাগ বর্ধমান ও আসানসোলে ওকালতী করিতেন। তিনি গুড়াপে পিতার

রমণীকান্ত ইনস্টিটিউসন ও মাতার স্মৃতির উদ্দেশে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া জগৎমোহিনী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

গুড়াপের গ্রাম্য প্রাচীন দেবী হইতেছেন 'বুড়িমা' অর্থাৎ দেবী দুর্গা। দুর্গার বামে গণেশ এবং দক্ষিণে কার্তিক। একমাত্র গুড়াপের নাগবংশের যে দুর্গা প্রতিমা হয়, তাহা ছাড়া হুগলী জেলার আর কোথাও এইরূপ গণেশের মূর্তি বামদিকে দেখা যায় না। বুড়িমার বর্তমান সেবায়েত হইতেছেন শ্রীকেশবলাল চট্টোপাধ্যায়!

গুড়াপের চক্রবর্তীদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে জটিলেশ্বর বিগ্রহ আছেন। এই মন্দিরের সেবায়েত হইতেছেন শ্রীগোপালদাস, নীলরতন ও মথুরামোহন চক্রবর্তী। চক্রবর্তীদের আর একটি মন্দিরের নাম শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দির। এতদ্ব্যতীত রামদেব নাগের গুরুদেব পণ্ডিত রামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত মুক্তকেশী মন্দির গ্রামের প্রসিদ্ধ মন্দির।

গুড়াপের চক্রবর্তীদের দুর্গা প্রতি বৎসর দশমীর পরিবর্তে একাদশীর দিন বিসর্জন হয়। এই স্থানের শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর জীউ খুব জাগ্রত দেবতা। গৌড়েশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্থানে চৈত্র মাসে গাজন সন্ন্যাস, ঝাঁপ ও চড়ক পূজা খুব সমারোহের সহিত হয়। গৌড়েশ্বরের তেলপড়া খুব বিখ্যাত; ঘায়ে একবার লাগাইলে ঘা সম্পূর্ণ সারিয়া যায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। তজ্জন্য তেলপড়া লইতে ঠাকুরের কাছে প্রত্যহ বহু লোক আসে। গুড়াপের নিকট **সাটীদাহ** নামে একটি গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে এই অঞ্চলে পূর্বে যে অনেক সতীদাহ হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হয়। সাটীদাহের জনসংখ্যা ৩৯০ জন। পরবর্তীকালে সতীদাহের অপভ্রংশে গ্রামের নাম সাটীদাহ হইয়াছে।

গুড়াপের মাল্টিপার্পাস স্কুল ও সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। পাঠাগারের নিজস্ব ভবন আছে উহা শ্রীরামচন্দ্র আশ ও শ্রীসুবলচন্দ্র আশ পিতার স্মৃতি-রক্ষার্থে ১৩৬১ সালে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গুড়াপের বসু ও মুখোপাধ্যায় বংশের প্রসিদ্ধি আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গুড়াপের অধিবাসী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গণিত শিক্ষক শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ গুড়াপে জন্মগ্রহণ করেন। গুড়াপের জনসংখ্যা বর্তমানে ২৪৯৮ জন এবং গুড়াপ ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৮৭৮৫ জন।

৫ই জুন ১৯৬০ খৃস্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে শ্রীনন্দলাল জীউর বিগ্রহ চুরি হইয়া যায় বলিয়া জানা যায়। সংবাদটি এইরূপ

"গুড়াপ (হুগলী), ৫ই জুন—হুগলী জেলায় ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত গুড়াপ গ্রামে শ্রীনন্দলাল জিউ-এর বিগ্রহ প্রায় তিনশত বৎসরের অধিককাল প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি রাত্রিকালে মন্দিরের তালা ভাঙ্গিয়া অষ্টধাতুর বিগ্রহ রাধারাণী (ওজন প্রায় ১০।১২ সের) ও গোপাল (ওজন প্রায় ২।৩ সের) ও ঠাকুরের কিছু বস্ত্রাদি চুরি গিয়াছে। বহু পূর্বে আর একবার রাধারাণী মূর্তি চুরি গিয়াছিল। পরে চোর অনুতপ্ত হইয়া অথবা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় মন্দিরের নিকটে মূর্তিটি ফেলিয়া যায়।"

॥ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ॥

গুড়াপে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হইতেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী। ১৮৮২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে গুড়াপ গ্রামে

তাঁহার জন্ম হয়। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ সিংহরায়। ১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিশোর বয়স হইতেই তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর নিকট মহামন্ত্র লাভ করেন এবং পরে তিনি স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতে সন্ন্যাস নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্মধারার সহিত এক হইয়া যান। বারাণসী, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর মায়াবতী, বলরাম মন্দির (কলিকাতা), ভুবনেশ্বর, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি মঠ ও মিশনের মহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং ১৯৬২ খৃস্টাব্দে স্বামী শঙ্করানন্দজীর তিরোধানের পর তিনি সংঘাধ্যক্ষরূপে বৃত হন। তিনি যে সমস্ত অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা "সৎপ্রসঙ্গ" নামে দুইখণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ১৭ জুন ১৯৬২ খৃস্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

॥ সোমসপুর ॥

ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত সোমসপুর ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৮৬৪৪ জন। এই ইউনিয়নের মধ্যে ছোট ও বড় মিলাইয়া প্রায় ২০টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে আলা, কাঁকড়াকুলি ও সোমসপুর প্রাচীন গ্রাম বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামসমূহে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে এবং একসময়ে গ্রামগুলি বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির আবাসভূমি ছিল।

সোমসপুর গ্রামের জনসংখ্যা ১১০৮ জন ও ইহা তন্তুবায়প্রধান। এখানে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্ শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে "সোমসপুর কালীকুমার জুনিয়র হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবন আছে। সোমসপুরের প্রাচীন শিবমন্দিরের গাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু মন্দির ভগ্ন হওয়ায় বর্তমানে শিবলিঙ্গ শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত আছে। শিবমন্দিরের সম্মুখে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে : "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শুভমস্তু—সকাব্দা ১২৬১ সক"। এই গ্রামে আর একটি শিবমন্দির-গাত্রে লেখা আছে : "শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিবমস্তু—শকাব্দা ১৭৫৯।" এই মন্দির ১২৪৪ সালে প্রকাশচন্দ্র শর্মা, রাজচন্দ্র শর্মা ও শিবচন্দ্র শর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। সোমসপুরের

শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির এই গ্রামের একটি প্রাচীন মন্দির। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ অতি সুন্দর। কথিত আছে যে, গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামীদের নিকট হইতে এই বিগ্রহ আনীত হয়। মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে বৃন্দাবনপুর নিবাসী শ্রীবটকৃষ্ণ ভড়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভড়, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভড়, শ্রীনলিনচন্দ্র ভড় ও দেবেন্দ্রনাথ ভড়, তাঁহাদের পিতা নন্দলাল ভড় ও মাতা প্রিয়বালা দাসীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৩৪৯ সালে দেবালয় পুনর্নির্মিত করিয়া দেন।

এইস্থানে নাথ সম্প্রদায়ের দুখীরাম চিত্রকর প্রতিষ্ঠিত "বুড়া দামান" আছে। বর্তমানে এই নাথ সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পূর্বে ইহারা মুসলমান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। ইহারা মৃতদেহ কবর দিত। এই "বুড়ো দামান" খুব জাগ্রত দেবতা। পুত্র কন্যা না হইলে এই দেবতার কাছে পুত্র-কন্যা লাভের জন্য অনেকে মানত করেন। এইস্থানে

একটি কালীমাতার মন্দির আছে। সোমসপুরের পার্শ্বে ইনাথনগর গ্রামের শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ১২১৪ সালে রাধাচরণ শীল কর্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীবটকৃষ্ণ ভড় ও তাঁহার চারি ভ্রাতা ১৩৫৩ সালে ১৩ই মাঘ উহার সংস্কার করিয়া দেন। গ্রামের কালীমন্দিরটিও উঁহারা ১৩৪৮ সালে সারাইয়া দেন। ইহার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম **হারপুর**। এই গ্রামে হরনগরেশ্বর শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। এইস্থানের লোকসংখ্যা ৫২৬ জন।

॥ আলা ॥

আলা একটি প্রাচীন স্থান এবং লাহা বংশ এখানের সর্বপ্রাচীন বংশ। লাহারাই এ গ্রামের আদি ধনী ব্যক্তি। এঁদেরই পূর্বপুরুষ শোভাচাঁদ লাহা বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। দেবোত্তর হিসাবে তিনি বর্ধমান মহারাজার নিকট হইতে ৭০।৭৫ বিঘা জমি পান। এই সময় তিনি মহারাজাকে হাজার টাকা নজরানা দেন; তাই তাঁকে হাজারী লাহাও বলে। সেই জমির ফসল হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ জীউএর ভোগ হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দামোদর' এখানে গ্রামের চক্রবর্তী বাড়ীতে সেবা পান। এরই প্রতিষ্ঠিত জগদীশ্বর শিবমন্দির, দোলমঞ্চ এখনও প্রাচীন কীর্তি হিসাবে বিরাজিত। এখানে পূর্বে নিত্য অতিথি সেবার ব্যবস্থা ছিল। জগদীশ্বর শিবের গাজন হয়। গাজনের সময় শিবের 'মনুই ভোগ' একটা বিখ্যাত ভোগ। বহু ব্যক্তি দূর-দূরান্তর হইতে এই ভোগ পাইবার জন্য এখনও আসেন। গাজনের সময় 'লীলাবতীর' বিবাহ উপলক্ষ্যে পূর্বে এখানে খুব ধূমধাম হইত। প্রচুর বাজী পোড়ান হইত, প্লাসের ঝাড় লইয়া আলোর দীপালি উৎসব হইত। এই লাহারাই দানপুকুর, সুখসাগর, মল্লিকপুকুরের দিঘী ও আলার দিঘি নামক চারিটি বিরাট বড় পুষ্করিণী কাটাইয়া দেন। লাহারা খুব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

এখানে পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরাট ভগ্ন বাড়ী দৃষ্ট হয়। এখানে এককালে সাবরেজিষ্ট্রী অফিস ছিল। এঁদের প্রতিষ্ঠিত 'রামেশ্বর শিব'। আলা ক্ষীরোদ বান্ধব পাঠাগার ১৩৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৪১৮ জন।

ধনিয়াখালীর অন্তর্গত **আলা** গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ একটি দর্শনীয় বস্তু। এতদ্ভিন্ন জগদীশ্বর নামক শিবমন্দির আছে। ইহার সেবায়েতের নাম দুলালচন্দ্র লাহা। আলার লাহা-বংশ হিন্দুধর্মোক্ত নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও দানধ্যানাদির জন্য পরিচিত। মুসলমান রাজত্বকালে একদল তন্তুবায় মুর্শিদাবাদ হইতে কোন নিরাপদ স্থানে বসতির জন্য বাহির হয়। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা এক বিশালকায়া নদী দেখিয়া ক্লান্তিবশতঃ আর অগ্রসর না হইয়া তথায় বসবাস করে। ক্লান্তির চলিত কথা হইতেছে, 'আলা' এবং সেই আলা হইতেই গ্রামের নাম আলা হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি।

সেই দলের অন্যতম তন্তুবায় শোভাচাঁদ লাহা বর্ধমান রাজষ্টেটে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। তিনি এক সময় জনৈক ব্রাহ্মণ একটি সুন্দর রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিতে যাইতেছেন দেখিয়া তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন এবং তাহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের মন্দিরের মধ্যে উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন।

হাজারি লাহা এই বংশে একজন কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বহু সম্পত্তি রাখিয়া যান। পরবর্তীকালে রামচাঁদ, গোরাচাঁদ ও দুলালচাঁদ গ্রামে কূপ, পুষ্করিণী ও বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্গীর অত্যাচার হইতে গ্রামকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা গড় খনন করাইয়া দেন। অদ্যাপি আলা গ্রামে রাধাগোবিন্দের দোল, রাস এবং জগদীশ্বরের গাজন সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায়গণ লাহা বংশের অধীনে কর্ম করিয়া বহু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। তাঁহাদেরও অনেক কীর্তি এখনও গ্রামে আছে।

যদুপুর এই গ্রাম একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। এখানের ওলাই চণ্ডীতলা মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত। এরই পাশ দিয়া ঝিমকীর খাল রহিয়াছে। লোকসংখ্যা ১০৮ জন।

॥ কাঁকড়াকুলি ॥

সোমসপুর ইউনিয়নের মধ্যে **কাঁক্ড়াকুলি** এক সময়ে খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। দামোদর নদের একটি শাখা কাঁক্ড়াকুলির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে; ইহা এই অঞ্চলে জুলকে নদী বলিয়া খ্যাত। অতীতে ইহা অত্যন্ত বেগবতী ছিল এবং জনশ্রুতি যে, পণ্যবাহী জাহাজ, বজরা প্রভৃতির যাতায়াত তখন ইহাতে ছিল। কিন্তু দামোদরের বাঁধ নির্মিত হইবার পর হইতে ইহার গতি রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে ইহা ক্ষীণাকৃতি হইয়াছে। কাঁকড়াকুলির এই নদীকে "বজরদহ" বলে। কারণ অতীতকালে এই নদীর মধ্যে একটি বড় বজরা ডুবি হইবার পর হইতে ইহার নাম "বজরদহ" হইয়া যায়। কাঁকড়াকুলিতে দত্ত, কুণ্ডু ও কর বংশের অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের কুণ্ডুবংশ এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির কাঁকড়াকুলির প্রাচীনতম মন্দির বলিয়া কথিত।

কুণ্ডুদের এই মন্দিরটি ছাড়া এখন আর কিছু গ্রামে নাই। তাঁহাদের প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা ধূলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। পূর্বে ইহাদের তসরের কারবার ছিল। এই বংশীয় কোন কোন ব্যক্তি বর্তমানে কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর মন্দির পূর্বে গ্রামে ছিল। কিন্তু ঐ মন্দির ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় বিগ্রহ এখন অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ এখনও বিদ্যমান আছে। উহাতে প্রতিষ্ঠার তারিখ "শকাব্দ ১৬৭৭" লেখা আছে।

সেনেদের লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরে ও শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠার তারিখ যথাক্রমে "শকাব্দ ১৬৪৮" ও "শকাব্দ ১৬১২" উৎকীর্ণ আছে। বীরু সেন প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন জমি গ্রামের জনৈক বাগ্দী ক্রয় করিয়াছে এবং মন্দিরটি বর্তমানে ছাগল রাখিবার স্থানে পরিণত হইয়াছে এবং শিবলিঙ্গ কোথায় তাহা অজ্ঞাত। গ্রামের দত্ত ও সেনগণ তাম্বুলী-সম্প্রদায়ভুক্ত।

কাঁক্ড়াকুলিতে বেনেদের শিবমন্দির বলিয়া কথিত আর একটি মন্দিরে "সন ১২২৮ ইং ১৮৪১" ও দত্তদের আর একটি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা "শকাব্দ ১৬৭৭" বলিয়া লিখিত আছে। এইস্থানের অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া এই অঞ্চল যে এক সময় শৈবপ্রধান ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। এই গ্রামের মধ্যে রক্ষাকালীমাতার একটি মন্দির ভগ্নাবস্থায়

আছে। ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে মন্দিরটির সংস্কার করা হয়। এই মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছে : "শ্রীশ্রীরক্ষাকালী মাতা। শ্রীএককড়ি দত্ত, তস্য পত্নী শ্রীমতী ননীবালা দাসী কর্তৃক এই দেবালয় নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত।"

কাঁক্ড়াকুলি গ্রামের সর্বাপেক্ষা সুন্দর মন্দির হইতেছে চন্দ্রশেখর কর প্রতিষ্ঠিত **"শ্রীশ্রীসীতারাম মন্দির"** ও **শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির"**। এই মন্দির দুইটির প্রতিষ্ঠা ও গঠন একই রকমের। প্রতিষ্ঠার তারিখ "১৬৫৫ শকাব্দ" লিখিত আছে। দুইটি মন্দিরের সম্মুখভাগে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ইষ্টকের উপর অঙ্কিত আছে। সীতারাম-মন্দিরের সম্মুখভাগ বর্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কারুকার্যখচিত ইষ্টকগুলি যাহার যেথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতেছে। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীহনুমানজীউর বহুপ্রকারের চিত্র অঙ্কিত ছিল। আমি হনুমানজীউর মূর্তিসমন্বিত কয়েকটি ইষ্টক প্রত্নশালায় দিবার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। সীতারামের বিগ্রহ বর্তমানে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই মন্দির দুইটি কেহ কেহ রামদেব কর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিষ্ঠাতা রামদেব কি চন্দ্রশেখর কর তাহা লইয়া মতভেদ আছে। করবংশীয়গণ কায়স্থ। এক সময় ইহাদের অবস্থা ভাল ছিল। বর্তমানে সকলেই প্রায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ৩১৯ জন এবং সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ৮৭৬ বিঘা। ধনিয়াখালী থানা উন্নয়ন ব্লক মান্দড়া, গুড়াপ, সোমসপুর, কনুইবাঁকা ও খাজুরদহ গ্রামে শিশুদের জন্য উদ্যান রচনা করিয়াছেন। এইরূপ উদ্যান অন্যান্য গ্রামে হইলে ভাল হয়।

কাঁকুড়াকুলির পার্শ্ববর্তী গ্রাম **সিতিপলাশী** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এই গ্রামের পোঁয়ারছত্রী সিংহরায় বংশে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রুড়কি টমসন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বি-ই পাশ করিয়া রেলওয়েতে চাকুরী লন। তিনি ভূপালে ইন্ডিয়ান মিডল্যান্ড রেলওয়ে নির্মাণে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী ভারতীয় শ্রম ও ভারতীয় মূলধনে বি-পি-রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা ছাড়া "টাইলড ওয়ালিং" "ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট" প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তকের রচয়িতা হিসাবেও তাঁহার প্রসিদ্ধি লাভ হয়। ২৭ জানুয়ারী ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত বহুদিন তাঁহার গৃহে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

॥ বেলমুড়ি ॥

বেলমুড়ি ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত বেলমুড়ি ইউনিয়নের অধীন একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। চুঁচুড়া হইতে তারকেশ্বর ও চুঁচুড়া হইতে হরিপাল এই দুইটি পাকা রাস্তার সংযোগস্থলে এবং হাওড়া বর্ধমান নিউ কর্ড রেলপথের উপর গ্রামটি অবস্থিত। বেলমুড়ি স্টেশন হাওড়া হইতে ৩৩ মাইল দূরে। হুগলী জেলার পূর্ব ও পশ্চিম হইতে পরিমাপ করিলে এই গ্রামের অবস্থান প্রায় মধ্যস্থলে বলা যায়। গত আদমসুমারীর তালিকানুযায়ী এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৯২৪ জন এবং বেলমুড়ি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৬৭৫৭ জন।

বেলমুড়ির পূর্বনাম কৃষ্ণরামবাটী ছিল। গ্রামে একসময় বসু, চট্টোপাধ্যায় ও বসুরায়

বংশের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। কিম্বদন্তী যে, মহানাদ হইতে মুসলমানদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বসুবংশীয় রাজারাম বসু, বিশ্বেশ্বর বসু ও কামদেব বসু এই তিন ভ্রাতা বেলমুড়িতে আসিয়া বসবাস করিবার পর গ্রামের ক্রমোন্নতি সুরু হয়। মধ্যম ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর বসুর পৌত্র প্রীতরাম ওরফে চিন্তামণি বেলমুড়ির যাবতীয় দেবালয় স্থাপন করিয়া সমাজে প্রসিদ্ধ হন। বসু বংশের কুলদেবতা গোপীনাথজীউর বিগ্রহের পাদপীঠে 'চিন্তামণি' এই নামটি উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়। গোপীনাথজীউর মন্দির ১২৬২ সালে বৈকুণ্ঠদাস বসু কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়। এই সম্বন্ধে একটি পাথরে লেখা আছে :

"শ্রীশ্রীযুগলপদাভিলাস
শ্রীবৈকুণ্ঠদাষ বসৌ
শ্রীমন্দির পুনঃ নির্মানিত
সন ১২৬২ সাল, ৩০ চৈত্র"

প্রীতরাম বসু বর্ধমান রাজ-স্টেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং নিজ প্রতিভাবলে মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন বলিয়া প্রভূত অর্থও সঞ্চয় করেন। তিনি পরবর্তীকালে 'কারকুন' উপাধি পান।

গ্রামের দ্বাদশ শিবমন্দিরও বসু বংশীয়গণের প্রতিষ্ঠিত; বর্তমানে একধারে তিনটি ও অন্যাদিকে একটি মন্দির মাত্র ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর যে কারুকার্য করা ছিল, তাহা আজও দৃষ্টিপথে আসে। এই কারুকার্য খচিত ইঁট সংরক্ষণের জন্য লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। শিবমন্দিরগুলির উপর প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র
শুভমস্তু
শকাব্দ ১৬৮৮

ইহাছাড়া বসুরায় বংশের ঠাকুরবাড়ী ও দুর্গাপূজার দালান এবং বসু বংশের আরো দুইটি শিবমন্দির গ্রামের মধ্যে আছে। পূর্বোক্ত দুইটি শিবমন্দির হইতে শিবলিঙ্গ দুইটি একটি সুসংস্কৃত মন্দিরে সংস্থাপিত করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বসুরায় বংশের ঠাকুর দালানে একখানি প্রস্তরে ১২৯৫ সালে শ্রীরসিকলাল রায় কর্তৃক উহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে।

ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের যে কয়েকটি স্থানে জাতীয়তার উন্মেষ দেখা দেয়, বেলমুড়ি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে এই গ্রামের মধ্যে স্বর্গত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন যুবক মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউসন নামে জাতীয় বিদ্যালয়, বান্ধব লাইব্রেরী নামক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার দ্বারা গ্রামে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। পরে নিভৃত পল্লীর বান্ধব লাইব্রেরীর উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হয় এবং লাইব্রেরীর সমস্ত তহবিল সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ খৃস্টাব্দে হারাধন বসুর নেতৃত্বে বেলমুড়ি ছাত্র সংসদের পরিচালনায় গোবিন্দ

বসুর বাটীতে পুনরায় পাঠাগার স্থাপিত হয় এবং বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যুবকবৃন্দ শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যের চেষ্টায় উহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বর্তমানে উহা নেতাজী তরুণ পাঠাগার নামে পরিচিত। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পাঠাগারের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় ও উহার জমি দান করেন শ্রীমতী শৈলবালা রায়। ইহা সরকারী অনুমোদিত। পাঠাগারে একটি কিশোর বিভাগ ১৯৬০ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর হইতে চলিতেছে। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগারিক দেবনারায়ণ দত্ত পরিচালিত বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে। বেলমুড়ি ও হাজিগড় ষ্টেশনের মধ্যে বর্তমানে শিবাইচণ্ডী নামে একটি ষ্টেশন হইয়াছে। গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় প্রতিষ্ঠান গ্রামস্থ সকলের সমবেত চেষ্টায় ও আন্তরিকতায় সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

॥ পলাশী ॥

পলাশী হুগলী জেলার সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম: বর্তমান জনসংখ্যা ১১২৪ জন। পলাশীর প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। ইহার পাশ দিয়া ঘিয়া নদী বলয়াকারে প্রবাহিত। এক সময়ে এই নদী খুব বেগবতী ছিল। ঘিয়া নদী বর্তমান ধনিয়াখালী ইউনিয়নের সীমানা হইয়াছে। এই নদীর এক দিকে লোকাবাটী, অন্যদিকে পলাশী। সম্প্রতি এই নদীর উপর একটি পাকা সেতু নির্মিত হইয়াছে।

পলাশী গ্রামে শ্রীশ্রীপাতিদুর্গামাতা খুব জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। পাতিদুর্গা অর্থাৎ শিবদুর্গার বিরাট মূর্তি একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরের মধ্যে শিবের পদতলে একটি ষাঁড় ও দুর্গার পদতলে সিংহ বিরাজিত এবং শিবের দক্ষিণে নন্দী ও দুর্গার বামে জয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণে ইহার পূজা করেন না। ইহার পুরোহিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পণ্ডিত, ইনি জাতিতে হাড়ি। আশ্বিন মাসে ও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। ১৩৪৮ সালের ২রা আশ্বিন গুড়াপ নিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী এই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছে:

শ্রীশ্রী৺পাতিদুর্গামাতা মমাভিষ্ট পূরণে ও
স্বর্গীয়া পত্নী মহামায়া দাসীর স্মৃত্যর্থে
এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।
পরিদর্শনকারী—শ্রীসুধীরচন্দ্র পাল, পলাশী।

মন্দির শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী 'প্রতিষ্ঠা' করিয়া দেন বলিয়া লেখা ভুল হইয়াছে। কারণ পাতিদুর্গামাতা তাহার অভীষ্ট পূরণ করায় তিনি মন্দির সংস্কার বা নির্মাণ করিয়া দেন। পাতিদুর্গা সুপ্রাচীন. গ্রামের লোকেরা ইহার স্থাপনা ১১০০ সালে হয় বলিয়া থাকেন।

বেলমুড়ি ও গুড়াপ রেলস্টেশনের মধ্যে পলাশী গ্রাম। এখন হাজিগড় নামে একটি রেলস্টেশন হইয়াছে। এই স্টেশনের পূর্বদিকে হাজিগড় ও পশ্চিমদিকে পলাশী। স্টেশনের নিকট কয়েক বৎসর পূর্বে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। সম্প্রতি পলাশীর অধিবাসী শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল হাজিগড় হইতে পলাশী পর্যন্ত একটি রাস্তা করিয়া

দিয়াছেন এবং দুইধারের জঙ্গল পরিস্কার করাইয়া তথায় পলাশী সাধারণ পাঠাগার, পলাশী পল্লীমঙ্গল সমিতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দিয়া গ্রামটিকে একটি আদর্শপল্লীতে পরিণত করিয়াছেন। এই গ্রামের জনসংখ্যা ১১২৪ জন।

ইহা ছাড়া, পালমহাশয় তাঁহার মাতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী পালের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে পলাশী হেমাঙ্গিনী উচ্চ বুনিয়াদী সহ নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয় এলং ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে হেমাঙ্গিনী বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করিবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা-মাহিনায় ছাত্রছাত্রীগণ পড়াশুনা করিয়া থাকে। নারায়ণ বাবু স্বয়ং পলাশী গ্রামের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও সম্পাদক। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও দানে পলাশী গ্রামের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা অন্যান্য গ্রামেরও অনুকরণযোগ্য।

॥ বসুয়া ও রুদ্রাণী ॥

বসুধাবাসিনী দেবীর নামানুসারে বসুয়া গ্রামের নামকরণ। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে (৮ পুরুষ পূর্বে) লালা গৌরহরি সিংহ এই মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর মূর্তি মহিষমর্দিনী-দারুমূর্তি। দুর্গামূর্তি। দুর্গা, অসুর, বামে সিংহ, দক্ষিণে বাঘ। এই দেবীকে চৈত্রসংক্রান্তির সময় লীলাবতীর বিবাহের সময় স্থানীয় শিবের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ৪ দিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় নিজ মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। বসুয়া নামটি বহু প্রাচীন গ্রন্থে "বোসো" বলিয়া লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহবংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ রামলাল সিংহের বংশধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লালা গৌরহরিসিংহ উক্ত শিবমন্দির ও মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভুর এখনও নিত্য ভোগ হয়। বিরাট নাটমন্দির এখনও বর্তমান। পূর্বে ৬ বিঘার উপর বিরাট ভদ্রাসন আজ পতনোন্মুখ। এই সিংহ বংশের একটি শাখা, ভাস্তাড়ায় যাইয়া বাস করেন। বসুয়াতে শ্রীঅমরনাথ সিংহ এখন বাস করেন। সিংহবংশের আদি মাধব সিংহ মহানাদ হইতে বসুয়া গ্রামে প্রথম আসেন। হুগলী জেলায় আকনা, বাঘাটি, বাঁশবেড়িয়া মাজিনান, মথুরাবাটী, দশঘরা, গজা, খেজুরদহ কৃষ্ণপুর, বেলুন, নতিবপুর বয়ড়া, খানাকুল, ধামনা প্রভৃতি স্থানেও মহানাদের সিংহ বংশ আছে।

রুদ্রাণী বেলমুড়ি ইউনিয়নের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পূর্বে বি পি রেলওয়ের এই স্থানে একটি স্টেশন ছিল। গ্রামে মদনমোহন জীউ খুব জাগ্রত বলিয়া খ্যাত। বৃন্দাবন হইতে ঠাকুর বৈরাগ্য নামক একজন সন্ন্যাসী মদনমোহনকে আনেন। বৃন্দাবনে গিরিগোবর্ধনের গুহায় বৈরাগ্য এই মদনমোহন মূর্তি প্রাপ্ত হন। দারুময় মূর্তি। ঠাকুর বৈরাগ্যের সমাধি এখনও বর্তমান আছে। চৈতন্য পূর্ব আমলের ঘটনা। মোগলরা যখন বাংলা দেশে আসিয়া পাঠানদের আক্রমণ করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন তখন দাউদ খাঁ এই গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে এই গ্রামে ঠাকুর বৈরাগ্যের আশ্রমে আশ্রয় নেন। এখানে কিছুদিন নিরাপদে থাকিয়া যান এবং ঠাকুর বৈরাগ্যকে প্রচুর অর্থ দেন। সেই অর্থে এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগ্রহ—মদনমোহন (নীল) বলরাম (শুভ্র), রাধিকা ও রেবতী (স্বর্ণকান্তি)।

কথিত আছে এই গ্রামের পাশ দিয়া এককালে দামোদর প্রবাহিত ছিল। এই গ্রাম উঁচু দ্বীপের মত ছিল। এই মন্দিরের পাশে পুষ্করিণীর নাম যমুনা—সেখানে এককালে জোয়ার ভাঁটা খেলিত। ইলিসমাছও পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এখানে একটি বকুলগাছ আছে। উক্ত গাছটি যে কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। কথিত আছে ঠাকুর বৈরাগ্য তপপ্রভাবে উক্ত গাছ হইতে আম পাড়িয়া খাওয়াইয়া ছিলেন।

বর্তমানে শ্রীমদ নিত্যানন্দ বংশের নিম্নোক্ত চারজন গোস্বামী তিন মাস পালা করিয়া মদনমোহনের সেবা করেন। গোস্বামীদের নাম: সুবলচন্দ্র গোস্বামী, নৃত্যগোপাল গোস্বামী, গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ও শ্যামচাঁদ গোস্বামী।

মদনমোহন জীউর মন্দির একবার বহুপূর্বে লালমণি দেবী সংস্কার করেন। একখানি পাথরে ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীরমানাথ গোস্বামীর কন্যা লাবণ্যমণি দেবী, তস্যা কন্যা শ্রীমতি বিন্দুবাসিনী কর্তৃক মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে।

॥ ভাস্তাড়া ॥

ভাস্তাড়া সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইষ্টার্ন রেলওয়ের গুড়াপ স্টেশনের তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। পূর্বে যখন বি-পি-রেলওয়ের অস্তিত্ব ছিল, তখন এই রেলপথের মগরা-তারকেশ্বর শাখায় ভাস্তাড়া একটি রেলস্টেশন ছিল। গুড়াপ হইতে ভাস্তাড়া পর্যন্ত ভাল পিচের রাস্তা আছে বলিয়া এখন যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই।

প্রাচীনকালে এই অঞ্চল বর্গীদের দ্বারা বহুবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাই বর্গী দলপতি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার অনুচরগণের আস্তানা এই জায়গায় ছিল বলিয়া গ্রামের নামকরণ ভাস্তাড়া হইয়াছে। পূর্বে ভাস্তাড়া গ্রাম মুসলমান অধ্যুষিত ছিল এবং এখনও বহু হিন্দুগৃহে মুসলমানদের কবর আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষবংশীয়দের বাড়ির উঠানে পীরের আস্তানা আছে। নীলের চাষের জন্য ভাস্তাড়া খ্যাত ছিল। ইহা ছাড়া বস্ত্র, বাঁশ, বেত, ঝুড়ি, মাদুর, পাখা, চিকনের কাজ ও বড় বড় হাঁড়ি কলসী জালা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যও এই গ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

ভাস্তাড়ার দানশীল জমিদার হিসাবে সিংহবংশের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি পূর্বে হুগলী জেলায় খুব ছিল। ভাস্তাড়ার সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপ্রাণ সিংহ ধনিয়াখালীর নিকট বোসো গ্রাম হইতে ১১৪০ সালে ভাস্তাড়ায় আসিয়া প্রথমে বাস করেন। তিনি বর্ধমান মহারাজার ষ্টেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং মহারাজা তাঁহার কর্মদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার বসতবাটী নির্মাণের জন্য একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দানপত্র করিয়া দেন। কৃষ্ণপ্রাণ সেই স্থানে বসতবাটী নির্মাণ করান এবং রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং ১১৭৬ সালের মন্বন্তরে ভাস্তাড়ায় অন্নসত্র খুলিয়া এই অঞ্চলের বহু লোকের প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্গীরা কৃষ্ণপ্রাণের বাটী আক্রমণ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শুকদেব সিংহ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বসতবাটীর অভ্যন্তরে নিহত হন। যে স্থানে তিনি নিহত হন, সেই স্থানটিতে একটি তুলসীমঞ্চ করিয়া উহা চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

॥ ছকুরাম সিংহ ॥

কৃষ্ণপ্রাণের প্রপৌত্র ছকুরাম সিংহ এই বংশের অদ্বিতীয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি বর্ধমান রাজষ্টেট হইতে একনম্বর লাট ভাস্তাড়ার বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করেন। এই জমিদারীর তৎকালীন বার্ষিক আয় ছিল সাত লক্ষ টাকার উপর। তাঁহার সময়ে সিংহবাবুদের ও ভাস্তাড়ার গৌরবময় যুগ ছিল বলা যায়। তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণ যেরূপ ছিলেন, ইনি তদপেক্ষা অনন্য সাধারণ ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, শিবালয় দেবালয় স্থাপন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। ইহা ছাড়া দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুধর্মোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার নির্মিত বিরাট রথ এখনও আছে, কিন্তু কয়েকবৎসর যাবত রথটি ভগ্ন হওয়ায় আর বাহির হয় না। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীধরজীউর মন্দির প্রাঙ্গনে নবমদোল উপলক্ষ্যে সং প্রদর্শিত হয়। দারুময় মূর্তিগুলি দেখিয়া প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের শিল্পকলা কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল তাহা বোঝা যায়। শ্রীধরজীউ সম্বন্ধে ২৬৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

তিনি ত্রিবেণীর ঘাটের সংস্কার এবং শ্রীশ্রীবেণীমাধবের মন্দির সারাইয়া দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে তিনটি করিয়া আরও ছয়টি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। উহাদের বিবরণ ৭৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ছকুরাম ত্রিবেণী হইতে ভাস্তাড়া পর্যন্ত তেইশ মাইল দীর্ঘ সুপ্রশস্ত এক পথ নির্মাণ করাইয়া দেন ও তাহার দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছ বসাইয়া দেন। ইহা ছাড়া হুগলী টাউন রোড সংস্কার, সপ্তগ্রামে রাস্তা নির্মাণ, বালী ব্রীজ নির্মাণ, হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুল নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার নির্মিত রাস্তাটির বর্তমান নাম সুলতানগাছা মাধবপুর খানপুর রোড। রাস্তাটি পাকা করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বাস চলাচল করিবে; এই রাস্তাটির কিয়দংশ "ছকুরাম সিংহ রোড" বলিয়া অভিহিত করিলে দাতার স্মৃতি রক্ষা করা হয়। তাঁহার বিরাট অট্টালিকা এখন ভগ্ন ও জীর্ণ হইলেও আজও উহা পথিকের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি ১৮৩২ খৃস্টাব্দে সশস্ত্র সিপাহী রাখিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। সরকার বাহাদুর ৪১৪৬ নং সনন্দে উহা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে পারসিভাষায় যে সনদ দেন তাঁহার ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

Translation of a **Sanad** *in Persian granted to the late* **Babu Chhakuram Sinha** *in 1832 for entertaining armed retainers*

No 4146, **Seal.**

Respectful Babu Chhakuram Sinha inhabitant of Mouzah Bhastarah,

May God grant you peace,

Whereas, you applied for permission to appoint Ten armed retainers for the safety of your Zemindary Treasure etc., you are hereby authorised to appoint sepoys and directed not to give them red uniform, which is the chief badge of the sepoys in Government service, you may give them uniform of any other colour you may like.

Dated the 16th April 1832.

ছকুরামের নানাবিধ সৎকার্যের জন্য বিদেশী শাসনকর্তার নিকট তিনি যে প্রশংসা লাভ করেন তাহার বিবরণ টয়েনবি সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকার হইতে তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়, তাহাও এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য।

Translation of a **Certificate of Honor** *in Persian presented to the late* **Babu Chhakuram Sinha** *in 1839.*

To the specially beloved and undoubtedly loyal &c., &c.

Babu Chhakuram Sinha, **Seal**

May the Lord preserve you for ever. **(Sd.) Illegible.**

Whereas, from the time of past authorities to this day, during the period of your Zemindary none of the subjects, has ever said anything unfavourable of you, either in Sudder or Mofussil and as on the contrary ryots of every class, being well taken care of in every possible way, live in peace and happiness, and are engaged in singing praises of your good qualities and good character, and as it is especially known, that, you have satisfactorily performed certain praiseworthy works having helped in and contributed to the construction of the new road to Dhaniakhally and of the bridges in village Satgaon and others in District Hooghly, and of the Chandni Ghat near Hooghly Kutchary, these facts were reported to the Hon'ble Council by the Officiating Magistrate of Hooghly and therefore the Governor-General in Council have been very much pleased at your character and good actions and His Excellency the Governor-General will remember the good services rendered by you.

By order of the Council this Purwanah, in the shape of a certificate, with the seal and signature of the Court granted to your glory, so that you may take pride in it. You are advised to esteem this as a mark of distinction among your equals and relations, and should be heartily thankful for this high esteem and great gift.

Dated the 7th January 1839, 22nd Pous 1245.

॥ যজ্ঞেশ্বর সিংহ ॥

ছকুরামের মধ্যম পুত্র যজ্ঞেশ্বর সিংহও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে হুগলী স্কুলে পরে কলিকাতা হিন্দু কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। ইনি হুগলী জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের সদস্য ও হুগলীর অবৈতনিক জেলা শাসক ছিলেন এবং নানাবিধ সমাজকল্যাণকর কার্য করিয়া সমাজে এবং শাসকবর্গের নিকট প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার আন্তরিকতা ও গভীর হৃদ্যতা ছিল। বাঙ্গলাদেশে কুলীনদের বহু বিবাহ রদ করিবার জন্য ইংলণ্ডে রাজদরবারে আইন প্রণয়নের জন্য যে আবেদন করা হয়, যজ্ঞেশ্বর তাহার অন্যতম সাক্ষরকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাধিকবার ভাস্তাড়ায় আগমন করেন এবং তাঁহার প্রেরণায় যজ্ঞেশ্বর ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন ইহার সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের বিবরণ ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত তিনি শশীভূষণ মিত্রের পরামর্শে ও সহযোগিতায় তৎকালে গ্রামের মধ্যে তারবার্তাসহ ডাকঘর (পোস্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস) স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। সমাজে তাঁহার খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মহারাণী

ভিক্টোরিয়া "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ কালে [১লা জানুয়ারী ১৮৭৭] তাঁহাকে বাংলার **ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল** যে প্রশংসাপত্র দেন তাহা এইরূপ ঃ

Certificate of Honor
PRESENTED TO
BABU JAGNEWSAR SINHA
IN DURBAR
ON THE OCCASION OF
Her Most Gracious Majesty's Assumption
OF THE TITLE OF
EMPRESS OF INDIA

By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General, this certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Victoria Empress of India to Babu Jagneswar Sinha Chowdry of Bhastarah, Zemindar, in recognition of his Famine and other services, especially his liberality and energetic assistance in the distress of 1874, his support of higher class English and Vernacular Schools and his conduct as a landlord.

(Sd.) RICHARD TEMPLE

January 1st, 1877

যজ্ঞেশ্বরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র জীবিত আছেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতি। জ্যেষ্ঠ নির্মলচন্দ্র মুন্সেফ, মধ্যম প্রভাচন্দ্র ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, তৃতীয় কিরণচন্দ্র ডাক্তার, চতুর্থ প্রকাশচন্দ্র ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং কনিষ্ঠ বিমলচন্দ্র মহকুমা শাসক নিযুক্ত ছিলেন। প্রভাচন্দ্র সিংহ কলিকাতা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে আট হাজার টাকা দান করেন। গ্রামে একমাত্র শ্রীসত্যেন্দ্র সিংহ বাস করেন।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ভাস্তাড়ায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল ছিল। ব্রজনাথ স্মৃতিরত্নের টোলের নাম এখনও শুনা যায়। মোগল আমলে মুসলমানদের অত্যাচারে এই অঞ্চলের বহু দেবদেবীর মন্দির ভাঙিয়া ফেলা হয়। ভাস্তাড়ায় পুস্করিণী খনন করিবার সময় বিষ্ণুমূর্তি, সূর্যমূর্তি, বরাহমূর্তি বা তাহাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। মূর্তিগুলি আশুতোষ মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ সংরক্ষণের জন্য লইয়া গিয়াছেন। মূর্তিগুলির গঠনৈপুণ্য দেখিয়া তিনি উহা দশম শতাব্দীর পালরাজাদের আমলের নিদর্শন বলিয়াছেন।

॥ চামুণ্ডা মূর্তি ॥

চামুণ্ডা দেবীর মূর্তি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ডিঙগাভাঙগার সাঁকো হইতে পাওয়া যায়। ইহার আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। এই বিগ্রহ গ্রাম্যদেবীরূপে এখনও পূজিতা হন। এইরূপ সুন্দর চামুণ্ডা মূর্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না। কালো পাথরের মূর্তিটি লম্বায় এক ফুট এবং চওড়ায় নয় ইঞ্চি। দেবীদুর্গার দশ হাত প্রসারিত, ইহা ছাড়া অসুর, সিংহ ও সর্প আছে। দেবীর বামে ও দক্ষিণে যোগিনী আছে। পূর্বে রাজা চণ্ডেশ্বর বর্মণের নামে পূজার সংকল্প হইত। আনামশাস্ত্রে ও পুরাণে চামুণ্ডার অনেক রকম রূপের ও মূর্তির কথা বিবৃত আছে। অগ্নিপুরাণে চামুণ্ডার রূপের যে বর্ণনা আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা।
নির্মাংসা অস্থিসারা বা ঊর্ধ্বকেশী কৃশোদরী॥

দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্তী দক্ষিণেঽস্যাঃ শবারূঢ়াস্থিভূষণা॥

অর্থাৎ চামুণ্ডার তিনটি চক্ষু কোটরে মগ্ন, তাঁহার দেহে মাংস নাই, অস্থিমাত্র সার। কেশ ঊর্ধ্বগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম। বামহাতে তাঁহার কপাল পট্টিশ, এবং ডান হাতে শূল ও কর্তী। ভূষণ অস্থি এবং আসন শব।

গ্রামের প্রাচীন মন্দিরগুলি সংস্কার করিবার জন্য একটি স্থায়ী "মন্দির সংস্কার সমিতি" আছে। সমিতিতে কৃষ্ণধন মিত্র, সয়ারাম দে, নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়গুপ্ত, দুলালচন্দ্র অধিকারী ও কমলাকান্ত ঘোষ সভ্য আছেন। এইরূপ মন্দির সংস্কার সমিতি অন্যান্য গ্রামে হইলে গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি সংরক্ষিত হয়। ভাস্তাড়া গ্রামে ডাঃ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ও তারকনাথ সিংহের ন্যায় কর্মী আছেন বলিয়াই এই গ্রামের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

গ্রামে আর একটি শিবমন্দির ভগ্ন হইলে উহা ১৩০২ সালে সংস্কার করা হয়। শ্বেতপাথরে মন্দিরের গায়ে এই কথা গুলি লিখিত আছে ঃ

শ্রীশ্রী স্বয়ম্ভুদেবের মন্দির
জীর্ণ সংস্কার
শক ১৮১৭ সন ১৩০২ সাল, ভাস্তাড়া

১৩৬৭ সালে পুনরায় স্বয়ম্ভুদেবের মন্দির সংস্কার করা হয় এবং জীর্ণ সংস্কারকল্পে যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদের সকলের নাম একটি পাথরে লেখা আছে। নামগুলি নিম্নে লিখিত হইল ঃ

দ্বারিকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র। গ্রামে ইনি 'বুড়ো শিব' বলিয়া কথিত হন। পূর্বে চড়কের সময় এইস্থানে গাজন হইত।

অতীতকালে গ্রামে মুসলমানদের জনসংখ্যা অধিক ছিল তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। মুসলমানদের ব্যবহৃত বহু ধাতুনির্মিত পাত্রাদি কূপ খনন করিবার সময় পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে মাঘনপীরের কবর আছে। এই দরগায় সকলে এখনও সিন্নি মানত করিয়া থাকে। গ্রামে এখন কোন মুসলমান নাই। গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা ১২৯৪ জন।

গ্রামে ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড, মহিলা সমিতি পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, মহিলা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, স্কুল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সরকারী ধাত্রী ও গ্রামসেবকের অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের নিজস্ব ভবন আছে। গ্রামে শনিবার ও মঙ্গলবার এই দুই দিন হাট বসে ও একটি চলচিত্রালয় আছে। যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া ভাস্তাড়ায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৫২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গৃহ নির্মাণকল্পে পারিজাত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (১৪৬ ল্যান্সডাউন রোড) এক হাজার এক টাকা দান করেন বলিয়া একখানি পাথরে লেখা আছে।

প্রবাসে এই গ্রামের অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদে ওকালতী করিয়া প্রভূত অর্থ সম্মান ও যশের অধিকারী হন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলাহাবাদের বাঙ্গালী সমাজে

তাহার অসামান্য প্রভাব ছিল। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার ওকালতী জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এলাহাবাদে সাড়ম্বরে সুবর্ণ জয়ন্তী প্রতিপালিত হয়। এলাহাবাদে তাঁহার বাড়ির দ্বার সকলের জন্য খোলা থাকিত বলিয়া তাঁহাকে লোকে অন্নদাতা বলিয়া অভিহিত করিত। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে ভাস্তাড়ায় তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এলাহাবাদ শহরে তাঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

॥ ভান্ডারহাটী ॥

ভান্ডারহাটী সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। হরিপাল ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। হরিপাল হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত যে বাসসার্ভিস আছে উক্ত সার্ভিসের বাসগুলি জেজুর-ভান্ডারহাটী-বেলমুড়ির মধ্যে দিয়া গিয়াছে। ভান্ডারহাটীর বদান্য ব্যক্তি স্বর্গীয় নৃসিংহনাথ আড্ডি তাঁহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে বিধুমণি ইনষ্টিটিউশন নামে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও হরিপাল হইতে ভান্ডারহাটী পর্যন্ত বিধুমণি রোড নামক পাকা রাস্তা করিয়া দেন। গ্রামে বহু ধনী সুবর্ণবণিকের বাস আছে। ভান্ডারহাটীর জনসংখ্যা ২২১৬ জন।

প্রসিদ্ধ ষ্টিভেডোর অতুলচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা করিয়া স্বীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং পরবর্তীকালে ভান্ডারহাটী গ্রামে যাবতীয় জনহিতকর কার্যে অগ্রণী হইয়া গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি করেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে শৈলেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পঞ্চম পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিধানসভার সদস্য। গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, হরিসভা, পোষ্ট অফিস, সিনেমা প্রভৃতি আছে। ধনিয়াখালি ও হরিপাল থানার মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। পূর্বে ভান্ডারহাটী গ্রামে সাঁওতালদের একটি খুব বড় মেলা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন হইত। এই মেলায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার সাঁওতাল নরনারীর সমাগম হইত।

॥ খাজুরদহ-মেলকী ॥

খাজুরদহ ও মেলকী ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে বি পি রেলওয়েতে মেলকী একটি ষ্টেশন ছিল। পাশাপাশি এই দুইটি গ্রামের নামানুসারে খাজুরদহ-মেলকী ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই ইউনিয়নের মধ্যে কানাজুলি গ্রামের শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ সরকারী আনুকূল্যে সর্বপ্রথম পাঞ্জাব হইতে সাহিওয়াল শ্রেণীর উন্নতধরণের ষাঁড় আমদানী করিয়া দেশী গাভীর সহিত প্রজনন দ্বারা উন্নতধরণের গাভী সৃষ্টি করিয়াছেন। এই গাভী বর্তমানে পঞ্চম-পুরুষে পড়িয়াছে। এই জাতীয় গাভীর সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে কানাজুলির গাভী প্রতিবৎসর প্রথমস্থান অধিকার করে। তাঁহার আদর্শে ধনিয়াখালী থানার সর্বত্র নূতন পদ্ধতিতে গোপ্রজননের ফলে গোজাতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই থানায় এক একটি গাভী পনের সের করিয়া বর্তমানে দুধ দেয়। খাজুরদহ-মেলকী ইউনিয়নের জন সংখ্যা ৭,৪৮৭ জন। খাজুরদহে একটি জুনিয়ার হাই স্কুল আছে। ধনিয়াখালী থানা উন্নয়ন ব্লক এই গ্রামে শিশুদের জন্য একটি উদ্যান করিয়াছেন।

॥ পারাম্বুয়া-সাহাবাজার ॥

পারাম্বুয়া ও সাহাবাজার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্ভুক্ত দুইটি গ্রাম বর্তমানে নগন্য ও অখ্যাত পল্লী হইলেও, প্রাচীনকালে সাহাবাজার গোলাম আলী পীরের জন্য মুসলমানদের নিকট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি ও তাহার পর দিন এই গ্রামে গোলাম আলীর স্মৃতির উদ্দেশে দুই দিবস ব্যাপী একটি বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী উক্ত মেলায় পীরের কাছে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য পীরের পুকুরে সিন্নি অর্থাৎ বাতাসা ভাসাইয়া দেয়। পীরের মাহাত্মে যাঁহার বাতাসা আবার ফিরিয়া আসে, তাহার অভিষ্ট লাভ হয়। সাহাবাজার গ্রামটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। গ্রামের জনসংখ্যা ১৭০ জন। সাহাবাজারের মেলার বিষয় ২৮১ পৃষ্ঠায় মেলা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

পারাম্বুয়া গ্রামটি হিন্দুপ্রধান এবং সাহাবাজারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পারাম্বুয়াতে একটি জুনিয়ার হাই স্কুল আছে। পূর্বে বি পি রেলওয়ের চৌতাড়া ষ্টেশনে নামিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা হইত। বর্তমানে তারকেশ্বর হইতে বাসে করিয়া গোপীনগরে নামিয়া এই গ্রামে যাইতে হয়। পারাম্বুয়া ও সাহাবাজার এই দুইটি গ্রামের নামানুসারে বর্তমানে একটি ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। পারাম্বুয়া গ্রামের জনসংখ্যা ৭২৬ জন এবং এই ইউনিয়নের জন সংখ্যা ৭,৬১২ জন। সাহাবাজারের পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর গ্রামের জনসংখ্যা ১,৩৭২ জন।

॥ মান্দড়া ॥

মান্দড়া ধনিয়াখালী থানার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বর্তমানে এই নামে একটি ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। ইউনিয়নের জন সংখ্যা ৮০৬০ জন। এই গ্রামে সর্বজাতির বাস আছে। এইরূপ একটি গ্রামে সর্বজাতির ও বর্ণের বাস সাধারণতঃ দেখা যায় না। মান্দড়ার ঘোষবংশীয়গণ এক সময় দানধ্যানাদির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

॥ গোপীনাথপুর ॥

গোপীনাথপুর ইউনিয়ন ধনিয়াখালী থানার এবং সদর মহকুমার শেষপ্রান্তে অবস্থিত। গোপীনাথপুর ইউনিয়নের মধ্যে কুমরুল, গোপীনগর, গোপীনাথপুর ধরমপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৯০৩২ জন।

গোপীনগর গ্রামের দুইটি পটি আছে একটি ইছাপুর, আর একটি মল্লিকপাড়া। এই স্থানের দানশীল ব্যক্তি গোপীনাথ সিংহ চৌধুরীর নামানুসারে গ্রামের গোপীনগর নামকরণ হয়। তাঁহার গড়বেষ্ঠিত প্রায় একশত বিঘা জমির উপর বিরাট অট্টালিকা বর্তমানে সমস্তই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনিয়া বসবাস করান। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভট্টাচার্য বংশ ও কায়স্থদের মধ্যে বসুমল্লিক, দত্ত ও সেন বংশ গোপীনগরে প্রসিদ্ধ। পূর্বে ভট্টাচার্য বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত ইন্দুভূষণ বেদান্ততীর্থ, অন্নদাপ্রসাদ বাচস্পতির নাম উল্লেখ্য। ইহাদের টোল ছিল। এই টোলে সেকালে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

সিংহ চৌধুরী বংশের পঞ্চচুড় শিবমন্দির ইছাপুর গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

সম্প্রতি এই মন্দিরের একদিকের দেওয়াল ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই মন্দিরের পাশে আরও একটি শিবমন্দির আছে। পাশাপাশি দুইটি মন্দিরে কাল ও সাদা পাথরের দুইটি শিবলিঙ্গ ছিল। এই বংশের ফকিরচন্দ্র সিংহচৌধুরী গ্রামে বাস করেন। এখন গ্রামে সেন বংশীয় আর কেহ নাই। বসুমল্লিক বংশের পূর্বপুরুষ বর্ধমান মহারাজার নাজির ছিলেন বলিয়া ইহারা নাজির বংশ বলিয়া খ্যাত। বিশালাচরণ বসুমল্লিক তারকেশ্বর হইতে গোপীনগর ষ্টেশন পর্যন্ত পাকারাস্তা করিয়া দেন। বসুমল্লিক বংশ গোপীনগরের জমিদার ছিলেন। গ্রামে গোপীনগর যুবক সঙ্ঘ পাঠাগার, হেলথ সেণ্টার, উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল ক্লাব, পোষ্ট অফিস আছে। গোপীনগর গ্রামের জনসংখ্যা ১,২৮২ জন। শ্রীঅভয় সরকার ও শ্রীগোলক ভট্টাচার্যের ন্যায় কর্মীর জন্য গোপীনগর গ্রামের এখন ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। পাঠাগারের নিজস্ব ভবন আছে। এই গ্রামের তন্তুবায়গণ ভাল কাপড় উৎপন্ন করে।

গোপীনগরের রামনাথ শিব একটি দর্শনীয় বস্তু। শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ একখানি লিপি হইতে মন্দির ১৩৫৯ সালে সংস্কার করা হইয়াছিল জানা যায়। লিপিটি এইরূপ ঃ

ওঁ
পিতা অর্দ্ধনারীশ্বর ভট্টাচার্য
ও
স্বামী ৺দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
স্মৃতি রক্ষার্থে প্রদত্ত হইল।
সন ১৩৫৯
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

শিবের নাম রামনাথ, বিরাট গৌরীপট্ট ও বিশাল শিবলিঙ্গ। এত বড় শিব সচরাচর দেখা যায় না। রামতর্কালঙ্কার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই বংশের শিষ্য আঁটপুরের কৃষ্ণরাম মিত্র নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের গায়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ১৩৫৯ সালে মন্দির সংস্কারের সময় সেগুলি চুনবালি দেওয়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। নিতাই-গৌর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ছয়খানি ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র এখনও বিদ্যমান আছে।

বাজার বারোয়ারীতলায় বিশালাক্ষ্মী গ্রাম্য দেবীরূপে পূজিতা হন। মন্দিরটি সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

পরমারাধ্য পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও
পরমারাধ্যা মাতা ৺পারুলবালা দত্তের
স্মৃতিরক্ষার্থে
তদীয়া কন্যা শ্রীমতী পঙ্কুবালা সেন
কর্তৃক
এই বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের সংস্কার সাধন হইল।
২ আশ্বিন ১৩৫৭

গোপীনগরের দ্বাদশ মন্দির রূপনারায়ণ রায় ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বংশের সমস্ত লোক একদিন রাত্রে তাঁহাদের দ্বিতল বাড়ি মাটির মধ্যে প্রোথিত হওয়ায় সকলে একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনার সঠিক তারিখ জানা যায় না। গ্রামের বৃদ্ধব্যক্তিরা ইহা ১২৮৫ সালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। রায়বংশের পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর প্রাসাদোপম বিরাট তিন মহল বাড়ি এই অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তু ছিল। বাড়ির প্রথম মহলে দ্বাদশটি শিবমন্দির দুই দিকে দুইটি করিয়া আড়ভাবে চারটি এবং মধ্যে আটটি মন্দির ও একটি বিরাট তুলসীমঞ্চ অদ্যাপি আছে। মন্দিরের দরজার নীচের গোবরাটগুলি কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্মিত। একটি মন্দিরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

"বিষ্ণুদেব রায়স্য পুত্র রামপ্রসাদ রায়
তস্য পুত্রৌ মানিক্‌চন্দ্র রায় শ্রীরূপনারায়ণ
রায়ৌ তেন শ্রীযুক্তেন. মন্দির শিবলিঙ্গে
প্রতিষ্ঠিতে মন্দির নির্মাণ কর্তা শ্রীনিমাই
চাঁদ মিস্ত্রি সক ১৭৮২ সন ১২৬৭ বৈশাখ মাস।"

দ্বাদশ মন্দিরের পিছনে ও সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন তাহার পর পিছন দিকে একটি সানবাঁধান পুষ্করিণী। দ্বিতীয় মহলে দুর্গাপূজার দালান ও তাঁহার দুই দিকে পূজার ব্যবহারের জন্য দ্বিতল দুইটি বাড়ি। এই ঠাকুর দালান ও একদিকের বাড়ির কিয়দংশ এখনও আছে। তৃতীয় মহলে রায়বংশের সুরম্য দ্বিতল আবাসভবন ছিল। এই ভবনটির একতলা সম্পূর্ণ মাটির নীচে ঢুকিয়া যায় এবং উপরতলা ভাঙ্গিয়া পড়ায় বাড়ির অধিবাসিগণ সকলে চাপা পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বাড়ির সীমানার মধ্যে এখনও ছয়টি পুকুর আছে। কালক্রমে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যায় এবং এই অঞ্চল রায়েরবেড়ের জঙ্গল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। রায়েদের ভিটা ইতিপূর্বে কয়েকজন কিনিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন নাই. কারণ ইহা কিনিবার পরই ক্রেতাদের অমঙ্গল হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সম্পত্তি শ্রীগোলকবিহারী ভট্টাচার্য ক্রয় করিয়া ইহার জঙ্গলাদি পরিস্কার করিয়াছেন। এই মন্দিরগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে ইহা এই গ্রামের শোভা বর্ধন করিবে। রায়বংশীয়গণ ষ্টিভেডোরের কার্যে বিত্তশালী হন।

বিখ্যাত ব্যক্তি

(১) সাহাবাজার শ্রীরামপুর নিবাসী 'বামাচরণ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মণিপুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ টিকেন্দ্রজিতের সম-সাময়িক।

(২) মামুদপুর নিবাসী ডাঃ ভবতোষ দাস এম-বি মহাশয়ের পিতা যদুনাথ দাস সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

(৩) গুড়াপ নাড়ুদহ পলাশী গ্রামের অক্ষয়কুমার সরকার এম-এ হুগলী ও চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার ছিলেন।

(৪) মামুদপুর গ্রাম নিবাসী রায় সাহেব ভূষণচন্দ্র দাস বিহার ও উড়িষ্যার ডিভিশন্যাল ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন।

॥ কুমরুল ॥

কুমরুল ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এই গ্রামের নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এলোকেশীর সতীত্বনাশের অপরাধে তারকেশ্বরের তৎকালীন মোহান্ত ধৃত হইয়া কারাবাস করেন এবং এলোকেশীর স্বামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে হত্যা করিলেও দেশময় তাঁহাকে খালাস করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন হয় বলিয়া এই গ্রাম বাঙ্গলাদেশে স্মরণীয় হইয়া আছে।

নবীনচন্দ্র কলিকাতা মিলিটারী অরফ্যান প্রেসে চাকুরী করিতেন। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ১২ আগষ্ট তিনি হুগলীর জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মোহান্ত মাধবচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে তাঁহার স্ত্রী এলোকেশীর সতীত্বনাশের জন্য নালিশ করেন। এই বিষয় লইয়া বহু পুস্তক, গান ও নাটক সেই সময় প্রচলিত হইয়াছিল। "ইস-মোহান্তের-এ-কী-কাজ" এবং "আমি তো উন্মাদিনী" নামে দুইটি নাটক তৎকালে রঙ্গজগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ তারকেশ্বরের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর লিখিত হইল না। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৯৫৪ জন। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পোষ্ট অফিস আছে। কুমরুল গোপীনাথপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর "ভারত-সংস্কারক" পত্রিকা এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত চমৎকার সংবাদ পরিবেশন করেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার হুগলীর জজ আদালতে মোহান্তের মোকর্দমা উপলক্ষ্যে লোকে লোকারণ্য হয়। ইতর, ভদ্রলোক, বৃদ্ধ, বালক, রিপোর্টার, এডিটর প্রভৃতি অনেকানেক দর্শক উপস্থিত হন। জজসাহেব নিজে বিচার না করিয়া মোকর্দমাটি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মোহান্তের দণ্ড হইবে বলিয়া সকলে আশান্বিত হইয়া গিয়াছিল, নিরাশ হইয়া দুঃখিত হইল। কিন্তু বালকেরা ছাড়িবার পাত্র নয়, তাহারা এজলাসের ভিতর পর্যন্ত মোহান্তের উপরে লোষ্ট্র প্রক্ষেপ করিয়াছিল এবং চারিদিকে হাততালি ও গালি দিয়া তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই।'

শেষ পর্যন্ত দায়রা সোপরন্দ হইলেন তারকেশ্বরের দুরাচারী মোহন্ত মাধব গিরি। আদালতের বিচারে তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরির তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আর দু-হাজার টাকা অর্থদণ্ডের হুকুম হইল। হাইকোর্টে আপীল করিলেন মোহন্ত। সে-আপীল ডিসমিস হইয়া যায়।

আর নবীনচন্দ্র? ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর জুরীরা একবাক্যে বলিলেন, নবীনচন্দ্র নির্দোষ। জুরীদের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। তারপর জজ সাহেব বলিলেন—জুরীরা নির্দোষ বলিয়াছেন, কিন্তু আমার মতে নবীনচন্দ্র দোষী। অতএব হাইকোর্টে মীমাংসার ভার অর্পণ করা হইল।

হাইকোর্টের বিচারে নবীনচন্দ্রের শাস্তি হইল—দ্বীপান্তর। হতভাগ্য নবীনচন্দ্রের জন্য অজস্র মানুষ সেদিন দুঃখিত হইয়াছিলেন। কয়েক হাজার ভদ্রলোক লেফটেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের কাছে আবেদন করলেন—"নবীনচন্দ্রকে ক্ষমা করুন।"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৯ ডিসেম্বরের 'ভারত-সংস্কারক' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

"ধর্মাধিপতি ঈশ্বর ধর্মদণ্ড হস্তে লইয়া জগৎকে শাসন করিতেছেন, পুণ্যবানকে পুরস্কার ও পাপীকে দণ্ডবিধান করা তাঁহার নিত্য কার্য। কিন্তু মনুষ্য তাঁহার হস্ত দেখিতে পায় না, তাই সংসারে পাপপুণ্যের বিচার নাই অনুমান করে। এই কারণে অনেকে গোপনে পাপানুষ্ঠান করে, অনেকে আপনার ক্ষমতাধিক্যের গর্বে প্রকাশ্যেও মহাপাপ করিতে সংকুচিত নয়। সংসারের অবস্থাগতিকে প্রকাশ্যে সকল পাপের সাক্ষাৎ দণ্ড বিধান হয় না, কত পাপের ফল 'ইহলোকে আদৌ ফলিল না, পরলোকে কি হয় কে জানে?' ইহা ভাবিয়া পাপকারীদিগের দুঃসাহস আরো বাড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহলোকেই যে পাপের শাস্তি হয়, মানবীয় কোন কল ও কৌশলে তাহার অন্যথা করা যায় না, আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে তাহার কত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। তারকেশ্বরের মোহন্তের ঘটনা ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এই হতভাগ্য সম্বন্ধীয় শোচনীয় ঘটনাটি বিশেষ অধ্যয়নের যোগ্য। ইহা হইতে প্রতি পদে মহামূল্য নীতিশিক্ষা লাভ হয়। মাধব গিরি যখন কুকামনার বশবর্তী হইয়া পরস্ত্রী এলোকেশীকে হস্তগত করিল, তখন সকল অবস্থা কেমন তাহার অনুকূল! যাহার স্ত্রী সে বিদেশবাসী, যাহাদিগের কন্যা ও আশ্রিতা তাহারা ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া মোহন্তের সম্পূর্ণ সহায়তা করিল, অবলা অজ্ঞানা স্ত্রীলোক নিজেও প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া আপত্তি করিল না! পাপের বীজ অনায়াসে রোপিত হইল, তাহা হইতে যে কোন বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাদিগের কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। যদি কখন সে ভাবনার উদয় হইয়া থাকে, ইহলোকে মোহন্তের অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া সকলে নিশ্চিত এবং পরলোক নাই এই বিশ্বাসে তাহারা বিশ্বস্ত রহিল। পাপবৃক্ষ দিন দিন বর্ধিত হইয়া ৫।৬ মাসে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল, প্রথমে লোকের চক্ষের অদৃশ্য ছিল, এখন তাহাকে লুক্কায়িত রাখা অসাধ্য হইল। ক্রমে তাহা এতদূর মস্তক তুলিয়া উঠিল যে দূরদেশস্থ স্বামীর চক্ষুরও গোচর হইল। তখন অচিরাৎ বৃক্ষটির পুষ্প ও ফলোদ্গম হইতে লাগিল।

হতভাগ্য নবীন সমূলে মোহন্তের পাপবৃক্ষচ্ছেদন করিবার জন্য তীক্ষ্ম কুঠার হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রথম কোপে পাপের সহিত এলোকেশীর কণ্ঠচ্ছেদন করিল। যে বৃক্ষ বাড়িতেছিল, তাহা ছেদিত হইল বটে, কিন্তু তাহা যে ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা রোপণ কর্তাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। মোহন্ত প্রথমে অমঙ্গল বার্তা শুনিয়া যে লোকালয় হইতে পলায়নপূর্বক মুখ ঢাকিয়া ছিল, সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছিল, গোপনেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত। কিন্তু সে ধর্মের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া দুঃসাহসে ধর্মকে লইয়া উপহাস করিবার জন্য ধর্মাধিকরণে আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে উপস্থিত হইল। লোকের ধর্মার্থ উৎসৃষ্ট অজস্র অর্থ হস্তে পাইয়া ধনবলে যতদূর করিতে পারা যায় তাহার কিছুরই ত্রুটি করিল না। অসাধারণ মন্ত্রবিদ্, তর্কপটু বাগ্মীবর ব্যারিষ্টার সকল নিযুক্ত করিল. সাক্ষীগণের কাহাকে অর্থে, কাহাকে কুহকে বশীভূত করিয়া মিথ্যা বলাইল, কাহাকে স্থানান্তরীকৃত, কাহাকে নিরুদ্দেশ করিল, কাহাকে বা দৈবশক্তিতে ইহলোক হইতে লোকান্তরে প্রেরণ করিল।...কিন্তু এত আয়াসের শেষ ফল কি হইল?... আহা! যাহার কোন ভাবনা ছিল না, কোন কায়ক্লেশ করিতে হইত না, সহস্র সহস্র লোক

যাহার দর্শন আপনাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিত, আজি সেই ব্যক্তি ধর্মের ন্যায়দণ্ড তাড়নে রোরুদ্যমান হইয়া দীনবেশে উচ্চৈঃস্বরে কি সকলকে বলিতেছে না "পাপ করিলে কিছুতেই এড়াইবার যো নাই, তাহার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। ভাই সকল! আর কেহ কুচক্ষে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। মোহন্তগণ! আমার দৃষ্টান্তে সাবধান হও।"

তাঁহার হৃদয়ছবি এলোকেশীর প্রেতাত্মা সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতসীমন্তিনীগণকে অনুনয় সহকারে বলিতেছে "ভগিনীগণ! দেখ সুখাশায় লুব্ধ হইয়া পাপানলে ঝম্প দিয়া আমার কি দশা হইয়াছে, প্রাণান্তেও কেহ সতীত্বরত্ন বিসর্জন দিও না?"

নবীন স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া দূষিত হইয়াছে, আমরাও তাহাকে শতবার দুষি এবং রাজদ্বারে সে যে দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও অনুপযুক্ত বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি রাগোন্মত্ত হইয়া সুকুমারী অশ্রুমুখী অনুতপ্ত ভার্যাকে পুঁচিয়া পুঁচিয়া কাটিতে পারে, তাহার হৃদয়ে কঠোরতা ও পাপের গুরুত্ব অনুভব করিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু তবে তাহার প্রতি লোকের এত দয়া কেন? সে যেরূপ অত্যাচারিত ও যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া আপনার স্বার্থ ও ইহার বিরুদ্ধে এই কার্য করে, তাহা অনুভব করিয়া আমরা একভাবে নবীনকে ধর্মের হস্তের যন্ত্র বলিয়া দেখিতেছি। নবীন প্রাণের আশা ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর কার্য না করিলে কি মোহন্তের শাসন হইত? এলোকেশী বাঁচিয়া থাকিলে এরূপ ঘটনা অল্পে অল্পে চাপিয়া যাইত।...সাধারণের সহানুভূতি না হইলে হয় ত তাহাকে মনের দুঃখ মনেতেই গোপন করিয়া রাখিতে হইত, অথবা তেজঃ প্রকাশ করিতে গিয়া শেষে আপনাকেই ফাঁদে পাড়িতে হইত। একজনের অনিষ্ট হইতে যে সাধারণের ইষ্ট লাভ হয়, এলোকেশীর মৃত্যু তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল এবং নবীন যেন দেবদূত হইয়া এই কার্য সাধন করিতে আসিয়াছিল।..."

॥ ধনিয়াখালীতে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ॥

হুগলী জেলার তন্তুবায়গণ যাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সুতার অভাবে কোনরূপ অসুবিধায় না পড়েন, তজ্জন্য ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জন্য পঃ বঃ স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ হুগলী ও নদীয়া জেলায় দুইটি বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন করিয়াছে। হুগলী জেলার ধনিয়াখালী ও নদীয়া জেলার রাণাঘাটে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁত শিল্পের উপযোগী সুতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তন্তুবায়গণের মধ্যেও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। বিক্রয়কেন্দ্রটি সরকারী পরিচালনাধীন এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংগ্রহ, বণ্টন ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে তাঁত শিল্পীদের বহুদিনের সংকটময় সমস্যার সমাধান হইবে।

ইহা ছাড়া হুগলী জেলার তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিবার জন্য কলিকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে এবং হাওড়া হাটে হুগলী শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সঙ্ঘ নামক বিক্রয়কেন্দ্র আছে। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, আরামবাগ, চন্দননগর, পাণ্ডুয়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, সেওড়াফুলি, রাজবলহাট প্রভৃতি স্থানেও বিক্রয়কেন্দ্র আছে।

॥ দশঘরা ॥

দশঘরা ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মাত্র আট মাইল দূরে প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তারকেশ্বর। বর্তমানে দশঘরা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইলেও প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বে দশঘরা বারোদুয়ারী রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দশখানি গ্রাম লইয়া রাজধানী গঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই অঞ্চল দশঘরা বলিয়া প্রখ্যাত হয়। যে দশখানি গ্রাম লইয়া দশঘরা হইয়াছিল সেই দশখানি গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম ঃ শ্রীকৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, দিঘরা, আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপীনগর, গঙ্গেশনগর, পাড়াম্বো ও নলথোবা।

দশঘরার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বিমলা ও পূর্বপ্রান্ত দিয়া কানানদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বে এই নদী দুইটি বিশালকায়া ছিল এবং দেশবিদেশের পণ্যরাজী এই নদীপথে তখন গমনাগমন করিত। আধুনিক কানানদী দামোদর নদের প্রাচীন খাত। দামোদর নদের গতি এই স্থান হইতে পরিবর্তিত হওয়ায় এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। মেজর হার্স্টের নক্সা ৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত নক্সা হইতে দামোদরের প্রাচীন খাত কিরূপ ছিল তাহা বোঝা যায়। ইহা ছাড়া ধনপতি সওদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে উজানিতে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সব বণিকদের সমাগম হইয়াছিল তাহার তালিকায় দশঘরার বাসুনা ও জাড়গ্রামের রঘুকুণ্ডুর নাম লিখিত আছে। দশঘরা ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৮,৬২৪ জন।

বারোদুয়ারী রাজবংশের কোন প্রাচীন নিদর্শন এখন আর গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বারোদুয়ারীর ভিটা বলিয়া কথিত এক বিস্তৃত অংশ বর্তমানে জঙ্গলাবৃত হইলেও এই স্থানেই রাজবংশের বিরাট অট্টালিকা ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের অংশবিশেষ আবাদী জমিতে পরিণত করিবার সময় বহু প্রাচীন দ্রব্য এই স্থান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। পালবংশীয় এক কায়স্থ নরপতি দশঘরার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া রজনীকান্ত রায় লিখিয়াছেন। কিন্তু এই রাজবংশের কথা কোন ইতিহাসে নাই। মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা রাজবংশের পূর্বপুরুষ নারায়ণচন্দ্র পাল মুসলমানদের অত্যাচারে দশঘরা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে জমিদারী সনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত পালবংশের 'সেঙ্গাই-বেঙ্গাই'-এর জমিদার বলিয়া পূর্বে খ্যাতি ছিল।

দশঘরার বিশ্বাসবংশ পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন এবং গ্রামের যাবতীয় উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। মানগোবিন্দ বিশ্বাস দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন বিদ্যালয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম। মানগোবিন্দ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়বাহাদুর প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ছিলেন পরে কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজরূপে কার্য করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদকৃষ্ণ বিশ্বাস হুগলী কোর্টে ওকালতি করিতেন এবং বহু বৎসর হুগলী জেলা পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান রূপে কার্য করেন। তিনি চেষ্টা করিয়া পর্ষদের

সহায়তায় রাস্তা নির্মাণ, পুস্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে অগ্রণী ছিলেন। দশঘরা বি কে রায় দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার প্রেরণায় বিপিনকৃষ্ণ রায়ের দ্বারা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন মানগোবিন্দ বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নিমাইচন্দ্র বিশ্বাসের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের দ্বারা ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

This building has been constructed and donated in memory of Late Revered Nimai Chandra Biswas by his sons & grandsons Late K. C. Biswas, Sri J. C. Biswas Sri P. C. Biswas & Sri R. K. Biswas.
Tablet affixed by the Managing Committee of the School.
October 1955.

বিদ্যালয়ের নূতন বিজ্ঞান ব্লক "নগেন্দ্রবালা বিশ্বাস স্মৃতি" ভবন বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে এইরূপ বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষাপ্রসঙ্গে ৩৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন, তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ ঃ

আজিও আমরা ভুলিনি তোমায়
ভুলিনি তোমার দান,
তোমার কীর্তি আজিও জানায়
তোমার বাসনা—ধ্যান।
মোদের শক্তি যদিও গিয়েছে,
প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা তো আছে,
স্মরিতে তোমার নাম,
হে নরদেবতা—বরণীয় তুমি
তোমারে করি প্রণাম।

দশঘরা বিশ্বাসবংশের পুস্করিণীর তীরে মনোরম পরিবেশে বিরাট অট্টালিকা এবং দুর্গাপূজার ঠাকুরদালান ও কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর কারুকার্যখচিত মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। একটি পাথরে মন্দির "শ্রীসদানন্দ বিশ্বাস" কর্তৃক "১৬৫১ শকাব্দে" প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। পোড়ামাটির শিল্পসম্ভার সমৃদ্ধ সুদৃশ্য এই মন্দির শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র বিশ্বাস সংস্কার করিয়া ইহার প্রাচীন রূপবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। দশঘরা বিশ্বাসবংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ধনকৃষ্ণ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ্য। তিনি ওকালতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বসবাস করেন এবং তত্রস্থ থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। দশঘরার নিকট কানাদামোদরে তিনি 'এ্যানিকাট' তৈয়ারী করিয়া দেওয়ায় এই অঞ্চলে চাষের খুব সুবিধা হয়। ইহা ছাড়া প্রখ্যাত সলিসিটর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস ও পৃথ্বীশচন্দ্র বিশ্বাসের নামও উল্লেখযোগ্য। পৃথ্বীশচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গ্রামের সহিত সংযোগ রাখিয়াছেন বলিয়া দশঘরার

সর্ববিষয়ে উন্নতি হইতেছে। তিনি গ্রামের বিবিধ উন্নতির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট এবং আধুনিক দশঘরার প্রাণস্বরূপ বলা যায়। আজও দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপাদি এই বংশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বাসদের রথ এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

॥ বিপিনকৃষ্ণ রায় ॥

দশঘরার রায়বংশে স্বনামধন্য দানবীর বিপিনকৃষ্ণ রায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। দরিদ্র গৃহস্থবংশের অর্ধশিক্ষিত যুবক ষ্টিভেডোরের ব্যবসা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া তৎকালে এই অঞ্চলে দানধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল বি কে রায় এণ্ড সন্স এবং কলিকাতার ৪নং কমার্শিয়াল বিল্ডিং-এ তাঁহার অফিস ছিল। দশঘরা গ্রামে রাজভবনের ফটকের ন্যায় বিরাট ক্লক টাওয়ার সমন্বিত ফটক ও বিরাট বাড়ি, ঠাকুরবাড়ী, দুর্গাপূজার ঠাকুর দালান, থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ এবং চব্বিশফুট চওড়া গাড়িবারান্দা এই গ্রামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি প্রত্যেক বৎসর দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, ঝুলনযাত্রা ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক থিয়েটার, নৃত্যগীত, যাত্রা ও [illegible] ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামের লোকের চিত্তবিনোদনের ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থাপনায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। এই অঞ্চলে দরিদ্রের অভাব ও দায়মোচনে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। তিনি নিজনামে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বি কে রায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং ইহা পরিচালনার জন্য জেলা পর্ষদের হাতে নির্দেশমত অর্থ দান করেন। সার্জন জেনারেল হ্যারিস সাহেব ইহা উদ্বোধন করেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানীয় ও চতুপার্শ্বস্থ দুঃস্থ ও দরিদ্র অধিবাসীদের রোগ নিরাময়ে প্রভূত সহায়তা করে। কঠিন অসুখ হইলে জেলা পর্ষদের প্রদত্ত ঔষধাদি ছাড়াও তিনি বহু দুর্মূল্য ঔষধ নিরাময়ের জন্য সরবরাহ করিতেন। এই চিকিৎসালয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

This building which was erected by the generosity of Babu
Bepin Kristo Roy was opened on the 30th January 1915
By Surgeon General G. F. A. Harris C.S.I., I.M.S.
and handed over to the District Board of Hooghly
for use as as Charitable Dispensary.

রায়বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউর মন্দিরও বিপিনকৃষ্ণ রায় নির্মাণ করিয়া দেন মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রা বা কীর্তনাদির জন্য আলাদা প্রশস্থ নাটমন্দির আছে। বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর। বিগ্রহের পদতলে "নন্দলাল রায়" এই নামটি ক্ষোদিত আছে। কৃষ্ণরায়ের তিনি একটি ঝিল খনন করেন। ইহাও একটি দর্শনীয় জিনিস। ঝিলের চারদিক রেলিং দিয়া ঘেরা ও একদিকে দ্বিতল সুরম্য ভবন। ইহা সাধারণতঃ মাননীয় অতিথি অভ্যাগতদের আবাস স্থান রূপে ব্যবহৃত হইত। এই ভবনের নাম "ব্রাডলিবার্ট বাংলো"। এই ভবনের সামনে ঝিলের চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর মূর্তি ও ফুলের বাগান। গ্রামে এইরূপ সুরম্য

উদ্যান আর কোথাও দেখা যায় না। ঝিলের সামনে একখানি পাথরে "শ্রীশ্রী'কৃষ্ণ রায় ঝিল" প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বিপিনকৃষ্ণ রায় দশঘরা, ২৯ বৈশাখ সন ১৩২০ লেখা আছে। বিপিন রায়ের জীবদ্দশায় হুগলীর জেলাশাসক এই বাংলোতে বিশ্রামার্থে প্রায়ই আসিয়া বাস করিতেন। এই বাংলোর সামনে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছে ঃ

BRADLY-BIRT-BUNGALOW
This Bungalow was first occupied by Mr. F. B. Bradly Birt I. C. S.
Magistrate Collector Hooghly on 25th August 1915.

রায়বংশের পূর্বগৌরব আজ ম্লান হইলেও বিপিন রায়ের পৌত্রগণ বংশের প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য সদা চেষ্টিত। বারদুয়ারী রাজবংশের পুত্রের দিক হইতে রায়বংশের উদ্ভব হইয়াছে এবং কন্যার দিক হইতে তালুকদার বসু বংশ ও চৌধুরী বংশ উদ্ভূত। দশঘরার বুড়ো শিব ও বিশালাক্ষ্মীদেবী গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন। পূর্বে রথতলার পশ্চিমে শিবপুকুরের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে শিবঠাকুর ও বিশালাক্ষ্মীর মন্দির ছিল। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন হইলে বিগ্রহ অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর বুড়োশিবের গাজন হয়। তদুপলক্ষ্যে অদ্যাপি দশঘরায় বহু লোকের সমাগম হয়।

দশঘরা এসোসিয়েশন এই গ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত পাঠাগার, সমাজসেবা বিভাগ, নাট্য বিভাগ, খেলাধুলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কয়েক বৎসর যাবত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার, দুগ্ধ বিতরণ, অনাথকে অন্নদান প্রভৃতি কার্যের দ্বারা দশঘরা এসোসিয়েশন এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি দশঘরা ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

দশঘরায় একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ইহার গায়ে ইঁটের উপর বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। একটি ইঁটের নমুনা আমি সংগ্রহ করিয়াছি। মন্দিরে একখানি পাথরে "শ্রীরামশুভমস্তু—শকাব্দ ১৬৬৮" উৎকীর্ণ আছে।

দশঘরা গ্রামে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্মা সরকারের এ্যাসিটেণ্ট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর আশুতোষ বসু, মণিপুর স্টেটের দেওয়ান রায় বাহাদুর বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরের সিভিল সার্জন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাঙলা সরকারের এ্যাসিটেণ্ট হেলথ ডিরেক্টার ডাঃ নগেন্দ্রনাথ রায়, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আদ্যনাথ বসু, পুলিশের সহকারী আই-জি বিনয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, নোয়াখালী সফরে মহাত্মা গান্ধীর পার্শ্বচর অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, প্রসিদ্ধ চিত্রপ্রযোজক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি উল্লেখের দাবী রাখেন কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় না পাওয়ায় এই স্থানে বিবৃত হইল না।

দশঘরার নিকটবর্তী জাড়গ্রামের 'কালু রায়' সম্বন্ধে কবি রামদাস আদক লিখিয়াছেন ঃ

জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালু রায়।
যাঁহার কৃপায় কবি রামদাস গায়॥

কালু রায় কর্তৃক প্রাপ্ত শিলাখণ্ড এখনও এই গ্রামে আছে। কালু রায়ের সেবায়েত হইতেছেন সাহা। পরে তাঁহারা পণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করেন। কালু রায়ের বাড়ির ভগ্নাবশেষ ও পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর গাজনের সময় 'বুড়ো রায়'কে বাদ্য ও শোভাযাত্রা সহকারে দিঘীড় গ্রামে আনা হয় এবং পূজার পর জাড়গ্রামে ফিরাইয়া আনা হয়। প্রতি বৎসর এই গ্রামে বৈশাখ মাসে তের দিন ধরিয়া কালু রায়ের গাজন হয়। ধর্মরাজ কালু রায় এই অঞ্চলে খুব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলে বর্ধমানের মহারাজা জাড়গ্রামে কালু রায়ের মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

জাড়গ্রামের কালুরায় দিঘীড়েতে বাড়ী।
জামা জোড়া হাসা ঘোরা উত্তম পাগড়ী॥

জাড়গ্রামের মাখনলাল পাঠাগার সরকারী ভ্রাম্যমান পাঠাগারের একটি কেন্দ্র হইয়াছে। এই পাঠাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি এবং স্থানীয় গ্রামাঞ্চল হইতে প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তি ও পোড়া-মাটির কারুকার্য খচিত ইষ্টকাদি সংরক্ষিত আছে।

দশঘরার হৈদরগঞ্জ পল্লীতে তুলসীদাস বসু প্রতিষ্ঠিত **তত্ত্ববিদ্যালয়** একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সত্য সেবা ও অহিংসা এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র। ইহা পৌত্তলিকতা বর্জিত একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই বিদ্যালয়ে যোগ-দানের অধিকারী। বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীতুলসীদাস বসু এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা। প্রতি বৎসর অসাম্প্রদায়িকভাবে বড়দিনের সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের বিষয় আলোচনা হয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন আছে। সদাশ্রয়ী অদ্বৈতবাদী প্রতিষ্ঠাতাকে তত্ত্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠান হুগলী জেলায় আর নাই।

দশঘরা ইউনিয়নের মধ্যে **গঙ্গেশনগর** পূর্বে হস্তনির্মিত কাগজ প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই স্থানে পূর্বে নীল চাষ হইত। নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে। কাগজীপাড়ায় এখনও কিছু কিছু কাগজ প্রস্তুত হয়। নীলকুটির কাছে বর্তমানে ধানকল স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৮০৭ জন। মাধবপুরেও পূর্বে নীলকুটি ছিল। পানের চাষের জন্য এই স্থান খ্যাত। বহু বারুজীবী এই গ্রামে বাস করে। এই গ্রামের 'বেলাপোঁতা' নামে একটি বৃহৎ মাঠে বর্গীরা শিবির স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলে লুণ্ঠন-কার্য করে। নলদহ **হজরৎতলায়** বেকার যুবকদের অন্নসংস্থানের জন্য সরকার হস্তনির্মিত কাগজ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

॥ আচার্য মন্মথমোহন বসু ॥

আচার্য মন্মথমোহন বসু ১২৭৭ সাল, ১০ই শ্রাবণ, (১৮৭০, ২৬শে জুলাই) হুগলী জেলাস্থ দশঘরা গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য বসু মহাশয়ের প্রতিভা বহুমুখী এবং কর্মশক্তি অসাধারণ। ইঁহার কর্মক্ষেত্রও তদনুসারে অতি বিস্তৃত এবং নানাদিকে প্রসারিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যাঁহারা ছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (বর্তমানে

যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ)-এর প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে ইনি একজন ছিলেন এবং উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিষদের সদস্যরূপে ও পরীক্ষকরূপেও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীনতম সভ্যদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন এবং পরে সভাপতি হন। হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যেও ইনি একজন ছিলেন। বঙ্গ-দেশের সেন্ট জন্স এ্যামবুলেন্স ব্রিগেড-এর সাধারণ বাহিনীর ইনি প্রথম সংগঠক এবং তাহার প্রথম কর্মসচিব ছিলেন। বসু মহাশয় আজীবন শিক্ষাব্রতী। বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া ইনি শিক্ষাকার্যে ব্রতী ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহাঁকে শিশু-শ্রেণী হইতে কলেজের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত বহু বিষয়ে শিক্ষকতা করিতে হইয়াছে এবং প্রতিটি বিষয়ে ইনি অসাধারণ শিক্ষা-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি এক সময় কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল) এবং উক্ত কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। কলেজে ইনি বিভিন্ন সময়ে ইংরাজি, বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত বিশেষ সাফল্যের সহিত অধ্যাপনা করিয়াছেন। ইনি শিক্ষিত সমাজে সর্বজনপ্রিয় "মাষ্টার মশাই" নামে খ্যাত ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম পরীক্ষকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম এবং ইহার ফ্যাকালটী অফ আর্টস ও নানা বোর্ডের সদস্যরূপে বহু কার্য করিয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহার রচিত বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ "আমি ও আমার দেহ" দার্শনিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। পরলোকগত মনীষী দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ইঁহার রচিত বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ 'আমি ও আমার দেহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার; এ হিসাবে তিনি সব্যসাচী।"

ইঁহার রচিত 'আঁধারে আলো' নামক নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছিল। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ইনি বিভিন্ন নাট্য-প্রতিষ্ঠানে নাট্যাচার্য ও নাট্যসংস্কারকরূপে কার্য করিয়াছেন। নাট্যজগতে যে সকল শিল্পী নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইঁহার শিষ্য। ইঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গিরিশ ঘোষ লেকচারারসিপ্" প্রতিষ্ঠিত হয়। "গিরিশ লেকচারার" রূপে ইনি বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রথম ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবি সঙ্ঘের ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি। থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র "পন্থা" ও পরে "ব্রহ্মবিদ্যা" এবং "কায়স্থ পত্রিকা"র অন্যতম প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া বঙ্গের একমাত্র সঙ্গীত-বিষয়ক মাসিকপত্র "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা"র পরিচালক এবং ইনি অধুনা বিলুপ্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর দৈনিক 'সার্ভ্যান্ট' পত্রের নাট্যবিষয়ের সম্পাদক ছিলেন।

ইনি একজন সিদ্ধবক্তা এবং সাধারণ মঞ্চের জনপ্রিয় বক্তাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি একজন সরাসরি বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। প্রায় ২৫ বৎসরকাল ধরিয়া ইনি এইকার্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ কানানদী ॥

ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত কানানদী গ্রাম আদিবাসীদের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে প্রতিবৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে "টুসু" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে আদিবাসীদের নাচ ও গান তীরধনুক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী-গণকে রোপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এই মেলা দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে প্রায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হয়। সন্ধ্যায় 'টুসু' ঠাকুরকে কানানদীর জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এই গ্রামের বসুমল্লিক বংশ প্রসিদ্ধ। পঞ্চায়েত সম্পাদক শ্রীঅজিত বসু-মল্লিক গ্রামের উন্নতিবিধায়ক সকল বিষয়ে অগ্রণী হন বলিয়া গ্রামের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

ধনিয়াখালী থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোটসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
গুড়বাড়ী	৭,৭৬৬	৩,৯৪৮	৩,৮১৮
গুড়ুপ	৮,৭৮৫	৪,৪৮৭	৪,২৯৮
ভাস্তাড়া	৭,০৪৮	৩,৫১৮	৩,৫৩০
খাজুরদহ-মেলকি	৭,৪৮৭	৩,৭৭৬	৩,৭১১
ধনিয়াখালী	৮,৯৮৫	৪,৫৩৮	৪,৪৪৭
সোমসপুর	৮,৬৪৪	৪,৩২৫	৪,৩১৯
পারাম্বুয়া-সাহাবাজার	৭,৬১২	৩,৯১৫	৩,৬৯৭
দশঘরা	৮,৬২৮	৪,৩৭৫	৪,২৫৩
গোপীনাথপুর	৯,০৩২	৪,৫৮৭	৪,৪৪৫
ভাণ্ডারহাটী	৮,৬২৮	৪,৩৭৫	৪,২৫৩
বেলমুড়ি	৬,৭৫৭	৩,৪৮০	৩,২৭৭
মান্দাড়া	৮,০৬০	৪,১১৭	৩,৯৪৩

॥ পোলবা ॥

হুগলী সদর মহকুমায় পোলবা থানার অধীনে অনেকগুলি প্রাচীন স্থান আছে। পোলবা থানা বারটি ইউনিয়নে বিভক্ত; উহাদের নাম সাটিথান, দাদপুর, মাকালপুর, বাবনান, হারিট, গোস্বামী-মালিপাড়া, মহানাদ, পোলবা, আমনান, সুগন্ধ্যা, রাজহাট এবং আকনা। পোলবা থানার জনসংখ্যা তিরাশী হাজারের উপর।

পোলবা নামকরণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে, পোলবায় পাল বংশের আদিপুরুষ নারায়ণ পাল ও তাহার ভাই জনার্দন পাল ৮৭০ সালে এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তখন এই অঞ্চল দিয়া দামোদরের কয়েকটি শাখা ভাগীরথী অভিমুখে প্রবাহিত হইত। বন্যায় তখন গোস্বামী-মালিপাড়া, হারিট, মহানাদ, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রায়ই ভাসিয়া যাইত, তাই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জায়গা দেখিয়া এই স্থানে বাস করেন। জনার্দন পালের নামানুসারে তখন গ্রামের নাম ছিল জনার্দনপুর।

পরে পালবংশের বৃদ্ধির সময় তাঁহারা যেখানে বাস করেন, তাহা, 'পালবাস' বলিয়া কথিত হয়। এই পালবাস বিকৃত হইয়া 'পালবা' এবং পরে, পোলবায় পরিণত হইয়াছে। পোলবা গ্রামের সদ্‌গোপ বংশীয় পাল ও নিয়োগী ছাড়া রায় বংশও খুব প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। সদ্‌গোপ বংশের দুইটি প্রধান কুল আছে; একটি পশ্চিমকুল ও আর একটি পূর্বকুল। হুগলী জেলায় এই পূর্বকুলের সদ্‌গোপ বংশের সংখ্যা সর্বাধিক।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে যে সজ্জন রাজ গোপীনাথ নিয়োগীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, পোলবার নিয়োগীবংশ সেই গোপীনাথ নিয়োগীর বংশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা এইরূপ ঃ

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যাতে বাস চাষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

প্রায় চারশ বছর আগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যাম রায় এই গ্রামের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবর প্রেরিত মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটিলে, শ্যাম রায় প্রতাপাদিত্যের নির্দেশে তাঁহার পূজিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ ও শ্রীশ্রীরাধারাণীকে পোলবায় তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া আসেন এবং উক্ত বিগ্রহের সেবা পূজা করেন। গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রী খঞ্জ ভগবান আচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পৌত্র কৃষ্ণদাস গোস্বামী (ভাগবতানন্দ গোস্বামী) স্বপ্নাদেশে পরিচালিত হইয়া স্বপ্নাদিষ্ট শ্যাম রায়ের নিকট হইতে পূর্বোক্ত বিগ্রহ দুইটি গোস্বামী-মালিপাড়ায় লইয়া আসেন।

শ্যামরায়ের "রায়বংশ" জনার্দন পালের "পালবংশ" (সদ্‌গোপ) এবং সদ্‌গোপ কুলীন "নিয়োগী বংশ" এখানকার অতি প্রাচীন বংশ। এখানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ প্রায় ৩০ ঘর আছেন— উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, হালদার, চক্রবর্তী, রায়, ভট্টাচার্য ঘোষাল।

ইহাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। ব্যক্তিগত ৪।৫টী শিবমন্দির আছে। প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে এখানে শেষ টোল বিদ্যমান ছিল—এই শেষ টোল পরিচালক পণ্ডিত ৺সীতানাথ শিরোমণি (ভট্টাচার্য) ও তাঁহার পিতা বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়। এখানকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বহুদিন যাবত প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রামে বহু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগে উচ্চ বেতনের হিসাব পরীক্ষক ছিলেন, বর্তমানে তিনি পেন্সন প্রাপ্ত। এই গ্রামবাসী কালিদাস রায় মহাশয়ের পিতা গিরীশচন্দ্র রায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত লিপিকর ছিলেন এবং অনেক সময় কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে বাস করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর কয়েকখানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি গিরিশবাবু বঙ্কিমবাবুর মৌখিক শ্রুতি লিখনে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। বাঁশবেড়িয়া থানার অংশরূপে পরে পোলবাতে মুখুজ্জেদের বিশাল বাড়ীর দোতালায় যখন প্রথমে পোলবা থানা স্থাপিত হয় তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবার ঐ থানা পরিদর্শন করিতে যখন এই গ্রামে আসেন তখন তিনি গিরীশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

॥ শ্যাম রায় ॥

পূর্বোক্ত শ্যামরায় মহাশয় রাঢ়ীশ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় গুড় গাঞি ব্রাহ্মণ। শ্যামরায় বংশের একশাখা মগরার সন্নিকটে কোলাগ্রামে বর্তমানে আছেন। শ্যামরায়ের ৭ম অধস্তন পুরুষ হরচন্দ্র রায় কুচবিহার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত বিত্ত সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি পোলবার বসত বাটীতে অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূজার দালান, দ্বিতল নাটমন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তিনি বাড়ীতে "গঙ্গাধর" শিব মন্দিরে স্থাপন করেন। কালক্রমে এই মন্দির অতিশয় জীর্ণ হইলে শ্যামরায়ের অধস্তন দশম পুরুষ প্রাণকৃষ্ণ মন্দির পুনঃনির্মাণ করেন। মন্দিরগাত্রে নিম্নোক্ত ফলক আছেঃ

নমঃ শিবায় নমঃ
স্বর্গীয় পিতা ৺নিলমণি রায়
ও
স্বর্গীয়া মাতা হেমাঙ্গিণী দেবীর
স্মরণার্থে তস্য পুত্র
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় কর্তৃক দেবালয় পুনঃ নির্মিত হইল।
গ্রাম পোলবা, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৬ সাল।

প্রাণকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় ও তৎপুত্রগণ শ্যামরায় মহাশয় পোলবা গ্রাম নিবাসী বর্তমান বংশধর। এই বংশ তেজস্বী ও অতিথিবৎসলরূপে প্রখ্যাত। পোলবা থানার পূর্বে দিক্‌সংলগ্ন ইঁহাদের বসত বাটী।

এই গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ তিন ঘর আছেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত ১ ঘর এবং গৌতম গোত্রীয় বসু দুই ঘর আছেন। ইহাদের বিশিষ্ট অট্টালিকাগুলি গ্রামে অনন্য সাধারণ। দত্ত ও বসুবংশীয়গণের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি অনেকে আছেন। ইহারা খুব প্রাচীন বংশ। ৺তারিণীচরণ দত্ত মহাশয় মগরা হইতে পোলবা পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ ও

পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের বারওয়ারী পূজিতা দেবতা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রাচীন মন্দির বিনষ্ট হইলে ১২৯৬ সনে তারিণীচরণ দত্ত মহাশয় ইহার নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরে নিম্নোক্ত ফলক আছে ঃ

"সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির
গোপালচন্দ্র দত্তের স্বর্গার্থে
প্রতিষ্ঠিত
তারিণীচরণ দত্ত।"

তিনি একটি পুষ্করিণী সংস্কার করিবার সময় একটি সুন্দর বাসুদেবের মূর্তি প্রাপ্ত হন। এই মূর্তিটি সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। মূর্তিটি গুপ্তযুগের মূর্তির মতন।

দত্তরা গ্রাম্যদেবতা রক্ষাকালীর ছোট মন্দিরটীও নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হরিচরণ দত্ত মহাশয় গ্রামের সর্বসাধারণের পানীয় জলের জন্য গ্রামের বিভিন্ন অংশে ৪টি নলকূপ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বসুগণ দানশীল, তাঁহারা গ্রামে একটি ভাল নলকূপ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রীবিষহরি বা মনসাদেবী পূর্ব মন্দির জীর্ণ হইলে অনিলচন্দ্র বসু একটি সুন্দর নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তথায় নিম্নোক্ত ফলক আছে ঃ

শ্রীঅনিলচন্দ্র বসু
গোলবা
১৩৩৮

দত্ত ও বসুগণের কলিকাতায় কয়েকটি বাড়ী আছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কলিকাতায় তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাদের কেহ কেহ উচ্চ চাকুরীও করেন। গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ দুই ঘর আছেন—ইহাদের উপাধি সিংহ এবং মজুমদার।

॥ জনার্দন পাল ॥

গ্রামে বর্তমানে সদ্‌গোপ দুই ঘর আছেন—উপাধি পাল এবং নিয়োগী। পূর্বে এখানে বিশ্বাস-উপাধিধারীও একঘর সম্ভ্রান্ত সদগোপ কুলীন ছিলেন। বিশ্বাসবাড়ীর চারিদিকে গড় আছে। পালবংশ অতি প্রাচীন এবং সদ্‌গোপ সমাজে কুলীনবৎ সম্মানিত। এই বংশের এখানকার আদি পুরুষ জনার্দন পাল ছিলেন। এই পালদিগের নামানুসারে "গোলবার" নামকরণ হইয়াছে—তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ জনার্দন পাল "গোপাল সাগর" নামক দীঘি কাটাইবার সময় ধাতুনির্মিত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। মাটি কাটিবার সময় কোদালের আঘাতে রাধারাণীর ডান হাত কাটা যায়। ছিন্নহস্ত রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় অদ্যাপি পালবংশে পূজিত হইতেছেন। জনার্দন পাল প্রত্যহ পদব্রজে ৬ মাইল দূরে ত্রিবেণীতে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী আসিতেন। সেই সময়ে তাঁহার মাথার উপর দিয়া তাঁহার ভিজা কাপড় শূন্যে ছায়া দান করিতে করিতে আসিত এই প্রবাদ। জনার্দন পালের অধস্তন কাশীনাথ পাল দেবসেবার জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তির মহাত্রাণ প্রাপ্ত হন এবং নিজে অধিকন্তু প্রস্তরময়ী রাধাগোবিন্দ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পালদিগের বৃহৎ

অট্টালিকা সংযুক্ত বসতবাটীর সম্মুখেই দেবমন্দিরে বিগ্রহগুলি নিত্য পূজিত হইতেছেন। গ্রামের হাটতলার কাছে ইহাদের দোলমঞ্চ এবং বাড়ীর কাছে রাসমঞ্চ ছিল, এইগুলি লুপ্ত হইয়া ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে। এই পালবংশে ভুবনমোহন পাল "সদ্‌গোপ তত্ত্ব" নামক পুস্তক প্রণয়নপূর্বক মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জনার্দন পালের আদি ভিটা গ্রামের বহির্ভাগে আছে। এই পরিত্যক্ত স্থান গোপালসাগর প্রভৃতি ৩।৪টী পুষ্করিণীসহ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ প্রকাণ্ড "পড়া" ছিল। ইহা দনার (জনার্দনের বিকৃতিতে) পড়া নামে এ অঞ্চলে সুপরিচিত। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু-দিগের পুনর্বাসনের জন্য গভর্ণমেন্ট এই "পড়া" গ্রহণ করিয়া এই স্থান পরিষ্কার ও উন্নয়ন করিয়া কিছুকাল হইল প্রায় ৬০ ঘর পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুকে বসাইয়াছেন।

সদ্‌গোপ বংশের নিয়োগী বাড়ী কুলীন ও সম্ভ্রান্ত। ইহাদের আর্থিক অবস্থা পূর্বে সমুন্নত ছিল। ইহাদের কৌলিক দেবতা "শ্রীধর" শালগ্রাম নিত্য পূজিত হইতেছেন। পূর্বে ইহারা মহাসমারোহে রথযাত্রা ও দুর্গোৎসবাদি পর্বের অনুষ্ঠান করিতেন।

এই গ্রামে ৪০।৫০ ঘর গোয়ালা আছেন। জায়গা জমি এবং ছানার কারবারে ইহাদের অর্থাগম হয়। হালদার ও চক্রবর্তী উপাধিধারী গোপদিগের তিন ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাদের মধ্যেও বর্তমানে শিক্ষার প্রসার হইতেছে। মাহিষ্য (কৈবর্ত) প্রায় ত্রিশ ঘর আছেন। জায়গা-জমি ও চাষ-বাস, ব্যবসা, বর্তমান শিক্ষা প্রসারিত হইতেছে। "চক্রবর্তী" উপাধিধারী ইহাদের তিন ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। গ্রামে কুণ্ডু, পাল, নন্দী উপাধিধারী চার ঘর তিলি আছেন। ইহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিক্ষায় উন্নত।

হাঁড়ি, দুলে, খয়রা ও বাগ্দী বহু ঘর আছে। সাঁওতাল ও বাউরী বহুসংখ্যায় গ্রামে বাস করিতেছে। সাঁওতালের অনেকের অবস্থা ভাল, জায়গা জমি আছে—ইহাদের ২।৩ জন ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রাইমারী স্কুলে এখন শিক্ষকতা করিতেছে। গ্রামে ৮।১০ ঘর মুসলমান আছে, ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ প্রসার নাই।

পোলবা গ্রাম উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম এই তিনটি পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক পাড়ায় নিজ বারওয়ারীতলা আছে। পূর্বপাড়ায় প্রধানতঃ থানা, শ্যামরায়ের গড়বাড়ী এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের বাটী অবস্থিত। উত্তরপাড়া হাটতলা (রবিবার ও বুধবার ছোট হাট বসে), নিয়োগী ও পালদের বাড়ী, দত্ত এবং বসুদিগের বাড়ী এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী অবস্থিত।

প্রাচীন গ্রাম্য দেবতাঃ—শ্রীশ্রীবিষহরি বা মনসাদেবী, ইঁহার বর্তমান মন্দির অনিলচন্দ্র বসু নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা—ইঁহার বর্তমান মন্দির তারিণীচরণ দত্ত নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। গ্রাম্য দেবতা রক্ষাকালীর মন্দিরের বিষয় ও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। দুলেপাড়ার মনসার মন্দির ঔচাই নিবাসী তিলিজাতীয় ধর্মপ্রাণ সন্তোষকুমার দে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই গ্রামের দুইটী পারিবারিক শিবমন্দির ও বারওয়ারী ষষ্ঠীদেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বারওয়ারীতলায় তিনি একটী নলকূপও স্থাপন করিয়াছেন নফর চক্রবর্তীর শিবমন্দিরে এই ফলক আছে ঃ

"ওঁচাই নিবাসী
শ্রীসন্তোষকুমার দে কর্তৃক
গৃহ নির্মিত
মাহে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল।"

পশ্চিমপাড়া বারওয়ারীতলা শিবমন্দিরের গাত্রে নিম্নোক্ত ফলক উৎকীর্ণ আছে ঃ

"ওঁচাই নিবাসী স্বর্গীয় হরিদাস
দের স্বর্গার্থে তদীয় পত্নী কর্তৃক
পুনঃ নির্মিত হইল। সন ১৩৩৮ সাল মাহে বৈশাখ।"

সন্তোষবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীতারকদাস দে এম-এ মহাশয় বর্তমানে পোলবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং এই আফিস বর্তমানে ওঁচাই গ্রামে তারকবাবুর বাড়ীতেই অবস্থিত। পাউনান গ্রাম পোলবা হইতে প্রায় দেড়মাইল এবং পোলবা ইউনিয়নভুক্ত।

দুলেপাড়ার মনসা মন্দিরের কাছে ভাদ্রমাসের শেষভাগে প্রায় সপ্তাহব্যাপী ঝাপান মেলা হইয়া থাকে। এই গ্রামে পোষ্টাফিস, থানা, পোলবা ব্লক ডেভলেপমেণ্ট-এর আফিস, দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের একটী ছোট অফিস, রেভিনিউ অফিসারের আফিস, এবং ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল অফিস আছে। হাটতলায় ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। চিকিৎসালয় ভবনে এই ফলকটী আছে ঃ

"পোলবা ইউনিয়ন বোর্ড
দাতব্য চিকিৎসালয়
স্থাপিত ১৩ই মে, ১৯৩৩।"

শ্রীকালিদাস রায় নিজ অর্থব্যয়ে স্বকীয় ও পৈত্রিক পুস্তকসমূহদ্বারা ১৩১৬ সালে "বান্ধব লাইব্রেরী" নামক গ্রামে একটী গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া তিনি নিজে ইহা প্রায় ৩০ বৎসর পরিচালনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ইহা বন্ধ হইয়া গেলে তিনি ইহার অধিকাংশ পুস্তক ওঁচাই গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত "শ্রীধর লাইব্রেরীতে" দান করেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবত "পোলবা সাধারণ পাঠাগার" নামে একটি গ্রন্থাগার এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে।

দেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাতের সময় এই গ্রামে পালদিগের বাড়ীতে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পত্তন হয়। ক্রমে পরে ইহা সমুন্নত হইয়া ১৯১০ সনে পোলবা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় নাম ধারণ করে। জনসাধারণ ইহা চালাইত। ইহা বিভাগীয় সাহায্য মাসিক ৫০্ পাইত। ক্রমে ইহার আর্থিক অবস্থা ও ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পায়। এই সময়ে দুই মাইল দূরবর্তী "আকনা ইউনিয়ন হাই স্কুল" সংগঠিত হইলে এখানকার স্কুলের অবস্থা আরও বিপন্ন হয় এবং ইহা লুপ্ত প্রায় হয়। গ্রামে পূর্বোক্ত দনারপাড়ায় উদ্বাস্তুদিগের কলোনী গভর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিলে গ্রামের স্কুলটী রেফুইজি প্রাইমারী স্কুল রূপে সরকারী খরচে চলিতেছে এবং গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণ করিতেছে। গ্রামের মাধ্যমিক পাঠকারী ছাত্রগণ "আকনা ইউনিয়ন হাইস্কুলে" পড়াশুনা করে।

পোলবা মগরা হইতে পাঁচ মাইল এবং ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। সম্প্রতি শ্রীরামপুর হইতে পোলবা পর্যন্ত (ভায়া চুঁচুড়া, হুগলী ব্যাণ্ডেল) যাত্রী বাহী বাস চলাচল করিতেছে। পোলবা গ্রামের জনসংখ্যা ২,২৩৪ জন।

পোলবা গ্রামে ২৪ নভেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারকল্পে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ ৩৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

॥ অমরপুর ॥

পোলবা থানার অন্তর্গত অমরপুর পূর্বে খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বর্তমানে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৩১২ জন। অমরপুরের পালিতবংশের সন্তান কালীকিংকর পালিত ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে অমরপুরে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজব্যয়ে তাহা পরিচালনা করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ৩৭৭ পৃষ্ঠায় এই বিদ্যালয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১৮৩৯ খৃস্টাব্দে হুগলী হইতে ধনিয়াখালি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য তিনি ছয় হাজার টাকা দান করেন। উহার বিবরণ ৯০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি কয়েকটি ইংরেজ সওদাগরের অফিসের বেনিয়ান (মুচ্ছুদি) ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া তাহা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম **স্যার তারকনাথ পালিত**। কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজ তাঁহার ১৫ লক্ষ টাকা দানে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থিত বিজ্ঞান কলেজের নাম "তারকনাথ পালিত ভবন।"

॥ তারকনাথ পালিত ॥

তারকনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং এই কার্যের দ্বারা প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল বলিয়া ছাত্রদের বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্থ দান করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তারকনাথের জন্ম হয়। কলিকাতায় তাঁহার নামে একটি রাস্তা আছে। হুগলী জেলার ইলছোবা গ্রামে ইহাদের আদি বাস ছিল। শৈশবে তারকনাথ পিতৃহীন হন। অত্যধিক দানশীলতার জন্য তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তারকনাথ মাতামহের সম্পত্তি লাভ করায় আর্থিক দুরবস্থায় পড়েন নাই। তাঁহার দেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইত বলিয়া দেশের সকল প্রকার মঙ্গলকার্যে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থসাহায্য করিতেন। তারকনাথ রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কেবল অর্থই দান করেন নাই. তিনি তাঁহার দানপত্রে একটি সর্ত করিয়াছিলেন যে, অধ্যাপনার জন্য যোগ্য ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই দানবীর পরলোক-গমন করেন।

॥ মহানাদ ॥

মহানাদ হুগলী জেলার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বর্তমানে একটি সামান্য স্থান হইলেও, শত বৎসর পূর্বে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ বৃহৎ জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে এবং কলিকাতা হইতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মহানাদ নামকরণ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, সুদূর অতীতকালে এই স্থানে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পতিত হয় এবং বায়ু লাগিয়া উহা হইতে মহানাদ উত্থিত হয় বলিয়া পরবর্তীকালে এই স্থান মহানাদ নামে খ্যাত হয়। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ডি জি ক্রফোর্ড 'হুগলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক গ্রন্থে মহানাদের অপর নাম '**কিশাবতী**' ছিল লিখিয়াছেন। এখন মহানাদে গ্রামের কিয়দংশ পোলবা থানা এবং বেজপাড়া পটি পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্ভুক্ত।

ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত "দেশাবলি বিবৃতি" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন। উক্ত গ্রন্থে মহানাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যোগীরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ এই স্থানে পুরুষ্কামৃত্তিকাময় দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতেন। নিম্নে এতৎসম্বন্ধীয় কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

"অথ মানাতদেশবিবরণম্—
যোগিজাতিগৃহেজাতো ভাগ্যবান সর্বলক্ষণঃ।
মহেন্দ্রনারায়ণ নৃপো মানাত নগরে পুরা॥
মৃত্তিকাময়দুর্গন্তু মর্যাদাভিঃ সমন্বিতম্।
স্থাপিত্যা বেণুবৃক্ষাস্তু দুর্গমধ্যে পুরা নৃপৈঃ॥"

By Manata is meant the district of Hughly where there is a famous village called Manada. It speaks of China Akna of Saptagram where, in by-gone days, a Vaidya dynasty of kings is said to have ruled. It further speaks of Triveni where the three rivers meet, of Pedua Pargana and of (45-A) Padanadana where there is a temple of Goddess Visalaksi.

45A- Colophon ইতি দেশাবলিবিবৃতৌ রাঢ়-দেশমধ্যে মানাতদেশ বিবরণম্।"

দেশবলি বিবৃতিতে লিখিত আছে যে, রাজা বৈজলের আদেশে জগমোহন পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থকার বৈজলরাজের পূর্বপুরুষের যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের বংশধর ও চৌহানবংশীয় ছিলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বৈজলরাজের মৃত্যু হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে এই পুঁথি আছে। পুঁথিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২।

এই পুঁথিতে প্রত্যেক দেশের প্রদেশ, গ্রাম, মহাগ্রাম, নদী, পর্বত, মন্দির ও প্রয়োজনমত ঐতিহাসিক আখ্যান, গ্রামের নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় বা অন্যান্য কিংবদন্তী ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। এই পুঁথির ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় "মানাতে"র যে বিবরণ আছে তাহার বঙ্গানুবাদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার করিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গানুবাদ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

মানাত দেশ

রাঢ় দেশে মানাত বিখ্যাত। যোগিজাতীয় মহেন্দ্রনারায়ণ রাজা পুরাকালে এখানে মৃত্তিকাময় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মানাতের এক যোজন পূর্বে ছিন্নাঙ্কনা (ছিনা আকনা) গ্রাম। ইহার একচতুর্থ ক্রোশ পূর্বে সরস্বতী নদীর সমীপে বালড় গ্রাম।

সরস্বতী নদী তত্র যাতি দক্ষিণবাহিনী।
সূক্ষ্মরূপা তোয়হীনা বর্ষাজলপ্রপূরিতা॥

বলড়ার দেড় ক্রোশ পূর্বে সপ্তগ্রাম, এখানে বৈদ্যজাতির নিবাস। পুরাকালে ইহার অম্বষ্ঠরাজার এক স্ত্রীর গর্ভে এককালে (যুগপৎ) সপ্ত পুত্র জন্মে, এই জন্য সপ্তগ্রাম নাম অথবা এক বণিকের সপ্ত পুত্রের মৃত্যু হেতু এই নাম হয়। ইহার নিকট মোমুদাবাদ। সপ্তগ্রামের দুই ক্রোশ পূর্বে ভাগীরথীর নিকট ত্রিবেণী গ্রাম।

সরস্বতী. জাহ্নবী ও যমুনা প্রয়াগে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গৌড় ও অঙ্গের সন্ধিভূমি রাজমালা পার হইয়া গৌড়নগরী প্রাপ্ত হয়। তারপর শঙ্খাসুরের বিড়ম্বনায় সৌতিক গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে যায়। কিন্তু সে সমুদয় নদী পথিমধ্যে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পৃথক হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। গঙ্গার সখী পদ্মার নামে ইহার নাম পদ্মাবতী হয়।

মৌরসুধাবাদ, বুধপল্লী, সোমপল্লী, পলাশগ্রাম, কণ্টকনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া ত্রিবেণীতে তিন ধারা পৃথক হয়।

মানাতের (১) তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে মন্দার নামক গৌড়ভূমীর বিখ্যাত স্থান; (২) এক যোজন উত্তরে বেলাভাবায়িজি মহাগ্রাম; (৩) তিন ক্রোশ পশ্চিমে বর্ধমান মহাগ্রাম; (৪) দেড় যোজন দক্ষিণে পাদনানো মহাগ্রাম (পাওনান); (৫) পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বড্র (বড়?) ও ক্ষুদ্র বেলুনগ্রাম; (৬) দেড় যোজন উত্তর-পূর্বে পেড়ুয়াপরগণা। মান্দারণে জীর্ণ দুর্গ আছে।

পূর্বে মহানাদ বাঙলার নাথধর্ম ও নাথসংস্কৃতির অন্যতম মহাকেন্দ্র ছিল। পূর্বভারতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নাথযোগীদের এত বড় সাধনকেন্দ্র আর ছিল না। তাই নাথযোগীদের নাদতত্ত্ব হইতে মহানাদের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নাথ-পন্থীদের প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদ প্রাচীনকালে শৈব ও শাক্ত সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল—কারণ তাঁহারা শিবের সঙ্গে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। মহানাদের সর্বত্র যে সব প্রাচীন মূর্তি ছড়াইয়া আছে, তাহা হইতে এই স্থানে শিব ও শক্তি সাধনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাথযোগীরা একসময় ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র রসায়ন বিদ্যাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতসম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ অর্থাৎ জালালুদ্দীন খিলজী ফিরোজ শাহের ভগ্নী পাণ্ডুয়ায় বসবাস করিতেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজা মহানাদে বাস করিতেন, সম্রাটের ভাগীনেয় শাহ সুফি হিন্দু রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং তাহার মাতুলের

সৈন্য সাহায্যে ও সপ্তগ্রামের জাফর খাঁ গাজির সহায়তায় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজাকে তিনি পরাজিত করেন এবং পাণ্ডুয়া ও মহানাদ তখন মুসলমানদিগের করতলগত হয়। এই সম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "লিষ্ট অফ এনসিয়েণ্ট মনুমেণ্টস ইন বেঙ্গল" নামক সরকারী পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ্য ঃ

"At the close of the 13th century, Shah Sufi, whose mother was sister to the Emperor Firoz Shah II who died in 1296 A.D., lived at Pandua. At that time the Hindu Pandua Raja ruled over the district and lived at Mahanath (now Mahanad) not far off. Being oppressed by the Raja, Shah Sufi fled to his uncle at Delhi, obtained assistance and with a large army and 2 men of renown, Zafar Khan Ghazi and Bahram Sakka, overthew the Raja."

"মহানাদ বা বাঙলার গুপ্ত ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কায়স্থ বংশসম্ভূত রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ মহানাদের রাজধানীর স্থাপয়িতা ও বহু বর্ষ যাবত তাঁহার বংশধরগণ এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। অতঃপর পোস্তার রাজা নরসিংহ দত্তের পূর্বপুরুষ কিছুকাল এইস্থানে রাজত্ব করেন এবং তিনি 'বেণে রাজা' বলিয়া আখ্যাত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'মহাগ্রামো" বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ আছে, তাহাও এই মহানাদ গ্রাম। প্রভাসবাবু কথিত বংশগুলি মহানাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং "মহাগ্রাম" সিঙ্গুরের পশ্চিমে হরিপাল নামক স্থান, মহানাদ নহে। "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে ঃ

"জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুরে পশ্চিমেস্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ।"

প্রাচীনকালের ইতিহাস কল্পনার সাহায্যে কোন বংশ বিশেষের গৌরবের জন্যে রচিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতীতকালে মহানাদে কে রাজা ছিলেন, তাহা জানা যায় না। মুসলমান অধিকারভুক্ত হইবার পর এই স্থান পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের শাসনাধীনে আসে এবং সেই সময়ের পরও এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের পর চিত্রসেন, তৎপর তিলকচাঁদ এবং সর্বশেষে তেজচন্দ্র এই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে প্রেরণ করিতেন। মহারাজ তেজচন্দ্র সময়মত রাজস্ব প্রেরণ করিতে না পারায় বোর্ড অব রেভিনিউ মহল বিক্রয় করিয়া দেন এবং তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ মহানাদের কিয়দংশ ক্রয় করেন। বর্তমানে জমিদারের স্বত্ব অবলুপ্ত হইয়াছে।

মহানাদে 'জটেশ্বরনাথ' মহাদেবের মন্দির বহু প্রাচীন; কাহার দ্বারা যে এই মন্দির প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই মন্দিরের মোহান্ত 'যোগীরাজা' বলিয়া খ্যাত। পূর্বোক্ত 'দেশাবলি-বিবৃতি' গ্রন্থে যোগী রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের নাম লিখিত আছে; সম্ভবতঃ তিনি এই মন্দিরের মোহান্ত ছিলেন এবং

মহানাদ শাসন করিতেন। জটেশ্বরনাথের মোহান্তগণ নাথপন্থী এবং ইঁহারা গৈরিক বসন পরিধান করেন। ইঁহাদিগকে চিরকুমার থাকিতে হয়। এবং মৃত্যুর পর সমাহিত করা হয়। মোহান্তর নির্দ্দেশমত তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান শিষ্য মোহান্তের গদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই মোহান্তগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ব্যক্তি, বাঙালী নহেন।

জটেশ্বরনাথের মোহান্তদের চেষ্টায় এই মন্দির প্রতি বৎসর সংস্কার করা হয়। মোহান্ত খুসীনাথ মন্দিরটি আমূল সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে লোহার কড়ি দিয়া বারাণ্ডা ও চীনামাটির টালি গ্রথিত করিয়া দেন বলিয়া, পূর্বদিকে মন্দিরগাত্রে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ আছে। লিপিটি এইরূপ ঃ

স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী ৺রাজবালা সাহা
স্মৃতিরক্ষার্থে
৺জটেশ্বরনাথ ঠাকুরের মন্দির সংস্কারকারী
দীন সেবকাধম শ্রীতারকচন্দ্র সাহা সাং পাণ্ডুয়া
সন ১৩৬০ সাল ১৯ ফাল্গুন শুভ শিবচতুর্দ্দশী

এইস্থানে প্রাচীনকাল হইতে মহাকালের পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং মন্দিরের মধ্যে বহু শালগ্রাম শিলা রক্ষিত আছে। একস্থানে এতগুলি শালগ্রাম থাকিবার কারণ এই যে. পূর্বে স্থানীয় গৃহস্থদের বাড়িতে এই শালগ্রামগুলি পূজিত হইতেন; কিন্তু উক্ত গৃহস্থদের কালক্রমে অবস্থা খারাপ হওয়ায়, তাঁহারা পূজা চালাইতে অসমর্থ হইয়া এই মন্দিরে শালগ্রামগুলি পূজার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে শিবরাত্রির সময় জটেশ্বরনাথের একটি মেলা হয়, ইহা 'মানাদের জাত' বলিয়া খ্যাত। প্রায় মাসাধিককাল ধরিয়া এই মেলা উপলক্ষ্যে বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং আনন্দবিধায়ক নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি দেখিবার জন্য বহু দেশ-দেশান্তর হইতে এই স্থানে জনসমাগম হইয়া থাকে।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকটে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির, শিবমন্দির এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরের উত্তরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরগুলি ও শিবলিঙ্গটি পূর্বতন মোহান্তদিগের সমাধির উপর স্থাপিত। ইহা ছাড়া নিম্ব ও বটবৃক্ষমূলে বটুক-ভৈরব শিব ও ভগ্ন কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি রক্ষিত আছে। বটুক-ভৈরব শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই হাত লম্বা একটি মকরের মস্তকের শুণ্ডের অগ্রভাগ এবং তাহার পার্শ্বে একটি একপাদ ভৈরব মূর্তিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মকরের মস্তক ও ভৈরব মূর্তির আলোকচিত্র পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। এই স্থানে খিলানের মধ্যে হর-গৌরী মূর্তি ও ভৈরবনাথের মূর্তি রক্ষিত আছে। বিষ্ণু, শীতলা ও মনসা প্রভৃতির কয়েকটি মূর্তি এই স্থানে আছে। এইস্থানে রক্ষিত অধিকাংশ মূর্তি বশিষ্ঠ গঙ্গা ও স্থানীয় পুষ্করিণী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থানে একটি সাত হাত লম্বা শিবলিঙ্গের ভগ্ন গৌরীপট্ট পতিত আছে। এত বড় গৌরীপট্ট ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মময়ী দেবীর কারুকার্য খচিত নবচূড়াবিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দির মহানাদের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এইরূপ গগনচুম্বী সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে দিনাজপুর, চন্দননগর, তেলিনীপাড়া ও বাক্‌সা ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালিকা দেবী বিরাজিতা এবং চারি কোণে চারিটি শিবলিঙ্গ ও ত্রিতলে সুবৃহৎ চুড়ার মধ্যে হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নিম্নোক্ত লিপি দুইটি হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক ১২৩৬ বঙ্গাব্দ অথবা ১৭৫১ শকাব্দায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। লিপি দুইটি এইরূপ ঃ

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং শাকে ভূশর মৌনচন্দ্রগণিতে শ্রীকালিকায়া মঠ। ঊর্দ্ধে পার্শ্বচতুষ্টয়েষু বিলসৎ হংসেশ্বরাদি শিবঃ। শ্রীকালীং ভবভঞ্জিনীং ভবভয়ং . হন্তুং মঠেঽস্থাপয়ৎ। শ্রীসদ্গোপ কুলোদ্ভব গুণবরং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাখ্যকঃ।"

"ব্রহ্মময়ীর বাস জন্য,	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম,
নির্মিত নবরত্ন,	অশেষ গুণে গুণধাম,
পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত।	সদ্গোপ কুলে উৎপত্তি।
পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি,	ভবসিন্ধু তরিবারে,
ঊর্দ্ধে এক শ্বেত তারি,	সুযত্ন করি অন্তরে,
দেখিবারে অতি সুশোভিত।	কালীপদে করিয়ে প্রণতি।

সন—১২৩৬ সাল"

বীরেশ্বর নিয়োগী মহানাদ নিয়োগী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পৌত্র রাধাকৃষ্ণ কলিকাতার মেকিন্যান মেকেঞ্জি এন্ড কোংর অফিসে চিনি সরবরাহ করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানি হইত। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বহু অর্থ ব্যয়ে এই মন্দির নির্মাণ করনে। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মন্দিরটি সুসংস্কৃত রাখিতেছেন এবং পূর্বপুরুষগণের অন্যান্য কীর্তি রক্ষা করিতেছেন।

মহানাদের তাম্বুলী কুলোদ্ভব করবংশ বিশেষ কীর্তিমান্‌ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে সপ্তগ্রাম হইতে ইঁহারা মহানাদে আগমন করেন এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইতে প্রচুর ধনলাভ করিয়া বহু জলাশয় ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের প্রাসাদোপম মনোরম অট্টালিকা-সমূহ আজও জনসাধারণকে করবংশের অতুল বৈভবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ধ্বংসোন্মুখ জনমানবশূন্য বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া এমন কেহই নাই যে, হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন না। বর্তমানে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রশিখর কর এই বংশের প্রধান ব্যক্তি; তিনি তাঁহার স্বর্গতা সহধর্মিণীর স্মৃতিরক্ষার্থে "মনোরমা লাইব্রেরী" নামক একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং ২১শে বৈশাখ ১৩৫৩ সালে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক উহার উদ্বোধন হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থাগার ইটাচোনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" পত্রের সংবাদ উল্লেখ্য ঃ

MAHANAD—The villages in India have not forgotton the necessity of having libraries. This was given proof in the village

Mahanad, District Hooghly, where Mr. Sudhir Kumar Mitra of Bangabhasa Sanskriti Sammelan performed the opening ceremony on Saturday the 4th May 1946 of "Manorama Library" started by Mr. Sailendra Sekhar Kar in memory of his deceased wife.

১৭৭৩ শকাব্দায় অর্জুনদাস কর মহানাদে একচুড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ "লালজীউর" মন্দির নির্মাণ করেন। এই অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি আধুনিক হইলেও ভূমিকম্পে এরূপ ফাটিয়া গিয়াছে যে, ভয়ে কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেই জন্য বিগ্রহ অন্যত্র রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
পদাশ্রিত
শ্রীশ্রীলালজীউ প্রভুর প্রীত্যর্থে
শ্রীমন্দির প্রস্তুত হয়।
শকাব্দা—১৭৭৩

*সহজরাম দাস কর	*রামসুধীর দাস কর
তস্য পুত্র শ্রীঅর্জুনদাস কর	তস্য স্ত্রী দ্রবময়ী দাসী।

করবংশের কাছারী বাড়ীর একাংশে ভীমচন্দ্র কর, শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরের জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৬৭ বঙ্গাব্দে উক্ত শিবের নামে নদীয়া জেলার পীরপুরদিগর গ্রাম নিত্যপূজার জন্য খরিদ করেন। বর্তমানে উক্ত দেবত্র সম্পত্তি হইতে নিত্য দেবসেবা হইয়া থাকে। শ্রীধর করবংশের প্রাচীন কুলদেবতা। এই বংশের শম্ভু কর, গিরিশ কর, শ্যাম কর ও ভীম কর প্রত্যেকে এক একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার বাঁধান ঘাট ও সুন্দর চাঁদনী নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমানে সুন্দর চাঁদনীগুলি ভাঙিয়া তাহার কড়ি-বরগা পর্যন্ত মাটির দরে বিক্রয় হইতেছে—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। নিম্নে একটি চাঁদনীর গাত্রের ক্ষোদিত লিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

"মহানাদ নিবাসী ধার্মিক জমিদার
স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র কর মহাশয়ের
স্মরণার্থে
জন্ম—৬ আষাঢ়, সন ১২৩৭ সাল
মৃত্যু—৩ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল
স্মৃতিস্তম্ভ
তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীআশুতোষ কর
ও শ্রীপ্যারীবল্লভ কর কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত
১৩১৪।"

প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য ২২শে বৈশাখ ১৩৫৩ সালে

মহানাদে "প্রাচ্য-ভবনের" উদ্বোধন হয়। উক্ত উৎসবে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় মহানাদ গ্রামবাসীগণের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থের লেখককে একটি কাব্যার্ঘ দেন।

মহানাদে কায়স্থ কুলোদ্ভব দত্তদের বাড়ির নিকট শিবমন্দির তাঁহাদের অতীত অস্তিত্বের কথা আজও স্মরণ করাইয়া দেয়। দত্তবংশীয়গণ কেহই বর্তমানে এ স্থানে বসবাস করেন না। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে পঞ্চানন দত্ত এই শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটির চতুপার্শ্বে ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ শীঘ্রই ইহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিবে। মন্দিরের একটি দোলমঞ্চ দৃষ্ট হয়; ইহাতেও যেরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, তাহাতে দত্তদের বাস্তু-ভিটার ন্যায় ইহারও ভূমিসাৎ হইতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই। শিবমন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত লিপি ইষ্টকে উৎকীর্ণ আছে ঃ

নমঃ শিবায়।
পঞ্চানন দত্ত।
শকাব্দা ১৭০৮।

এই স্থানে অগ্নিশ্বর, অখিলেশ্বর, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি আরো বহু দেবমন্দির আছে। মুসলমানদিগের নিদর্শনের মধ্যে কাজিমন ফকিরের সমাধি-স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফকিরের সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা বিচিত্র বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কিংবদন্তীটি এইরূপ ঃ

বহু প্রাচীনকাল হইতে মহানাদে "জীয়ৎ-কুণ্ডু" নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর এইরূপ অলৌকিক শক্তি ছিল যে, রুগ্ন, আহত ও নিহত ব্যক্তিকে এই কুণ্ডে স্নান করাইলে সেই ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শাহ সুফির সহিত পাণ্ডুয়া রাজার যুদ্ধ হয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যুদ্ধে নিহত বা আহত হিন্দু সৈন্যগণ জীয়ৎ-কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তিরে পুনর্জীবন লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় গমন করিতে লাগিল। ফলে মুসলমান সৈন্যগণ পরাজিত হইতে লাগিল। এই সময় লোকপরম্পরায় উক্ত কুণ্ডের মৃতসঞ্জীবনী শক্তির কথা জানিতে পারিয়া নবাব উহার শক্তি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কাজিমন ফকির নামে এক সাধু ঐ অঞ্চলে বাস করিতেন। নবাবের কথামত তিনি অসুস্থতার ভাণ করিয়া সুস্থ হইবার জন্য উক্ত কুণ্ডে স্নান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন এবং তিনি স্নান করিবার সময় গো-মাংস উহাতে ফেলিয়া দিয়া উহার অলৌকিক শক্তি নষ্ট করিয়া দেন। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ও মুসলমানগণ পরে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করিলে, ফকিরকে এই স্থানে সমাহিত করা হয়।

অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এই স্থান হিন্দু-মুসলমানের নিকট পবিত্র বলিয়া খ্যাত। কারণ কোন কিছু মানত করিলে, বিশেষ করিয়া বাত প্রভৃতি ব্যাধিতে কাজিমন ফকিরকে মাটির ছোট ঘোড়া দিলে ভাল হয় বলিয়া বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক এই স্থানে আসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তাহার সমাধির সম্মুখে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

মুসলমানদের অত্যাচারের পর বর্গীর অত্যাচারেও মহানাদের জনসাধারণ যে ভীষণভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বর্গীদের অত্যাচারের

বিবরণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। নিম্নে হারাণচন্দ্র গুহ রচিত 'বর্গীর-পুরাণ' হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"চন্দ্রকোণা মহানাদ আর দিগলনগর।
খিরপাই পোড়ায় আর ত্রিপিনি সহর॥"

বৌদ্ধ যুগে কায়স্থগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত তাহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ধর্মকীর্তি ও ধর্মগ্রন্থ রচয়িতার আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাসিদ্ধাচার্য বৃদ্ধ কায়স্থ টঙ্কদাস রচিত "সুবিদ সম্পুট" নামে শ্রীহেবজ্রতন্ত্র রাজ্যের টীকা দৃষ্ট হয়। মহানাদ গ্রাম নিবাসী কায়স্থ গদাধর (সিংহ) প্রায় ৫০ খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাকর সিংহ বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ ও তন্ত্রের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থ রাজা ভৈরব সিংহের সময়ে রচিত হয়। মহানাদ নিবাসী গঙ্গাদাস বসু ঘটক "কায়স্থকারিকা" গ্রন্থ রচনা করেন।

"রসমঞ্জরী" নামক রসতত্ত্ব ও কাব্যের অপূর্ব গ্রন্থ মহানাদ নিবাসী কবি ভানু দত্তের রচিত। মহানাদের রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "ন্যায়লোক সিদ্ধ" নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র ও শব্দ বহুল মহাভাষ্যের অর্থের অল্পতা দেখিয়া "চন্দ্র ব্যাকরণ" নামে ছয় অধ্যায়ে পাণিনির ভাষ্য রচনা করেন।

৯৯১ খৃঃ অব্দে কায়স্থ পাণ্ডুদাসের জন্য শ্রীধর, বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য "পদার্থ ধর্মসংগ্রহের টীকা" লিখিয়া বৌদ্ধগণকে পর্যুদস্ত করেন। শুকদেব সিংহ কুলাচার্য অনেকগুলি কুলগ্রন্থ রচনা করেন। জয়হরি সিংহের "কক্ষোল্লাস" নামক একটি গ্রন্থ ছিল এবং রাঘব সিংহ অনেক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ রচয়িতা কায়স্থ চাকা দাস মহানাদবাসী ছিলেন।

১১৯০ খৃঃ অব্দে পুরুষোত্তম নামক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ মহানাদে "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন।

১২০৫ খৃঃ অব্দে মহানাদ নিবাসী শ্রীধরদাস ৪৪৬ জন পূর্বতন বিভিন্ন কবির রচিত শ্লোক সংগ্রহ পূর্বক "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামক পুস্তক রচনা করেন।

মহানাদের হিন্দু স্কুল স্থাপয়িতা ললিতমোহন কর "পার্বতি পরিণয়" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকখানি মুদ্রিতও হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।

বাঙলা ভাষায় গবাদি পশু চিকিৎসার পুস্তক না থাকায় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক খণ্ডাকারে "গো-জীবন" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে এবং চারি খণ্ড প্রকাশের পর বিগত ১৩৩১ সালে সকল মতে চিকিৎসা সম্বলিত পরিবর্ধিত আকারে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় একখণ্ডে ৫ম সংস্করণ "গো-জীবন" প্রকাশিত হয়। এই দেশে সাঁওতাল আগমনের পর তাহাদের ভাষা শিখিবার বলিবার ও বুঝিবার সুবিধার্থে সন ১৩২১ সালে "সাঁওতালী-ভাষা" নামক আর একখানি পুস্তক রচিত হয়। এক্ষণে উহার ২য় সংস্করণ চলিতেছে। শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

বর্ধমানের মহারাজা ঘনশ্যাম রায় কর্পূরেও মহানাদ একবার লুণ্ঠন করেন। তারপর

কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতেও যে এইস্থান অব্যাহতি পায় নাই, তাহা বিভিন্ন পুষ্করিণী হইতে প্রাপ্ত ভগ্ন দেবদেবীর মূর্তিগুলি হইতেই প্রমাণিত হয়। মহানাদের কর ও নিয়োগী বংশ এবং অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিগণ এই স্থানের আনন্দকোলাহল বহুদিন নিবৃত্ত হইতে দেন নাই, কিন্তু ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের "বর্ধমানের জ্বর" নামক মহামারী ১৮৬০ খৃস্টাব্দে এই স্থানে প্রথম দেখা দেয় এবং ফলে বহুশত লোকের ইহাতে প্রাণ বিয়োগ হয়। বর্ধমানের জ্বরের বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর লেখা হইল না। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর এই অঞ্চলে দেখা দেয় এবং মহানাদের লোকসংখ্যা সেইজন্য দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়া হাণ্টার সাহেব "এ্যানালস অফ রুরেল বেঙ্গল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

১৮৭১ খৃস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর বঙ্গদেশে ভীষণ ঝড় হয় এবং তাহার ফলে ৪৭৮০০ জন লোকের জীবনান্ত ঘটে এবং ইহাতে এত সম্পত্তি ও অর্থহানি হইয়াছিল যে, সরকার তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। হুগলী শ্রীরামপুর, কালনা, প্রভৃতি অঞ্চলে ঝড়ের বেগ এবং বৃষ্টিপাত অধিক হইয়াছিল। হুগলী এবং কালনার মধ্যস্থিত মহানাদের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নে মিঃ সি, ই, বাকল্যান্ড রচিত "বেঙ্গল আন্ডার দি লেফট্যান্ট গভর্নারস" নামক সরকারী গ্রন্থ হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"Here during the night of the 4th it raged with great forces and hence the centre of the storm appears to have travelled northerly, inclining eastward along the right bank of thc Hooghly at a pace varying from 8 to 26 miles an hour. The wave rose in some places to a height of 30 feet, sweeping over the strongest embankments. flooding the crops with salt water carrying away entire village and its effect was more disastrous than the voilent wind. The gale was felt severely at Hooghly, Serampore, Kalna, Krishnagar, Rampur-Boalia, Pabna and Bogra."

হুগলী জেলার প্রাচীন বিদ্যালয়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলী জেলার যে সমস্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐতিহাসিক কীর্তি কাহিনী জড়িত মহানাদের বিদ্যালয়টি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের মিশনারীগণ মহানাদে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। কালক্রমে তাহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। অতঃপর ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় অধিবাসীগণ স্কটল্যান্ড মিশনের বাংলা বিভাগের সম্পাদক মিঃ ডব্লু এস সোমেলীর নিকট হইতে বিদ্যালয় গৃহ এবং তৎসংলগ্ন জমি পাঁচ শত টাকায় ক্রয় করেন।

১৯৫১ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়টি একটি জুনিয়র হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। মহানাদের এই বিদ্যালয়টি বহু মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত; তন্মধ্যে রেঃ আলেকজান্ডার ডাফ, রেঃ জে ডি ভট্টাচার্য, রেঃ লালবিহারী দে, গণিতজ্ঞ * পি ঘোষ, স্বনামধন্য জজ *কিশোরীমোহন সেন, রায়বাহাদুর *শ্রীশচন্দ্র মিত্র, রায়সাহেব প্রসন্নকুমার মিত্র, *হীরালাল মুখোপাধ্যায়, ও শ্রী পি, সি, পালের নাম উল্লেখযোগ্য।

শত বৎসর যাবত এই বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন নাই। গত ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম এই বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী-পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছে শ্রীমঞ্জু মিত্র। তিনি পার্শ্ববর্তী বেলুন গ্রামস্থ প্রাচীন মিত্র-বংশসম্ভূতা বিদুষী মহিলা।

১৯৫৭ খৃস্টাব্দের ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব যথারীতি পালিত হয়। সরকার বিদ্যালয়টিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ের রূপ দান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও প্রসারকল্পে মহানাদের নিয়োগী-বংশের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস ১৬/ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। সম্পাদক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ সরকারের প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

মহানাদ পতনের দিকে ধাবিত হইবার পূর্বে 'ফ্রি চার্চ মিশন' এই স্থানে আগমন করেন এবং নিয়োগীদের নিকট হইতে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে দলিল করিয়া ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ, ডব্লিউ ফাইফ এবং রেভারেণ্ড জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কিছু স্থান সংগ্রহ করেন এবং "ফ্রি চার্চ মিশন স্কুল" নামক শিক্ষালয় খেলা হয়। পূর্বোক্ত দলিলে মহানাদে কোন গির্জা নির্মাণ বা মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করা হইবে না. এইরূপে সর্ত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে এই স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে উক্ত মিশন পরিচালিত এণ্ট্রান্স স্কুল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে উঠিয়া যায়।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মহানাদ খনন করিয়া বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সমস্ত জিনিস কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে' রক্ষিত আছে। কয়েকটি সুবর্ণ মুদ্রাও এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। করেদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রক্ষিত এবং স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক প্রাপ্ত একটি মুদ্রার বিষয় ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাটি চতুষ্কোণ এবং ওজন এক ভরি এক আনা। আলাউদ্দিন তাঁহার খুল্লতাত জালালুদ্দিনকে হত্যা করিয়া ১২৯৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ১৩১৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি কর্তৃক তিনি নিহত হন।

হুগলী জেলা বলিয়া কোন জেলা পূর্বে ছিল না: ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম হুগলী জেলার সৃষ্টি হইলেও, মহানাদ পূর্বমত বর্ধমানেই ছিল, পরে ইহা হুগলীর মধ্যে আসে। যখন বি, পি, রেলওয়ে ছিল তখন মহানাদ উক্ত রেলওয়ের একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও মহানাদ একটি মহকুমা ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে এই স্থান আজ একটি নগণ্য পল্লীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মহানাদের সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল ও চূণের কাজের জন্য এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমস্ত স্থানই অরণ্যময় হইয়া গিয়াছে। সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুবৃহৎ অগণিত মন্দিরাজি ও প্রাসাদোপম হর্ম্যশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান থাকিয়া বঙ্গদেশের গ্রামগুলি পূর্বে যে কিরূপ ছিল তাহাই আজ ঘোষণা করিতেছে, আর বিস্মিত পথিকের মনে উদয় হইতেছে, মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের সেই কথা ঃ

"কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজ
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে

শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।"

॥ মহানাদের গুহবংশ ॥

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষে' মহানাদের গুহ রাজবংশ নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "মহানাদ বা বাঙগলার গুপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হওয়ার পর রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী জেলা হুগলীর অন্তর্গত মহানাদের পুরাতত্ব আবিস্কারে কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্টের খনন বিভাগ মহানাদের রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের কিয়দংশ খনন করিয়া অতীতের অন্ধকার কক্ষের যে রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিয়াছেন, তাহাতে ১০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে যে সকল প্রাচীন চিহ্ন ও রাজভবনের ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরাদি বাহির হইয়াছে, তাহা ১৪০০ বৎসরেরও পুরাতন বলিয়া নির্ণীত হইলেও উহার একস্থানে তিনটি যুগের (Periods) চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ইহাতে সিংহ ও গুহ রাজবংশ ব্যতীত আরও একটি রাজার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অতীতের কোন্ স্মরণাতীত যুগে হয়ত অন্য কোন বংশীয় নরপতি মহানাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেটি কোন্ রাজবংশ তাহার আলোচনা আমি এখন করিব না, সমগ্র স্তূপ খননের পর সকল তথ্যই আবিষ্কৃত হওয়া সহজ হইবে।

এই যে সিংহ ও গুহবংশ ইঁহারা কে কাহার পর রাজত্ব করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায় যে, মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে মহানুভব বিরাট গুহ মহানাদে আগমন করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সিংহবংশীয় রাজারা অতি প্রাচীনকাল হইতে মহানাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা সিংহবংশের রক্ষিত কাগজপত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে গুহ বংশকেই সিংহ বংশের পরবর্তী রাজা মনে করিতে হয়; কিন্তু মুরশীদ্ কুলী খাঁর সময়েও পুরণ খাঁ সিং মহানাদের রাজা ছিলেন, সুতরাং গুহ বংশের পরেও সিংহবংশীয় রাজা দেখিতে পাওয়া যায় মহানাদের উত্তরাংশে মহারাজ বিরাট গুহ প্রথমে একটি উদ্যান বাটিকা নির্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ঐ স্থান "বরাট" নামে কথিত হয়, এক্ষণে সেই বরাট নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে পরাক্রান্ত সিংহরাজগণ সময় সময় অন্যান্য স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহারাজ বিরাটের মহানাদে আগমনের পর সিংহবংশ অন্য কোন স্থানে চলিয়া যান এবং তদবধি গুহবংশ মহানাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। সিংহবংশে বিবাহ করিয়াই গুহবংশ মহানাদে অবস্থিতি করেন, সিংহবংশের সঞ্চিত কাগজপত্রে ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। এই দুই বংশের পরস্পর আত্মীয়তা থাকায় এবং মহানাদের রাজবাটীর সুবিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া ইহাও মনে হয় যে, হয়ত উভয় রাজবংশের রাজভবন পাশাপাশিভাবেই অবস্থিত ছিল। গুহবংশের কতিপয় পুরুষ গত হওয়ার পর সিংহবংশের সহিত গুহবংশের সংঘর্ষ হওয়ার কথাও জানিতে পারা যায় এবং কালক্রমে গুহবংশের বিস্তৃতি হয় ও ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে, এই সময় গুহবংশ বাঙগলার নানা স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন এবং মহানাদ ক্রমে গুহবংশশূন্য হয়; সেই সময়ে সিংহবংশ আবার মহানাদে

আগমন করিয়া থাকিবেন। কালের গতিতে সিংহবংশও মহানাদ হইতে অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

মৌদ্গল্য গোত্র সিংহবংশীয়গণের মধ্যে অনেকের নিকটে তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী ও রাজকীর্তির বহু প্রাচীন কাহিনী লিখিত ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে আমার হস্তগত হইয়াছে। মহারাজ বিরাটের বংশধর বাঙলার বহু স্থানে অবস্থান করিতেছেন; অনুসন্ধান করিতে পারিলে হয়ত সিংহবংশের অপেক্ষাও তাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্তিকাহিনী অধিক পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। সিংহ ও গুহ রাজবংশের অনেক প্রাচীন কথা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

টাকী, শ্রীপুর, সৈয়দপুরের গুহবংশের আদি পুরুষ রাজা ভবানীদাস গুহ রায় চৌধুরী তিন শত বৎসর পূর্বে মহানাদে ছিলেন। মহেশ্বরপাশার রায় বাহাদুর নলিনীনাথ গুহ মজুমদার মহাশয়ের ঊর্ধ্বতন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা আনন্দিরাম বা নন্দরাম গুহ মহানাদ হইতে মহেশ্বরপাশায় যাইয়া বাস করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও এই মহানাদ বরাটের গুহবংশীয় ছিলেন। ঢাকা বাঘুটিয়ার গুহ নিয়োগীবংশ মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা তপন গুহের পৌত্র রাজা পুণ্ডু গুহের বংশধর। মহানাদ-বরাটের ৯ম পর্যায় রাজা রাজা নন্দন গুহের পৌত্র ত্রিলোচন গুহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র যাদবেন্দ্র গুহের ভ্রাতৃ-পৌত্র বিশ্বনাথ গুহ রায় চৌধুরী জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন ইনি সু-কবি প্রথমনাথ রায় চৌধুরী ও মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এই গুহ-রাজবংশের সন্তান। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে বহু স্থানের গুহবংশের সহিত মহানাদের সম্বন্ধ বিজড়িত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক কথায় যাঁহারা মহারাজ বিরাট গুহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই মহানাদের গুহরাজবংশসম্ভূত।

মহানাদে গুহরাজবংশের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কেহ নাই, লিখিত বিবরণেরও অভাব; এক্ষণে আমরা এখানে যে সকল সাক্ষী দেখিতে পাই, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পুষ্করিণী, রাজপথ, পল্লী, মন্দির প্রভৃতি অতীতের মূক সাক্ষী। মহানাদে আমরা ঐ প্রকার কতিপয় মূক সাক্ষীর নিকট হইতে গুহরাজবংশের বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারি।

মহারাজ বিরাট গুহের অপর নাম বীর গুহ এবং তাঁহার একটী উপাধি ছিল—গুণাকর। মহানাদের উত্তরাংশে মহারাজ বিরাট গুহ উদ্যানবাটিকা নির্মাণ করিয়া একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণীও খনন করিয়াছিলেন, সেই পুষ্করিণীটি "বীরপুকুর" নামে খ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সুরম্য রাজোদ্যানের অস্তিত্ব না থাকিলেও পুষ্করিণীটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ঐ পুষ্করিণীর অবস্থা দেখিলে উহা যে বহুকাল পূর্বে খনন করা হইয়াছে এবং ঐরূপ সুবৃহৎ জলাশয় যে সাধারণ লোক খনন করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইটিই "বরাট" নামে খ্যাত। কালক্রমে সেই বরাট নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে মহানাদের বেজপাড়ার জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বসু ঐ স্থানের নাম বৈকুণ্ঠপুর রাখিয়াছিলেন এখনও সেই নামে উহা কথিত হইতেছে। এক সময় ঐ স্থানটী মুসলমান পল্লীতে পরিণত হয় ও সেই সময় হইতে মুসলমানেরা ঐ বীরপুকুরকে পীরপুকুর করিয়া লইয়াছেন এবং কতিপয় বৎসর পূর্বে ঐ পুষ্করিণীর

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটী বটবৃক্ষের নিম্নে তাঁহাদের "ইদগড়" নির্মাণ করিয়াছেন। এক্ষণে বীর পুকুর স্থলে পীরপুকুর হইয়া থাকিলেও কোন কোন স্থানের পীরপুকুরে যেমন বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নানা স্থানের মুসলমানেরা স্নানার্থ সমাগত হইয়া থাকেন ও মেলা বসে এখানে কখনও সেরূপ কিছু হয় না। যে স্থান যাহার অধিকারে আসে, সে তখন তাহা সকল রকমে নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করে, ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং মুসলমানদের সময়ে বীরপুকুর পীরপুকুর হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

এই বীরপুকুরের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে আর একটী বৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, সেটীর নাম "গুণাপুকুর"। এই নামটীও মহারাজ বিরাটের উপাধি প্রকাশক, সুতরাং এই পুষ্করিণীটিও তাঁহার উপাধির স্মৃতি বহন করিতেছে।

আর একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেটি—বশিষ্ঠ গঙ্গা। মহানাদে বশিষ্ঠ কাশী নির্মাণের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কর্তৃক যোগবলে গঙ্গাকে আনয়ন করার ব্যাপার যদি বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হ'লে ঐ বশিষ্ঠ গঙ্গা মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৭ম পুরুষ মহারাজ বশিষ্ঠ গুহ খনন করিয়া থাকিবেন। ঐ পুষ্করিণী জটেশ্বর শিবের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত এবং উহা এক্ষণে ঐ শিবের সেবাইত মোহান্ত মহারাজের অধিকারভুক্ত থাকিলেও উহা চিরকালই বশিষ্ঠ গঙ্গা নামে খ্যাত আছে, উহাকে কেহ কখনও শিবগঙ্গা বলে না। মহানাদের অনতিদূরে সুদর্শন গ্রামে "বশিষ্ঠ" নামে আর একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

মহানাদ-দেপাড়া নামক ১২০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা—যাহা "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস ১ম খণ্ডে" বর্ণিত হইয়াছে—গুহবংশীয় রাজারা প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন, কারণ ঐ রাস্তা মহানাদের বরাট হইতেই বহির্গত হইয়াছে।

নিজ নামে পল্লীস্থাপন করা শুধু ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই ঐ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের যে স্থানে রাজবাটীর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে, যেখানে গভর্ণমেণ্টের খনন বিভাগ খনন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঐ স্থানটীর নাম নগরপাড়া। এই নগরপাড়ার সংলগ্নপূর্বদিকে সুবৃহৎ 'হাড়মালা' পল্লী মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৪র্থ পুরুষ মহারাজ হাড়মল্ল গুহের নাম ঘোষণা করিতেছে। এই হাড়মালা পল্লীটি অতি সুরম্য ও বাসের উপযুক্ত স্থান ছিল বলিয়াই পরবর্তীকালে (২৫০ বৎসর পূর্বে) তাম্বূলী জাতীয় করবংশ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। মহানাদে আগমনের পর করদের অবস্থা খুব ভাল হয় এবং তাঁহারা রাজভবন সদৃশ গৃহাদি নির্মাণ করেন। এই সম্বন্ধে করদিগের বংশধরগণ বলিয়া থাকেন—হাড়মালায় বাস করিবার সময় ঐ স্থানের একাংশে কতকগুলি মুসলমানের বাস ছিল; হাড়মালার পূর্ব সীমায় বাসগৃহাদি নির্মাণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করার পর নিজেদের বাসভবন নির্মিত হইয়াছিল। কালের গতি ও অদৃষ্টের পরিহাসে আজ করবংশের অবস্থা হীন, বাসভবনাদি ভগ্ন ও ইষ্টকাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে! এখনও অবশিষ্ট প্রাচীর-গাত্রে গ্রথিত ইষ্টকের মধ্যে প্রাচীনকালের বৃহদাকারের পুরাতন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে মনে হয়—সেই ইষ্টকগুলি গুহরাজবংশের নিদর্শন। হাড়মল্লের নাম হইতেই যে হাড়মালা

নাম উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই হাড়মালা চিরদিন মহারাজ হাড়মল্ল গুহের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। মহানাদের দক্ষিণে "লক্ষ্মণহাটীর মাঠ" (লক্ষ্মণহাটী গ্রাম এক্ষণে রামনাথপুর নামে অভিহিত) এবং উত্তরে "রুদ্রখণ্ডা" গ্রাম মহারাজ হাড়মল্ল গুহের পিতা মহারাজ লক্ষ্মণ গুহ ও পুত্র মহারাজ রুদ্র গুহের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ন্যায় "হাড়মালা" পল্লী ব্যতীত গুহরাজবংশের আর একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, সেটি—"'আনন্দময়ীর মন্দির"। হাড়মালায় দেবী আনন্দময়ীর মন্দির ছিল, ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বর্তমান আছে এবং ঐ স্থানটী "আনন্দময়ীর ভিটা" নামে কথিত হইতেছে। এই দেবী মৃন্ময়ী ছিলেন। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন হইবার সময় দেবীমূর্তিও ভগ্ন হইয়া যায়, তৎপরে আর মন্দির অথবা মূর্তি পুনর্নির্মিত হয় নাই, কিন্তু তদবধি দেবীর ঘট অন্যত্র ('অখিলেশ্বর শিবের মন্দিরাভ্যন্তরে) রক্ষিত হইয়া আজ পর্যন্ত পূজিত হইতেছেন। শুনা যায় 'আনন্দময়ীর সেবা পূজার জন্য যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার কতকাংশ পূজক পরিবর্তনের সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কোন কোন পূজক অভাববশতঃ নিজের সম্পত্তি বলিয়া কতক বিক্রয় করেন এবং অসাধু জমিদার কর্তৃকও কতক আত্মসাৎ হইয়াছে। এই সকল কারণে এখণে কয়েক বিঘা শালি জমি ও 'আনন্দময়ীর মন্দিরের ভিটা নিষ্কর দেবোত্তর বলিয়া সেটেল্‌মেন্টের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং উহা বর্তমান পূজকের অধিকারে আছে। হাড়মালায় এই 'আনন্দময়ী দেবীকে কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; মহানাদের অন্য কোন রাজা, জমিদার বা কোন ধনবান বংশ এ পর্যন্ত কোন দিন কেহ দেবীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবী করে নাই; কিন্তু গুহবংশেরই কোন রাজা (সম্ভবত হাড়মালা পল্লী-স্থাপয়িতা রাজা হাড়মল্ল গুহ) এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় অথবা গুহগণ যে সময়ে মহানাদ হইতে অন্যত্র যাইয়া বসতি স্থাপন করেন সেই সময় 'আনন্দময়ীর সেবা পূজার জন্য যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দেবোত্তর রূপে এই গুহবংশই দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; কারণ এখনও দেখা যায়—গুহবংশের যে সকল ধনবান ব্যক্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে 'আনন্দময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ইহা অপেক্ষা মহানাদে গুহরাজবংশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

সিংহ ও গুহবংশের আদিম রাজাদের সম্বন্ধে এই দুই বংশের বংশাবলী ছাড়া বৈদিক সাহিত্য খুঁজিয়া দেখিবার দরকার নাই; কারণ এই দুই বংশ অদ্যাপি বিশাল শাখাপ্রশাখা হইয়া ভারতের নানাস্থানে বর্তমান আছেন। গুহবংশের প্রাচীন রাজধানী মহানাদ বরাটের স্মৃতি কবে বিস্মৃতির অতল তলে সমাধি-শায়িত, কিন্তু মহানাদ নগরে তাঁহাদের গৌরব আজ পর্যন্ত ম্লান হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ ঘটক, জগচ্চন্দ্র ঘটক, নন্দরাম ঘটক প্রভৃতির কারিকায় গুহবংশের বংশাবলী আছে, মহানাদ সমাজের নামোল্লেখ আছে। মহারাজ বিরাটের অধস্তন বিংশ জন নরপতি মহানাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মালদহ জেলা পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এখনও তাহার চিহ্ন ঐ জেলায় গুহবংশের স্থাপিত বরাট ও ছাতনা-বরাট গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে

গুহবংশে অনেকগুলি প্রাচীন উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যেমন—গুহ ঠাকুরতা, গুহ কীর্তনীয়া, গুহ মীরবহর, গুহ দস্তীদার, গুহ খাসনবীশ, গুহ দেওয়ান, গুহ বক্সী, গুহ মজুমদার, গুহ সরকার, গুহ নিয়োগী, গুহ খাঁ, গুহ রায়, গুহ রায় চৌধুরী ইত্যাদি। মহানাদের এই গুরুদ্বারেই গুহবংশের অভ্যুত্থান হয়।

॥ মহানাদে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির তালিকা ॥

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহানাদ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। হুগলী জেলায় বৈদ্যবাটিতে "সারদাচরণ মিউজিয়মে" উহা সংরক্ষিত হইয়াছে।

মৃণ্ময় প্রদীপ (গুপ্তযুগের)। চারিটি মৃণ্ময় ঢাকনী (গুপ্তযুগের), তিনটি মৃণ্ময় ওজনের বাটখারা (গুপ্তযুগের), মৃণ্ময় টাকু (গুপ্তযুগের), চারিখণ্ড রঙ্গীন মৃৎপত্র (পাঠান ও মোগলযুগের), নক্সাদার ইষ্টক—মহানাদ গড়পাড়ায় আবিষ্কৃত। একটি প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন। প্রস্তরময় দুইটি বিষ্ণু মূর্তি (পাল যুগের)—মহানাদ গড়পাড়ায় আবিষ্কৃত প্রস্তর মূর্তিতে পালযুগের পুষ্পের নিদর্শন—মহানাদ গড়পাড়ায় আবিষ্কৃত।

কলিকাতার সরকারী যাদুঘরে (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম) সংরক্ষিত দ্রব্যাদির তালিকা :

টালি—(গুপ্তযুগের), "জাম্বেলা" প্রস্তর মূর্তি—(বৌদ্ধযুগের), বৌদ্ধযুগের মৃণ্ময় ছাঁচ ও মূর্তি (খৃঃ ৫ম শতাব্দীর), মহানাদ বশিষ্ট গঙ্গায় আবিষ্কৃত একটি একপদ ভৈরব মূর্তি,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

মহানাদ নাথ মঠের ভূতপূর্ব মোহন্ত শ্রীশ্রীলছমীনাথ যোশীয়াদের নির্দেশ মত একটি পাল যুগের "হর-পার্বতী" মূর্তি—কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননকালে একটি ইমারত, একটি কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ স্থানে একটি গুপ্তযুগের Stucco head অর্থাৎ প্রাচীরের কারুকার্যের জন্য মস্তক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রত্নদ্রব্য ও মহানাদে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের সুবর্ণ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মহানাদ ও সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রতিষ্ঠিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রত্নশালায় পৃথকভাবে সজ্জিত আছে।

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি কুমারেগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা ও একটি স্কন্দ গুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা সংরক্ষিত আছে।

মহানাদের পার্শ্ববর্তী রোসনা নামক পল্লীতে আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণু মূর্তি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

মহানাদে ১৫ ফুট ভূগর্ভে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন নক্সাদার মৃণ্ময় হাঁড়ি ও কটরা আবিষ্কৃত হয়। উভয় দ্রব্য সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

মহানাদ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন :

মহানাদ রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম
শিবের মন্দির মনোহর।
রাজা চন্দ্রকেতু গড়ে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কণক উৎপল॥

॥ গোস্বামী-মালিপাড়া ॥

গোস্বামী-মালিপাড়া হুগলী জেলায় পোলবা থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু প্রাচীন স্থান। সুদূর অতীতে এই গ্রামের ভূভাগ কেদারমতী নদীর গর্ভগত ছিল। এই নদী এখনও ক্ষীণাকারে গোস্বামী-মালিপাড়া ও দাঁতড়া গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যখন এই নদী খুব বেগবতী ছিল, তখন পারাপারের জন্য ইহার দুই তীরে দুইটি ঘাট নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই দুইটি ঘাটে—উত্তর দিকে স্বারবাসিনীতে শ্রীশ্রীবিষহরি দেবী ও দক্ষিণ দিকে সানিহাটে শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদের সেবার জন্য কুচপালের নবাবের জমি দান করা আছে। কালক্রমে এই নদীগর্ভে যে চর বাহির হয়, সেই চরে রাজা স্বারপালের পুষ্পোদ্যান হইয়াছিল এবং রাজার মালিরা সেই চরে বাস করিত বলিয়া, ইহা মালিপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়।

পূর্বে এই অঞ্চল দামোদরের ভাগীরথীমুখী শাখা-প্রবাহের তীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের উত্তরে কেদারমতী নদী দামোদরের এই প্রাচীন প্রবাহের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর শ্রীপাদ খঞ্জভগবান আচার্যের সময় হইতে গোস্বামীগণ এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন এবং গোস্বামীদের প্রাধান্য হেতু ইহা গোস্বামী মালিপাড়া বলিয়া পরিচিত হয়। ভগবান আচার্য একজন সাধক পুরুষ ছিলেন: প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও তাঁহার বিষয় লিখিত আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন ঃ

খঞ্জন আচার্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥
খঞ্জনে দেখিলা প্রভু দিয়া হরি বোল।
দুবাহু পসারিয়া তারে দিলা কোল॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে ঃ

ভগবান আচার্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে বিষয়॥

ভগবান আচার্য মহাশয় গৃহাশ্রমে বাস করা কালে পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন, শ্রীশ্রীবৃন্ধামাতাজীউ স্বপূজিত প্রিয়াজীসহ কেশবলালজীউ প্রভৃতি বিগ্রহের পূজা মালিপাড়া গ্রামে প্রবর্তন করিয়া এই স্থানে প্রেম-দীক্ষা-শিক্ষা প্রবর্তনের বীজ পত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আধুনিক গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে আজও তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। মহাপ্রভুর সময় হইতেই বাংলাদেশে তাঁহাদের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং আজও এই গ্রামের অসংখ্য মন্দিরাদি দেখিয়া, পূর্বে ভগবান আচার্য মহাশয় যে ইহাকে সত্যসত্যই অভিন্ন বৃন্দাবনরূপে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করা যায়।

কলিকাতা হইতে গোস্বামী-মালিপাড়ার দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল এবং চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে ইহা দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের জনসংখ্যা ১,৮৩৪ জন। গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, সাধারণ গ্রন্থাগার, ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যালয়, হরিসভা, পল্লী উন্নয়ন সমিতি, দাতব্য চিকিৎসালয় সমবায় ব্যাঙ্ক, নাট্যমন্দির এবং খেলাধূলার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। একটি ছোট গ্রামের মধ্যে এরূপ সুব্যবস্থা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইন্দোর প্রজা পরিষদের সভাপতি হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউ ও রাধাকান্তজীউর মন্দির বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। শ্রীপাদ বল্লভ গোস্বামী মদনগোপালজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের মধ্যে প্রিয়াজীসহ রাধাবল্লভ এবং রাধা মদনগোপাল এই দুই যুগল মূর্তি আছেন। এতদ্ব্যতীত গোস্বামী বংশের বংশীবাদন শালগ্রাম এবং শ্রীশ্রীবৃদ্ধামাতা নামক দক্ষিণ কালিকা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। একটি মন্দিরের মধ্যে দুইটি যুগলমূর্তি কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটি যুগলমূর্তি থাকিবার সম্বন্ধে এইটি ইতিহাস আছে।

বল্লভ গোস্বামী সর্বপ্রথম প্রিয়াজীসহ রাধাবল্লভের সেবা এই মন্দিরে প্রকাশ করেন। ইহার অল্পদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী নামক এক শিষ্য তাঁহার কুলদেবতা মদনগোপালজীউর বিগ্রহ লইয়া গুরুগৃহে এই গ্রামে আসেন। তিনি রাধাবল্লভ দর্শন করিয়া নদীতে স্নান করিতে যান; স্নানান্তে বাড়ি যাইবার সময় তিনি আর মদনগোপালকে মন্দির হইতে উঠাইতে পারেন নাই। পরে মদনগোপাল কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তিনি এই স্থানেই থাকিবেন, অন্যত্র যাইবেন না। ব্রহ্মচারী ইহাতে বিশেষ ব্যথিত হইয়া ত্রিবেণীতে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। বল্লভ গোস্বামী মহাশয় মদনগোপালজীউকে রাধাবল্লভের পার্শ্বে রাখিয়া যথাবিধি সেবাপূজা দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করেন এবং কথিত আছে যে, বিগ্রহের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় রাধারাণীর বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মদনগোপালের সহিত বিবাহ দেন এবং একই মন্দিরে যুগলসেবা লাভ করেন।

এই মন্দিরের মধ্যে তিনশত বৎসরের পুরাতন একখানি পাল্‌কি আছে। এই পালকি করিয়া দুই যুগলমূর্তি রাসের সময় রাসমঞ্চে এবং রথযাত্রার সময় রথে আরোহন করিবার জন্য যান। মন্দিরের বাহিরে বল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের পুষ্পসমাধি রক্ষিত আছে। অদ্যাপি তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব সপ্তাহব্যাপী ধরিয়া এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কর্তৃক মন্দির ও নাটমন্দির প্রতি বৎসর সুসংস্কৃত হয়। ১২৮৫ সালে শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী নাটমন্দিরে শ্বেতপাথর বসাইয়া দেন, ইহা একটি প্রস্তরে লিখিত আছে।

মন্দিরের পার্শ্বে দেশদেশান্তর হইতে আগত বৈষ্ণবদিগের থাকিবার জন্য সুন্দর ঘর আছে। এই বৈষ্ণব-ঘরের নির্মাতার নাম একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। ফলকটি এইরূপ ঃ

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব
মদনগোপাল দেবশর্মা
ও
মাতৃদেবী নিতম্বিনী দেবীর

তালচিনান নিবাসী তদীয় পুত্র
শ্রীতিনকড়ি পাঠক দেবশর্মা
কর্তৃক এই বৈষ্ণববাস্তু নির্মিত হইল।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দির। শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রিয়াজীসহ রাধাকান্ত বিগ্রহ মহারাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বিগ্রহ হুগলী জেলার পোলবা নিবাসী শ্যাম রায়ের গৃহে পূজিত হইতেন। শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী স্বপ্নাদেশ পাইয়া উক্ত বিগ্রহ গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যসেবা ও ভোগরাগাদিতে পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে জনৈক বটব্যাল ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যাকে লইয়া মন্দিরে আসেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যু হয়। কন্যার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ বিশেষ কাতর হন; তখন ভাগবতানন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ব্রাহ্মণ কন্যা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়াজী হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণকে শোক ত্যাগ করিতে বল এবং তাঁহার কন্যার একটি ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া আমার পার্শ্বে সংস্থাপন কর। উহা "বড়ালের ঝি" নামে রাধাকান্তজীউর বাম পার্শ্বে অদ্যাপি বিরাজিতা আছেন। এই প্রাচীন বিগ্রহ অপহৃত হয় বলিয়া একটি সংবাদ ১লা নভেম্বর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের 'যুগান্তর' পত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপ ঃ

বিগ্রহ অপহৃত ॥ মালিপাড়া গ্রামে চাঞ্চল্য

মালিপাড়া (হুগলী) ২৮শে অক্টোবর—শ্রীপাট গোস্বামী মালিপাড়ায় শ্রীরাধাকান্তজীর বিগ্রহ অপহৃত হওয়ায় এখানে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ, গত ২৪শে আশ্বিন শনিবার রাত্রে গোস্বামী বংশের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী ও তাঁহার দুই প্রিয়াজিসহ এই মন্দিরে স্থাপিত আরও কয়েকটি বিগ্রহ চোরেরা লইয়া গিয়াছে। ঘটনাটি স্থানীয় পুলিশের গোচরে আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মন্দিরের বাহিরে শ্রীধ্রুবচাঁদ ও শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত একটি ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর মন্দির
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিকর
শ্রীপাদ খঞ্জ ভগবান আচার্যের পুত্র
শ্রীপাদ রঘুনাথ আচার্যের পৌত্র

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বা ভাগবতানন্দ
গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৩৬১ সালের ২৪শে কার্তিক রাধাকান্ত জীউর মন্দির ও নাটবাংলা আন্দুল-মৌড়ী নিবাসী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া কুণ্ডু-চৌধুরাণী তাঁহার পিতা মাকড়দহ নিবাসী কেদারনাথ শ্রীমানী ও মাতা কুসুমকুমারী দাসীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমূল সংস্কার করিয়া দেন। এই কথাগুলিও একটি প্রস্তরে লিখিত আছে।

রাধাকান্তজীউর মন্দির সংলগ্ন সেবাকুঞ্জ ১১ই বৈশাখ ১৩৪৩ সালে সংস্কার করা হয়। আড়িয়াদহ নিবাসী শ্রীপ্রিয়নাথ দে ও তাঁহার সহধর্মিণী বসন্তকুমারী দাসী স্বর্গীয় নবকুমার দে'র স্মৃতিরক্ষার্থে উহা সংস্কার করিয়া দেন। ভাগবতানন্দ গোস্বামী খঞ্জ ভগবান আচার্যের পৌত্র; পূর্বে তাঁহার নাম ছিল কৃষ্ণদাস। 'জগদীশচরিত' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একবার বৃন্দাবনে যাইলে, শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর পাইয়া তিনি তাঁহাকে 'ভাগবতানন্দ' আখ্যা দেন তাঁহার সম্বন্ধে জগদীশচরিতে এইরূপ লেখা আছে ঃ

পূর্বেতে শ্রীকৃষ্ণ নাম আছিল বিখ্যাত।
তাঁহার পাঠ শুনি প্রভুর হৈল মহাপ্রীত॥
দেখি গৌর ভক্তগণের হইল আনন্দ।
সবে নাম রাখিলেন 'ভাগবতানন্দ'॥

তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং রাধাকান্তজীউর মন্দিরে জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ভগবৎ পর্বের অনুষ্ঠান করিতেন। অদ্যাপি উক্ত অনুষ্ঠানগুলি যথারীতি হইয়া থাকে। তিনি "গোপাল-মন্ত্র-পদ্ধতিঃ" নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। মন্দিরের বাহিরে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা-দ্বাদশী হইতে সাত দিন যাবত তিরোভাব মহোৎসব এই স্থানে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই গ্রামের মাঝেরপাড়ায় একটি প্রাচীন শিব মন্দির ও কালী মন্দির, পূর্বপাড়ায় মদনমোহন জীউর মন্দির, পশ্চিমপাড়ায় বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দির এবং আচার্যপাড়ায় গোপীনাথজীউর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঝেরপাড়ার শিব মন্দির ও কালী মন্দিরের নিত্যসেবার জন্য বর্ধমানের মহারাজা ও আন্দুলের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত জমি আছে। উহার আয় হইতেই সেবা পূজা হইয়া থাকে। শিব মন্দির বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া কুণ্ডু-চৌধুরাণী ১৩৩১ সালে ইহা সংস্কার করিয়া দেন।

পূর্বপাড়ায় মদনমোহনজীউর মন্দির বর্তমানে ভগ্ন হইয়াছে। একবার এই গ্রামের চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দেন। আচার্যপাড়ায় গোপীনাথ জীউর সেবাপূজা স্থানীয় চক্রবর্তীগণ করিয়া থাকেন। দোলের সময় এই স্থানে মেলা হয়। প্রতি বৎসর গ্রামে মহাধুমধামের সহিত সার্বজনীন অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে পূর্বে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে সম্পাদকরূপে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামীর এবং প্রধান-শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাব্রতী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রধানতঃ চেষ্টায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ইহা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

বিশ্বনাথবাবুর চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনও হইয়াছে। ইহা নির্মাণের জন্য পণ্ডিত বঙ্কিমবিহারী গোস্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী ও দুই পুত্র শ্রীনবগোপাল ও জয়গোপাল গোস্বামী ১০০১্ টাকা সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ইটালী নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় যদুনাথ সরকারের সহধর্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সরকার তাঁহার ত্যক্ত এষ্টেট হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া এই বিদ্যালয়ে সাহায্য করিবার জন্য একটি উইল করিয়া গিয়াছেন।

গোস্বামী-মালিপাড়ায় গিরিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুন্দর নিজস্ব ভবন আছে। শ্রীঅজিতকুমার মণ্ডল ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অর্থদানে ও সরকারী অর্থ-সাহায্যে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামীর চেষ্টায় বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। উচ্চ-বিদ্যালয়ের সহিত প্রাথমিক-বিদ্যালয়ের বিভাগের পূর্বে গৃহ নির্মাণের জন্য মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করেন। বর্তমানে সেই গৃহই বর্ধিত আকারে উচ্চ-বিদ্যালয় ভবন হইয়াছে।

শ্রীশিবনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী এই গ্রামে 'ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব' স্থাপন করেন; উহার ত্রি-শাখায় খেলাধূলা, গ্রন্থাগার ও অভিনয়ের সুব্যবস্থা আছে। গোস্বামী-মালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী ও শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বর্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিজস্ব ভবনও নির্মিত হইয়াছে এবং ইহা গ্রাম্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাররূপে পরিগণিত। গোস্বামী-মালিপাড়ার বৃহৎ রথ যাহা মদনগোপালজীউর রথযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা কিশোরীমোহন গোস্বামীর চেষ্টায় নির্মিত হয়। সংস্কৃত চর্চার জন্য এই স্থান এক সময় বিখ্যাত ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়নের জন্য বহু টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। এই গ্রামের গৌরগোপাল গোস্বামী তর্কালঙ্কার এবং হর্ষানন্দ গোস্বামী অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য বর্ধমান মহারাজার দ্বারপণ্ডিত হন। নবকৃষ্ণ গোস্বামী ও সীতানাথ গোস্বামী 'মন্ত্রমুক্তাবলী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সঙ্কলিত গোস্বামী মহোদয়গণের বংশাবলীর ভূমিকায় গোস্বামীদের পাঁচটি দেবালয়ের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ্য ঃ

শ্রীবল্লভী রাধাকান্ত মদনগোপাল।
রাধাদামোদর গোপীনাথ পরম দয়াল॥
এই পঞ্চ প্রভুর শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
প্রেমে কৃষ্ণসেবা করে বংশধরগণ॥

মালীপাড়া গোস্বামী সমাজ

ক্ষিরোদবিহারী গোস্বামী রচিত "শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবলী" নামক গ্রন্থে মালীপাড়া গোস্বামী সমাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

ইহাও জাহ্নবীর কীর্তি। চট্টবংশের কুলীন অরবিন্দ চট্টো। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহর, তৎপুত্র কন্দর্প, তস্য কনিষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীবর শতানন্দ খ্যাত। এই ষষ্ঠীবর তাহার পিতার নিকট "বুড়োমা" দক্ষিণাকালীর মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন। যাহা অদ্যাবধি 'মদনগোপাল

জিউর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তস্য মধ্যম পুত্র খঞ্জ ভগবান্ আচার্য। তস্য পুত্র রঘুনাথ আচার্য।

তথাহি

পাণ্ডিতো জগদীশশ্চ যজ্ঞপত্নীমম প্রিয়া।
আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জ মমভক্তো মমাংশ ভাক্॥
(অনন্ত সংহিতায়াং)

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য!
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করেন নিমন্ত্রণ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয় বিমুখ আর্য বৈরাগ্য প্রধান॥
গোপাল ভট্টাচার্য নাম তার ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তার ঠাঁই॥

অপিচ

বঙ্গদেশে এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল শুনাইতে॥
ভগবান্ আচার্যসনে তার পরিচয়।
তারে মিলি তার ঘরে করিল আলয়॥

উক্ত ভগবান্ আচার্য বিকলাঙ্গ ছিলেন, সুতরাং কুলশাস্ত্রানুসারে তাঁহার কুলমর্যাদা ছিল না। তিনি গোস্বামী মালীপাড়ায় মধুসূদন ঘটকের কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া মালীপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। উক্ত শতানন্দের পুত্র খঞ্জ ভগবান্ ও গোপাল কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লয়েন। খঞ্জ ভগবানের পুত্র রঘুনাথ আচার্য মোং খেতরীর মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবী মাতা গোস্বামিনীর কৃপায় মোহন্ত পরিগণিত হইয়া, মোহন্ত পর্যায়ের আসনপ্রান্ত হইয়াছিলেন। এই কারণ বশতঃ ইহারা গুরুস্থানীয় হইয়া বহু নীচজাতি পর্যন্ত শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য অতি বিরল, শ্রীনিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের নীচ জাতি শিষ্য ছিল না। ইহারা উভয়ে কখন নীচ জাতীয় শিষ্য করেন নাই। তাহারা জাতিভেদ তুচ্ছ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অনুসারে অকাতরে হরিনাম ও হরিভক্তি প্রদান করিতেন; কিন্তু মন্ত্র দিতেন না। এক্ষণে আমাদের ঐরূপ আচার বা শিক্ষা নাই। উদরজ্বালায় ও প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া ঐসকল আচার পরিত্যাগপূর্বক সকল কার্যেই তৎপর হইতে হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দবংশে চাকুরী বা কৃষি বাণিজ্য ফলপ্রদ হয় না। কাজে কাজেই এই সকল হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা

প্রয়োজনীয় না হইলেও একটী পুরাতন ইতিহাস স্মরণ হইল, পাঠকবৃন্দ ইহাতে আমাদের পূর্ব পূর্ব আচার ব্যবহারের কিছু নমুনা পাইবেন।

পূর্বকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধস্তন পঞ্চম পর্যায়ে শ্রীল সন্তোষ গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীল কেবলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু। একদিবস উষাকালে কেবলকৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেছিলেন, এমন সময় ধনমদে গর্বিত এক তন্তুবায় দীক্ষাগ্রহণ হেতু কেবলকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে সেই স্থানেই উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে এরূপ অনুরোধ করিতেন, কেবলকৃষ্ণ প্রভু মৃত্তিকাশৌচ করিতেছেন, সেই জন্য বিরক্ত হইয়া ঐ তন্তুবায়কে বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ, তুই আবার এমন সময় কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলি? আমি শূদ্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করি না ও করিব না, কেন আমাকে সকল সময় বিরক্ত করিস?" এইরূপ বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তন্তুবায় সহাস্য বদনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক বলিল, "প্রভু! আমার কার্য সফল হইয়াছে. আর আমি আপনাকে বিরক্ত করিয়া অপরাধী হইব না, এবং মন্ত্র গ্রহণেরও আর প্রয়োজন নাই। 'লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।"

কেবলকৃষ্ণ প্রভু চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কার্য সফল হইয়াছে?" তন্তুবায় আহ্লাদে গদগদ স্বরে বলিল, "আপনার মুখনিঃসৃত মহামন্ত্র আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। এই গোষ্পদ সম ভবনদী অনায়াসে পার হইব, অপর চেষ্টার অপেক্ষা নাই।" এই বলিয়া তন্তুবায় প্রস্থান করিল। কেবলকৃষ্ণ তাহার অসীম শ্রদ্ধার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিস্তর দ্রব্যসম্ভার এবং তাহার সহিত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা সন্তোষ প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইল। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া কেবলের পিতা জিজ্ঞাসা করিলে, ভৃত্যগণ বলিল, "মহাশয়, আমাদের প্রভু গুরুদক্ষিণা ও পূজার দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছেন।" প্রভু বিরক্ত হইয়া পুত্রকে ইহার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেবলকৃষ্ণ প্রাতঃকালের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জ্ঞাত করিলেন। সন্তোষ প্রভু পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। কেবলকৃষ্ণ আপন অপরাধ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা সন্তোষ প্রভু বলিলেন, "তুমি নীচ জাতি শিষ্য করিয়াছ, তোমার সহিত একত্রবাস করিলে আমাকে পাপভোগী ও নিন্দিত হইতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাদিগকে হরিনাম বিলাইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। শিষ্য করিতে আদেশ করেন নাই।"

কেবলকৃষ্ণ যখন গৃহান্তরে বাস করিবার জন্য বহির্গত হইলেন, সেই সময় তাঁহার উপাস্য 'লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা তাহাকে দিয়াছিলেন মাত্র। তন্তুবায় দূরের কথা, আমরা ধনবান্ হাড়ি পাইলে ছাড়ি না। যাহাকে স্পর্শ করিলে দেহ ও মন একেবারে কলুষিত হয়, তাহাকে অর্থলোভে আমরা আরাধ্যদেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেও কুণ্ঠিত নহি। বরং আমরা ব্রাহ্মণাদিকে নির্ধনতা হেতু অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, কিন্তু বর্ণসঙ্কর হইতে বিবিধ নীচ জাতিক আদরের সহিত শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। ইহা

অপেক্ষা আর অধঃপতন কাহাকে বলে? বেশ্যার ত কথাই নাই, ইহা আমাদের পরম পুরুষার্থ। এইরূপ শিষ্য আমাদের বিশেষ যত্নের ধন ও আদরের সামগ্রী।

জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য খঞ্জভগবান্ আচার্যের পুত্র রঘুনাথ আচার্যের দুই বিবাহ। প্রথমবার গর্ভে গোপীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 'বল্লভীবল্লভ। ইহার তিরোভাব উপলক্ষ্যে অদ্যাবধি অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস মহোৎসব হয়। রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ বল্লভ গোস্বামী খ্যাত, বল্লভী কান্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার তিরোভাব উপলক্ষ্যে চৈত্রী শুক্লা একাদশীতে মহোৎসব আরম্ভ হয়। রাধাবল্লভ জিউর সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। ইহার ৫ পুত্র পাঁচ বাড়ীর গোস্বামী বলিয়া খ্যাত। রঘুনাথের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস ভাগবতানন্দ গোপাল মন্ত্র পদ্ধতিপ্রণেতা রাজপণ্ডিত ছিলেন। ইহার তিরোভাব উপলক্ষ্যে মালীপাড়ায় ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীতে মহোৎসব হয়। 'রাধাকান্ত জিউর সেবা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় শ্যামদাস মোং হারিটে বাস করেন। 'গোপীনাথ জিউর সেবা প্রকাশক। জ্যৈষ্ঠী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইহার তিরোভাব উপলক্ষ্যে মহোৎসব হয়। তৃতীয় রামদাস ইহার বাসস্থান খামারপাড়া।

মালীপাড়ার গোস্বামিগণ খনোর চাটুতি খ্যাত। ইহারা কত পূর্ব হইতে ভঙ্গভাবাপন্ন তাহা বলা কঠিন। তবে এই পর্যন্ত জ্ঞাত হইয়াছি যে রতিরামের বংশে শক্তিরামের চতুর্থ পুত্র লালমোহন, মালীপাড়া নিবাসী জগদানন্দ তর্কপঞ্চানন গোস্বামীর কন্যা বিবাহে ভঙ্গ হয়েন।

॥ হারিট ॥

পোলবা থানার অন্তর্গত হারিট একটি গণ্ড গ্রাম। গোস্বামী মালিপাড়া হইতে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী এই গ্রামে আসিয়া প্রথমে বসতি স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ মদনমোহনজীউর সেবা প্রতিষ্ঠা পূর্বক একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরে তাঁহার পিতামহ শ্যামদাস গোস্বামীর পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রামও পূজিত হন। খঞ্জ ভগবানাচার্যের পুত্র রঘুনাথ আচার্য মহাপ্রভুর আদেশমত ও জগদীশ পণ্ডিতের আদেশমত গুরুগৃহে বাস পূর্বক শিক্ষাদীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া মালিপাড়ায় আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষাশিক্ষাদি প্রদান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরের গৃহে খেতুড়ী গ্রামে যে বিরাট মহোৎসবের আহ্বানে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ যে যে স্থানে ছিলেন, তাঁহারা সকলে সেই স্থান হইতে মহোৎসবে গিয়াছিলেন। সেই মহোৎসবে রঘুনাথ আচার্য নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর সহিত সপ্তগ্রামে মিলিত হইয়া এক সঙ্গে মহোৎসবে গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে ঃ

রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥
তেঁহো আসি ঈশ্বরীকে তথাই মিলিলা।
অতি প্রাতে উঠি সবে অম্বিকা আইলা॥

শ্যামদাস গোস্বামী রঘুনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত। তাহার পুত্র গৌরাঙ্গচরণ। গৌরাঙ্গের পুত্র হরেকৃষ্ণ গোস্বামী মালিপাড়ার বাস ত্যাগ করিয়া হারিটে আসেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শ্যামদাস গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমী হইতে তিন দিন ধরিয়া হারিট গ্রামে গোপীনাথজীউর মন্দিরে মহোৎসব উপলক্ষ্যে বহু বৈষ্ণবের সমাবেশ হয়। তদুপলক্ষ্যে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

হারিট গ্রামে যন্ত্ররূপিণী বাস্তুকালী আছে। ইহা স্থানীয় একটি পুকুর হইতে পাওয়া যায়। মন্দিরে উৎকীর্ণ একখানি পাথরে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রী কালীমাতা বিজয়

স্থাপিত ১২৯৮ সাল

রাধাগোপীনাথ জীউ ও মদনমোহন জীউর বিগ্রহ অতি সুন্দর। উহাদের আলোকচিত্র গ্রন্থে দেওয়া হইল। অগ্রহায়ণ মাসে কাত্যায়নীকল্পে বিগ্রহের অষ্টকালীন সেবা পূজা উল্লেখযোগ্য। ভোর চারটায় মঙ্গলারতি, নাম সংকীর্তন, মন্দির পরিক্রমা। সকাল সাতটায় শয্যাউত্থান, আরতি ও ভোগরাগ। আটটায় গোষ্ঠের আরতি ও ভোগরাগ। দশটায় সেবা, ফলমূলাদি, চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদভাগবত গ্রন্থ পাঠ। বেলা একটায় অন্নভোগ, আরতি ও শয়ন। বৈকাল চারটায় গাত্রোত্থান, ও ধূপারতি। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সন্ধ্যারতি ও নামকীর্তন এবং রাত্রি দশটায় ভোগারতির পর শয়ন।

এই গোস্বামী বংশ পূর্বে সংস্কৃত চর্চা, ভগবন্নাম সংকীর্তন এবং গীতবাদ্যাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। গোস্বামীদের অসাধারণ বৈষ্ণবতা দেখিয়া রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বলিয়া এই বংশ গৌরবান্বিত হইয়াছেন বলা যায়। পূর্বে হারিট গ্রামে অনেক টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল এবং অধ্যাপকগণ আহার ও বাসস্থান দিয়া নিজেদেরে চতুষ্পাঠীতে ছাত্র রাখিতেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত ও মহাভাগবত গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। হারিট ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন অনেকগুলি গ্রাম আছে। গ্রামে পোষ্ট অফিস, বিদ্যালয় হরিসভা আছে। হারিটের জনসংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭২ জন।

॥ দাঁতড়া ॥

গোস্বামী-মালিপাড়ার পার্শ্বস্থিত দাঁতড়া গ্রাম কেদারমতি নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে যখন এই নদী বেগবতী ছিল তখন এই গ্রাম রেশমের ও তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানের রেশম **'লালশশি'** বলিয়া খ্যাত। এখনও গ্রামে লাল বা কাল রঙের তাঁতের কাপড় (১৮ হাত × ২ হাত) তৈয়ারী হয়। এই গ্রামের পশ্চিমে ভূশালী ও দীঘাগোড় এবং পূর্বে কেশবপুর ও সোমসাড়া গ্রামেও খুব ভাল কাপড় তৈয়ারী হইত।

গ্রামে ভট্টাচার্যদের শিবমন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। পূর্বে গ্রামে ভৈরবনাথ ও কাশীনাথের মন্দির ছিল। বর্তমানে উহা বিনষ্ট হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী কালী গ্রামের জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। কাশীনাথ ঘোষালের টোল এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। চৌধুরীদের কালী মন্দির বর্তমানে ভগ্ন। শিবনারায়ণ ঘোষাল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দাঁতড়ার জনসংখ্যা ৪০৪ জন।

॥ দ্বারবাসিনী ॥

দ্বারবাসিনী পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রাম। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এই স্থান রাজা দ্বারপাল নামক এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার নামানুসারে এই স্থান দ্বারবাসিনী বলিয়া খ্যাত হয়। পাল বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বংগদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত আছে; তাঁহারা ভূস্বামী বা ভুঁইয়া রাজা নামে খ্যাত ছিলেন বলিয়া হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর রাজা মহিপাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি বৌদ্ধ-ধর্মালম্বী হইলেও তাঁহার পুত্র দ্বারপাল হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কিম্বদন্তী এইরূপ যে, সেইজন্য পিতাপুত্রে মতানৈক্য হওয়ায় দ্বারপাল এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন ও পরবর্তীকালে একটা ক্ষুদ্র রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা দ্বারপাল ও তাঁহার বংশধরগণ বহু বৎসর যাবত এই স্থানে রাজত্ব করেন কিন্তু পাণ্ডুয়া বিজেতা সাহাসুফি যে সময় মহানাদ আক্রমণ করেন সেই সময় দ্বারবাসিনীর তৎকালীন অধিপতি মহানাদ রক্ষার জন্য সাহা সুফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, তাঁহারা যবন হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মদান শ্রেয় বলিয়া সপরিবারে অগ্নি কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন। মহানাদের ন্যায় এই স্থানে জীয়ৎ-কুণ্ডু নামক একটি বৃহৎ জলাশয় আছে এবং এই রাজার পরাজয় সম্বন্ধে মহানাদের ন্যায় একটি গল্পও প্রচলিত আছে। রাজা দ্বারপাল দ্বারবাসিনী নামক এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন উহা বর্তমানে বীরভূম জেলার মল্লারপুর গ্রামে অবস্থিতা আছেন। বর্তমানে রাজবাড়ীর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে কুচপালের নবাব বংশের কোন ব্যক্তি এই স্থানে বসবাস করিতেন, তাহার প্রাসাদ ও দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত বরাহী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই গ্রামে বিষহরী নামক এক জাগ্রতা দেবী আছেন। লালচাঁদ ঘোষের উদ্যোগে দ্বারবাসিনীর শ্রীশ্রীবিষহরি ও রুদ্রাণীর শ্রীশ্রীকালী প্রতিষ্ঠিত হন। দেবীর মূর্তি দ্বিভূজা, বর্ণ কৃষ্ণ ও বামে মহাদেব দণ্ডায়মান আছেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, সেনহাটির বিশালাক্ষ্মীদেবী ও দ্বারবাসিনীর বিষহরি দেবী দুই ভগিনী। দেবীর সেবার জন্য কুচপালের পূর্বোক্ত নবাবের কিছু জমি দান করা আছে।

মোগল রাজত্বকালে দ্বারবাসিনী মহানাদ পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য এই সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বারবাসিনীতে 'মোগলভিটা' নামে স্থানটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রাচীন ঘর বাড়ির নিদর্শন এখনও এই স্থানে দেখা যায়। বাড়ি পড়িয়া যাওয়ায় স্থানটি বর্তমানে জংগলে পরিপূর্ণ একটি ছোট পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে ইহা কোন উচ্চরাজকর্মচারীর বাসস্থান ছিল বলিয়া মনে হয়। গ্রামে এখনও বহু পীরের আস্তানা আছে। এই অঞ্চল হইতে যে-সব দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মহানাদ, দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া একই প্রাচীন সভ্যতার স্তরভুক্ত ছিল বলা যায়। দামোদরের প্রাচীন প্রবাহের একটি শাখা দ্বারবাসিনীর নিকটে এখনও আছে, উহার নাম কেদারমতী। এই নদীর একদিকে দ্বারবাসিনী ও অন্যদিকে

সেনহাটি অবস্থিত। দ্বারবাসিনীর মধ্যে পালপাড়ায় বহু যোগী বাস করেন। ব্রাহ্মণপাড়ায় ধর্মঠাকুরের পূজারী হইতেছে ডোম। এই গ্রামের প্রধান উৎসব নাগপঞ্চমীর দিন বিষহরির বা মনসার পূজা। পূর্বে এই অঞ্চল শৈবপ্রধান ছিল। তাহার পূর্বে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাধান্যের অসংখ্য নিদর্শন এই স্থানে পাওয়া যায়।

পূর্বে এই স্থানে নীলের কারখানা ছিল; অদ্যাপি কারখানার ইষ্টক নির্মিত চিমনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের "বর্ধমানের জ্বর" নামক মহামারীতে ইহার জনসংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। দ্বারবাসিনী গ্রামে মহামারীতে যত লোক মরিয়াছিল হুগলী জেলার মধ্যে আর কোন গ্রামে এত অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় নাই। এই মহামারীতে দ্বারবাসিনীর কোন কোন বাটির সমস্ত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং কত শত লোক যে গৃহের মধ্যে মরিয়া তথায় পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

'বর্ধমানের জ্বর' বলিয়া কথিত ম্যালেরিয়া জ্বর আসিবার পূর্বে সুস্থ ব্যক্তি ইহার কোন আভাস পাইত না। সুস্থ শরীরে হৃৎকম্প দিয়া জ্বর আসিত এবং সে জ্বর প্রাণ বহির্গত হইবার পরও ছাড়িত না। অধিকাংশ স্থলে দশ-বার ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইত। পল্লীগ্রামে সেই সময় ডাক্তার ছিল না; হাতুড়ে বৈদ্য ও পাচন বিক্রেতাগণই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এই রোগে রোগীকে বৈদ্য দেখিতে আসিবার পূর্বেই তাহার ভবযন্ত্রণা শেষ হইয়া যাইত। গৃহ মধ্যে ও রাস্তার ধারে সে সকল মৃতদেহ পচিয়াছিল, বহু বৎসর যাবত সেই নর কঙ্কালগুলি রাস্তায় পড়িয়া তবে মাটিতে মিশিয়াছিল। শৃগাল কুকুর ও শকুনী গৃধিনীর দল গৃহ হইতে শবদেহ টানিয়া রাস্তায় বসিয়া নির্ভয়ে ভক্ষণ করিত। বহু মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শৃগাল কুকুর তাহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইবার পূর্বেই ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। এই মহামারীতে দ্বারবাসিনীর বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল—যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, তাহারাই কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়াছিল।

দ্বারবাসিনীতে মহামারীর সময় বহু ভৌতিক গল্প রটিয়াছিল; নিম্নে একটি উল্লেখ্য ঃ দ্বারবাসিনী গ্রামে জনৈক গুরুদেব তাঁহার শিষ্যবাটিতে সেই সময় আগমন করেন; কিন্তু শিষ্যবাটির প্রত্যেক লোকই মহামারীতে প্রাণত্যাগ করে। শেষ ব্যক্তির লোকাভাবে শবদাহ হয় নাই। গৃহ মধ্যেই শব পড়িয়াছিল। গুরুদেব বাহির হইতে ডাকা ডাকি করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ পরে গৃহ হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে ভিতরে যাইবার আহ্বান আসিল। তিনি ভিতরে যাইয়া একজন মহিলাকে শয্যায় শায়িতা দেখিলেন; উক্ত মহিলা তাহাকে বলিলেন যে, আমাদের বাটির সকলেই মহামারীতে মারা গিয়াছেন; আমিও শয্যাগত, উঠিয়া আপনার সেবা করিতে পারিব না, আপনি কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় যাইতে পারিবেন না। হাত মুখ ধুইয়া পাশের ঘরে গুড় ও চিঁড়া আছে দয়া করিয়া আনিয়া আহার করুন।

শিষ্যার কথায় গুরুদেব চিঁড়া গুড় লইয়া আহারে বসিলেন কিন্তু ফলার খাইবার জন্য নেবু পাইলে ভাল হইত বলায়, তাহার শয্যায় শায়িতা শিষ্যা কঙ্কালসার হস্ত ক্রমশঃ লম্ব করিয়া বাগান হইতে নেবু তুলিয়া আনিল। ইহা দেখিয়া গুরুদেব অজ্ঞান হইয়া গেলেন ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ারে মহামারীতে লোকক্ষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

Darbasini according to the map is twelve miles as the crow flies from Tribeni, the nearest point on the river. It was one of the places which suffered most from the fever, the alleged mortality being higher than that of any other village in the District. The village had not recovered its former health up to the date of the report (1871) and still (1901) is a very malarious place.

বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ পেলো ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জ্বরের সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দ্বারবাসিনী হুগলী জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আক্রান্তস্থান বলিয়া লেখেন। উত্তরপাড়ার জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহামারীর সময় গ্রামবাসিগণকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। মহামারীর পর সরকার এই স্থানে একটি চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন এবং জয়কৃষ্ণ বাবু সেনহাটী, মায়াপুর, হাটবসন্তপুর প্রভৃতি গ্রামে, তাঁহার জমিদারী অন্তর্ভুক্ত থাকায় মুক্তহস্তে প্রজাদের জন্য উক্ত স্থানসমূহে কুইনাইন বিতরণ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হন।

দ্বারবাসিনী গ্রামে বহু ভদ্রলোক বাস করেন; ইহা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের একটি প্রধান ষ্টেশন ছিল। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৩৯ মাইল; গ্রামের মধ্যে কুমার রাজেন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয়, ডাকঘর, পাঠাগার ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে। বহু অবস্থাপন্ন লোক এই গ্রামে বসবাস করেন; কিন্তু কিম্বদন্তী এইরূপ যে, কোন সদ্গোপ গ্রামে বাস করিলে, তিনি দৈবধন প্রাপ্ত হইবেন। সেইজন্য কোন সদ্গোপ এই গ্রামে বাস করিতে পায় না। এই স্থান প্রাচীন কালে 'রাঢ়াপুরী' নামক একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল এই স্থান খনন করিয়া পাঁচ প্রকারের বিষ্ণু মূর্তি, বরাহ মূর্তি, সূর্য মূর্তি, চন্ডী মূর্তি প্রভৃতি পাল রাজত্বের কতকগুলি নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন; মূর্তিগুলি আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় (১ জুন ১৯৪৬) প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখ্য ঃ

There is an ancient site known as Darbasini in the district of Hooghly. Mr. P. C. Paul Archaelogist, the Curator of Saradacharan Museum of the District has recently discovered a few broken stone images of Vishnu (of excellent workmanship), Suraya, Baraha and other Gods & Goddesses there. Besides he has found the site of an ancient place where bricks, potheads and a ring well of good old days are visible. There are seven tanks bearing the memory of the seven queens. Mr. Paul is of opinion that Darbasani was flourishing seat of Vigraha Pal in the Rarh during invasion by Dhanga Dev, son of Vasavarman Dev, the king of Chandal, Central India, in the 11th century A.D.

॥ পুনাজগড় ॥

দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ পুনাজগড় একটি অখ্যাত গ্রাম, ইহার প্রাচীনকালের নিদর্শন বর্তমানে কিছুই পরিলক্ষিত না হইলেও সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল এই

স্থান হইতে দুই প্রকারের দুইটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উক্ত মূর্তিগুলি দশম শতাব্দীর পাল রাজাগণের নিদর্শন বলিয়া আমরা মনে করি। একটি বিষ্ণুমূর্তি গ্রামবাসিগণ কর্তৃক স্থানীয় এক প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে সর্বসাধারণের পূজার জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে এবং অন্য মূর্তিটি বৈদ্যবাটী সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই সম্বন্ধে ৩১ মার্চ ১৯৪৬ "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

Mr. Paul has discovered a few other broken stone images including Vishnu of the Pals at Punajgarh near Darbasini.

দীঘা ॥ দীঘা দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; পূর্বে এই স্থানে বহু লোক বাস করিত, কিন্তু 'বর্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীতে এই গ্রামও একপ্রকার জনশূন্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। সম্প্রতি একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি এই গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উক্ত মূর্তিটি সারদাচরণ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রামের সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং মূর্তিটি যে কোন সময়ের তাহাও চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়া, এই গ্রাম সম্বন্ধে আমরা কোন অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম। দীঘায় পোষ্ট অফিস আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৬৭৮ জন।

॥ সুগন্ধা ॥

সুগন্ধা হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পোলবা থানায় অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। কুন্তী ও সরস্বতী নদী বলয়াকারে এই স্থান বেষ্টন করিয়া আছে। চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে দুই মাইল ও গংগা হইতে চার মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামের বসু বংশ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার জন্য একসময়ে খ্যাত ছিল। তখন আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিবার জন্য বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে আসিত। প্রাচীনকালে বসু বংশের চিন্তামণি "বৈদ্যরাজ" বলিয়া কথিত ছিলেন। এক সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৌত্র সুলতান সুজার এক আত্মীয়াকে চিকিৎসা করিয়া চিন্তামণি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং সম্রাট দরবার হইতে তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ ৩৬২ বিঘা জমিসমন্বিত সুগন্ধা গ্রাম ও 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। এই ফরমানে সম্রাট জাহাঙ্গীরের হস্তের পাঞ্জা মোহর দেওয়া আছে। এই ফরমানের তারিখ ২০ সওয়াল ১০২৬ হিজরী। এই গ্রামে শীতলা দেবী ও মহেশ নামে ভৈরবের মন্দির আছে। কিম্বদন্তী যে, মহেশ কুন্তী নদীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। যে স্থান হইতে তিনি আবির্ভূত হন, সেই স্থানটিকে মহেশতলা বলে। মহেশের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে শ্রীবিভূতিভূষণ রায় ও শ্রীহেমন্তকুমার রায়ের চেষ্টায় ১৩৪১ সালে উহার সংস্কার করা হয়। এখানে দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও পোষ্টঅফিস আছে। দোলের সময় গ্রামে একটি মেলা হয়। গ্রামের রায় বংশের যুগল বিষ্ণুমূর্তি ও বালগোপালের সুন্দর মন্দির আছ। পূর্ব গ্রামে প্রত্যহ বাজার বসিত এবং এই স্থান তখন জনমুখরিত থাকিত; কিন্তু সপ্তগ্রামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধাও জনশূন্য হয়।

চিন্তামণি সম্বন্ধে শ্রীমতী নির্মলনলিনী রায়ের একটি কবিতায় নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

"বাদসা ভূষিত করে রায় উপাধিতে
চিন্তামণি পাওয়া রায় বংশ তার সাথে।
নিষ্কর মিলিল স্থান সুগন্ধা গ্রাম
বহে কুন্তী সরস্বতী মনোহর ধাম॥"

সুগন্ধায় বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুরুলিয়ার লোক-সেবক সমাজের নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, এম-এল-এ এই গ্রামের রায় বংশের স্বর্গীয় অঘোরকুমার রায়ের কন্যা। অঘোরবাবু পুরুলিয়ার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। রায় বংশের অন্যতম সন্তান শ্রীসন্তোষ রায় ও তাঁহার সহধর্মিনী শ্রীঅনুরাধা রায় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত আছেন।

॥ শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ॥

১৩০৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত সুগন্ধার বিখ্যাত রায় পরিবারে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের জন্ম হয়। তিনি পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্বর্গত অঘোরকুমার রায়ের কন্যা। ১৯০৮ সালে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯২৬ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে মানভূম হইতে যাঁহারা উহাতে সপরিবারে যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সর্বাগ্রগণ্য। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ওকালতি ত্যাগ করিয়া ইহাতে যোগ দেন। শ্রীমতী ঘোষ সেই সময় দুই পরিবারে শিশু পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করেন। এই সংগ্রামে যে সব কর্মী আসিয়া যোগদান করেন, তাঁহাদের সংগ্রামী জীবনের আশ্রয়স্থলরূপে "শিল্পাশ্রম" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। এই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপা লাবণ্যপ্রভা দেবী সকলের "মা" বলিয়া অভিহিতা। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার অবদান উল্লেখ।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে লাবণ্যপ্রভা ঘোষ স্বীয় কন্যাগণ সমভিব্যাহারে ধানবাদ ঝরিয়া ও বাঁকুড়ার স্কুল কলেজগুলিতে পিকেটিং করেন। পুরুলিয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে তিনি এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত হন। কারামুক্তির কিছুদিন পর তিনি বিহার ভূকম্পনের দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪০ সালে যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইলে তিনি উহাতে যোগদান করিয়া ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর মহাত্মাজীর নির্দেশে জেলার সর্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে থাকেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় নিরাপত্তাবন্দিরূপে তিনি প্রায় ২ বৎসরকাল কারাবাস করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর মানভূমে বাঙলা ভাষা উচ্ছেদের জন্য যে ব্যাপক অভিযান সুরু হয় উহাকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়

তিনি সহকর্মিগণ সহ কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ভাষা ও অন্যান্য সমস্যা লইয়া ১৯৪৯-৫৪ সালের মধ্যে জেলায় যে সব গণআন্দোলন ও সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়, তিনি তাহাতে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। এই সব আন্দোলনের সময় উগ্র হিন্দী পন্থীদের হাতে তাঁহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হয়। মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি দমনের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে যে ঐতিহাসিক "টুসু" সত্যাগ্রহ হয়, উহা পরিচালনার জন্য পাঁচদফা অভিযোগে তাঁহার ১২ মাস কারাদন্ড ও ৬ শত টাকা অর্থদন্ড হয়। জনমতের চাপে বিহার সরকার পরে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। বঙ্গ বিহার একীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালনায় যে সত্যাগ্রহিদল কলিকাতা অভিযান করেন, লাবণ্যপ্রভা দেবী তাঁহার নেতৃত্ব করিয়া কারাবরণ করেন। পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গভুক্তি আন্দোলনেরও তিনি অন্যতমা ছিলেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পুরুলিয়া কেন্দ্র হইতে লোকসেবক সঙ্ঘের প্রার্থিরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

॥ পুইনান ॥

পুইনান পোলবা থানার অন্তর্গত একটি গন্ডগ্রাম। চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর বা হরিপাল পর্যন্ত যে বাস সার্ভিস আছে, সেই রাস্তার উপর অবস্থিত। গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৮১ জন। গ্রামে হালদার, ঘোষ ও শেঠদের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। এই গ্রামে একটি ধর্মরাজের মন্দির আছে, ইহার পূজারী হইতেছেন ডোম। এই মন্দিরের দুই ধারে শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের মন্দির ও কারুকার্যখচিত ইটের দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ আছে। রাজরাজেশ্বর হইতেছেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই মন্দিরটি বর্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সত্বর সংস্কার না হইলে পড়িয়া যাইবে।

পুইনান গ্রামে তিনটি শিবমন্দির শঙ্কর হালদার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার শিবলিঙ্গগুলি কাশী হইতে আনীত। ইহার নিকটে গৌরমোহন শেঠের ভগ্ন ঠাকুরদালান বিদ্যমান। গ্রামে কামেশ্বর মন্দির একটি সুন্দর মন্দির, ইহাও হালদারদের প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যে মঙ্গলচন্ডী, মনসাদেবী এবং শীতলাদেবীও আছেন। সম্ভবতঃ ঐ মূর্তিগুলি অন্যস্থান হইতে আনিয়া এই শিবমন্দিরের মধ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। একটি পাথরে "মন্দির ১৩০২ সালে উমাচরণ সেটের বনিতা কর্তৃক সংস্কার করা হইয়াছিল" বলিয়া লেখা আছে। শিবমন্দিরের পার্শ্বস্থ একটি ডোবা হইতে একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি ভগ্ন সূর্যমূর্তি পাওয়া যায়। উক্ত মূর্তিদ্বয় হুগলীতে গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজে সংরক্ষিত হইয়াছে। ঘোষবংশীয়দের একটি রাধাকৃষ্ণের সুন্দর মন্দির আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। পরে শুনিলাম যে, সেবায়েত সুশীলকুমার ঘোষ দেবসেবার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিগ্রহ পুকুরে ফেলিয়া দেন। শেঠেদের অশ্বত্থগাছের তলায় বহু বৎসর যাবত একটি বিষ্ণুমূর্তি পড়িয়াছিল। সম্প্রতি উহাও উক্ত কলেজে রক্ষিত হইয়াছে।

পুইনানে শ্রীহরিপদ হালদারের চেষ্টায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য "রবিতীর্থ" নামে একটি ভবন নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রন্থাগার, সভাসমিতির জন্য

একটি হলঘর এবং অতিথিশালা আছে। সদর মহকুমার মধ্যে কোন গ্রামে এইরূপ অতিথিশালা কোথাও নাই। এই ভবনে একখানি প্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

"রবিতীর্থ

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।"

সম্প্রতি পুইনান গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা স্থাপনকল্পে সরকার দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই শস্যভাণ্ডার হইতে তপশীলী ও আদিবাসিদের প্রতি মণে ৭॥ সের ধান সুদ লইয়া ধার দেওয়া হয়। পূর্বে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হইতে এক মণ ধান ধার করিলে এক মণ ধান সুদ দিতে হইত। এই শস্যভাণ্ডার হওয়ায় পুইনান ও গোস্বামী মালীপাড়া ইউনিয়নের চাষীদের খুব সুবিধা হইয়াছে। এইরূপ শস্যভাণ্ডার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের উপকার হইবে।

॥ পাউনান ॥

পাউনান গ্রামের পূর্বপ্রান্তে গ্রামের বাহিরে মনোহর পরিবেশে "শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউ" অনাদি শিবলিঙ্গসমন্বিত সুন্দর মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিবগঙ্গা পুষ্করিণী বর্তমান। অতি প্রাচীন মন্দির, কে নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারে না। কয়েক বৎসর পর পর ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। গ্রামবাসী প্রভূত বিত্ত-উপার্জনকারী ৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর ইষ্টক নির্মিত ভোগঘর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভোগঘরের বাহিরের দেওয়ালে শ্বেতপাথরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং
যদুনাথস্য পদাব্জলব্ধয়ে।
যদুনাথস্য সুযত্নতঃ পিতুঃ॥
যদুনাথস্য গুরোর্মহানসং।
যদুনাথস্য সুতো নির্মমে॥
নেত্র বহ্নি বসু ভূমিত শাকে।
ফাল্গুনস্য রজনীকর বারে॥
মাকরী পূর্ণিমা তিথিযুক্তে।
দীন হীন সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যঃ॥"

শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর নিত্য পূজা হয়। এইরূপ শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ দেখা যায় না। শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি উদ্ধারযোগ্য ঃ

একসময় আমনান গ্রামে অনাবৃষ্টি হওয়ায় এখানকার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোক সকল চিন্তা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন গ্রামের বিশিষ্ঠ লোক সকল মিলিয়া এই যুক্তি স্থির করিলেন যে ভট্টপল্লী হইতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া একটি ভাল দিন স্থির করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বাবার ঘরে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা হউক। তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে।

এই মতই সকলে শিরোধার্য করিলেন এবং শীঘ্রই উপরোক্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া স্বস্ত্যয়নের কার্য আরম্ভ হইল। কার্য শেষ হইলে বাবার ঘরের দ্বার (অর্থাৎ ঘরের দ্বারে কপাট নাই) ভালরূপে বাঁধিয়া প্রথমে ১০৮ কলসী গঙ্গাজল "বাবার" মাথায় ঢালা হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিয়া "বাবার" পুষ্করিণী অর্থাৎ শিবগঙ্গার জলে বাবাকে ডুবাইবার জন্য সকলেই যত্নবান হইলেন এবং যখন ঘরের মধ্যে এক মানুষ সমান জল হইয়া গেল তখনও বাবাকে জলে ডুবাইতে পারিলেন না। "বাবা" জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া ডুবান হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

ঐ সময় আকাশে এরূপ মেঘের সঞ্চার হইয়া গেল যে একেবারে সমস্ত দিক অন্ধকার হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়া সমস্ত গ্রামের ক্ষেত্রগুলি জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বৃষ্টির অবসানে সকলে পরস্পরে মিলিত হইয়া শ্রীভগবান শঙ্করের গুণগান করিতে করিতে আনন্দে পুলকিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশ শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর আদি সেবাইত। নিত্য সেবার জন্য পূর্বে বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। চট্টোপাধ্যায়দিগের ওয়ারীশসূত্রে বর্তমানে গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারীও আংশিকভাবে সেবাইত আছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই মন্দিরে বিস্তর যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। এখানে প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী শিবরাত্রি মেলা হয়।

গ্রামের মধ্যভাগে প্রাচীন গ্রাম্য বারওয়ারী দেবতা °শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা আছেন। প্রথমতঃ তিনি কাষ্ঠময়ী দণ্ডাকৃতি ছিলেন, পরে গ্রামবাসী °গিরীশচন্দ্র ঘোষ (গোপ) পাকা ঘর করিয়া দিলে গ্রামের °যদুনাথ মজুমদার (সদ্‌গোপ) সেবার জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিলে গ্রামবাসীরা তন্মধ্যে মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপনা করেন এবং তদবধি, পূজা এই আকারেই চলিয়া আসিতেছে। °শরৎচন্দ্র সুর মহাশয় এই মন্দিরে কতকগুলি জানালা করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে এই মন্দির জীর্ণ হইলে গ্রামবাসী °সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে সংস্কৃত বর্তমান সুন্দর মন্দির হইয়াছে। বর্তমানে মন্দির গাত্রে ফলকে আছেঃ

"এই মন্দির সংস্কারের
প্রধান উদ্যোগী
স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

এই স্থানে পালা পার্বণে বিশেষ তিথিতে বলিদান হয়। প্রাচীন সেবাইত বৈদিক বংশীয় ব্রাহ্মণগণ। পূর্ব বারওয়ারীতলায় হালদারদিগের শিবমন্দির আছে। উহাতে লিখিত আছেঃ

সংস্কার—শ্রীননিলাল হালদার
পৌষ, সন ১৩৩৪ সাল।"

এই প্রাচীন শিবমন্দিরের পূজারী বৈদিক ব্রাহ্মণবংশীয় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই শিবমন্দিরের নিকটে ধর্মরাজের আস্তানা আছে। °কৈলাসচন্দ্র পণ্ডিত ডোম—ইহার শেষ ডোম পূজারী ছিলেন। দক্ষিণ পাড়ায় পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। বর্তমানে বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজারী।

পশ্চিম পাড়ায় "দে সরকার"দিগের পূর্বপুরুষদিগের স্থাপিত অতি প্রাচীন শিবমন্দির

ছিল, তাহাতে সুশোভন শ্বেত শিবলিঙ্গ ছিলেন। নিত্য সেবা দীর্ঘকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে এই শিবমন্দির ইচ্ছাকৃত ভগ্ন করিয়া বিলুপ্ত করা হইয়াছে। "ছোট সান" নামক দীঘির পাড়ে ৩টী শিবমন্দির আছে। ইহাদের অধিষ্ঠিত "শিবলিঙ্গ"ত্রয় কোন ও মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে নিত্য সেবা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রামে পূর্বে বহু পণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রামে অনেক টোল ছিল। সাম্প্রতিককালে ৺ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার (ঘোষাল) এবং ৺ফেলুমোহন ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) এর টোল ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণপাড়ার ৺দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি আছে। দক্ষিণপাড়ার অভয় মুখোপাধ্যায়ের টোল ছিল। গ্রামবাসিগণ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এই টোলের বৃত্তিরূপে অর্থ সাহায্য করিতেন।

গ্রামের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয়—ইহাদের ঘোষাল, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় এবং ভট্টাচার্য উপাধি আছে।

গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ইহাদের ভট্টাচার্য ও চক্রবর্তী উপাধি আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ ৺গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন এবং কাণ্বায়ন গোত্রীয় ৺হরগোরী ভট্টাচার্য সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ৺ফটিকচন্দ্র সিদ্ধান্ত (ভট্টাচার্য) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন—তৎপুত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের প্রাচীন এম-এ, দীর্ঘকাল তিনি কলিকাতা জি, পি, ও-র উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পূর্বোক্ত হরগোরী ভট্টাচার্য বংশীয় ডাঃ শ্রীহরিবিলাস ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য একজন বিশিষ্ট ডাক্তার।

পাউনানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘোষাল বংশ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন বাসিন্দা। কয়েক শত বৎসর পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ৺ভবানীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত তান্ত্রিক ও দৈবশক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। একবার তিনি হুগলী জেলাস্থিত পাণ্ডুয়া গ্রামে গিয়া তথাকার কোন মুসলমান নবাবের বেগমকে দৈবশক্তিতে আশ্চর্যরূপে কঠিন রোগমুক্ত করিলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া ৩৮০ নং তৌজীর ১৪ শত বিঘা জমি নামমাত্র বার্ষিক খাজানা চৌদ্দ আনা ধার্যে ৺ভবানীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সময়ে এই জমির বার্ষিক খাজানা চৌদ্দ সিকা অর্থাৎ সাড়ে তিন টাকা ধার্য হইয়া তদীয় বংশধরগণের উপর এযাবত বলবৎ ছিল। ইহার অধস্তন বংশধর সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে কাকিনাড়া জুট মিলের বড়বাবু (হেড ক্লার্ক) হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। স্বকীয় বাসভবন বিশাল অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়া তিনি বিভিন্ন দেব পূজায় বিরাট অনুষ্ঠান করিতেন। শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর সুন্দর ভোগমন্দির এবং ইষ্টক নির্মিত চত্বর নির্মাণ করিয়া তিনি পুণ্য অর্জন করিয়াছেন—এ বিষয়ের বিবরণ পূর্বে ব্যক্ত করিয়াছি। তৎপূর্বে একবার আমনান গ্রামের ৺গোপালচন্দ্র সুর মহাশয় টাটেশ্বরনাথের মন্দির ও চত্বর সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি এ অঞ্চলের বহু লোকের চাকুরীকার্য সংস্থানের সহায়তা করিয়াছেন। ৺শরৎচন্দ্র সুর মহাশয় প্রদত্ত ভূমির উপর বিদ্যালয়ের অট্টালিকা নিজব্যয়ে

নির্মাণ করিয়া দিয়া "সিদ্ধেশ্বর মাইনর ইংলিশ স্কুল" স্থাপন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা ছিলেন।

পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ পাশ করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (তুফান) মহাশয়ের পুত্র শ্রীজগবন্ধু মুখোপাধ্যায় এম্ বি পাশ করিয়াছেন। ইঁহারা গ্রামে থাকেন না।

পশ্চিমপাড়ায় কায়স্থগণ বসু, দে সরকার, রুদ্র, রুদ্রমজুমদার উপাধিতে ভূষিত আছেন। বর্তমানে একঘর দে সরকার এই গ্রামে আছেন। দে সরকারদিগের পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমপাড়ার শিব মন্দিরের বিষয় পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের গৃহস্থিত শালগ্রাম ও শিব আছেন। রুদ্রদিগের পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ" নামক শালগ্রাম অদ্যাপি নিত্য পূজিত হইতেছেন। এই গ্রামে নন্দী, পাল, দে মল্লিক উপাধিধারী তিলিগণ বাস করিতেছেন। এখনও এই স্থানে সদ্‌গোপজাতীয় কুলীন সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস আছেন।

*শরৎচন্দ্র সুর মহাশয় বহু বৎসর পূর্বে বিপুল অর্থব্যয়ে পিতৃশ্রাদ্ধে বিরাট ভোজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে অনন্যসাধারণ হওয়ায় ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি পাউনান পোষ্টঅফিসের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন, স্কুল ও মন্দির সংস্কার ও জনহিতকর কার্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। *ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র সুর, বি, এস, সি, এম্-বি, নামকরা ডাক্তার ছিলেন। তিনি গ্রামে হাট (অধুনালুপ্ত) স্থাপন এবং হাইস্কুল স্থাপন সংগঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুজ ডাঃ শ্রীবলাইচাঁদ সুর এল-এম-এফ এই সংগঠন সংরক্ষণ করিতেছেন। ডাঃ বলাইচাঁদ সুর এ অঞ্চলের সুচিকিৎসক।

*রসিকলাল সুর—আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়া বিস্তর দান খয়রাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্র দানশীল শ্রীবলাইচাঁদ বিশ্বাস ও তৎভ্রাতৃবর্গ কলিকাতায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থবান এবং স্বনাম বিখ্যাত। তাঁহাদের মাতৃদেবীর নামে পাউনান হাইস্কুলের নামকরণ হইয়াছে। কলিকাতায় "রাধা সিনেমা"র তিনি সত্ত্বাধিকারী। ইহা ছাড়া অক্ষয়চন্দ্র সুর—ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং অমৃতলাল সুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উচ্চ পদস্থ অফিসার (অডিটর) ছিলেন।

* ডাঃ হরিদাস বিশ্বাস (বাংলায় ভি, এল, এম, এস ক্যাম্বেল স্কুল হইতে প্রাপ্ত) এ অঞ্চলে যশের সহিত চিকিৎসা করিয়া প্রভূত বিত্ত সম্পত্তি ও জমিদারী করিয়াছিলেন। চন্দননগর গোস্বামী ঘাটের গোস্বামীদিগের পূর্ব পুরুষদের আরাধ্য গোস্বামী মালিপাড়ার শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর সম্পত্তি পাউনান গ্রামস্থ "বড়শান" নামক সুবৃহৎ দীঘি চন্দননগরের সাত ভাইদের (সদ্‌গোপ) বাড়ী হইতে (গোস্বামীদিগর হইতে হস্তান্তরিত হওয়ায়) তিনি খরিদ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র * ডাঃ ননীগোপাল বিশ্বাস এল-এম-এফ দীর্ঘকাল গ্রামে ভালরূপে ডাক্তারী করিয়াছিলেন। বর্তমানে ননীবাবুর পুত্র ডাঃ জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস এম-বি, পাশ করিয়া গ্রামে যশের সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

অকুলীন মৌলিক সদ্‌গোপ বংশে এই গ্রামে সমাদ্দার, হালদার, ঘোষ, পাল, মণ্ডল উপাধি আছে। নাপিত, কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, তাঁতি, মুচি, বাদ্যকর প্রভৃতি জাতি

আছে। গোয়ালা আছে—ইহাদের যাজনকারী নাস্সী নামক এক বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। আধুনিককালে সাঁওতাল ও বাউরী জাতির এই গ্রামে অবস্থান আরম্ভ হইয়াছে।

বর্তমান শিক্ষা—বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পাঠশালার পত্তন হইয়া বিদ্যালয়টী এম-ই স্কুলে উন্নীত হইয়া সিদ্ধেশ্বর এম-ই স্কুল নাম ধারণ করে এবং ক্রমে ৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার পাকা বাড়ী হয়। পরে ইহা নলিনীমোহন এইচ-ই স্কুল নাম ধারণ করে। ১৯৪৬ সন হইতে ইহা শ্রীবলাইচাঁদ বিশ্বাসের মাতৃদেবীর নামে "রাধারাণী হাই স্কুল" নামকরণ করা হয় এবং দানশীল ব্যবসায়ী শ্রীবলাইচাঁদ বিশ্বাস এই স্কুলে দ্বিতল গৃহগুলি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং মাসিক অর্থ সাহায্য করেন। উক্ত হাই স্কুলের প্রাইমারী বিভাগ পৃথক হইয়া কয়েক বৎসর যাবত 'রাধারাণী প্রাইমারী বিদ্যালয়" নামে চলিতেছে। গ্রামের মধ্যভাগে পাউনান হিন্দু বালিকা প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে। গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে "সিদ্ধেশ্বর প্রাইমারী স্কুল" নামে একটী 'স্পেশাল ক্যাডেয়ার' স্কুল আছে।

১২৯০ সনে এক সন্ন্যাসী গ্রামের এক গোয়ালার বাড়ীতে কিঞ্চিৎ ঘৃত ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হওয়ার একটু পরেই সেই বাড়ীতে আগুন লাগে এবং ক্রমশঃ এই আগুন সারা গ্রামে ছড়াইয়া গ্রামের অধিকাংশ খড়ের ঘর এবং কাঁচা বাড়ী ভস্মসাৎ হয়। তদবধি পাউনানকে "পোড়া পাউনান" বলিতে শুনা যায়।

বহু বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউ মন্দিরের পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে কোন পথিক তাহার পথিমধ্যে বিশ্রাম স্থানে ভুলক্রমে তাহার টাকার থলি রাখিয়া চলিয়া যায়। পরে টাকার কথা মনে হওয়ায় সে দ্রুত আসিয়া যথা স্থানে না খুঁজিয়াই তাহার টাকার থলি পায়। পথিক ঐ স্থানে ভগবৎ কৃতজ্ঞতায় একটী পুকুর খনন করাইয়া দিয়াছিল। এই পুকুরটী "না খোজা" পুকুর নামে পরিচিত।

॥ নীলমণি দে ॥

এই গ্রামের নীলমণি দে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাউনানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ পঞ্চানন দে ভূষণার নিমক দারোগা ছিলেন। পিতামহী অতি ধর্মশীলা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হন। নীলমণির পিতার নাম মধুসূদন। গ্রামে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা ও ধা ছাত্রজীবনেই প্রকাশিত হয়। প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময় On the uses f adversity নামক ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'পীলপদক' প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের "কলিকাতা লিটারারী গেজেটে" রিচার্ডসন সাহেব উক্ত প্রবন্ধের বিষয় সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন যে কোন ইংরাজ ছাত্র দূরে থাকুক, কোনও পরিণত বয়স্ক ইংরাজ বিদেশীয় ভাষায় উহার চেয়ে সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ।

নীলমণি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশনের অফিসে প্রধান সহকারী হিসাবে কর্ম করেন এবং বঙ্গভাষায় 'রেজেষ্টারী দর্পণ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। প্রসিদ্ধ

দেশনায়ক ও বাগ্মী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কন্যা কুমুদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি বহু বৎসর কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। ১৩০২ সালের ১৫ চৈত্র তিনি পরলোকগমন করেন তাহার পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিভিল সার্জন রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র দে, তৃতীয় পুত্র কিরণচন্দ্র ... কমিশনার প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। সতীশচন্দ্রের পুত্র ডক্টর সুশীলকুমার দে-র নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। প্রফুল্লচন্দ্রের পুত্র সুবোধকুমার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইহারা সকলে কলিকাতায় বাস করেন। নীলমণি দের কন্যা সুরবালা ঘোষ মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ৪৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

আমনান ও গোস্বামী-মালিপাড়া পাউনান হইতে যথাক্রমে প্রায় একমাইল পূর্বে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পাউনান গ্রামের জনসংখ্যা ৭২৮ জন।

'দেশাবলিবিবৃতি' নামক প্রাচীন পুঁথিতে পাউনানের নামোল্লেখ আছে। এই পুঁথিতে তিনশত বৎসর পূর্বের বাঙ্গলার ভৌগোলিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকায় প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাসের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থে "মানাত দেশ" সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল ঃ

মানাতের (১) তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে মন্দার নামক গৌড়ভূমির বিখ্যাত স্থান। (২ এক যোজন উত্তরে বেলাভাবায়িজি মহাগ্রাম; (৩) তিন ক্রোশ পশ্চিমে বর্ধমান মহাগ্রাম; (৪ দেড় যোজন দক্ষিণে 'পাদনানো' মহাগ্রাম (পাওনান)।

॥ সেনহাটী ॥

সেনহাটী হুগলী জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম; জাগ্রতা বিশালাক্ষ্মী দেবীর জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। দেবীর বিরাট দ্বিভুজা মৃন্ময়ী মূর্তি এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রাচীনকালে স্থানীয় হালদার বংশীয়গণ কর্তৃক এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারাজা ও উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়গণ কর্তৃক দেবীর সেবাদির সুব্যবস্থা হয়।

বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বে পুরাণ-পুকুর বলিয়া একটি জলাশয় আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, দেবী একটি মহিলার বেশে এক শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরিয়া, তাঁহাদের বাটী হইতে (অর্থাৎ হালদার বাড়ী) মূল্য লইবার কথা বলিয়া অদৃশ্যা হন। শাঁখারী হালদার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিয়াছে বলিয়া মূল্য চাহিলে, বাড়ীর কর্তা ভীষণ আশ্চর্য হইয়া যান, কারণ তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। পরে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, দেবী স্বয়ং শাঁখা পরিয়াছে এবং পূর্বোক্ত পুরাণ-পুকুরে তাঁহার শাঁখা পরা হাত দেখিয়া তিনি ওই পুষ্করিণীর তীরেই বিশালাক্ষ্মী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ কাহিনী বায়ড়া গ্রামের রণজিৎ রায়ের বিশালাক্ষ্মী দেবী সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

মন্দিরের আকৃতি কতকটা দো-চালা খড়ের ঘরের ন্যায় এবং মন্দির গাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা তারিখ "সন ১২২৯ সাল" উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির মধ্যে প্রথম দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে মহাদেব বামপার্শ্বে শ্রীরামচন্দ্র এবং পশ্চাদ্দিকে ভূত প্রেতাদি আছে

দ্বিতীয় স্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামপার্শ্বে সরস্বতী এবং তৃতীয় স্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে গণপতি ও বাম পার্শ্বে কার্তিকের মূর্তি আছে।

বঙ্গবাসীর সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতলের বহু প্রকারের শিল্পকার্য এই স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ঘুঘুর, নূপুর, কব্জা, ছিটকিনী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু কাংস্য বণিক এই গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহারাই এই শিল্পে অদ্যাপি লিপ্ত আছেন। এই গ্রাম সেনহাটীর অপভ্রংশ 'সেনেট' বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই। পূর্বে দ্বারবাসিনী হইতে সেনহাটী পর্যন্ত কেদারমতী নদী নামে একটি বেগবতী নদী ছিল; বর্তমানে তাহার চিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ৮৪৮ পৃষ্ঠায় গোস্বামী-মালিপাড়া প্রসঙ্গে এই নদীর বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রামের জনসংখ্যা ১,৬২৩ জন। জলাভাবের জন্য বহু ব্যক্তি এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করিতেছেন। সরকারী কাগজপত্রে গ্রামের নাম "তালচিনান-সানিহাটী" বলিয়া লেখা আছে।

॥ কুচপালা ॥

কুচপালা প্রাচীনকালে একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। এই স্থানে বারোহাজারি মনসবদার এক মুসলমান নবাব বাস করিতেন। তিনি কুচপালের নবাব বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নবাব প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ ইঁটের স্তূপ এখনও আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নবাবের গোলাকৃতি হাতিশালার কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে। এই বংশের শেষ নবাবের নাম ছিল তোরাব আলী খাঁ। ১২৪০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এখন এই বংশে কেহ জীবিত নাই। দ্বারবাসিনীর বিষহরি ও রুদ্রাণীর কালীমাতার সেবার জন্য এই নবাব বংশের প্রদত্ত দেবত্র জমি ছিল।

গ্রামে তেলীর ভিটা ও রায়ের ভিটা নামক দুইখণ্ড জমি নির্দিষ্ট আছে। প্রাচীনকালে এই দুই বংশ বর্ধিষ্ণু ও ক্রিয়াকলাপশীল ছিল বলিয়া জানা যায়। স্থানীয় কুম্ভকারদেরও দোল দুর্গোৎসবাদি হইত। 'বাউল-সঙ্গীত' রচয়িতা রাজারাম যোগী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে গ্রামের জনসংখ্যা ৭০৭ জন। গ্রামে পোষ্ট অফিস আছে।

॥ মেঘসার ॥

দ্বারবাসিনীর পার্শ্ববর্তী মেঘসার গ্রামে মহানাদের রাজা অম্বরেন্দ্রের পত্নী মেঘমালার ঋতুস্নানার্থ মেঘসার নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার নাম হয় মেঘসরোবর। কালক্রমে মেঘসরোবর 'মেঘসারে' পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বিরাট সরোবর সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইহার জলকর সাড়ে তিনশত বিঘা। পূর্বে এই গ্রামে কাগজ প্রস্তুত হইত।

১২৫৫ সালে মেঘসার গ্রামের একটি পুষ্করিণী হইতে শ্রীকেনারাম চক্রবর্তীর পিতামহ একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্ত হন। মূর্তিটির উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট। এই

মূর্তি গ্রামে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় থাকা কালে ১৩৩৬ সালে শ্রীহরিহর শেঠ উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের পাশে দেউল পড়ায় বিস্তর দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত। মেঘসারের জনসংখ্যা ৯০৭ জন। গ্রামে একটি বিদ্যালয় আছে।

॥ সাটীথান ॥

সাটীথান গ্রামটিও খুব প্রাচীন। গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা ৫২৬ জন। গ্রামটির পূর্বনাম সতীস্থান ছিল। কালক্রমে সতীস্থান সাটীথানে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে গ্রামের প্রান্তবাহিনী কেদারমতী নদীতীরে অসংখ্য সতীদাহ হইত বলিয়া গ্রামটি সতীস্থান বলিয়া খ্যাত হয়। এই স্থানের শেষ যে সতীর কথা শোনা যায়, তাহা গ্রামের চক্রবর্তী ও ঘোষ বংশীয়া দুইটি মহিলার। সাটীথান গ্রামের ঘোষ, চক্রবর্তী, মল্লিক প্রভৃতি কয়েকটি বর্ধিষ্ণু বংশের বাস ছিল। পণ্ডিত বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ন্যায়রত্ন, ভজকৃষ্ণ মল্লিক, গোকুল-কৃষ্ণ ঘোষ ও লালচাঁদ ঘোষের নাম এখনও সম্ভ্রমের সহিত লোকে স্মরণ করে।

গ্রামে রামচরণ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত কারুকার্যময় দুইটি পুরাতন শিবমন্দির, দুর্গাপূজার দালান ও বৃহৎ বৈঠকখানা এখনও ঘোষবংশের প্রাচীন বৈভবের সাক্ষ্য দিতেছে। এই বংশের লালচাঁদ ঘোষের উদ্যোগে দ্বারবাসিনীর শ্রীশ্রীবিষহরি ও রুদ্রাণীর কালীমাতা প্রতিষ্ঠিত হন। গ্রামে বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে।

দীঘানেশ্বর পোলবা থানার অন্তর্গত বর্তমানে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামের সর্বেশ্বর শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। এই শিব স্থানীয় শিবপুকুর হইতে পাওয়া যায়। বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে এই শিব আরোগ্য করেন বলিয়া কথিত আছে। সর্বেশ্বর শিবমন্দির বর্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায়দের অধিকারভুক্ত আছে।

এই গ্রামের মিত্র, সেন, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের পূর্বে খুব খ্যাতি ছিল। সদ্গোপ ঘোষ বংশীয়গণও এই গ্রামে প্রসিদ্ধ। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলা সেন, জেলা বোর্ডের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রসিদ্ধ শ্রমিকনেতা নির্মলকুমার সেন দীঘানেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাঘাট ভাল না হইলে কোন উন্নতি হইবে না। গ্রামে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৫৮৮ জন। দীঘানেশ্বরে পোষ্ট অফিস আছে।

॥ আমনান ॥

আমনান গ্রাম পোলবা থানার অন্তর্গত একটি সুপরিচিত প্রাচীন স্থান। এখানকার গ্রাম পূজিতা দেবতা-বৃক্ষরূপিণী-বসন্ত চণ্ডীমাতা, ধর্মরাজ ঠাকুর, পঞ্চানন্দ এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা আছেন। এখানকার চক্রবর্তী বংশে একজন কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসী ভ্রমণ করিতে করিতে আমনানে আসেন। তাঁহার নিকট যাদব রায়, রাধারাণী, গোপাল ও নারায়ণের বিগ্রহ ছিল। কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্তী উহা তাঁহার নিকট হইতে সেবা করিবার জন্য গ্রহণ করেন। আমনান গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা ৭৩৮ জন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত বিগ্রহ নিত্য পূজিত যাদব রায় এবং রাধারাণী অদ্যাপী আছেন। এই চক্রবর্তী বংশের এক কন্যা এলোকেশী দেবী উন্নত ধর্মসিদ্ধির জন্য "গোপালের মা" নামে এ অঞ্চলে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী শ্রীগোপাল লীলামৃত নামক দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য "সাধুর কথা" নামক প্রবন্ধে গোপালের মা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্য ঃ

॥ গোপালের মা ॥

ভগবন্নিষ্ঠ পরমবৈষ্ণব শ্রদ্ধেয় সাধু শ্রীল হরিচরণ দাস বাবাজী মহারাজ হুগলী জেলাস্থিত আমনান গ্রামের হরিসভার শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দির আশ্রয় করিয়া বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত ভগবৎ সেবা ও নাম প্রচারে রত আছেন। বাৎসল্যরসের খনি "গোপালের মা" (স্বর্গীয়া এলোকেশী দেবী) আজীবন তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া অন্তে তাঁহার হস্তেই তাঁহার সাধের শ্রীশ্রীগোপালজী প্রমুখ বিগ্রহের সেবা পূজার ভার ন্যস্ত করিয়া গত ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৭শে পৌষ নশ্বর দেহত্যাগ পূর্বক নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগোপাল জীউ পুণ্যশ্লোকা এলোকেশী দেবীর সঙ্গে বাৎসল্যভাবের যে সকল অলৌকিক লীলা করিয়াছন, শ্রদ্ধেয় হরিচরণ দাস বাবাজী মহারাজ তাহাদের কথঞ্চিৎ বিবরণ স্বরচিত শ্রীগোপাল লীলামৃত নামক গ্রন্থে দুই খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাঠে মন মহাভাবে পরিপূরিত হয়। চিরকুমার বাবাজী মহাশয় "জঙ্গমস্তুলসীতরু" পরাভক্তির অধিকারী; তাঁহার পূত সঙ্গ করিলে জাগতিক ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত এবং বিষয়ীরও মন ভগবন্মুখীন হয়। তাঁহার জীবন মহাভাবে পরিপূর্ণ।

আমনান গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। কুলক্রমে কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রয়ী ধর্মনিষ্ঠ জনক জননীর সুযোগ্য সন্তান বাবাজী মহাশয় বাল্যকাল হইতেই ধর্ম পালনে রত। তাঁহার বাল্যকালের অলৌকিক বিবরণ শ্রীগোপাললীলামৃত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম যৌবনেই তিনি বাঙ্গালীর অন্যতম ধর্মগুরু শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ও কৃপা লাভ করেন। সাময়িক কর্মস্থান দিল্লী নগরী হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে আমনান গ্রামে আসিয়া তিনি নাম প্রচারের জন্য আমনানে হরিসভা স্থাপন করেন এবং ভগবন্নাম সংকীর্তন ও সেবা মহোৎসবাদি সংঘটন করেন। তখন হইতেই আমনানের গোপালের মারও বিশেষ কৃপা লাভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীশ্রীগোপাল জীউ তথা গোপালের মার সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

শুধু হরিচরণ দাস বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কালীয়দহের পরমবৈষ্ণব সাধু শ্রীল জগদীশ বাবাজী মহারাজ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তথা হইতে আমনানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি জগদীশ বাবাজীর নির্দেশে গোপালের মার আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর সেবা ও নিজ সাধন ভজন নিরবিচ্ছিন্নভাবে করিতেছেন। গোপালের মার তিরোভাবের পরেও তিনি অদ্যাবধি তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়সে অদম্য উৎসাহে ভগবৎ সেবা সংরক্ষণ করিতেন। গোপালের মা এবং বাবাজী মহাশয়ের আকর্ষণে একবার শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুর মহাশয় আমনানে আসিয়া তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন; সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত

হইলে যেমন তাহার সুবাস সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপে আত্মগোপনকারী এই মহাপুরুষের কাহিনী অলৌকিক ভাবে প্রচারিত হইতেছে। এ বিষয়ের কয়েকটি বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ্য। এলোকেশী দেবীর (গোপালের মা) আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। সে সময়ে আমনান নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সুর মহাশয় প্রত্যুষে পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দিরে দিয়া আসিতেন। একদিন অতি প্রত্যুষে তিনি পুষ্পসহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার কেহই তখনও জাগরিত হয় নাই, কারণ রাত্রি রহিয়াছে। বিপিনবাবু বলেন, তিনি দেখিলেন গোপাল মন্দিরে বাবাজী মহাশয় অতিশয় তেজঃপুঞ্জধারী অলৌকিক দেহে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা পুজায় নিমগ্ন আছেন। বাবাজীর দেহের ছটায় চতুর্দিক আলোকিত। বিপিনবাবু ফুলসহ অতিসন্তর্পণে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন সকাল বেলায় ফুলসহ তথায় গিয়া গোপালের মা এলোকেশী দেবী মহাশয়ার সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন।

গোপালের মা শ্রদ্ধেয়া এলোকেশী দেবীর জীবদ্দশায় শ্রীল বাবাজী মহাশয় গোপালের অলৌকিক লীলাকাহিনী সম্বলিত একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা মুদ্রিতাকারে প্রকাশ সম্ভব হইতেছিল না। কলিকাতা নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রতুল-চন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশু সরকার মহাশয়দ্বয় ধর্মালোচনার স্পৃহায় কিছুকাল পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে সাধু মহাত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের জনৈক বিরক্ত সাধু বলেন, "আপনারা এতদূর আসিয়াছেন কেন? বাংলা দেশেই ত আমনান গ্রামে একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষ রহিয়াছেন—আপনারা তাঁহার সঙ্গ করুন—শান্তি পাইবেন।" তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু আমনান গ্রাম কোথায় অবগত নহেন। প্রাণের আকুতিতে তাঁহারা অলৌকিকভাবে অবিলম্বে হঠাৎ একদিন আমনানে গোপাল মন্দির আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়র পদপ্রান্তে উপনীত হন এবং তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করেন। ক্রমে তাঁহারা শ্রীগোপাললীলামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। শ্রদ্ধেয় প্রতুলবাবু অর্থব্যয়ে শ্রীগোপাললীলামৃত গ্রন্থ দুই খণ্ডে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তখন হইতেই উক্ত ভক্তদ্বয় নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগোপাল জীউ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবানুকূল্য করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা নিবাসী বীরেশ্বর নাগ মহাশয় চিঠিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়কে লিখেন যে, তিনি স্বপ্নে গোপাল মন্দিরে বাবাজী মহারাজ হইতে ইষ্টমন্ত্র লাভ করিয়াছেন এবং বাবাজী মহাশয় সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন। নাগ মহাশয় তদবধি নামাশ্রয়ে আছেন। সম্প্রতি কলিকাতা হইতে মাড়ওয়ারী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণ অলৌকিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া আমনানে শ্রীশ্রীগোপাল জীউ তথা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সমীপে আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হরনাথ ঠাকুর মহাশয় বা আমনানের শ্রীশ্রীগোপাল জীউর সঙ্গে অলৌকিকভাবে আলাপ বা কথোপকথন করিতেছেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তন্ত্রোক্ত একটী বিষয়ের এবম্বিধ মীমাংসায় সংশয় জাগে। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি এক দেবী মন্দিরে গিয়াছেন,

তথায় আমনানের শ্রীশ্রীগোপাল জীউও দাঁড়াইয়া আছেন—তদ্দৃষ্টে তাঁহার সমমীমাংসা হইয়া গেল। প্রতুলবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এখানেও মলে তুমি দাঁড়াইয়া আছ!"

দুই একটী সাম্প্রতিক অলৌকিক কাহিনী লিখিতেছি। বর্তমান ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে এ অঞ্চলে অতি বর্ষণ ও প্রবল বন্যা হয়। অতিবর্ষণের ফলে আমনানের শ্রীশ্রীগোপালজীউ বাড়ীর একদিকের কাঁচা মাটীর প্রাচীরের কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়ে। গোপালজীর স্বতঃনিরত কর্মী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাগ অবিলম্বে এই দেওয়াল মেরামত আরম্ভ করিয়াছে। তখন এক রাত্রিতে সে দেখিল, গোপাল বাড়ীর সদর ফটক খোলা। বাবাজী মহাশয় মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া জপ করিতেছেন। ঘরের ভিতরে—ছয় বৎসরের ফুটফুটে চেহারার গোপাল গা-ময় গহনা, মাথায় খুব চুল, জ্যোতিঃপূর্ণ, চোখ ঝলসে যায়—ঘাড় নাড়িয়া দুলিতেছেন—গলায় শ্বেতফুলের মালাগাছ'ও দুলিতেছে।

প্রৌঢ়া ভক্তিমতী শ্রদ্ধেয়া হিরণবালা দাসী আমনানের মেয়ে; তাঁহার শ্বশুর বাড়ী সেইয়া গ্রামে। তিনি গোপালগত প্রাণ, প্রায়ই গোপালজীকে দর্শন করিতে আমনানে আসেন। সম্প্রতি বন্যার সময়ে জলমগ্ন রাস্তায় একদিন বৈকালে গোপাল বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পরই অতিবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় তিনি সেই রাত্রিতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দিরের বারান্দায় অবস্থান করেন। পরদিন প্রাতে তিনি ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "রাত্রিতে খুব আশ্চর্য দেখিলাম! গোপাল পীত বসন, গহনা এবং মাথায় চূড়া পরিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি বলিলেন, 'তবে আমাকে ধর না—ধর'। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না।"

ইহার কিছু দিন পরে একদিন রাত্রিতে তিনি নিজ বাড়ীতে দেখিলেন, ছয় বৎসরের গোপালজী তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন 'গোপাল এখানে দাঁড়িয়ে আছ, দেখছি যে!' এই কথা বলা মাত্রই গোপাল দৌড়াইতে লাগিলেন। ভক্তিপ্রাণা হিরণবালাও 'ধরিতে পারি কি না দেখি' বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি অনেক দূর দৌড়াইয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তখন গোপাল বাঁশীটি মাটিতে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লান্ত হইয়া তিনি বসিয়া পড়িলে গোপাল তাঁহাকে বলিলেন, 'বসিয়া পড়িয়াছ যে, ক্লান্ত হইয়াছ নাকি?' তিনি বলিলেন, 'ক্লান্ত হইব না? কত দৌড়াইয়াছি।' গোপালজী বলিলেন "আমি তোমার কোলে বসিব কি?" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বসো।" গোপাল শান্তভাবে তাঁহার কোলে বসিয়া বলিলেন, "তোমার কষ্ট হইতেছে কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার কোন কষ্ট হইতেছে না।" তখন তথায় সামনে এলোকেশী দেবী এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেরও কোলে নিতে পারিবি কি?" তিনি পা ছড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা নিতে পারিব।" দেখিতে দেখিতে গোপালজী ও অন্য দুই জন অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

উক্ত হিরণবালার পিতৃকুলের সম্পর্কিতা আত্মীয়া নিকটবর্তী গ্রাম খুঁড়িগাছি নিবাসিনী প্রবীণা শ্রদ্ধেয়া সুমতি দাসী অতিশয় গোপালগতপ্রাণা। তিনি একটু নীরবে চিন্তামগ্ন হইলেই শ্রীশ্রীগোপালজীউর দর্শন লাভ করেন।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় দত্ত মহাশয় বলেন, একরাত্রিতে শ্রীশ্রীগোপাল জীউ তাঁহার কাছে তথায় গেলেন। তাঁহার মাথায় চূড়া নাই কেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলে গোপালজী বলিলেন "আমার চূড়ার কানের পাশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া বাবাজী পরাইয়া দেন নাই।" শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময়বাবু আমনানে হরিসভায় আসিয়া খোঁজ নিয়া জানিলেন সত্যই গোপালের চূড়ার কানের পাশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি সযত্নে নিজ অর্থব্যয়ে উক্ত চূড়ার কানের পাশা কলিকাতা হইতে মেরামত করিয়া আনিয়া গোপালজীকে দিয়াছেন।

সাধারণ লোকে অলৌকিক বিষয় বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাই বলিয়া ভক্ত সংগে শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা কদাচ বন্ধ থাকে না বা থাকিবে না।

আমনানের চক্রবর্তী বংশের পণ্ডিত কান্তচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় কলিকাতায় টোল পরিচালনা করিয়া ৩২ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীটে বাড়ী করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট ঐ বাড়ীতে তাঁহার পিতার অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আছে, শুনা যায়। এই বংশের আর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ৺দিগম্বর ন্যায়রত্ন মহাশয় আমনান গ্রামে দীর্ঘকাল সংস্কৃত টোল পরিচালনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। চক্রবর্তী বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্তী হুগলী জেলার জুলকুল গ্রাম হইতে আমনানে আসিয়া বসবাস করেন। বলরাম, জগন্নাথ, গঙ্গানারায়ণ ও দর্পনারায়ণ নামে তাঁহার চার পুত্র হইয়াছিল। বাৎসল্য রসের অদ্বিতীয় মূর্তি "গোপালের মা" গঙ্গানারায়ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বদনচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীমৎ হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় এই গ্রামের একজন পরম বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত।

এই গ্রামের ধর্মপ্রাণ ৺রাধানাথ সুর মহাশয় প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধারাণীসহ শ্রীশ্রীরাধানাথ জীউর সুমনোহর শ্রীমূর্তি স্থাপনা করিয়া নিত্য সেবার ব্যস্থা করেন। ঐ বাড়ী বর্তমানে ঠাকুরবাড়ী নামে সুপরিচিত। তদ্বংশীয় ৺উপেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে এখানে রাধানাথ এম-ই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে এই স্কুল উঠিয়া গেলে ঐ স্কুল ভবনে বর্তমানে আমনান ইউনিয়ন দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে।

এই গ্রামের জমিদার ৺অম্বিকাচরণ নিয়োগী মহাশয় বসন্ত চণ্ডীমাতার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছিলেন (এই বিবরণ শ্রীগোপাল-লীলামৃত পুস্তিকার স্থানে স্থানে দ্রষ্টব্য) তিনি বসন্ত চণ্ডীমাতার স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দীপ দান এবং বিশেষ তিথিতে সেবা পূজার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াগিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান ওয়ারীশ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সুর মহাশয় ও দৌহিত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নীলমণি সুর এবং তৎপরিবারবর্গ এই সেবা পূজা অদ্যাপি পরিচালনা করিতেছেন।

বিপিনবাবুর পিতা আমনান ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে নিজব্যয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন। বিপিনবাবু এ অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন।

৺গোপাল সুর মহাশয়ের দীর্ঘকাল পূর্বে জগদ্ধাত্রী পূজার স্থায়ী অর্থব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ওয়ারীশগণ অদ্যাপী এই পূজা সমারোহে করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সুর এম-এ, দীর্ঘকাল গ্রামে থাকিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং গ্রামের জনহিতকর কার্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সুর বি-এস-সি মহাশয় এ অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ের হিতকর কার্য করিয়াছেন।

রামদাস আদক ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে গীত ধর্মমঙ্গলে পাউনানের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"সাতমাসা পাউনান গড় মান্দারণে।
পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে॥
দিবস দ্বিযাম শুভ গগনে যখন।
অনুকূল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ॥"

গোস্বামী মালিপাড়ার ভূমি-প্রকৃতির অবস্থান পাউনান হইতে উচ্চে অবস্থিত। পূর্বে এ অঞ্চলে প্রায় বন্যা হইত, বন্যায় আমনান গ্রাম ডুবিয়া যাইত এবং পাউনান গ্রাম ভাসিত। এ বিষয়ের এ অঞ্চলের একটী জন প্রবাদঃ—

"আমনান ডুবু ডুবু, পাউনান ভাসে।
সোণার মালপাড়া দাঁড়িয়ে হাসে॥"

এই আমনান গ্রাম সদ্‌গোপ সমাজের কুলীন স্থানরূপে এ অঞ্চলে বহু প্রাচীন হইতে পরিচিত আছে। এই গ্রামে সদ্‌গোপ "সুর" কুলীনদিগের আদিপুরুষ ৩য় সুর মহাশয় কয়েক শতাব্দী পূর্বে বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ। নিয়োগী ও বিশ্বাস উপাধিধারী অন্য কুলীনগণেরও এখানে অবস্থান আছে। আমনান ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৮,৫৫৫ জন।

বিশ্বাস বংশীয় ৺রায় সাহেব কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস গোরক্ষপুর অঞ্চলে রেল বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং "সদানন্দ" নামে শেষে উন্নত ধর্মজীবন যাপন করিয়া গোরক্ষপুর হইতে 'দি ম্যাসেজ্' নামক একটি মাসিক ধর্ম পত্রিকা দীর্ঘকাল সম্পাদনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি "তন্ত্রী" নামক একখানা ধর্মসঙ্গীত পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অধুনা ভদ্রেশ্বর গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সুর এম-এ, লাহোরের এক কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, পরে দীর্ঘকাল এই গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অধুনা তিনি চন্দননগরে অবস্থান করিতেছেন।

সুর, বি-এস-সি, হুগলী র' ছিলেন, অধুনা তিনি পেন্সন প্রাপ্ত। তাঁহার এক পুত্র এম-বি, ডাক্তার। তাঁহার ধর্মপ্রাণ পূর্বপুরুষ গ্রামে দুইটি শিবলিঙ্গ ও তাহাদের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র সুর এম-এ-বি-এল, বিহারে ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইয়াছিলেন।

গ্রামে হরিসভার নিকটবর্তী নিয়োগী বংশীয়গণ গয়া, ধানবাদ, আসানসোল, কল্যাণী প্রভৃতি অঞ্চলে উচ্চ কার্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন। শ্রীবিভূতিভূষণ নিয়োগী ধানবাদ মাইনিং কলেজে অধ্যাপনা করিয়া সম্প্রতি পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ গৌরমোহন নিয়োগী এম-বি, একজন চিকিৎসক।

*রামলাল সুর এল-এম-এফ, দীর্ঘকাল কাশীতে চিকিৎসা ব্যবসা করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি একখানা বাড়ীও করিয়াছেন। তিনি আমনান গ্রামের নিকটবর্তী জোড়া অশ্বত্থতলায় পাকা রাস্তার ধারে নিজব্যয়ে একটী নলকূপ সাধারণের জলপানার্থে খনন করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে নিম্নোক্ত ফলক আছেঃ

"কালিদাস সুর ও *মুক্তকেশী সুরের
স্বর্গীয়া পুত্রবধূ সাবিত্রী প্রতিম
সুধাংশুবালার
স্মৃতিকল্পে
"শান্তি সুধা ধারা"
ইতি ডাঃ রামলাল সুর
আমনান ১।১।৪৬ বাং।"

পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য এই গ্রামের বর্তমান উপাধিধারী পণ্ডিত। তিনি হুগলী সহরে অবস্থান করেন। তাঁহার পুত্র একজন বি-এ।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এযাবত নাই। এখানে অনেক ঘর সাঁওতাল ও অন্য জাতি আছে।

দীর্ঘকাল পূর্বে (প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে) আমনান রাধানাথ এম-ই স্কুল উঠিয়া গেলে বহুদিন এই গ্রামে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ছিল না। সাময়িকভাবে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের পত্তন হইত মাত্র। এই গ্রামের শ্রীনীলমণি সুর মহাশয়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে গ্রামবাসিগণের আনুকূল্যে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী স্কুলটী এখানে ১৯৪৫ সন হইতে হুগলী জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত "আমনান ফ্রী প্রাইমারী স্কুল" চলিতেছে। স্কুলের জমি গ্রামবাসী শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য দান করিয়াছেন। গৃহ এবং আসবাবপত্র নীলমণিবাবুর মূলতঃ চেষ্টায় হইয়াছে। বাং ১৩৩৩ সনে এখানে "বান্ধব পাঠাগার" নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। মধ্যে ইহা কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবত ইহা পুনরায় সুপরিচালিত হইতেছে। গ্রামে দুইটি যাত্রা পার্টি এবং একটী ফুটবল ক্লাব দীর্ঘকাল যাবত পরিচালিত হইতেছে। গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ইউনিয়ন বোড এবং বেঞ্চ আদালতের পাকা অফিস বাড়ী আছে।

গ্রামে কয়েকঘর কুম্ভকার আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'পটারি' নির্মাণ শিক্ষার্থে গত দুই বৎসর এখানে একটী 'ট্রেণিং সেণ্টার' হইয়াছিল।

॥ ঘোষপুর ॥

পোলবা থানার এলাকাভুক্ত মহানাদের পার্শ্ববর্তী ঘোষপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস। এখানে "রবীন্দ্র পাঠাগার" নামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত একটি পাঠাগার আছে। গ্রামের অধিবাসীদের সহযোগিতায় এবং যুবকগণের উদ্যোগে পাঠাগারটি ১৩৬২ সালে স্থাপিত হয়।

॥ পাণ্ডুয়া ॥

পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান. পূর্বে এই স্থান **"পাণ্ডুনগর" বা "পাণ্ডুনগর"** বলিয়া পরিচিত ছিল এবং মুসলমান-রাজত্বকালেও এই স্থান হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য নামে এক রাজা পাণ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীন পেঁড়োবসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজ বংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূরে এবং হাওড়া হইতে ইষ্টার্ন রেলওয়ের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন গৌড়ের পাণ্ডুয়ার অনুকরণে এই পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছে।

পাণ্ডুয়া থানার আয়তন একশত দশ বর্গ মাইল। এই থানার অন্তর্ভুক্ত চোদ্দটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। উহাদের নাম ঃ—বেড়েলা-কোঁচমালী, বাটিকা-বৈঁচি, জামনা, হরাল-দাসপুর, রামেশ্বরপুর-গোপালনগর, সিমলাগড়-ভিটাসিন, তোড়গ্রাম-পাঁচগড়া, পাণ্ডুয়া, জামগ্রাম-মণ্ডলাই, ইলছোবা-দাসপুর, শিখিরা-চাপ্তা, ইটাচোনা-খন্যান, বেলুন-ধামাসীন, এবং জায়ের দ্বারবাসিনী।

পাণ্ডুয়া ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক হইতে সপ্তগ্রামের অব্যবহিত পরেই পাণ্ডুয়ার স্থান নিঃসন্দেহে দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও এই স্থান পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদিগের কোন নিদর্শনই বর্তমানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদিগের মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হয় এবং হিন্দুদিগের প্রত্যেক দেব-দেবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমস্ত হিন্দুদিগকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে পাণ্ডুয়া হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও হিন্দুদিগের যাবতীয় চিহ্ন এই স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন ঃ "Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as the site of a great victory gained by the Musalman under Shah Safi over the Hindus about 1340 A. D."

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীন সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ভগিনী তখন পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন; তাঁহার এক পুত্র ছিল নাম সাহা সুফি। তিনি এই অঞ্চলের মুসলমানদিগের ধর্মযাজক এবং 'ফকির' বলিয়া সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পাণ্ডুয়ার রাজার সহিত মুসলমানদের বিরোধ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ডুয়ার রাজার এক নবজাত পুত্র হইয়াছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার রাজ্যে এক ভোজের বন্দোবস্ত করেন। ভোজের দিবসে রাজার এক মুসলমান কর্মচারী তাহার বাড়ীতেও ভোজের জন্য একটি গো-হত্যা করিয়া গরুর হাড়গুলি মাটীতে পুঁতিয়া দেয়। কিন্তু রাত্রে কুকুর কর্তৃক উক্ত হাড়গুলি রাজপথে আনীত হয় এবং সেই জন্য হিন্দু প্রজাগণের মধ্যে

ভয়ংকর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যে মুসলমান গো-হত্যা করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রজাবৃন্দ বিফল-মনোরথ হয় এবং রাজপুত্রের জন্যই এই ভোজের আয়োজন হইয়াছিল বলিয়া ক্রোধবশতঃ তাহারা রাজপুত্রকে হত্যা করে। রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে গো-হত্যার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান; কিন্তু সমস্ত মুসলমানগণ ভয়ে তাঁহার রাজত্ব হইতে পলায়ন করে।

সাহা সুফির মাতুল দিল্লীর সম্রাট্; সাহা সুফি প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত বহু সৈন্য দিয়া তাঁহাকে পাণ্ডুয়ায় পাঠাইয়া দেন। সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁ সাহা সুফির খুল্লতাত; তিনি এবং বহরাম সাক্কা, সাহা সুফিকে পাণ্ডুয়ার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। পাণ্ডুয়ার হিন্দু প্রজাবৃন্দ গো-হত্যার জন্য অকারণে রাজার প্রতি বিরূপ ছিল; এই সময়ে সাহা সুফি সসৈন্যে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিল। হিন্দু রাজার সহিত মুসলমানগণের তুমুল যুদ্ধ হইল এবং কয়েকদিন যুদ্ধের পর রাজা নিহত হইলেন; পাণ্ডুয়া সাহা সুফির করতলগত হইল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশে ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভিযান চলে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হুগলী জেলায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মুসলমান গাজীরা এই সব অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া ধর্মযুদ্ধে নিহত হন বলিয়া পাণ্ডুয়া মহানাদ প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য পীরের আস্তানা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। স্টেপেলটন সাহেব লিখিয়াছেন যে, দিল্লীর সুলতানরা গাজী ও আউলিয়াদের পাঠাইয়া ভিতর হইতে বঙ্গদেশ জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহা তাহাদের রাষ্ট্রনীতির একটি কৌশল ছিল। তাহার মতে ইহারা দিল্লীর সুলতানের "পঞ্চম বাহিনী"। সাধারণতঃ এই সব গাজীসাহেবরা হিন্দু রাজাদের এলাকায় প্রবেশ করিয়া সামান্য কারণে ঝগড়ার সৃষ্টি করিতেন। তারপর মুসলমান সাধুদের উপর অত্যাচারের সুযোগ লইয়া শাসকদের সৈন্যদল হিন্দুদের শিক্ষা দিবার জন্য সেই রাজ্যে প্রবেশ করিত। গাজী সাহেবদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা। ধর্মের আস্তানা স্থাপন না করিলে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা যে সম্ভব নয় ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য পাণ্ডুয়ায় মুসলমানগণ সেই কৌশল করিয়াছিলেন।

সাহা সুফি পাণ্ডুয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজার প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিলেন এবং সেই স্থানে মন্দিরের উপকরণ দিয়া মসজিদ নির্মাণ করিলেন। এই মসজিদ 'বাইশ-দরজা' অর্থাৎ বাইশটি বৃহৎ খিলানের দ্বারা এই বাড়ীটি নির্মিত ছিল। ইহা পূর্বে দেব মন্দির ছিল; ইহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত সিংহাসনের ন্যায় একটি 'বেদী' অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; এই সিংহাসনের মধ্যে কোন বিগ্রহ-মূর্তি থাকিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিংহাসনের সোপানগুলিও সুন্দর প্রস্তর নির্মিত। মন্দিরের চতুর্দিকে বহু মিনার বা স্তম্ভ ছিল; সেকালের হিন্দুরাজগণ প্রাতঃকালে উচ্চ স্থান হইতে সূর্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলি বিনষ্ট করিয়া কেবলমাত্র বৃহৎ স্তম্ভটিকে নামাজের আজানের জন্য রক্ষা করা হয়। এই

সম্বন্ধে "লিষ্ট অফ এ্যানসিয়েণ্ট মনুমেণ্টস ইন বেংগল" নামক পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি ঃ

At the close of the 13th century, Shah Sufi, whose mother was sister to the Emperor Firoz Shah II, who died in 1296 A.D. lived at Pandua. At that time, the Hindu Pandua Raja ruled over the district and lived at Mahanath (now Mahanad) not far off. Being oppressed by the Raja, Shah Sufi fled to his uncle at Delhi, obtained assistance and with a large army and two men of renown Zafarkhan Ghazi and Bahram Sakka, overthrew the Raja. The old temple of Pandua was then destroyed and the present mosque built with its remains. The large tower was used as a Minarch or a Minaret (call for prayer). Every Hindu was driven out of the town. The vault of Pandua in which *SUFI* was buried still exists. This story does not give the date of erection of the tower but of its use as a Mazinah, Mr. Blochmann of the East Asiatic Society was of opinion that the tower resembles in structure well-known *KUTABMINAR*, near Delhi. The town of Pandua consists of a very curious old tower about 125 ft. in height, a large long Masjid and also a square Masjid near the famous tomb of Shah Safi-ud-din.

It is improbable that the Masjid and Minar might have been built by the nephew of the *FIROZ* as the style of the long Masjid is very like that of the other mosques built during his reign. The great tower is the Mazina or Muazzin's Minar ; its entrance on the west towards the Masjid. (General Cunningham thinks that the square Masjid tower belongs to the first half of the 9th Century of the Hijra). The Minar at Pandua is very curious structure, quite different from all others that are generally to be found.

মহীউদ্দিন ওস্তাগর "পাণ্ডুয়ার কেচ্ছা" নামক পুস্তকে পাণ্ডুয়ার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

বড় পে'ড়ো ছোট পে'ড়ো তিরবেণী আর
পীরের খাতেরে আল্লা করেছেন তৈয়ার
আল্লার পেয়ারা পীর শাসুফী সোলতান
পাঁড়োয়া মকান মাঝে করেন মকান।
এ খাতেরে পাঁড়োয়া যে জাহের আলমে
শিরণি খতম হয় শাহ-সুফী নামে।
এয়ছা ভাতে কত লোক করে কহা শুনা
নাহি জানে কোনরূপ নেহাৎ ঠিকানা।
আমি বান্দা গোনাগার পাঁড়োয়াতে যাইয়া
দেখিনু মনুরা ঘর নেহাৎ করিয়া।
বাদশাহী মকান হেন হয় অনুমান

দেল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া মকান।
এয়ছা কেরামত ছিল সে পাণীর শুনি
মোর্দা দিলে জিন্দা হইত কুদরতে রব্বানি।
কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান
বাঘের নিকট রইত বকড়ির সমান।
এছলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দোলাইত।

পাণ্ডুয়া বিজয়ী সাহা সুফি মন্দিরের সর্বোচ্চ স্তম্ভটি মুসলমানদিগের বিজয় স্তম্ভ-স্বরূপ রাখিয়া দেন; ইহার উচ্চতা পূর্বে ১৩৬ ফিট ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে স্তম্ভের, উপরিভাগের ১১ ফিট বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে ইহার উচ্চতা ১২৫ ফিট দাঁড়াইয়াছে। ইহার আকার ও গঠন প্রণালী দিল্লীর কুতবমিনারের অনুরূপ এবং ইহা বাঙলার প্রাচীনতম ইমারত। এইরূপ ইমারত বাঙলা দেশে আর দ্বিতীয় নাই। লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন, "This minaret is said to the oldest masonary building of Bengal" পাণ্ডুয়ার মিনারটি পাঁচটি তলায় বিভক্ত প্রথম তলায় ব্যাস ৬০ ফিট। মিনারটি ক্রমশঃ উপরের দিকে সরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপরের দিকে পঞ্চম তলার ব্যাস মাত্র ১৫ ফিট। প্রত্যেক তলায় একটি করিয়া বেড়াইবার জন্য বারান্দা আছে। উক্ত বারান্দা দিয়া মিনারের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা যায়। একতলার প্রবেশদ্বার বাইশ দরজার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। একতলা হইতে ঘুরান সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। মিনারের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ১৬১টি সিঁড়ি আছে। মিনারের গঠন ও আকার নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

পঞ্চম তলার ব্যাস ১২ ফিট উপরে ও ১৫ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট। চতুর্থ তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চি উপরে ও ২৮ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট। তৃতীয় তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চি উপরে ও ২৬ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট। দ্বিতীয় তলার ব্যাস ৪৭ ফিট ৬ ইঞ্চি উপরে ও ৪৮ ফিট ১ ইঞ্চি নিম্নে; উচ্চতা ২৫ ফিট। পঞ্চম তলার উপরের চুড়ার উচ্চতা ৯ ফিট। মিনারের মোট উচ্চতা ১২৫ ফিট। মিনারের চুড়ার উপর একটি ছড়ি আছে। প্রবাদ যে, সুলতান সাহা সুফি ঐ ছড়ি লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

কুতবুদ্দিন ১২০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে কুতবমিনার নির্মাণ করেন। ইহা পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহার উচ্চতা ২৩৮ ফুট এবং উপরে উঠিবার জন্য ইহার মধ্যে ৩৯৭টি সিঁড়ি আছে। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশা তোগলক উপরের তলা দুইটি পুনঃনির্মিত করেন। ভারত-ইসলামীয় স্থাপত্যের ইহা সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া কথিত হয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে নব-বর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক পাণ্ডুয়ায় সমবেত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মেলার সময় মিনারের উপর উঠিবার জন্য এরূপ ভীড় হইয়াছিল যে, সিঁড়ি হইতে একটি লোক পড়িয়া লোকের পদতলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মিনারের গাত্রে কোন শিলালিপি নাই।

মিনারের উত্তর পশ্চিমে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং সুলতান সাহা সুফির সমাধি মন্দির আছে। মসজিদটি ছোট ছোট ইট দিয়া গাঁথা হইয়াছে। মসজিদের ফটকে একখানি শিলালিপি গ্রথিত ছিল, কিন্তু ফটকটি পড়িয়া যাওয়ায় শিলাখণ্ডও স্খলিত হইয়া যায় এবং বর্তমানে উহা মসজিদের পূর্বদিকে অবস্থিত সাহা সুফির সমাধির মধ্যে রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাৎ দিকে একটি ভগ্ন সূর্যমূর্তি খোদিত আছে। কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর খোদিত সূর্যদেবের একটি মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহার নিম্নভাগের পশ্চাৎ দিকে আরবী অক্ষরের লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,-"হিজরী ৮৮২ অব্দে সামসুদ্দীন ইউসুফ সাহেব সেনাপতি কর্তৃক পাণ্ডুয়ার হিন্দু-রাজত্বের বিলোপসাধন এবং হিন্দুদের বিগ্রহগুলির দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে।" পাঠকগণের অবগতির জন্য এক দিকে শিলালিপি ও অন্যদিকে সূর্যমূর্তি নিম্নাংশের আলোকচিত্র দেওয়া হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লালকুনওয়ার নাথ নামক এক হিন্দু এই মসজিদ সংস্কার করেন।

আলোকচিত্রে আরও দুইটি ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাতে আল্লার নামে মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। উহাদের অন্য দিকেও হিন্দুমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মূর্তিগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িয়াছে বলিয়া ঐগুলি কোন্‌টা যে কি দেবতার মূর্তি ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না। মসজিদের সম্মুখে আর একটি সমাধি আছে; অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা মকদুল সাহেবের সমাধি। উক্ত মকদুল সাহেব কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। পাণ্ডুয়ায় বারটি মসজিদ আছে এবং বহু স্থানে ইতস্ততঃ কবরও দৃষ্ট হয়। হিন্দু রাজার সময় হইতে পাণ্ডুয়ার সীমানা পাঁচ মাইলব্যাপী প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা ছিল; প্রায় শতবৎসর পূর্বেকার মানচিত্রেও পাণ্ডুয়ার চতুর্দিকে প্রাচীর বা বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে কোন প্রাচীর দৃষ্ট না। সাহ সুফির সমাধি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি "লিষ্ট অফ এ্যানসিয়েণ্ট মনুমেণ্টস ইন বেঙ্গল" নামক সরকারীগ্রন্থে লিখিত আছে :

Hooghly-Pundua—*TOMB OF SHAH SUFI-UD-DIN* is a fine building, 200-ft long and with 60 tombs.

এই স্থানে 'পীরপুকুর' নামে একটি পবিত্র জলাশয় আছে। ক্রফোর্ড সাহেব ইহা ৫০ ফিট গভীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পীরপুকুর সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা অতি বিচিত্র। এই পুকুরের মধ্যে সত্যপীর অবস্থান করেন এবং তাঁহার দুইটি কুমীর আছে। কুমীর দুটিকে ডাকিলেই তাহারা আসে এবং তাহাদিগকে সিন্নি দিলে যদি তাহারা সিন্নি গ্রহণ করে তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মহানাদ ও দ্বারবাসিনীতেও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দুইটি পুষ্করিণী আছে। পাণ্ডুয়ার পুষ্করিণী পাণ্ডুরাজা খনন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। পাণ্ডুয়ার সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল, শণ ও ধানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখনও কাগজিপাড়ায় কোন কোন মুসলমান কাগজ প্রস্তুত করে; ধানের জন্য আজও পাণ্ডুয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং বহু ধানের কল এই স্থানে আছে। পূর্বে প্রায় দশ হাজার লোক এই ক্ষুদ্র স্থানটিতে বসবাস করিত; কিন্তু

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'বর্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীতে এই স্থান শ্মশানে পরিণত হয়। ৬১৬১ জনের মধ্যে ৫২২২ জনের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই এই স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম রেল-পথ পাণ্ডুয়া পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন মিঃ হজসন নামক একজন ইংরেজ প্রথম রেলগাড়ী পাণ্ডুয়া পর্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর জন্য পাণ্ডুয়ায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা খোলা হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পাণ্ডুয়ার মিনারটি পূর্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ভিতরের দেওয়ালে অনেক মীনার কাজ আছে। রূপান্তরিত মন্দিরের উপর মিনারটি কেন নির্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। মালদহ জেলায় আর একটি পাণ্ডুয়া আছে। উহা পূর্ববঙ্গ রেলপথের আদিনা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীঅশোক মিত্র এই মিনার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

The object with which the tower was built is not clear. It may be a muazzin tower or victory tower. Or it may be a watch tower for flares connecting the view of distant watch towers like the Firuz and Minasarai towers in Malda. (District Handbooks Hooghly)

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে যে সকল প্রাচীন স্থান আছে তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি অন্যান্য বহু স্থানের তুলনায় যে অধিক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়. আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন স্থানগুলির ইতিহাস অসংখ্য রচিত হইয়াছে. কিন্তু আমাদের গৃহের কোণে হিন্দুরাজবংশের ও হিন্দু সভ্যতার স্মৃতি-বিজড়িত এই সমস্ত ধ্বংসপ্রায় শ্মশানক্ষেত্রে পদার্পণ না করিলে বাঙ্গলার ইতিহাস মূর্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির উদ্ধারসাধন যে মহাপুণ্যজনক কার্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? স্রষ্টা যায় কিন্তু সৃষ্টি চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকে; আজ এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের স্রষ্টাগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত কবরসমূহ ঘোর নীরবতার মধ্যেও তাঁহাদের কৃত কর্মের জন্য অট্টহাস্যে মানবনশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে।

পাণ্ডুয়ার মাঘ মেলা

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় ১লা মাঘ এই মেলা বসে। সারা মাঘ মাস ধরিয়া এই মেলা বেশ জমজমাট থাকে। এই মেলাটি প্রধানতঃ মুসলমানদের হইলেও সর্ব সম্প্রদায়ের লোকই এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের এই মেলায় যথেষ্ট ভীড় হয়। পেড়োর মন্দির পাণ্ডুয়ার একটি দর্শনীয় বস্তু। দৈনিক এই মেলায় আগত হাজার হাজার লোক এই উচ্চ পেড়োর মন্দিরে উঠিয়া আনন্দলাভ করেন। প্রতি বৎসর মেলার উদ্বোধনী দিনে সর্বাপেক্ষা বেশী জনসমাগম হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক রসিকপাঠক 'মধুকর' ছদ্মনামে পাণ্ডুয়ার মেলা দেখিয়া ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী হালিসহর হইতে মেলার যে জীবন্ত চিত্র দেখাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

॥ পাণ্ডুয়ার মেলা ॥

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের গাড়িতে বসেই দেখা যায়, অদূরে গ্রামের মাঝখানে বিশাল গম্বুজ তার উদ্ধত তর্জনী তুলে রেখেছে আকাশে। স্টেশনের গায়ে দেখুন, গাঁয়ের নাম পাণ্ডুয়া। একদাবর্ধিষ্ণু হুগলী জেলার এক গ্রাম। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইলও হবে না। ইলেকট্রিক ট্রেনে দেড় ঘণ্টার বেশী সময় নেবে না। স্টেশনের বাইরে এসে রিক্সা পাবেন। কোথায় যাবেন আপনি? কী দেখবেন? বাইশ দরওয়াজা? শাহ সুফির মসজিদ? পাণ্ডুয়ার মিনার? তাহলে পায়ে হেঁটে চলে যান। আধ ঘণ্টা সময়ও নেবে না।

সারাটা বছর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। ভয়াবহ নির্জনতা একে স্থবির গম্ভীর করে রেখেছে। আর আজ? আজ এখানে লক্ষ লোকের মেলা। মেলার উপলক্ষ্য কেউ জানে না। কেবল মিলতে হয়, মিলতে হবে এই কথাটাই হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই। তাই বছর ঘুরে এলে মাঘের প্রথম দিনেই এসে হাজির হয়েছে সবাই। হোটেল বসেছে। সারে সারে কাচের চুড়ির দোকান আগলে বসেছে মুসলমান মেয়েরা। মনোহারী দোকানের পাশেই বটতলার নাটক নভেল। শুধুই কি নাটক? রামায়ণ-মহাভারতের পাশে হজরত বড় পীরের জীবনী। তার গা ঘেঁষে শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম, সেই সঙ্গে সিনেমার গানের পুস্তিকা। এসেছেন শৈলজানন্দ, প্রভাবতী দেবী, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার। আবার তাদের গা ঘেঁষে সাহিত্যরত্ন অমুক আলীর সেরা উপন্যাস 'জীবন আর চাই না।' তা ছাড়া আছে হিন্দী চিত্রতারকাদের সুসজ্জিত ছবি। পাশেই রামকৃষ্ণ সারদা দেবীর ধ্যানমৌন মূর্তি। উত্তর দিকে বসেছে খাট-পালঙ্কের দোকান। মিস্ত্রিদের মরবার সময় নেই এখন। মাটির বাসন, আয়না, কাঁকুই, চুলের ফিতে—না আছে কী? হরেক কিসিমের খদ্দের, হরেক রকমের মাল। ছুরি-কাঁচি দা-কোদাল আছে সবই। লোহার বেড়ি কড়াই খুন্তির দোকান বসেছে গোটা চারেক। কাঁসা পেতলের দোকান তিনটি। আলাপ হল দোকানীর সঙ্গে। বললে, না মেলা জমলে কী হবে। বিক্রি-বাটা আর নেই। সারাদিনে বিশ টাকাও মেলে না। অথচ দেখুন আট হাত জায়গার ভাড়া চোদ্দটি টাকা। ধান-চাল ছোলা-মটরের দোকানও আছে। আছে তরিতরকারি, মাছ দুধের ব্যবস্থা। অবশ্য সকালের দিকেই পাবেন সেসব। রাস্তার পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে একটাই। এবার সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে কেমন।

জাগয়ার মালিক বোঘরের মোল্লা সাহেব। মেলার সময় খাজনা আদায় করেন অবশ্য জায়গীরদার। মেলা চলবে পুরো একটি মাস। তারপর আবার সেই শূন্য পুরী খাঁ খাঁ করবে। জি টি রোডের বুকে ছুটন্ত বাসের জানালায় চোখ রেখে অবাক হবে সে যে কোনদিন এ পথে আসেনি। দেখবে নির্জন, নিঃসঙ্গ মিনারের পাশে বাইশ দরওয়াজা যার পাথরের ভাঙা দরজার খিলান একদা হুগলী-পাণ্ডুয়ার সমস্ত ইতিহাস খোদাই করা আছে! প্রায় তেতাল্লিশ গজ উঁচু মিনার। পাঁচতলা বাড়ির সমান। গোলাকৃতি গম্বুজের ব্যাস উপরের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে শাহ্ সুফির মসজিদ। এমন বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলা দেশে হয়তো অনেক জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে,

কিন্তু এখানে এলে মনে হবে আপনি যেন কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছেন। এ যেন এক মুসলমান যুগের যাদুঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি।

সময়ের ব্যবধানে কত কী হয়! অসংখ্য কিংবদন্তী তৈরী হয়েছে এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। লোকমুখে শোনা যাবে তখনকার সামন্ত রাজাদের সংগে মুসলমান গাজী পীরদের যুদ্ধান্দোলনের নানা গল্প। এমন কি শান্তিপুরের মহীউদ্দীন ওস্তাগর রচনা করেছেন 'পাণ্ডুয়ার কেচ্ছা।' এই পাণ্ডুয়ার নাম আবার ছোট পেঁড়ো। কারণ মালদহ জেলায় আছে বড় পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া। কিন্তু গল্প, কেচ্ছা অথবা কিংবদন্তী যাই থাক তাকে ঘটনা আখ্যা দেওয়া চলে না। তবু মনে করা যেতে পারে হিন্দু সামন্ত রাজাদের অত্যাচারী মনোভাবই প্রজাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে কারণে এ অঞ্চলে ইসলামের অনুপ্রবেশ এবং আধিপত্য সম্ভব হয়ে উঠেছিল। আজকেও হুগলীপাণ্ডুয়া মুসলমানপ্রধান অঞ্চল তাদের মসজিদ, দরগা ইত্যাদি হয়তো হিন্দুদের মঠ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হুগলী-পাণ্ডুয়ার ভূমিকা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত বলা যায় যার স্বাক্ষর এখানকার পুরাতন স্তম্ভে দেওয়ালে সর্বত্র বিদ্যমান। কালের কঠিন হস্তাবলেপে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হতে পারেনি। কিন্তু হবে। আজ কিম্বা কাল।

পাণ্ডুয়ায় বহু পীরের সমাধি ও বহু লোকের কবর আছে। এখানে বারোটী মসজিদ আছে। পূর্বে এখানে নীল কুঠী ছিল ও এখানকার কাগ্‌জী পাড়ায় কাগজ প্রস্তুত হইত। পাণ্ডুয়া পূর্বে কাগজ, নীল, চূণ, বালি ও ধানের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং বর্তমানে এ স্থান বালি ও ধানের জন্য বিখ্যাত ইহা একটী বাণিজ্য-কেন্দ্র।

এখানে বারোটী ধানের কল, ধান ও চাউলের আড়ত, ইউনিয়ন-বোর্ড চৌকিদারী ডিস্পেন্সারী, এগ্রিকালচার অফিস, পোষ্ট-অফিস, কাঁটাগড়িয়া নিবাসী স্বর্গীয় খান্‌ সাহেব হাজী আতর আলী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সুলতানিয়া অবৈতনিক হাই মাদ্রাসা, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাহা মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শশীভূষণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ইউনিয়ন-বোর্ড ভিলেজ্‌-হল লাইব্রেরী, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীণাপাণী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীণাপাণী উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, থানা হেল্‌থ সেণ্টার, সাব্‌-রেজিষ্টারী অফিস, পুলিশ-থানা, ইন্‌সপেক্সন বাংলো, মুকুল সিনেমা, দীঘি, দোকান-পসার, প্রগতি সঙ্ঘ প্রভৃতি আছে। এখানে সপ্তাহে রবিবার ও বুধবারে দুই দিন হাট বসে। এখানে একটী পশু হাটও আছে, উহাও ঐ দিনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পশুর হাটে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি-বিভাগের কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র ও পাণ্ডুয়ার গড়ে 'নীরোদ-গড় উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটী বিদ্যালয় আছে। সম্প্রতি এখানে আরও দুইটী ধানের কল হইয়াছে।

এখানে 'পীরপুকুর' নামে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। মেলার সময় এই পুষ্করিণীতে দেশবিদেশ হইতে বহু যাত্রী ও দর্শক আসিয়া স্নান করিয়া রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে। পুষ্করিণীতে দুইটী কুমীর আছে, উহারা ফুল-শিরণি গ্রহণ করে। পাণ্ডুয়া পুনরায় সুসমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখানকার কুঁজা ও সরা খুব বিখ্যাত। এখানকার লোক সংখ্যা ৮,১৩৫ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৪,৫০৩ ও মহিলা ৩,৬৩২ জন।

মহানাদ নিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় পাণ্ডুয়ার গড় হইতে সেন-রাজত্বের দুইটী বিষ্ণু মূর্তি ও একটী গৌরী পট্ট আবিস্কার করিয়াছেন। উহা পাণ্ডুয়া নিবাসী ডাক্তার গোকুলচন্দ্র পালের বাটীতে এবং অপর ভগ্নমূর্তিটী পাণ্ডুয়া পুলিশ থানায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পাঠান-রাজত্বের তুর্কী-সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ বিবিধ মৃৎপাত্র, কতিপয় তুর্কী তাম্র মুদ্রা, মোগল আমলের বিবিধ মৃৎপাত্র, রঙীন মৃৎপাত্র ও সম্রাট শাহ্ আলমের তাম্র মুদ্রাগুলি এখানকার 'বিবেকানন্দ' কলোনীতে (১নং প্লটে) আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সকল দ্রব্যাদি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়মে' সংরক্ষিত হইয়াছে।

॥ খন্যান ॥

খন্যান একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। স্বর্গীয় শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় এই গ্রামের একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। এই গ্রাম ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ও স্বাধীনতাপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ নেতা এবং দেশ-প্রেমিক বাগ্মী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মস্থান। এখানে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্মৃতি-পাঠাগার, পোষ্ট-অফিস, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাট তলায় সুপ্রসিদ্ধ পাঁচপীরের সমাধি ও পূর্ব পাড়ায় (বাহির খন্যানে) উচ্চ প্রাথমিক মক্তব-মাদ্রাসা এবং সুপ্রসিদ্ধ অহেদবকস্ মোল্লার সমাধি আছে। পূর্বে এখানে নীলকুঠী ছিল। এখানে সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবারে দুই দিন হাট বসে। ইটাচুণা-খন্যান ইউনিয়নের অন্তর্গত **মান্দারণ** একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে 'চাঁপ' নামক পুষ্করিণী থাকায় এই গ্রামেকে 'চাঁপাবেড়িয়া মান্দারণ' বলা হয়। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই গ্রামের একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। এখানে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রভাত বসু উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

বিপ্লবের দীক্ষাগুরু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শুধু বিপ্লবগুরু হিসাবে নয়, সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরূপেও বাংলার ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কত তরুণ, কত প্রবীণ মুক্তিকামী উপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের সঙ্গে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের হয়ত পরিচয় নেই, কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য—নতুন বাঙলাকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন উপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাঁর বিচিত্র জীবন-কথা উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর, ধর্মপুস্তকের মত মর্মস্পর্শী। চিত্তে অমিত তেজ, মস্তিষ্কে অপূর্ব মনীষা, হৃদয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা নিয়ে এই প্রতিভাবান পুরুষ হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী খন্নিয়াম গ্রামে ১২৬৭ সনের ১লা ফাল্গুন জন্মেছিলেন। এঁদের পরিবার ফুলিয়া-কৃষ্ণনগরের কুলগৌরবসম্পন্ন। দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রই ভবানীচরণ। তিনিই পরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

শিশুকালে ভবানীচরণ মাতৃহারা হন পিতামহীর স্নেহ-যত্নে তিনি মানুষ হতে

লাগলেন। গ্রাম্য ছড়া, হেঁয়ালি, রামায়ণ, মহাভারত এই মেধাবী শিশুর কণ্ঠস্থ ছিল। অল্পবয়সেই সংগী বালকরা ভবানীচরণকে নেতার মর্যাদা দান করেছিল। স্বাধীনতাপ্রিয় এই কিশোর সহজেই সব ব্যাপারে দলপতিত্ব করে বড়দেরও চমৎকৃত করতেন। খেলাধুলো দুষ্টামির সংগে সংগেই পাঠশালা এবং পরে চুঁচুড়ার হিন্দু স্কুলে ও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভবানীচরণ যখন প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন—তখন অনেকেই এই বালকের মধ্যে ভাবী দেশনেতার অংকুরোদ্গম লক্ষ্য করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই ভবানীচরণের ইংরাজী ভাষায় অসামান্য দখল ছিল। কলিকাতার জেনারেল এসেমব্রী স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে ইংরেজ শিক্ষককেও বিস্মিত করে তুলতেন। তেরো বছর বয়সে উপনয়নের পর তিনি নিরামিষাশী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভাটপাড়ায় গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করলেন। মস্তিষ্ক চর্চার সংগে সংগে কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, লাঠি ও ক্রিকেট খেলা প্রভৃতির দিকে তাঁর সমান উৎসাহ। তাঁর শরীরের সুদৃঢ় গঠন ও তেজোদৃপ্ত কান্তি দেখে তাঁকে উত্তর ভারতের বা পার্বত্যপ্রদেশের অধিবাসী বলে মনে হ'ত। অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন ভবানীচরণ।

তখনকার দিনে আর্মানী, ফিরিঙ্গী ও গোরারা দুর্বল ভারতীয়দের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। একবার চুঁচুড়ায় এই ইতর প্রকৃতির লোকগুলি পাড়ার স্ত্রীলোকদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করে। তাদের সাবধান করা সত্ত্বেও অভদ্র ব্যবহার বন্ধ হ'ল না। ফলে ভবানীচরণের নেতৃত্বে ছেলের দল তাদের এমনই শিক্ষা দিল যে, কোট-প্যান্টলুন ছিঁড়ে টুপি হারিয়ে, সর্বাংগে আঘাতের চিহ্ন ধারণ করে ফিরিঙ্গি আর্মাণীর দল উর্ধশ্বাসে পলায়ন করল। দ্বিতীয়বার গোলমাল করার সাহস তাদের আর কখন হয়নি।

তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বাংলার অবিসম্বাদী নেতা। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ভবানীচরণের মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। আবেদন-নিবেদন, বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রভৃতিতে স্বরাজলাভে তাঁর আস্থা ছিল না। এই মুক্তিকামী যুবকের মাথায় এক চিন্তা—আমাদের দেশে এসে, আমাদের অন্নে মানুষ হয়ে, আমাদের সংগে বিবাদ, বিরুদ্ধেই লড়াই! ইংরেজের এত তেজ—এত অহংকার! এর ওষুধ দিতেই হবে!.... প্রথমেই সৈনিক হওয়া প্রয়োজন। যুদ্ধবিদ্যা শিখে লড়াই করে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

তরুণ ভবানীচরণ সোজাসুজি কংগ্রেস-সভাপতি আনন্দমোহন বসুর কাছে গিয়ে বললেন নিজের বাহুবলের ওপর নির্ভর করতে হবে—এই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু এই সাংঘাতিক মতবাদকে স্বীকার করে নেবে—এমন মানুষের সন্ধান ভবানীচরণ পাচ্ছিলেন না। "একলা চল রে" মন্ত্র তাঁর দু'কানে বেজে উঠল। তাঁর আয়ত চোখে সৈনিক হবার স্ব[illegible] অন্তরে স্বাধীনতা শক্তিরূপিনী ভারত মাতার প্রতিচ্ছবি।

বাড়ী থেকে পালিয়ে পশ্চিমে কোনো দেশীয় রাজার অধীনে সৈন্য হবার কল্পনা তাঁকে পেয়ে বস্‌ল। পড়াশোনায় আর মন বসে না।...যে কথা সেই কাজ! তিনজন সংগী নিয়ে কলেজের দু'মাসের মাইনে দশ টাকা সম্বল করে আদর্শবাদী এই তরুণরা গোয়ালিয়র

যাত্রা করলেন তখন বয়স সতেরো বছর।......তাঁরা ইটাওয়া ষ্টেশনে নেমে শুনলেন, গোয়ালিয়র সেখান থেকে ৩৬ ক্রোশ দূরে। চোখে ভারত-উদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে যুবকদল সেই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। এই সম্পর্কে যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।..."গ্রীষ্মকাল, সকাল বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। চারিজন সতেরো আঠারো বৎসরের বাঙ্গালী যুবক ভারত উদ্ধারে যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে চারিটি কি পাঁচটি টাকা আছে। কিন্তু হৃদয়ে সিংহবল। প্রথমেই যমুনা পার হইতে হইল। তারপর অনেক দূর হাঁটিয়া চম্বল নদী পাইলেন। চম্বল পার হইয়া আরও কিছুদূর গিয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পরিশ্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। চারিজনে পরামর্শ করিলেন, দিনের বেলায় বিশ্রাম করিবেন ও রাত্রিতে পথ হাঁটিবেন। সংগে বিশেষ কিছু আহার সঞ্চয় ছিল না। তেপান্তর মাঠ, বালি আর কণ্টক গুল্মে ভরা। একটা বোতলে কিছু ছোলা ভিজানো ছিল, আর কিছু ছাতু ও গুড় ছিল; তাহাই চারিজনে উদরসাৎ করিলেন।"

কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনরা সন্ধান পেয়ে জোর করে ভবানীচরণকে গোয়ালিয়র থেকে ফিরিয়ে এনে, আবার কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটউ্যশনে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কিন্তু পড়াশোনা আর ভালো লাগে না। কলমের চেয়ে তরবারির দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। তাই কিছুদিন পরে আবার তিনি গোয়ালিয়র যাত্রা করলেন। এবার একা সংগে ত্রিশ বত্রিশ টাকা। যেমন করে হোক্ ভারত উদ্ধার করতেই হবে। পরাধীনতার জ্বালা আর সহ্য হয় না।...উটের গাড়ীতে চড়ে ভবানীচরণ সিন্ধিয়া-রাজ্যের পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে চলেছেন। মনে মনে ভাবছেন—কবে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর মারাঠী অশ্বারোহীতে ছেয়ে যাবে, আর আমি অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করব! সূর্যের কিরণে কোষমুক্ত তরবারি জ্বলে উঠবে। অগণিত শত্রু-নিপাতের দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্বাধীন ভারতের জয়পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকবে!...তরুণ দেশ প্রেমিকের মনে কত রঙীন কল্পনা মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

কিন্তু গোয়ালিয়র মহারাজের সেনাপতির সংগে কথাবার্তা কয়েও যখন তাঁর সাধ অপূর্ণ রইল, তখন কিছুকাল পরে বাধ্য হয়ে ভবানীচরণ পুনরায় কলিকাতায় ফিরে এলেন।

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়ে তিনি কিছুদিন আদর্শ শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে কলিকাতায় 'সারস্বত আয়তন' প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন না নিয়ে উপাধ্যায় মশায় তাদের নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করতেন; প্রাচীন আর্য ঋষিদের আদর্শে নব-ভারতকে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য; নবলব্ধ ইংরেজী জ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত করে তুলবে—এই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় সম্পর্কে একখানি পত্রে যা লিখেছেন, আমরা তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দিই।

"এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সংগে আমার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির
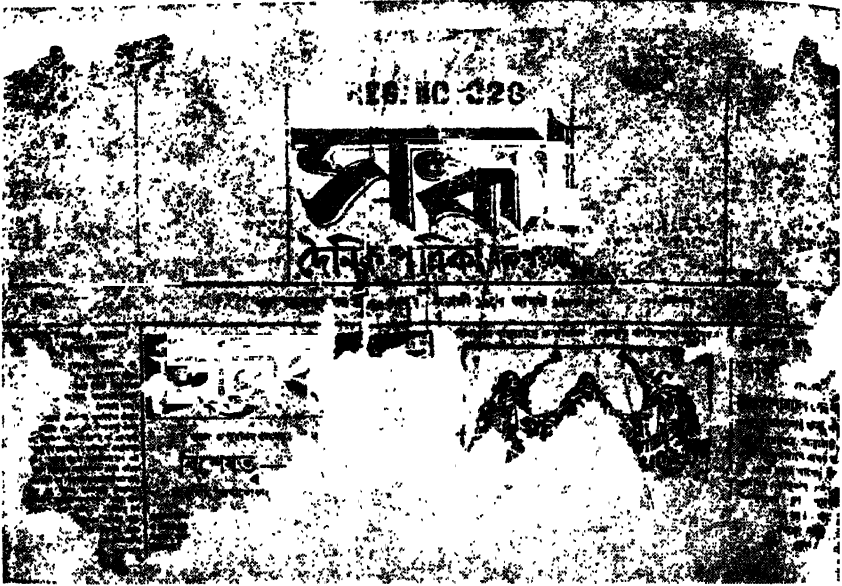
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক সন্ধ্যা পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি
(সন্ধ্যা সম্বন্ধে আলোচনা ৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি।...এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি ......তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।...... তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মত, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্চে।"

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব তাঁর অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করবার মানসে বিলাত-যাত্রার আয়োজন করেন। ভারতের বাণী পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তার করুক, স্বদেশের গৌরব বিশ্বসমাজে হোক্—এই ছিল তাঁর কাম্য। উপাধ্যায়ের বিলাত-যাত্রায় সম্বল মাত্র সাতাশ টাকা। কিন্তু তাঁর অজেয় মনোবলের সাম্‌নে বাধাবিপত্তি, অসুবিধা অকিঞ্চিৎকর সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব কোনমতে পাথেয় সংগ্রহ করে য়ুরোপবিজয় মানসে বোম্বাই থেকে এক বিলাতগামী জাহাজে চড়লেন। সঙ্গে জিনিষপত্র নাই, আছে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিবাহী আত্মা আর তাঁর মুক্তিকামী সতেজ মন। নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর দিগ্‌বিজয়ে বাহির হলেন!

অক্সফোর্ডে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর তাঁর সুনাম হল। শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত কম্বল মাত্র সম্বল বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মুখে গভীর তত্ত্বকথা, ভারতপ্রেমের বাণী শুনে য়ুরোপীয় শ্রোতারা বিস্মিত হলেন। উপাধ্যায়ের মহৎ প্রচেষ্টায় ইংরেজরা ভারতীয়দের নামে যে কলঙ্ক রটাতেন তা অনেক মাত্রায় অপনীত হল। হিন্দুস্থানের নরনারীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিলাতের জনসমাজে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কার্জন সাহেবের নির্মম অস্ত্রাঘাতে বঙ্গ-খণ্ডনের ব্যবস্থা হ'ল! জনগণ বহুদিনের নিদ্রা ত্যাগ করে "বন্দে-মাতরম" মন্ত্রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌লে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী ব্রত নিয়ে বঙ্গবাসী নেচে উঠল; ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষোভের তরঙ্গ অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করল। উপাধ্যায় সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণের সিন্ধুমাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "সন্ধ্যা"য় ধর্মতত্ত্বের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সরল, সহজ' অথচ তেজোময় নতুন ভাষা সৃষ্টি করে উপাধ্যায় দোকানী, পশারী, মুটে, মজুর আপামর জনসাধারণের প্রাণে সাড়া জাগিয়ে তুললেন। সকলের হাতে "সন্ধ্যা" পত্রিকা। জমিদারের সেরেস্তায়, পাঠশালায়, অন্দরমহলে, বৈঠকখানায় পণ্ডিতের আসরে, পথচারীদের মধ্যে "সন্ধ্যা"র লেখা সম্পর্কে আলোচনা চল্‌তে লাগল। কেশবচন্দ্র সেন প্রচারিত 'সুলভ সমাচারের' পর 'সন্ধ্যা'ই জনগণের সংবাদপত্ররূপে সর্বজনবরেণ্য হয়ে উঠিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এতদিন ধরে ইংরেজ হিন্দুসমাজের উপর যে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, "সন্ধ্যা"র কঠোর সমালোচনার আঘাতে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

নির্ভীক, সত্যপ্রিয় উপাধ্যায় রাজরোষে পড়লেন। অকপটে ন্যায়সঙ্গত কথা বল্‌তেন বলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্যায়ের

সংগে আপোষ মীমাংসা করা অসম্ভব ছিল। তিনি কেন কড়া কথা বল্‌তেন, তার যুক্তি দেখিয়ে লিখেছিলেন—"আমাদের বুলি কেন রূঢ়—কেন এত কড়া। যাঁহারা রুচি রুচি করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছে আমি কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না। আমরা সাদাসিধে বুলিতে প্রাণের কথা লিখি—তাই সেটা সভ্য বাবুদের ভাল লাগে না। তাঁহারা ছেঁদে-বেঁধে কথা কহেন ও লিখেন। আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অত সভ্যভাবে প্রকাশ করিতে পারি না, তাই আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই। কিন্তু যাঁরা আমাদের বুলিটা কিন্তু কড়া বলিয়া নালিশ করেন তাঁহাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমাদের স্বাভাবিক বুলি এত চোয়াড়ে নয়। তবে যখন রাগ দেখাতে হয়—হাঁক ডাক করিতে হয়—তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলে না। দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। এ সময় কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে শানাইবে না। আর একটা উপমা দিই। পুকুরের নীচে পচা পাঁক জন্মিয়াছে। সেই জল খাইয়া লোকের জ্বরবিকার ধরিতেছে। ঐ পাঁক একবার ঘাঁটিয়া দিতে হইবে। এখন ঘাঁটিতে গেলেই জল ঘোলা হইবে। এই ঘোলানো দেখিয়া আমাদের সভ্য বাবুরা নাক সেটকান। কিন্তু মানুষ যে মরে—সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনো সাড়া নাই—ব্যথা নাই। তাঁহারা বুঝেন না যে ঘোলানোটার পরে যখন জল থিতুবে তখন সরোবর নির্মল ও স্বাস্থ্যকর হইবে।"

ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার কাজে "সন্ধ্যা"র সংগে যুক্ত হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ। তা ছাড়া বহু তরুণ এসে "সন্ধ্যা"র আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা সকলেই স্বদেশীভাবে উদ্বুদ্ধ। "সন্ধ্যা"র কার্যালয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে" রূপান্তরিত হ'ল। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, যুবক, বৃদ্ধ সকলের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের প্রেরণায় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। মুক্তির ইতিহাসে এই জাগরণ এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৩১৩ সনে "সন্ধ্যা" কার্যালয় থেকে কিছুদিন ধরে অর্ধ সাপ্তাহিক "করালী" ও সাপ্তাহিক "স্বরাজ" প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তি আন্দোলন প্রচারে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ নেতাদের সংগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম চিরতরে যুক্ত হয়ে রইল। আজ উপাধ্যায়ের নাম বিস্মৃত প্রায়। স্বাধীন ভারতে তাঁর কীর্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করাও আমাদের একান্ত কর্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হবেন, আমরা এই আশা করি।

১৩১৩ সালেই উপাধ্যায় বিশেষ আড়ম্বরের সংগে "শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন। তিলক, খাপর্দে, মুঞ্জে প্রমুখ নেতারা কলিকাতায় এলেন। এক সপ্তাহ ধরে সিংহবাহিনী মূর্তির পূজা চল্‌তে লাগল। বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ল দিকে দিকে। ব্রহ্মবান্ধবই উদ্যোগী হয়ে "বন্দেমাতরমে"র ঋষি বঙ্কিমের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে "মাতৃপূজা"র অনুষ্ঠান করেন। ১৩১৫ সনে "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" "সিডিসানের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ুম"প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে, রাজদ্রোহিতার

অপরাধে পুলিশ 'সন্ধ্যা'লয়ে খানাতল্লাসী করল। তার নামে সমন আছে জেনে উপাধ্যায় নিজেই পুলিশকে আহ্বান করে' গ্রেপ্তার হলেন। ফিরিঙ্গির আদালতে পাছে গেরুয়া বসনের অপমান হয় সেজন্য শাদা ধুতি পরে সেখানে গেলেন। বিচারক কিংসফোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে "সন্ধ্যা"র সকল দায়িত্ব নিজের মাথায় নিলেন। আরো বলিলেন, "ভগবৎ প্রেরণায় আমি ভারতে স্বরাজ সংস্থাপনকার্যে লিপ্ত হইয়াছি; এজন্য বিদেশীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিব না।"

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ উপাধ্যায়ের চিরসঙ্গী ছিল। সিডিসানের মোকদ্দমায় দিনের পর দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সে রোগ আরো বেড়ে গেল। বসবার আসনের প্রয়োজন আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন,—'ফিরিঙ্গী'র কাছে ভিক্ষা, কখনই না।" ক্রমে তাঁর রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করল। বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন, "ফিরিঙ্গি" আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।" শেষ পর্যন্ত এই মহাপুরুষের সত্য-বাণীই সফল হ'ল। ১০ই কার্তিক রবিবার সকাল ৮টায় তাঁর চিরমুক্ত আত্মা তেজোময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে' চলে গেলেন। ইংরেজের কারাগার তাঁকে রুদ্ধ করে রাখতে পারল না। বিদেশী বিচারকের দণ্ডকে উপেক্ষা করে হাসিমুখে তিনি অনন্তধামে চলে গেলেন। স্বদেশ-বাসীর জন্য রেখে গেলেন স্বাধীনতামন্ত্রের অমরবাণী। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "সন্ধ্যা" পত্রিকায় এইভাবে ছাপা হয়েছিল—"ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছা-মৃত্যু—ইহাই কর্মবীরের অবসান!"

দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এই শোক সংবাদ পেয়ে প্রিয়তম নেতাকে শেষবারের মত দেখবার জন্য ছুটে এলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে আট দশ হাজার লোকের শোভাযাত্রা চলল নিমতলা শ্মশানের অভিমুখে। শবানুগমনে এই বিপুল লোকসমাগম তখনকার দিনে এক অপূর্ব ঘটনা। পাঁচ হাজার লোক সমবেতকণ্ঠে "বন্দেমাতারম" সংগীত গাইতে গাইতে এই মহা-নায়ককে বহন করে নিয়ে চল্‌লেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব জাগ্রত জনতার কত আপন ছিলেন এ ঘটনায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমর জাতীয় সংগীত শ্মশানের আকাশবাতাস মুখরিত করে তুল্‌ল। স্বদেশপ্রেমিক বীরের চিতায় অগণিত নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। জ্বলন্ত চিতার ওপর তার অগ্নিশিখার সম্মুখে উপাধ্যায়ের স্বদেশবাসীরা নতুন করে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

দেহত্যাগের একমাস আগে কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় বলেছিলেন—"আমি ত মা চিরকালই তোমার দুরন্ত ছেলে—আমি ত কাহারও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাই নাই—এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে যে, দেশের কাজ করিতে, সত্যের প্রচার করিতে করিতে, জেলে যাইবার পূর্বে যেন আমার এ দেহ পঞ্চভূতে মিশায়।"

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের একান্ত কামনা পূর্ণ হ'ল। তিনি বলে গেছেন, আবার ফিরে এসে ভারতবর্ষেরই সেবা করবেন। তাঁর এই অভিলাষ সফল হোক্। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রত্যুষে তাঁর অমর বাণী, আদর্শ জীবন আমাদের নবভাবে নব উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুক।

॥ কাঠাগোড় ॥

হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া থানার অধীন ইস্টার্ন রেলওয়ের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে কাঠাগোড় নামক একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এখনও বর্তমান আছে এবং তথায় মাহীনগরের বসু বংশীয় অনেক বংশধর এখনও বাস করিতেছেন। পাণ্ডুয়া কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল উত্তরে রাঢ়দেশেই অবস্থিত এবং বঙ্গের একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর। দুই শতাব্দী পূর্বে পাণ্ডুয়া একটী অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাণ্ডুয়ার অনেক ইতিবৃত্ত এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন রাজা আদিশূরের পরে পাল বংশ আসিয়া শূরের শূরত্ব নাশ করিয়া গৌড় অধিকার করিলে পলাতক শূর রাজারা পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় লন। আদিশূরের পুত্র ভূ-শূর রাঢ়ে আসিয়া পুণ্ড্র নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্তমান পাণ্ডুয়া বা পেড়োই এই নূতন পুণ্ড্র বলিয়া অনুমিত হয়।

কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু এই বংশের আদি পুরুষ। এই বংশে পুরন্দর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বল্লালী প্রথার অনেক অংশের পরিবর্তন করিয়া দিয়া সমাজের বহু উপকার সাধন করেন। বল্লালের নিয়মে কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত ছিল। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে সবিশেষ ক্লেশ পাইতে হইত। পুরন্দর ইহার পরিবর্তন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুল প্রবর্তিত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরো অনেক প্রথার পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত প্রথাকে "পুরন্দীর প্রথা" বলে। পুরন্দর মাহীনগর সমাজভুক্ত বসুবংশের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বরূপ। পুরন্দরের সহোদর সুন্দরবর খাঁ মল্লিক ও তদীয় বংশধরগণের যে স্থানে বাস ছিল, ইহা মল্লিকপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশীয় রঘুনাথ বসু বাঙলার তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানী কার্য করিয়া মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন! ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত কাটাগোড় গ্রামে বাস করিতেছেন। বসু মল্লিক বংশের বিহারীলাল বসু-মল্লিকের কনিষ্ঠপুত্র গৌরীশংকর বসু-মল্লিক কালনায় গঙ্গাতীরে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র কলিকাতার অন্যতম পুস্তক প্রকাশক সুধীর বসু।

কাঁটাগোড় গ্রামের স্বর্গীয় যদুগোপাল বসুর ভবনে দেড়শত বৎসর ধরিয়া দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রামে তারকেশ্বর-মহাদেব আছে।

॥ রাধানাথ বসু মল্লিক ॥

এই রঘুনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামকুমার বসু রাধানাথের জনক। ইনি কাটাগোড় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস স্থাপন করেন। রাধানাথ বাল্যকাল হইতে মেধাবী শ্রমশীল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিলাত হইতে আগত জাহাজের মুচ্ছুদ্দীর কার্য করিতে থাকেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে জ্যাকস্

এন্ড কোম্পানী নামক অফিসের মুচ্ছুদ্দী হন। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া তৎকালে অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ রিড নামক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হাওড়ায় একটি ডক্ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ডকের আয়ে ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ডকের অন্যতম অংশীদার রিড সাহেব রাধানাথের সাধুতা ও অধ্যবসায় গুণে মুগ্ধ হইয়া বিলাত প্রত্যাবর্তন কালে রাধানাথকে হুগলী ডকের একমাত্র অংশীদার করিয়া যান। ইংরেজদের সহিত সর্বদা মিশিলেও ইনি কখনও হিন্দুধর্ম বিগর্হিত কার্য বা ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন নাই। ইহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব হইত। স্বীয় চরিত্র গুণে ইনি জনসাধারণের অতুল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ৫৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

॥ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক ॥

রাজা সুবোধচন্দ্র কাটাগোড় বসু-মল্লিক বংশ সম্ভূত: ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহার জন্ম হয়। সুবোধচন্দ্রের পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতে করিতে তিনি বিলাতে যান এবং তথায় সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য 'ইনে' প্রবেশ করেন।

তিনি অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং বাংগলা ও ইংরাজী ভাষায় খুব সুন্দর লিখিতে পারিতেন। বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাঠ করিবার সময় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার কলিকাতায় আসেন. সেই সময় বংগদেশে বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; সুবোধচন্দ্র বিপ্লবীদলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বংগদেশের ছাত্রদিগকে জাতীয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইলে, তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন, এবং উহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদে সূচনা হয়। বর্তমানে শিক্ষা পরিষদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাংগলা দেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার দান অসামান্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিন নম্বর রেগুলেশনে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্ত হন।

দেশবন্ধু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, তাঁহার বিশেষ অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন, এবং ইঁহাদের জন্যই বংগবাসীর হৃদয়ে দেশসেবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাংগলার জাতীয় জাগরণে তিনি সারথি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পরলোকগমনে একটি সংবাদ পত্রের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"..................বাংগলার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়া যখন সুবোধচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ন্যায় দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যখন তাঁহার দুগ্ধপোষ্য সন্ততিগণের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়াছিল; তখন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নাই—দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাঁহার ত্যাগ মহিমা মণ্ডিত মুখশ্রী অক্ষুণ্ণই ছিল। তিনি বাংগলাকে ত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি মনে প্রাণে বাংগালীকে বুঝিয়াছিলেন—তাহার দোষকে উপেক্ষা করিবেন, অকৃতজ্ঞতায় নিজের জন্য ব্যথিত হইবেন না। কিসে বাঙ্গালী মানুষ হয়, তাহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে অকাতরে

কত ত্যাগ স্বীকার ও কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। ......অদ্য যে সভা হইবে—তাহাতে সকল বাঙ্গালী সম্মিলিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের তৃপ্তি বিধানের ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি সর্বস্ব দিয়াছিলেন—আজ প্রাণ দিয়া গেলেন। সকল স্বদেশবাসীর আত্মোৎকর্ষ ও চেষ্টায় তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাব বর্ধিত হউক......"
নবযুগ, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭

॥ শ্রীগোপাল মল্লিক ॥

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক রাধানাথ বসুমল্লিকের পুত্র। দেহত্যাগ কালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহার সর্ত মতে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্ত শিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ১২৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০শ খানা পুস্তক বিদ্যালয়কে এবং ১০০শ খানা পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোন বাঙ্গালী এ পর্যন্ত করেন নাই। এই দানের জন্য বসুমল্লিক মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। শ্রীগোপালের হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ও ভগবতভক্তি অসীম ছিল। তাঁহার সম্পত্তির অর্ধাংশ তিনি তাঁহার কুলদেবতা শ্রীধরজীউর সেবার্থে উইল করিয়া যান। ১২৫৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রে বেদান্ত চর্চার সহায়তাকল্পে "শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোসিপ" সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

SREEGOPAL BASU MULLICK FELLOWSHIP :

The following scheme for Sreegopal Basu Mullick Fellowship has been finally adopted by the Syndicate of the Calcutta University and the Trustee of the donor :—

(1) A fellow shall be appointed in the first instance for a period of three years : (a) to give tutorial assistance to students of Sanskrit generally and students of Vedanta Philosophy in particular, (b) to deliver a course of lectures in Vedanta Philosophy, (c) to carry on research on Vedanta Philosophy.

The Fellow shall hold classes not less than three times a week during at least 36 weeks in the year. The Fellow shall annually deliver a course of public lectures on Hindu Philosophy in general and Vedanta Philosophy in particular.

The remuneration of the Fellow shall be as follows :—A stipend of Rs. 125/- a month, A lump sum payment of Rs. 1,400 at the end of the year will also be paid to him.

[*The Bengalee—October 20, 1906*]

॥ বৈঁচিগ্রাম ॥

হুগলী সদর মহকুমা পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী পল্লী। সম্প্রতি এখানে ইষ্টার্ণ রেল পথের বৈঁচিগ্রাম নামে একটি ষ্টেশন হইয়াছে। স্বর্গীয় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের একজন স্বনামধন্য জমিদার ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহারীলাল উচ্চ অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয় অদ্যাপি এইখানে রহিয়াছে। চিকিৎসালয়টি বর্তমানে "বিহারীলাল মুখার্জী স্বাস্থ্যকেন্দ্র", নামে খ্যাত। উক্ত বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় স্থাপনের মূলে রহিয়াছেন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের অনুপ্রেরণা। বিহারীবাবুর সমস্ত সম্পত্তি এবং দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ হুগলী জেলার কালেক্টারের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৯৪৯ সন হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পাইতেছে। বিদ্যালয় বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দুইটি প্রাচীন মন্দির বিরাজ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ বৃহদাকারের মন্দিরটির দক্ষিণ গাত্রে ১৬০৪ শকাব্দে নির্মিত বলিয়া উল্লিখিত ছিল। এই পৌনে তিনশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। অনতিবিলম্বে ইহার সংস্কার সাধনের প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যতে ইহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খিলানের উপর অবস্থিত ছোট মন্দিরটির তলদেশ দিয়া জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলে গাড়ী ঘোড়া প্রবেশ করিত। তবে সে ইতিহাস এখন কালের প্রবাহমান চক্রে কিম্বদন্তীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্তমানে খিলানটির কিয়দংশ দৃষ্ট হয় মাত্র। বিদ্যালয়টি একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ভিতরে ছেলেদের খেলিবার ময়দান। জমিদার বাবুর এই প্রাসাদোপম বাড়ীতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বিহারীবাবুর ধর্মপ্রাণা পত্নী কমলেকামিনী দেবীর দানে নির্মিত নদী পারাপারের একটি পাকা সেতু রহিয়াছে। সেতুটির নির্মাণকাল ১৩১০ বঙ্গাব্দ। এ ছাড়া এখানকার প্রাচীন "রামনাথের" বিখ্যাত মন্দির, রাধাবল্লভ জীউর মন্দির, বামদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত বড়মা কালীর মন্দির ও উত্তরপাড়ার জীর্ণ পঞ্চশিবের মন্দির আজও বিদ্যমান আছে।

বিহারীবাবু প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা এবং তদীয় পত্নী স্বর্গীয়া কমলেকামিনী দেবীর দানে নির্মিত একটি পাকা সেতু আছে। বিদ্যালয়-বাড়ীতে দুইটি প্রাচীন দেউল আছে, এই ভগ্ন মন্দির দুইটির বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানকার প্রাচীন রামনাথের মন্দির, রাধাবল্লভ জীউর মন্দির ও বামদেব দত্তের কালীমন্দির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে কাশীপতি মেমোরিয়্যাল লাইব্রেরী, বীণাপাণি মধ্য-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী দাঁ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী ও পিতলের নির্মিত রথ আছে এবং এখানে রথের মেলা হয়। এখানে বৈঁচিগ্রাম নামে পোস্ট-অফিস, কালীবাড়ী, দোকান-পসার প্রভৃতি আছে ও এখানে দৈনিক বাজার বসে।

এই গ্রামে দৈনিক 'বঙ্গনিবাসী' সংবাদপত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় বামদেব দত্ত ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। গ্রামের কৃতি-সন্তান ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), ড-লিট্ (লিলি), বার-এ্যাট্-ল (গ্রেস্-ইন্), কাব্যতীর্থ, ন্যায়ভিষগাচার্য (গোল্ড-

মেডালিস্ট), লন্ডন ওরিয়েন্ট্যাল স্টাডিওর প্রাক্তন লেক্‌চারার মহাশয় বর্তমানে শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন। এই গ্রামে পদার্থ-শাস্ত্রের গবেষক ডক্টর রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম, এস-সি. পি-এইচ্‌-ডি, রায়বাহাদুর নরেশচন্দ্র বসু, কৃষ্ণগোবিন্দ বসু মহাশয়ের বাসস্থান। পূর্বে এখানে পুলিশথানা ছিল ও এখানকার পিতল ও কাঁসার বাসন বিখ্যাত ছিল। এখানে সাতটি মস্‌জিদ আছে।

১৯০৭ সালে স্বর্গীয় দানবীর কাশীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এখানে "বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার" নামে একটি অবৈতনিক গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারটির পূর্ব নাম বৈঁচি পাব্‌লিক লাইব্রেরী ছিল। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব সুদৃশ্য ভবন বর্তমান সম্পাদক শ্রীনকুলচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে নির্মিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমতী বীণাপাণি দাঁ মহোদয়ের তের হাজার টাকা এককালীন দানে "বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়" নামে বালিকাদের একটি নিম্ন বিদ্যালয় বৈঁচিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরিচালক সমিতির বর্তমান সম্পাদক পদার্থ শাস্ত্রের গবেষক ডক্টর রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁহার সহৃদয়তায় উক্ত বিদ্যালয়ের অনেক দুঃস্থা ছাত্রী একান্ত নির্ভরশী এতদ্ব্যতীত আরও চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই গ্রামে আছে।

বৈঁচি গ্রামে রথের মেলায় এইরূপ বিপুল লোক সমাগম হুগলী জেলার মধ্যে ভিন্ন খুব অল্প স্থানেই হয়। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈঁচির জাগ্রতা দেবী জগৎগৌরী মাতার পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্থানীয় বাজারের কেন্দ্র স্থলে যে মেলা হয় তাহাও দর্শনীয় এবং পরম উপভোগ্য। এখানে মৃৎ-নির্মিত বড়মা কালীর মূর্তিটি প্রায় চৌদ্দফুট উঁচু এত বড় মৃৎ-নির্মিত কালীমূর্তি এই অঞ্চলে আর কোথাও নাই। এই প্রতিমার আলোকচিত্র গ্রন্থে দেওয়া হইল। এখানে বৈঁচিগ্রাম নামে একটি পোষ্ট অফিস রহিয়াছে। এই স্থানে প্রত্যহ তরী তরকারীর বাজার বসে।

গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-ভগ্নদশাপ্রাপ্ত অবস্থায় আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। গ্রামের মধ্য দিয়া হুগলী জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে "শরৎমণি রোড" নামে দুই মাইল দীর্ঘ কাঁচা খোয়ার রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। এবং বাঁটিকা-বৈঁচিগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে কিছু কাঁচা রাস্তাও বিদ্যমান। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসটি বৈঁচিগ্রাম বাজারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বোর্ডের বর্তমান সভাপতির নাম শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ সিংহ। বৈঁচির বর্তমান লোকসংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত ২২ জন; অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৮১ জন বলিয়া গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির তালিকায় উল্লিখিত আছে। এই গ্রাম হইতে "দেশবন্ধু" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বাহির হইত।

শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সহজ গীতা" ও ইংরাজী ভাষায় Geeta made eas নামক দুইখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি বর্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইনেস্পেক্টর ছিলেন। অধুনালুপ্ত "মানবের শিক্ষা" নামক মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন

॥ অবহেলিত দেউল ॥

১৩৬৬ সালের ৪ আশ্বিন আনন্দবাজার পত্রিকায় বৈঁচি গ্রামের মন্দির সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

হুগলী জেলার **পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচি গ্রামে** অবস্থিত রেখ-দেউলের চমৎকার নিদর্শন-স্বরূপ পৌনে তিন শত বৎসরের পুরাতন একটি মন্দির বিনা যত্নে ও অবহেলায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নগর স্থাপত্যকলার যে ক্রমবিকাশ উড়িষ্যায় দেখা যায়, তাহার প্রভাব হইতে বাঙলা দেশ মুক্ত হইতে পারে নাই—এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপত্যকলার মধ্যে তাহাই প্রতীয়মান হয়। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার রেখ দেউল ও তাহার জগমোহন। বাঙলা দেশে সাধারণতঃ রেখ-দেউলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নানা কারণে জগমোহন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশে বরাকরের পাথরের দেউলগুলি ছাড়া পুরানো রেখ-দেউলের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। যেগুলি বর্তমানে আছে তারও অবস্থা জরাজীর্ণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের ক্রমাগত অবহেলায় ঐগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটিও অযত্নে ও অবহেলায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

প্রকাশ, গ্রামবাসীরা বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ইহার প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। স্থানীয় লোকের বিশেষ করিয়া পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ বিষয়ে একেবারে নীরব। গত ৩রা আগষ্ট তারিখে বৈঁচী গ্রামের উড়িষ্যার মন্দিরের অনুকরণ সপ্তরথ ও সপ্তাঙ্গের পরিকল্পনায় বাঙালী শিল্পীদের রচিত মন্দিরটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এ পর্যন্ত উহাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

বিগত ৩৫ বৎসরের মধ্যে মন্দিরের এক চতুর্থাংশ মাটির নীচে বসিয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামের আরও কয়েকটি মন্দিরও নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

॥ ভাগবতাচার্য নীলকান্ত গোস্বামী ॥

ভাগবতাচার্য পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী ১২৫৪ সালের আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন রবিবারে বৈঁচিগ্রামের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার বাটীতে টোল ছিল। তিনি ছাত্রগণকে ভরণ-পোষণ দিয়া শিক্ষা দিতেন।

বাল্যকালে গ্রামে লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হয় নাই। তৎকালীন পল্লীর প্রবীণ তাঁরা গোস্বামী-পুত্রের ইংরাজী পড়ার বিরোধী ছিলেন। নীলকান্ত গোস্বামী কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। এবং এখানকার প্রতি পরীক্ষায় তিনি প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়কার অধ্যাপকগণের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

কর্মজীবনে প্রথমাবস্থায় ইনি শালিখার কোন এক মধ্য ইংরাজী স্কুলে মাসিক ১০,

টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন কর্ম করিবার পর তিনি সেখান হইতে কর্মচ্যুত হন। তখন হইতে চাকুরীর উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মে এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মনযোগ দেন। কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা করেন। তাঁহার ঐকান্তিক ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে ছাত্রবর্গের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় কোন দিন নিজে অসুস্থতা বশতঃ কোন সভায় পাঠ করিতে যাইতে না পারিলে গোস্বামী মহাশয়কে পাঠ করিতে পাঠাইতেন; এরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে যাহাতে, শ্রোতারা তাঁহার অসাধারণ বুঝাইবার শক্তি ও বর্ণনা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই চাহিতেন। ক্রমে "ভাগবতাচার্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এ দেশে তিনি একজন প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকার হন। তাঁহার পাঠ ও বক্তৃতা শুনিয়া কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছেন। তিনি প্রথমে কলুটোলায় বিশ্ব বৈষ্ণব সভায় এবং চোরবাগানের 'রামচাঁদ শীল মহাশয়ের বাটীতে পাঠ করিতেন। তিনি তালতলা হরি সভায়, ডন সোসাইটিতে, গড়পার হরি সভায়, মাণিকতলা হরি সভায় অনেকবার অনেক বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একবার গড়পার হরিসভায় তিনি রামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সেদিন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা শুনিতে আসেন, সঙ্গে তাঁহার একটি নাতি ছিল, বক্তৃতা শেষ হইলে গুরুদাসবাবু বলেন দেখুন গোঁসাইজী আমি মনে করিয়াছিলাম যে নাতির দোহাই দিয়া চলিয়া যাইব কিন্তু আপনার রাসলীলা বক্তৃতা আমার এত ভাল লাগিল যে নাতিকে ঘুম পাড়াইয়া শুনিতে বাধ্য হইলাম; এরূপ রাসলীলা ব্যাখ্যা আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই। তালতলা হরি সভায় একবার তিনি মূর্তি পূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; সে সভায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মনীষী উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। বক্তৃতা শেষ হইলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন আমি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী কিন্তু আজ গোস্বামী মহাশয় যাহা বলিলেন এবং যেভাবে বুঝাইলেন তাহার উপর আমার কোন কথা বলিবার নাই। তিনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

তিনি কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা" এবং "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্" গ্রন্থ দুইখানি প্রসিদ্ধ। ১৩৩৪ সালে ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার তিনি মরজগৎ ত্যাগ করিয়া যান।

॥ বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ॥

হুগলী সদর মহকুমার বাঁটিকা-বৈঁচিগ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্গত "বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার" একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান। এতদঞ্চলে বিশেষ করিয়া হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার। স্বর্গীয় দানবীর শিক্ষানুরাগী কাশীপতি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহা স্থাপিত হয়। পূর্বে উক্ত গ্রন্থাগারটি বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছিল। প্রথমাবস্থায় ইহার নিজস্ব ভবন না থাকায় চালা ঘরে মাত্র পাঁচ খানি বই এবং একটি জীর্ণ আলমারীকে আশ্রয় করিয়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জীবনযাত্রা

সুরু হয়। কাশীপতিবাবুর জীবদ্দশায় গ্রন্থাগারটির নাম ছিল "বৈঁচি পাব্লিক লাইব্রেরী"

জনশ্রুতি প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কাশীপতিবাবু একদা উক্ত গ্রন্থাগারের জন্য তাঁহার পুরীর বাড়ীতে রক্ষিত কিছু বই আনিবার উদ্দেশ্যে অসুস্থ দেহে বৈঁচি হইতে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গুরুতর অসুস্থ হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে তিনি শয্যা লইতে বাধ্য হন, এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাশীপতিবাবুর মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য উক্ত গ্রন্থাগারটি একরকম বন্ধই ছিল। সেই সময় ডাক্তার পঞ্চানন ভট্টাচার্য, এম-বি, মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে এইরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহার চেষ্টায় আরও কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়া কাশীপতিবাবুর অন্তরের প্রতিষ্ঠানটিকে নবকলেবর শোভিত করিয়া, "বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার", নামে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময় গ্রন্থাগারটিকে বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট হইতে বৈঁচিগ্রাম বাজারে শ্রীদুলালচন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহে পাঁচ টাকা ভাড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়।

তারপর গ্রন্থাগারটির সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের জীবনেতিহাস একরকম ভাঙ্গাগড়ার। তবে এই, অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে কাশীপতি পাঠাগারের জীবনে যে কয়জন ব্যক্তি তাঁহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীজয়গোপাল দত্ত ও শ্রীগণেশচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সম্পাদক শ্রীনকুলচন্দ্র দাঁ প্রায় এগারো বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থাগারের সম্পাদক পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে গ্রন্থাগারটি এক নূতনরূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহার নিরলস কর্ম সাধনার ফলে বৈঁচিগ্রাম বাজারের মধ্যস্থলে বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারটির সুদৃশ্য নিজস্ব ভবন ১৯৫৮ সনে নির্মিত হয়। এই ভবন নির্মাণ-কল্পে যে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার অর্থেক সরকারী সাহায্যে পূরণ হইয়াছে। বাকী অর্দ্ধাংশ সহৃদয় গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে যাঁহারা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় কাশীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীনকুলচন্দ্র দাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বসাকুল্যে এই গ্রন্থাগারটি নির্মাণকল্পে ৯০০০, হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। ভবন নির্মাণকল্পে যে জমি টুকুর প্রয়োজন হইয়াছিল তা সম্পূর্ণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন স্বনামধন্য শ্রীদাশরথি দত্ত মহাশয়। গৃহনির্মাণের জন্য সরকারী ডেভলাপমেণ্ট বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছে ৩৯০৫, টাকা।

গ্রন্থাগারে পৃথকভাবে একটি শিশু বিভাগ ও একটি পাঠকক্ষও রহিয়াছে। মাসে গড়ে ৩৬০ জন লোক এই গ্রন্থাগারের পুস্তক পড়িয়া থাকে। মোট পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। ইহা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সভ্য। বৈঁচিগ্রামে এখনও একজন খুব প্রাচীন ব্যক্তি আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ২ বৈশাখ ১৩৬৮ সালে "যুগান্তর" পত্রে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

বয়স এক শতাব্দী পূর্ণ করিয়া আরও ছয় বৎসর—অর্থাৎ এখন "দ্বিতীয় শৈশব" চলিতেছে। ইহার আরও একবার অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনির

সংখ্যা ত্রিশের বেশী। ইনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ; এবং স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করিতেছেন। হুগলী জেলার বৈঁচিগ্রামে এই সুপ্রাচীন ব্যক্তির দেখা পাওয়া যাইবে। নাম, শ্রীশশিভূষণ সিংহ।

॥ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

বাঙলা ১২৭৬ সালের পূর্বে রাধানগর গ্রামবাসী জমিদার বাবু উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির বৈঁচি নিবাসী জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঋণ গ্রহণ ও বিষয় কর্ম উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিহারীবাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এক সময়ে বিহারীবাবু কলিকাতায় আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক, স্ত্রীর মনে যদি কষ্ট হয় এ কারণে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব আমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা আমার বিষয় সম্পত্তি অকারণ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আমাদের নাম লোপ হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, যদি আমার মত গ্রহণ কর, তবে আমার মতে দত্তকপুত্র না লইয়া আপনার যাবতীয় সম্পত্তি দেশের হিতকর কার্যে সমর্পন করুণ। তাহাই কর্তব্য ও তাহাই পরম ধর্ম, এবং তাহাই বহুকালস্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ হইবে না। দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় এবং অসহায় রোগীদিগের আহার ও থাকিবার স্থান দান করা এবং নিজ গ্রামের ও তাহার পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অন্ধ, পঙ্গু ও অনাথ প্রভৃতি নিরুপায় লোকদিগের দুঃখমোচনে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়োজিত করা প্রধান ধর্ম। স্বর্গীয় বিহারীলালবাবু আহ্লাদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রস্তাবের

করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় উইলের আদর্শ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি একখানি নূতন উইল প্রস্তুত করাইয়া বহুদর্শী উকীলবাবুদিগকে দেখান, পরে ঐ আদর্শ উইলখানি বিহারীবাবুকে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। সন ১২৭৭ সালের ২৫শে শ্রাবণ ঐ উইল প্রস্তুত করিয়া যথারীতি রেজেষ্টারি করাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিহারীলালবাবুর মৃত্যু হইলে ঐ উইলের সর্তানুসারে তাঁহার বণিতা শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী দাতব্য স্কুল, ডিস্পেন্সরি ও হাসপাতালের জন্য সন ১২৮৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, ইং ১৮৭৭ সালে ২৯শে জুলাই, একলক্ষ ষাট্টি হাজার টাকা ঐ বৎসরের শেষ পর্যন্ত হুগলী জেলার কালেক্টরিতে আমানত করিলেন, এবং ঐ বর্ষ হইতে দাতব্য এণ্ট্রান্স স্কুল, ডিসপেনসারি ও হাসপাতালের কার্য আরম্ভ হয়। ঐ কার্য অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অপিচ দাতার উইল অনুসারে ভোগাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত অভাবে যাবতীয় সম্পত্তি গবর্ণমেন্ট নিজ হস্তে তত্ত্বধানের ভার লইয়া দাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য সকল নিষ্পন্ন করিবেন, এবং ঐ বিষয় প্রিভিকৌনসেল পর্যন্ত যাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উইলের কোন অংশ রহিত কি পরিবর্তিত হয় নাই।

জাম্‌না ইউনিয়নের অন্তর্গত **গহমী** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ পীরশাহ্‌ নওয়াজউদ্দীন সাহেবের সমাধি আছে। এখানে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। জাম্‌নার পার্শ্ববর্তী **সারগাড়িয়া** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার কর্মকার-গণের নির্মিত ডোঙ্গা প্রসিদ্ধ। এই ইউনিয়নের অন্তর্গত **পীড়া গ্রাম** একটি ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা বৈঁচি-বৈদ্যপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এই পল্লীতে দশভুজা নামে বহু পুরাতন প্রতিমা বিদ্যমান আছে ও এখানে 'বাণী-গ্রন্থ-কুটীর' নামে লাইব্রেরী এবং পল্লীর উত্তর প্রান্তে পীর গোরাচাঁদের সমাধি আছে। গহমীর লোকসংখ্যা ৩৭২ জন। জামনা ইউনিয়নে ৬ হইতে ১১ বৎসর বালক-বালিকাদের জন্য সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

॥ ভুইমোহন ॥

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ভুইমোহন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা বৈঁচি-বৈদ্যপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার সন্নিকটে পীড়াগ্রামের বাস স্ট্যান্ড হইতে মাত্র দশ-বারো মিনিটের পথ। গ্রামটি ধুসী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ১১৮৫ সালে উক্ত গ্রাম নিবাসী দানবীর স্বর্গীয় নবুদার মিস্ত্রী ধুসী নদীর উপর সাধারণের পারাপারের নিমিত্ত একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সালে তাঁহার প্রদত্ত এখানে তিনগুম্বজ-বিশিষ্ট একটি বড় মস্‌জিদ আছে। এখানকার মস্‌জিদটি দর্শনীয় বস্তু। এই গ্রামে পোষ্ট অফিস ও চিকিৎসালয় আছে।

ধুসী নদীর শাখা যে-স্থানে উত্তরদিকে বাঁকিয়া পুনরায় ধুসী নদীতে মিলিত হইয়াছে —সেই বাঁকের মধ্যস্থানে নির্মিত গ্রামবাসিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণের পারাপারের একটি ক্ষুদ্র পাকা সেতু আছে, উহা বাহির-পয়নালার সেতু নামে খ্যাত। স্বর্গীয় আসব্বার হালদার এই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। এই গ্রাম কবি আবদুর রহমানের জন্মস্থান। এখানে ১৩৩৫ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রহমানিয়া লাইব্রেরী' আছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় আসব্বার হালদার সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে 'আসব্বার হালদার মেমোরিয়্যাল হল' নির্মিত হইয়াছে।

ভুইমোহনে ১৩১৪ সালে স্থাপিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান পীরের সমাধি আছে। এখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগকে প্রতি বৃহস্পতিবারে ঔষধ দেওয়া হয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবারে তাঁহার উরস্‌ (স্মৃতি উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভুইমোহন গ্রামের জনসংখ্যা ৩৩২ জন।

পাণ্ডুয়া থানার জামনা ইউনিয়নের মধ্যে **ইন্‌সুরা** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হরকালী ঠাকুর ও পোস্ট-অফিস আছে। এই গ্রামের স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডের আসন ও কালীবাড়ী আছে। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে ও প্রতি অমাবস্যার দিনে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ইহা ছাড়া এখানে হরকালী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পল্লী-মঙ্গল লাইব্রেরী ও মেদিনীপুর-নিবাসী (নাগা-বাবা) মোহনগিরি মহাশয়ের শিষ্য উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোমতীগিরি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম আছে। প্রতি মাঘী-পূর্ণিমাতে ইহার মহোৎসব হয়।

এই গ্রামে বৈঁচি-বৈদ্যপুর রাস্তা হইতে এক মাইল পশ্চিমে ধুসী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পীর আলীমন্ সাহেবের সমাধি আছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবারে তাঁহার উরস্ (স্মৃতি উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে দেশ-বিদেশ হইতে বহু রোগী আসিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ইন্সুরা গ্রামের জনসংখ্যা ৫৬৭ জন।

॥ ভোঁপুর ॥

জাম্না ইউনিয়নের অন্তর্গত ভোঁপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহার নাম ছিল মামুদপুর। জনশ্রুতি যে এই স্থানে মহাদেব ভূমি হইতে স্বয়ং উত্থিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার ভুঁইফোড় হেতু গ্রামের নাম ভোঁপুর নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিরঞ্জন লাইব্রেরী ও পূর্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'বাণেশ্বর চতুষ্পাঠী আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় নিত্যগোপাল ঘোষ মহা- শয়ের প্রদত্ত এখানে ধুসী নদীর উপর সাধারণের পারাপারের একটি পাকা সেতু আছে সম্প্রতি এখানে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল কুমার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাপীঠ' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের লোকসংখ্যা ৯৪২ জন।

পাঁচগড়া একটি বর্ধিষ্ণু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, পোস্ট-অফিস, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১২৩৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটি বহু পুরাতন বর্ধিষ্ণু বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়-সংলগ্ন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সাহায্যপ্রাপ্ত একটি লাইব্রেরী আছে।

পাঁচগড়া তোড়গ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্গত **বল্লালদীঘি** একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহ একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। এই গ্রামে রাজা বল্লাল সেনের একটি বৃহৎ দীঘি আছে তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম বল্লালদীঘি নামকরণ হইয়াছে। এখানে মুর্শিদাবাদ নবাবে দেওয়ান জাকের আলীর বাসস্থান ছিল। এই গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে প্রসিদ্ধ পীর শাহ খোওয়াজউদ্দীন সাহেবের সমাধি আছে। এখানে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে

পাঁচগড়া তোড়গ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্গত কাঁটাগড়িয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে পাণ্ডুয়া সুলতানিয়া অবৈতনিক হাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা খান্ সাহেব হাজী আতর আলী সাহেবের বাসস্থান। এখানে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ বুড়োপীর সাহেবে সমাধি আছে। ইহার পার্শ্ববর্তী **ন'পাড়া** গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এখানে তাঁতের ভাল গামছা প্রস্তুত হয়। **নেয়াল** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে হুগলী বর্ধমান উভয় জেলার সরকারী-স্তম্ভ আছে। নেয়ালের লোকসংখ্যা ৪৪৬ জন।

॥ বাটিকা ॥

ইহা বাটিকা-বৈঁচি নামে খ্যাত। এই গ্রামে বান্ধব পাঠাগার, তিনটি ধানের কল, ধানে আড়ত, দোকানপসার, এগ্রিকালচার অফিস, ডি, ভি, সি অফিস, সুপ্রসিদ্ধ পীর আমি শাহ্ ও দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। ২৬শে মাঘ তারিখে দেওয়ান সাহেবের উরস

(স্মৃতি উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে বৈঁচি নামে পোস্ট-অফিস ও এখান হইতে দুই মিনিটের পথ—ই, আই, রেলওয়ের স্টেশন আছে। স্টেশন হইতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় বৈঁচি-বৈদ্যপুর নামে বাস সার্ভিস আছে ও এখান হইতে বৈঁচিগ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। এখান হইতে গ্রান্ডট্রাংক রোডে চুঁচুড়া-বৈঁচি নামক বাস-সার্ভিস আছে ও ঐ রাস্তায় বালি-বর্ধমান এবং বালি-বরাকর নামে বাস-সার্ভিস যাতায়াত করে। এখানে তরি-তরকারির দৈনিক বাজার বসে। বাটিকার জনসংখ্যা ১,৯৪২ জন।

॥ চোবেড়া ॥

বাটিকা-বৈঁচি ইউনিয়নের অন্তর্গত চোবেড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে স্বর্গীয় ধনঞ্জয় মন্ডলের প্রদত্ত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরগাত্রে "১৬৩৮ শকাব্দা" লিখিত আছে। এখানে মহাকাল দেবের একটি স্থান আছে, প্রতি বৈশাখী-পূর্ণিমাতে মহাকাল দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে ও উক্ত ঠাকুরের নামানুসারে 'মহাকাল দীঘি' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীতে বাতগ্রস্ত রোগী ও অন্যান্য রোগী দেশ-বিদেশ হইতে আসিয়া স্নান করিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। ইহার পার্শ্ববর্তী **আলীপুর** ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পীর আজ্‌গুবী সাহেবের সমাধি আছে।

বেড়েলা একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। এখানে বহু ভগ্ন, অর্ধ লুপ্ত মন্দির ও বাড়ী দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটির গাত্রে শকাব্দা ১৭৭১ শক্ অর্থাৎ ১২৫৬ সাল লিখিত আছে। সম্প্রতি এখানে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কোঁচমালী একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা গ্রান্ডট্রাংক রোডের উত্তর ধারে অবস্থিত। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। এখানকার মজুমদার-বংশ সুপ্রসিদ্ধ। পূর্বে এখানে পুলিশ-থানা ও একটি প্রসিদ্ধ সরাই ছিল। বর্তমানে এখানে ভূতনাথ কুমার চল্ মেমোরিয়াল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সম্প্রতি এখানে একটি পশুর হাট স্থাপিত হইয়াছে, উহা শনি-মঙ্গলবারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রান্ডট্রাংক রোডের উত্তর ধারে 'নাড়ু' নামক পুষ্করিণী ঘাটের প্রাচীন চাঁদনি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা পুরাতন কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামে পোষ্ট-অফিস আছে। জনসংখ্যা ৪৬১ জন।

বেড়েলা-কোচ্‌মালী ইউনিয়নের অন্তর্গত বোড়াগড়ি একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রামছিল। এখানকার প্রাচীন মনোরম পঞ্চরত্ন 'জোড়া শিবমন্দিরটি' দর্শনীয় বস্তু। মন্দির-গাত্রে শকাব্দা ১৭৫৪ ও সন ১২৩৯ সাল লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন 'গোপাল জীউর' মন্দিরটির গাত্রেও ১৬০১ শকাব্দা লিখিত আছে।

কোচ্‌মালী গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে ও তেল্‌কোপা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পীর সাহ্‌বান্দ্ সাহেবের সমাধি আছে। এখানে আধ-কপালে ও চক্ষু রোগ ভাল হয়।

আমনমোরী গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বর্গীয় অভয়চরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ধুসী নদীর উপর সাধারণের পারাপারের দুইটি পুরাতন পাকা সেতু ও গ্রামবাসিগণ কর্তৃক প্রদত্ত দুইটি পাকা সেতু আছে। গ্রামে পোষ্ট অফিস আছে। জনসংখ্যা ৫৫৭ জন।

॥ হরাল ॥

হরাল একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরাল-দাসপুর নামে পোষ্ট অফিস, ভূপেন্দ্র-বাণী মন্দির ও হরাল-দাসপুর সাধারণ পাঠাগার আছে। এখানে সাতটি মসজিদ আছে, তন্মধ্যে শাহ্ আলম বাদশাহের বাদশাহী আমলের একগম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এই মসজিদ-গাত্রে প্রস্তর-ফলকে আরবী অক্ষরে যাহা লিখিত আছে তাহা এতই অস্পষ্ট যে, তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহা ছাড়া এখানে ছোট শাহ্জী, গাজীসাহেব ও বালাসৈয়দ নামক চারিজন সুপ্রসিদ্ধ পীরের সমাধি আছে। যে-স্থানে বালাসৈয়দ সাহেবের সমাধি আছে সেই স্থানে ঈদোপলক্ষে মেলা বসে ও খেলাধুলা হয়। এখানে সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবারে দুই দিন হাট বসে।

দাসপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা হরাল-দাসপুর নামে খ্যাত। এখানে হরাল-দাসপুর ইউনিয়ন বোর্ড বিনোদিনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী, এম, এ, পি-আর্-এস্, মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত তিনকড়ি-শিবানীপ্রসাদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। দাসপুরের জনসংখ্যা ৫৫১ জন।

এই ইউনিয়নের মধ্যে কলুপুকুর, বাসুদেবপুর, পায়রা, সর্বমঙ্গলা গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। **বাসুদেবপুরে** পীর সাহবান্দ সাহেবের সমাধি আছে। এই স্থানে চক্ষুরোগের ভাল ঔষধ পাওয়া যায় বলিয়া প্রতি বৃহস্পতিবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

হরাল-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত **বিল্সরা** একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সুধীরচন্দ্র ঘোষ এই গ্রামের একজন সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বৈঁচি-বিল্সরা নামে পাকা রাস্তা আছে। এই গ্রামে যতীন্দ্র দাতব্য ঔষধালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, পোষ্ট-অফিস, মহামায়া আশ্রম, চতুষ্পাঠী ও নেতাজী পাব্লিক লাইব্রেরী আছে।

হরাল-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত **তারাজোল** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে পীর সুফী সাহেব ও বুড়ো দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। ২৪শে পৌষ তারিখে সুফী সাহেবের উরস্ (স্মৃতি-উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে বুড়ো দেওয়ান সাহেবের একটি পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিলে কুকুরে ও বিড়ালে কামড়ান রোগী ভাল হয় বলিয়া শুনা যায়। তারাজোল গ্রামের জনসংখ্যা ১৫৯ জন।

॥ হাত্নী ॥

হরাল-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত হাত্নী একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুমার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত পূর্ণচন্দ্র বিদ্যামন্দির নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হাত্নী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোষ্ট-অফিস, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রাম-সেবাদল লাইব্রেরী আছে। স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদনমোহন কুমার, এম, এ, মৌলানা আজাদ কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষক। এখানকার একটি পুষ্করিণী খননকালে একটি চতুর্ভুজ ভগবতীর মূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় ঐগুলিকে পাল-যুগের নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মূর্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়মে' সংরক্ষিত হইয়াছে। **চীনাগ্রাম** একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এই পল্লীতে একটি আদর্শ পল্লী-উন্নয়ন ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার আছে ও এই পাঠাগার সংলগ্ন একটি সেবা-বিভাগ আছে। হাতনা গ্রামের লোকসংখ্যা ৭৯২ জন।

সিমলাগড় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জয়চন্দ্র রায়চৌধুরী এই গ্রামের একজন স্বনামধন্য জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত—ই, আই, রেলওয়ের ষ্টেশন, ইউনিয়ন বোর্ড চেরিটেবল্ ডিস্পেন্সারী, পোষ্ট-অফিস ও প্রতিভা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাঁহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথম রচিত 'গ্রীষ্ম' নামক কবিতা 'প্রয়াগদূত' পত্রিকায় ও 'কর্ম-ফল' কবিতা 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রামে 'নেতাজী পাঠাগার', সিংহ পোলট্রি ফার্ম (মুরগী-পালন কেন্দ্র) বৈজ্ঞানিক প্রথায় গো-প্রজননের পল্লী-কেন্দ্র ও 'শ্মশান কালী' নামক জাগ্রতা ঠাকুর আছে। এখানকার মুন্সী-বাড়ী সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রামে হাজী মুন্সী জসীমউদ্দীন নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সিমলাগড়-ভিটাসীন ইউনিয়নে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

হুগলী জেলার সিমলাগড় নামক পল্লীতে আবিষ্কৃত পালযুগের সূর্যমূর্তি সম্বন্ধে [১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০] আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এই ঃ

॥ হুগলী জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ॥

হুগলী, ২৭শে জানুয়ারী—হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক এক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান আছে। পাণ্ডুয়ার পার্শ্ববর্তী সিমলাগড় নামক পল্লীতে পাল যুগের এক প্রস্তরময় সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটী প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রী পি সি পাল কর্তৃক নয়াদিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় প্রদত্ত হইয়াছে।

ভিটাসীন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পীর হজরত ওস্মান আলী ও গোলাম সোম্দানী সাহেবের সমাধি আছে। সিমলাগড়-ভিটাসীন ইউনিয়নের ন্তর্গত রাণাগড় একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। পাট্রা গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ বুড়োশিব আছে। এখানে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে হাঁপানি-কাশির স্বপ্নাদ্য ঔষধ পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে ঐদিন এখানে একটী মেলা বসে।

॥ পোঁট্বা ॥

পাণ্ডুয়া থানার সিমলাগড়-ভিটাসীন ইউনিয়নের অন্তর্গত **পোঁট্বা** একটী প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। এখানকার ঘটক-বংশ সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রামে স্বর্গীয় রাজা নন্দকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাসস্থান। যমুনা দীঘি, গোপাল দীঘি তাঁহার-ই কীর্তি। এখানে আনন্দময়ী দেবী আছে। ১৩০৫ সালে অধ্যক্ষ রাখালদাস মুখোপাধ্যায় উক্ত দেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। **চাঁপাহাটী** একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে সচ্চিদানন্দ ভারতীর আশ্রম আছে। এখানে বার্ষিক রাস-লীলা ও দোল-মেলার উৎসব হয়। পোটবা গ্রামের জনসংখ্যা ৮২৮ জন।

রামেশ্বরপুর-গোপালনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত **নন্দীনগ্রাম** একটী প্রাচীন পল্লী।

পূর্বে ইহা একটী সমৃদ্ধশালী পল্লী ছিল। এই পল্লীতে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান পীরের সমাধি আছে। এখানকার একটী পুষ্করিণীর তীরে লতাবৃক্ষে আবৃত একটি অনুচ্চ ইটের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে, উহা পূর্বে নীলকুঠী ছিল। এই ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

॥ দমদমা ॥

রামেশ্বরপুর-গোপালনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত দমদমা একটী প্রাচীন সুসমৃদ্ধিশালী গ্রাম। স্বর্গীয় কপিল উদ্দীন মোল্লা সাহেব এই গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহারা মাত্র সতেরো ঘর বাসিন্দা ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে রমানাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ও রামপদ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া এই গ্রামের উপর দিয়া আসিবার সময় গ্রামটী তাঁহাদের পছন্দ হয়। এখানে তাঁহারা বসবাস করিতে মনস্থ করেন ও মোল্লাদিগকে গ্রামে গো-হত্যা করিতে নিষেধ করেন। মোল্লারা গ্রামে গো-হত্যা করিবেন না, স্বীকার করেন। রমানাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত ও রামপদ বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয় সংস্কৃত পণ্ডিত ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। এখানে পঞ্চ-মুণ্ডের বেদী আছে, এই বেদীর উপর উপবেশন করিয়া রমানাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত উপাসনা করিতেন। তিনি নবাবকে তপস্যাবলে অমাবস্যার চাঁদ দেখাইয়া ছিলেন বলিয়া তজ্জন্য নবাব তাঁহাকে ৩৫৯টী মৌজা উপহার দিতে বাসনা করেন। কিন্তু রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অস্বীকার করিলেন। নবাব তখন বাধ্য হইয়া এক টাকা করিয়া প্রত্যেক মৌজার কর ধার্য করিয়া দিলেন ও সেই হইতে দমদমা গ্রামের নূতন নাম 'আয়মা-নবাবপুর' হওয়ায় এখানকার পোষ্ট-অফিসটির 'আয়মা-নবাবপুর' নামকরণ হইয়াছে।

রমানাথ তর্ক-সিদ্ধান্তের আট পুত্র ছিল। যথা ঃ—রামশরণ, রামানন্দ, রামকেশব, কৃষ্ণচন্দ্র, মধুসূদন, রামদুলাল, রাম তর্কবাগীশ ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত একটী শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় আঠারো পুরুষ গত হইবার পর উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় তুলসীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাদের বংশধর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রমানাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ও রামপদ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে এবং তাঁহাদের গৌরব-রক্ষার মানসে উক্ত গ্রাম নিবাসী কণ্ট্রাক্টর স্বর্গীয় যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জে সি ব্যানার্জী) ১৩৪৩ সালে 'বুড়িমার' দালানের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

এখানে নরেন্দ্র মেমোরিয়্যাল হাই স্কুল, নরেন্দ্র-সুরতকুমারী স্মৃতি-মন্দির, আয়মা-নবাবপুর নামে পোষ্ট্-অফিস, ফুড্ কমিটীর অফিস ও কো অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রত্যেক একাদশীর দিনে অম্বলের অসুখের ঔষধ পাওয়া যায়। মোল্লা-বংশীয় জনাব আহম্মদ আলী ও জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব ভ্রাতৃদ্বয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

পাণ্ডুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত তিন্নাগ্রাম ও ইলামপুর গ্রামের সন্নিকটে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণ দিকে পীর বালোল সাহেবের সমাধি আছে।

পাণ্ডুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত **নমাজগ্রাম** একটী প্রাচীন পল্লী। এই পল্লীতে একটী

প্রাচীন সুবৃহৎ ঈদ্‌গাহ্‌ আছে। ইহা পাণ্ডুয়া থানার বৃহত্তম ঈদ্‌গাহ্‌। এরূপ বৃহৎ ঈদ্‌গাহ্‌ পাণ্ডুয়া থানার অন্য কোন পল্লীতে দৃষ্ট হয় না। উক্ত ঈদ্‌গাহ্‌ এখানকার অমূল্য সম্পদ ও দর্শনীয় বস্তু। এখানে একটি বেসিক স্কুল আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৮৮৫ জন।

সেখপুকুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে পাণ্ডুয়া পুলিশ-থানার পশ্চিমে বড় পীর সাহেবের সমাধি আছে। এখানকার 'সোনার গাঁ' নামক কলোনীতে তাঁতের সাড়ী প্রস্তুত হয়। কুলীপুকুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

পাণ্ডুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ক্ষীরকুণ্ডি গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ পীর হাফেজ সাদেমানী সাহেবের সমাধি আছে। এখানে কয়েকটী প্রাচীন মনোরম কারুকার্য খচিত মন্দির আছে। মহানাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রত্নান্বেষণকার্যে নিযুক্ত হইয়া এখানকার কারুকার্য খচিত মন্দিরগুলিকে এখানকার অমূল্য সম্পদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ জামগ্রাম ॥

জামগ্রাম একটী প্রাচীন সুসমৃদ্ধিশালী পল্লী। ইহা পাণ্ডুয়া-কালনা রোডের উত্তর দিকে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর নন্দী মহাশয় পূর্বে এই গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার ছিলেন। তাঁহাদিগের বৃহৎ যৌথ পরিবার ও যৌথ এষ্টেট্‌ আজিও বিদ্যমান্‌ আছে। এখানে প্রাচীন রাস-মন্দির, জনার্দ্দন ইন্‌ষ্টিটিউসন, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, ইউনিয়নবোর্ড চ্যারিটেবল্‌ ডিস্পেন্সারী ও বৃহৎ 'নন্দী লাইব্রেরী' আছে। এখানকার রাস্তাটী পাকা, উহা পাণ্ডুয়া-কালনা রোডে মিলিত হইয়াছে। গ্রামের লোকসংখ্যা ১,৫৪৯ জন।

জামগ্রাম-মণ্ডলাই ইউনিয়নের অন্তর্গত **রুক্মিনী** একটী প্রাচীন গ্রাম। শ্রীযুক্ত এককড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে 'দেব-কুণ্ডু' নামে একটী পুষ্করিণী আছে। এই গ্রামে বসুপরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন শিব-মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রের নির্মাণ-তারিখটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

॥ কানুড় ॥

জামগ্রাম মণ্ডলাই ইউনিয়নের অন্তর্গত কানুড় একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, হেফ্‌জুলকোরাণ মাদ্রাসা ও সুপ্রসিদ্ধ বুড়োপীর সাহেবের সমাধি আছে। ক্ত সমাধি স্থানে এক খণ্ড তেঁতুল কাষ্ঠ পড়িয়া আছে, উহা বহু পুরাতন। উহাতে আজ পর্যন্ত উই ধরে নাই বা উহা কোনরূপে বিনষ্ট হয় নাই। এখানকার 'কনকশিব' পুষ্করিণীর তীর খনন-কালে একটী মন্দিরের নিদর্শন ও তিনটী অভগ্ন ও একটী ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহানাদ নিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পালের প্রিয় বন্ধু শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সেইগুলি রক্ষিত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত পালের নির্দ্দেশ মত অভগ্ন মূর্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়মে' সংরক্ষিত হইয়াছে ও ভগ্নমূর্তিটি জামগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পাল মূর্তিগুলি সেন-রাজত্বের নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন—পাণ্ডুয়ায় মূর্তি-শিল্পের একটী কারখানা ছিল এবং মূর্তিগুলি এক-ই শিল্পী-

কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এখান হইতে আবদুর রহমানও একটি মূর্তি সংগ্রহ করেন।

দাসপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে এখানে একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ থাকায় গ্রামের নাম ছিল 'গঞ্জ-দাসপুর'। বর্তমানে ইহা গজিনা দাসপুর নামে খ্যাত। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, গজিনা দাসপুর নামে পোষ্ট্-অফিস, ফ্রেন্ডস্ ক্লাব নামক লাইব্রেরী, সবুজ-সংঘ ও কৃষি-শিল্প সংঘ আছে। গজিনা দাসপুরের মিত্রবংশের খ্যাতি আছে। জনসংখ্যা ৮৫৮ জন। **বৃন্দাবনপুরে** সিনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে আদিবাসীদের আশ্রমবাসের সুবিধা আছে। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ পল্লী উন্নয়ন সমিতি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

ইল্ছোবা-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত দেপাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা পান্ডুয়া-কালনা রোডের উত্তর দিকে অবস্থিত। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। রাজা দেবপালের নামানুসারে গ্রামের নাম দেবপাড়া হইতে দেপাড়ায় পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামে রাজা দেবপালের একটি সুবৃহৎ দীঘি আছে। গ্রামটিও যত বড়, দীঘিটিও তত বড়। এখানকার দীঘিটি দর্শনীয় বস্তু। দীঘির পাড়ের ভগ্ন মস্জিদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এই মস্জিদের মাত্র সম্মুখভাগের দেওয়ালটী বিদামান্ আছে। উক্ত দেওয়াল-গাত্রে প্রস্তর-ফলকে আরবী অক্ষরে যাহা লিখিত আছে উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। এখানে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুপ্রসিদ্ধ পীর হাফেজ আফ্তাবউদ্দীন ও মাণিক পীর সাহেবের সমাধি আছে। ইল্ছোবা-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত আঁশুয়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামে পীর সুফী সাহেবের সমাধি আছে। এখানকার মস্জিদের ভিতরে একখানি প্রস্তর-খোদিত পবিত্র 'রসুলে-কদম' নামক পদচিহ্ন আছে। পদচিহ্নটি ঈদুল্‌ফেতর ও ঈদুজ্জোহার দিন গ্রাম্য মুসলিম জনসাধারণের দর্শনার্থে বাহির করা হয়। এখানে একটি 'গড়-খাই' আছে।

॥ ইটাচুণা ॥

ইটাচুণা একটী বর্দ্ধিষ্ণু সুসমৃদ্ধিশালী গ্রাম। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয় এই গ্রামের একজন স্বনামধন্য জমিদার ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এখানে বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় ও রায়বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু রোড আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে শ্রীনারায়ণ ইন্ষ্টিটিউসন, অক্ষয় নারায়ণ হস্পিট্যাল, পোষ্ট-অফিস, সাবিত্রী-মনোরমা লাইব্রেরী, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মশালা ও প্রবুদ্ধ ভারত-সংঘ প্রভৃতি আছে এবং পল্লীউন্নয়নে ইটাচুণা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ কুণ্ডু মহাশয় এই গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। ইটাচুণার জনসংখ্যা ৬৬৯ জন।

বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে গ্রামে উচ্চ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাঁহার নামে একটি কলেজ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। দরিদ্র ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে বিনা-বেতনে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় আছে।

বিজয়বাবুর ষ্টেট হইতে ছাত্রগণের আহারাদির ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মধ্যে বিনা-বেতনে এইরূপ বিদ্যালয়ের জন্য এই অঞ্চলে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। বিজয়বাবু গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন এবং কৃষিকার্য শিক্ষার জন্য 'মডেল ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামের যাবতীয় উন্নতি তাঁহার একক চেষ্টায় হইয়াছে।

॥ বেলুন ॥

'বেলুন' পাণ্ডুয়া থানার এলাকায় একটি বর্ধনশীল পল্লী। হিন্দু রাজত্বে ইহা মহা-নাদের উত্তর সীমা ছিল। এই স্থানের উত্তর প্রান্ত দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইত। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে বেলুনের উত্তরে 'বাচকা' নামক স্থানে উক্ত নদীর উপর সেতু নির্মাণ-কালে নদীগর্ভ হইতে নৌকার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্রীপ্রভাস পাল লিখিয়াছেনঃ দু রাজত্বে বেলুনে বহু দেবালয় বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ তত্রস্থ 'কোচ' নামক এক প্রাচীন পুষ্করিণী হইতে কতিপয় নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুন, ১৯৫৪)। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি মৃন্ময় মুখকলস এবং প্রস্তরময় একটি চণ্ডীমূর্তি, একটি বন্দনারত হনুমানমূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখ্য। দেব পালের রাজত্বকালে ময়নার রাজা লাউসেন ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া অজয় নদের তীরস্থ ঢেকুর রাজ্যের রাজা ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে লাউসেন জয়যুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীয় রাজ্য মধ্যে ধর্মঠাকুরকে 'যাত্রাসিদ্ধি' নামে অভিহিত করেন। বেলুনে আবিষ্কৃত মুখকলসটি যাত্রাসিদ্ধির মূর্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (যাত্রাসিদ্ধির পূজাদির জন্য আন্দাজ ৫/০ বিঘা ধানের জমি আছে। বর্তমান সেবায়েৎ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ এবং পূজারী শ্রীদুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়)। বর্ণনায়—ঠাকুরের কেশহীন তক ও সহাস্য বদন। দেখিলে মনে হয় যেন—শঙ্কর নাগবেষ্টিত জটাজুট পরিত্যাগ-পূর্বক সৌম্যমূর্তি ধারণকরতঃ ভক্তকে সহাস্য বদনে অভয় দান করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের অবসান ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকালে শিবের এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া শিল্পী তাই ধন্যার্হ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া চণ্ডী ও হনুমান মূর্তিকে ধর্মঠাকুর বা যাত্রাসিদ্ধির হিত পূজা করা সংগত বলিয়া মনে করি। কারণ ধর্মমংগলে বর্ণিত আছে,—ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান দ্বারকেশ্বর নদীতীরস্থ অরণ্য হইতে শিশু লাউসেনকে উদ্ধার করিয়া-ছিল। আবার যুদ্ধকালে লাউসেনকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। আর চণ্ডী ছিলেন ঢেকুররাজ ইছাই ঘোষের আরাধ্যা দেবী। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত এই যুদ্ধের কাহিনী যেন লঙ্কাযুদ্ধের সমতুল্য।

দেবপালের রাজত্বকালে ময়না ব্যতীত রাঢ়ের বিভিন্নাঞ্চলে যাত্রাসিদ্ধির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত এই জাতীয় তিনটি মূর্তি একত্রে একমাত্র বেলুন ব্যতীত অপর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই নিমিত্ত মূর্তিত্রয় দেবপালের রাজত্বকালীন বিশিষ্ট অবদান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়া থানায় 'দেবপাড়া' নামক পল্লীতে দেবপালের প্রতিষ্ঠিত একটি 'দীঘি' আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেবপালের সময়ে পাণ্ডুয়ায় একটি সুরম্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক 'ডিহি বয়ড়া' নামক পল্লীতে একটি প্রস্তরময় কূর্মমূর্তি দৃষ্ট হয়। মূর্তিটি "যাত্রাসিদ্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাঢ়দেশের অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় কূর্মমূর্তি কেবল 'ধর্মরাজ' বলিয়া পূজিত হইতেছে।

বিগত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মহানাদের দক্ষিণাংশে সুদর্শন নামক স্থানে পালযুগের একটি প্রস্তরময় কূর্মাবতার মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। বর্ণনায়—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক বিষ্ণুমূর্তি এবং ইহার পাদপীঠে কূর্ম চিহ্নিত আছে। মূর্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই জাতীয় মূর্তি ভারতের অন্যত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, পাল রাজত্বে মহানাদের সর্বত্রই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল।

বেলুনে পূর্বোক্ত মূর্তিগুলি ব্যতীত মথুরার রক্ত প্রস্তর নির্মিত পালযুগের একটি ক্ষুদ্র নাগমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীমঙ্গল চক্রবর্তী এবং তদীয় ভ্রাতা কবিরাজ খগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই মূর্তিটিকে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নাগচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র মনসা মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এক মনসা বৃক্ষতলে স্থাপিত হইয়াছে। সুদর্শন বক্ষে প্রস্তরময় দুইটি পালযুগের এবং একটি সেনযুগের মনসা মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছি। (পালযুগের মনসা মূর্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি মূর্তি হুগলী সহরস্থ কালীতলা ঘাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হয়—এতদঞ্চলে ধর্মপূজার ন্যায় মনসা পূজারও প্রচলন সমভাবে বিদ্যমান ছিল

প্রাচীনকাল হইতে বেলুনে আর একটি পূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম 'বাস্তুপূজা'। উত্তরপাড়ায় 'বাস্তুতলা' নামে একখণ্ড পতিত ভূমি আছে। তথায় প্রাচীন ইষ্টক, মৃৎ-পাত্রখণ্ড এবং একটি পাটযুক্ত কূপের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। বাস্তুপূজার জন্য এই স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রতি বৎসর আষাঢ় নবমীতে চিরাচরিত প্রথানুসারে বাস্তুপূজা হইয়া থাকে।

বাস্তুতলার সন্নিকটে "নেড়াদীঘি" নামে এক প্রাচীন পুষ্করিণী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীটি পালযুগের একটি নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্বপাড়ায় "খাঁদীঘি" নামক পুষ্করিণীটি মুসলমান রাজত্বে খাঁ উপাধিধারী কোন এক উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ বেলুনে আজিও কোন মুসলমান পরিবারের বাস নাই এবং পূর্বে কখনও ছিল বলিয়া সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেলুনের দক্ষিণাংশে "আয়মাডাঙ্গা" নামে এক স্থান আছে। অনুমিত হয়, উক্ত কর্ম-চারীই নবাবের নিকট হইতে বসবাসের জন্য উক্ত ভূমি উপহারস্বরূপ পাইয়াছিলেন।

বেলুনের বায়ুকোণে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম "পীঠিপরা"। স্থানটি বর্তমানেও ২৫/০ বিঘার কম নহে এবং ইহা এতাবৎকাল গোচররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পালবংশীয় রামপালের রাজত্বকালীন "পীঠি" নামক এক ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ আছে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকোরে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর বহুবিধ প্রস্তরমূর্তি, স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করিয়া পাইকোরকে প্রাচীন "পীঠি" নগর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছি।

পীঠির অধিপতি ছিলেন ভীমযশঃ। বারেন্দ্রী অভিযানে যে সকল সামন্তরাজ রামপালের অধীনে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গলসিংহ এব

ঢেক্করীয়ের অধিপতি প্রতাপসিংহের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং এই জেলারই অন্তর্গত পাইকোর নামক স্থানটি ভীমযশের রাজধানী 'পীঠি' হওয়া অসম্ভব নহে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পীঠিপতি ভীমযশঃ বারেন্দ্রভূমিতে যাত্রাকালে মহানাদের প্রান্তভাগে নদীতীরস্থ এই প্রান্তরে সৈন্যসমভিব্যাহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদাবধি প্রান্তরটি পীঠিপতির স্মৃতিবিজড়িত "পীঠিরপড়া" নামে বিদিত।

বেলুনের মৃত্তিকা বালুকাময় ও কঙ্করময়। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে এই স্থানের পার্শ্ববর্তী নদী প্লাবিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই অঞ্চলের পুনর্গঠন ও "বেলুন" নামকরণ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিব।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত গয়স্তা, মেহগ্রাম, কুড়ুমগ্রাম, কালুদা, বেলুন প্রভৃতি স্থান লইয়া (বর্তমান রামপুরহাট মহকুমা) এককালে 'মিত্রভূম' নামে বিদিত ছিল। মিত্রভূমের অন্তর্গত বেলুন গ্রামে পুরুষোত্তম মিত্র নামে এক খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—কোচ, বট, বাচস্পতি ও নরসিংহ। মিত্র বংশের কারিকায় বর্ণিত আছেঃ

"পুরুষোত্তমাধ্যস্তৎ পুত্রো তস্য চত্বারি সুনবঃ।
কোচঃ বাচস্পতশ্চৈব বটমিত্রস্তু মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠো নরসিংহোঽপি এতে চত্বারি সংজ্ঞকাঃ।
বেলুনে চ স্থিত কোচঃ মগধে প্রস্থিতো বটঃ॥"

পুরুষোত্তম মিত্রের মধ্যম পুত্র বট মিত্র খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ভাগলপুর জেলার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বর্তমান কহলগার সন্নিকটে ভাগীরথিকূলে তাঁহার রাজধানী ছিল। তথাকার বটেশ্বর মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এই বট মিত্র সেন-বংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লাল সেনকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কোচ মিত্র। তিনিও বহু গুণের আধার ছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস—কোচ মিত্র মহানাদ নামক এই ঐতিহাসিক স্থানে শুভাগমন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় নদীতীরস্থ "বেলুন" নামক এক নূতন পল্লীর সৃষ্টি হয়। বেলুনে 'কোচ' নামক প্রাচীন পুষ্করিণীটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং আজিও তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত। আবার কোচ মিত্রের অধস্তন গঙ্গাধর মিত্র ও বিশ্বনাথ মিত্র খুবই প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। বর্তমান বেলুনের পার্শ্ববর্তী 'ভায়ড়া' ও 'ভুঁইপাড়া' নামক স্থানদ্বয় তাঁহাদের নামানুসারে যথাক্রমে "গঙ্গাধরপুর" ও "বিশ্বনাথপুর" নামে মহল ছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক—কোচ মিত্রের আর এক পূর্বপুরুষ মধুসূদন মিত্র সর্বপ্রথম সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইরূপে অবগত হওয়া যায়—এই মিত্র বংশের অনেকেই মিত্রভূম হইতে হুগলী জেলাস্থ সপ্তগ্রাম, মহানাদ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে এই বেলুনে কোচ মিত্রের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। এখানকার মিত্র বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এই মিত্র বংশের দুইজন শ্রীশচন্দ্র মিত্র ও প্রসন্নকুমার মিত্র ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন সেইজন্য উভয়কেই "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বর্তমানে এই মিত্র-বংশের দুইজন মহিলার নাম উল্লেখযোগ্য। চিত্রজগতে অভিনেত্রিগণের মধ্যে শ্রীমতী মঞ্জু দের নাম সুবিদিত। শ্রীমতী দে অমরেন্দ্র মিত্রের কন্যা। আর একটি উল্লেখযোগ্য ও আনন্দের বিষয় এই যে, শতবর্ষ যাবত যে স্কটল্যাণ্ডের মিশনারিগণের প্রতিষ্ঠিত মহানাদ বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন নাই, গত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন শ্রীমতী মঞ্জু মিত্র। শ্রীমতী মিত্র স্বর্গীয় রাধারমণ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে তাঁহার সুনাম আছে।

বহুকাল যাবত বেলুনে শাক্তধর্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মহাসমারোহের সহিত এক মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবীর নাম "হাঁপাকালী"। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পল্লী ও সহর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম দেখা যায়। পূজায় অন্যান্য অনুষ্ঠান ব্যতীত ন্যূনাধিক অর্ধশত ছাগ বলি হইয়া থাকে। নিশার ন্যায় পরদিন প্রত্যুষেও প্রসাদ বিতরণের আর এক আনন্দোৎসব সৃষ্টি হয়। কি ছাগ, কি ফল-মূল, কি চিনি-সন্দেশ যেন সকল প্রসাদই নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সমাগত আবাল-বৃদ্ধ দেবী প্রসাদ নীলামের মাধ্যমে ক্রয় করিতে আনন্দ বোধ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন, এই প্রকারে সংগৃহীত অর্থ দেবীর মন্দির, ভূমি ও আসবাবপত্রাদির জন্য ব্যয়িত হয়। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০০৲ হইতে ৫০০৲ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসাদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায় না। বহু দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য দেবীর স্বপ্নাদ্য ঔষধ বিতরণেরও ব্যবস্থা আছে। বেলুনের জনসংখ্যা ১,২৪৭ জন। ১১৯৮ সালে গোপালপুর নিবাসী 'কৃষ্ণদাস অধিকারীর অনুরোধে বেলুনে এক হরিসভার সূচনা। অতঃপর স্থানীয় সর্বসাধারণের আন্তরিক চেষ্টায় হরিসভার জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মিত হয়। তদাবধি হরিসভা স্থায়িত্বলাভ করে।

ইতঃপূর্বে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময় মহোৎসব হইত এবং গোস্বামী মালীপাড়া নিবাসী নফরচন্দ্র গোস্বামী পৌরোহিত্য করিতেন। প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্থানীয় সাধারণের সুবিধার্থে প্রতি বৎসর গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বেলুন এখন বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এই গ্রামে ইউনিয়ন-বোর্ড, দাক্ষ্যায়ণী দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট-অফিস, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেবক-সমিতি লাইব্রেরী ও কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক আছে। বেলুন ধামাসীন ইউনিয়নের অন্তর্গত দেলুয়াগছি একটী প্রাচীন গ্রাম। পাণ্ডুয়া যুদ্ধের পর দেলওয়ার গাজী নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষ এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম দেলওয়ার গাজী হইতে দেলুয়াগাছিতে পরিণত হইয়াছে। তিনি এখানে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, উহা আজিও বিদ্যমান্ রহিয়াছে। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত হেল'থ-ওয়েল্‌ফেয়ার' সোসাইটী আছে।

বেলুন-ধামাসীন ইউনিয়নের অন্তর্গত মহানাদের অন্যতম পাটি বেজপাড়া একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে নীলকুঠী, মহাতাপ্ দীঘি, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও সুপ্রসিদ্ধ পীর কাজীমন্ সাহেবের সমাধি আছে। ১লা মাঘ তারিখে তাঁহার উরস্ (স্মৃতি-উৎসব) উপলক্ষে

এখানে একটী মেলা বসে ও ঈদের সময় ইচ্ছামত মেলা বসিয়া থাকে! এখানে বাতগ্রস্ত রোগী ও অন্যান্য রোগী দেশ-বিদেশ হইতে আসিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

বেলুন-ধামাসীন ইউনিয়নের অন্তর্গত জগন্নাথপাড়া একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে জগন্নাথদেবের একটী স্থান আছে, পূর্বে ঐ স্থানে পূজা হইত। উক্ত জগন্নাথদেবের নামানুসারে গ্রামের নাম জগন্নাথপাড়া নামকরণ হইয়াছে। এখানে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, সুপ্রসিদ্ধ বুড়ো পীর ও বুড়ো পীরানীর সমাধি আছে।

মার্সিট্ গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পীর ইস্‌মাইল শাহের সমাধি আছে। ৮ই মাঘ তারিখে প্রতি বৎসর তাঁহার স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম্প্রতি এখানে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্তী চন্দ্রহাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পীর হাফেজ আফতাবউদ্দীন সাহেবের সমাধি আছে। প্রতি শুক্রবারে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে দেশ-বিদেশ হইতে বহু রোগী আসিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডাকাতির জন্য এই অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। নয়াসরাইয়ের নিকটস্থ চন্দ্রহাটী গ্রামে দস্যুতা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত সংবাদ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। "সমাচার দর্পণ" পত্র হইতে উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন

মোকাম কালনার নিকটবর্তী দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতা হইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাংলা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়াসরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়া তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচে লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুই জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অর্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে করিতে জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকূল্যে ভাসিতে ভাসিতে অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জল হইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতা দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘিরিয়া প্রাতঃকাল পর্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষ-

দিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুই জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরে চালান করিয়াছে। এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

॥ জামনা ॥

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত **জামনা** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা বৈঁচি-বৈদ্যপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এখানকার রায়েদের প্রাধান্য হেতু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এখানকার পোস্ট-অফিসটি 'রায়-জামনা' নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানে ইউ-নিয়ন বোর্ড চেরিটেবল্ ডিস্পেন্সারী, রায়-জামনা নামে পোস্ট-অফিস ও ভবেশ স্মৃতি পাঠাগার আছে। এই গ্রামে সাব-জজ্ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ রায় ও এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার অফ পোস্ট-অফিস অফ বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম স্বর্গীয় রায় সারদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর মহাশয়দিগের বাসস্থান। জামনার কবিরাজ স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায়ের পেটের অসুখের ঔষধ 'ঘোল-বড়ি' প্রসিদ্ধ। এখানে ভুবনেশ্বরী দেবী আছে। **'ভগবতী-তলা'** নামে এখানে একটি স্থান আছে, পূর্বে ঐ স্থানে পূজা হইত। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এখানে চড়ক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা হয়। জামনা গ্রামের জনসংখ্যা ৫৫৮ জন।

॥ ভুঁইপাড়া ॥

বেলুন-ধামাসীন অন্তর্গত **ভুঁইপাড়া** একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহার নাম ছিল বিশ্বনাথপুর। পূর্বে এখানে বহু লোকের বসতি ছিল ও এখানে হাট বসিত। এই গ্রামে আজ্‌গুবী সাহেব, আক্‌দিল সাহেব ও অলী পীর সাহেবের সমাধি আছে। অলী পীর সাহেব বর্ধমান-রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় কার্যে অবসর-গ্রহণ কালে রাজার নিকট মসজিদ-নির্মাণের জন্য কিঞ্চিৎ জায়গার প্রার্থনা করেন, রাজা সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জায়গা ও জমি দান করিয়াছিলেন। অলী পীর সাহেব এই গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করিবার পর দেহত্যাগ করিলে মসজিদের সন্নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। **রোসনা** গ্রামে একটী পুষ্করিণী খননকালে দুইটী ভগ্ন ও একটী অভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছিল। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পালের প্রচেষ্টায় মূর্তিটী কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পালের অভিমতে মহানাদের পাল-যুগের বিষ্ণুমূর্তি সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

॥ ছোট সরসা ॥

ছোট সরসা পাণ্ডুয়া থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে পোষ্ট-অফিস, হরিসভা ও বিদ্যালয় আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ১,০১৫ জন। এই গ্রামের মিত্র-বংশের আদি-পুরুষ হরিপাল থানার জেজুর গ্রাম হইতে আসেন। রাধারমণ মিত্র তাঁহার পিতার স্মৃতি-রক্ষার্থে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। **"কুমারেশ"** নামক ঔষধের আবিষ্কারক হিসাবে রাধারমণবাবু প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ছোট সরসার সেন-বংশেরও খ্যাতি আছে। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীব্রজেন সেন এই সেন বংশের সন্তান। **বড় সরসা** এই গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত এই গ্রামেও পোষ্ট-অফিস ও বিদ্যালয় আছে। জনসংখ্যা ৮৩১ জন।

॥ ইলছোবা ॥

হুগলী সদর মহকুমায় পাণ্ডুয়া থানায় ইলছোবা একটি প্রাচীন গ্রাম। বাংলা ভাষায় প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস লেখক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" রচয়িতা নৈয়ায়িক পণ্ডিত স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "ইলছোবা" নামক একখানি পুস্তক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কিন্তু ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান মাত্র। ইহাতে পাওয়া যায় যে, রাজা গণেশের সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক হিন্দু রাজার "ইলাবতী" নামে কন্যার সয়ম্বর সভা হয়। তাহা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি বহুদূর ব্যাপি বিস্তৃত মণ্ডলাকারে গঠিত হয়। ইহাই নাকি এক্ষণে ইলছোবা-মণ্ডলাই। কিন্তু মণ্ডলাই নামের উৎপত্তির কোন ঐতিহাসিক বিবরণ নাই।

তাঁহার পুস্তকে গ্রামের পূর্বে "ভগবতীতলা" নামে এক বৃহৎ প্রান্তরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের নীচে এক ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বপ্ন দেখেন, তাহাই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ বৃক্ষটি এখনও দেবতা জ্ঞানে পূজা হয় এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহারই ওশোয় মেলা অর্থাৎ "ভগবতীর জাত" হয়। শোনা যায় তাহার তলায় কেহ রাত্রি বাস করিলে নানা বিভীষিকা দেখিতে হয়। তাহার পুস্তকে প্রদ্যুম্ন-নগর "পাণ্ডুয়া", চম্পকলতা "চাঁপ্তা" (প্রসিদ্ধ টপ্পা লেখক রামনিধি গুপ্ত "নিধুবাবুর" জন্মস্থান) দেবপল্লী "দেপাড়া" হরিদাসপুর "হলুদপুর" জঙ্গলবিহারী "জঙ্গলপুর" এবং গঞ্জদাসপুর বা "গজিনা-দাসপুর" নামের উল্লেখে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ থাকিতে পারে বুঝিতে পারা যায়। নিধুবাবুর বিষয় ৯২১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

ইলছোবা গ্রামে দাসবংশের দুইটি পঞ্চরত্ন মন্দির দর্শনীয় বস্তু। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মন্দির দুইটি নির্মিত হইয়াছিল। একটি মন্দিরে বিষ্ণু আর অন্যটিতে শিব । মন্দির নির্মাণের তারিখটি বোধহয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দির দুইটির গঠন ভদ্রদেউলের অনুরূপ। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির বহু সুন্দর সুন্দর অঙ্কিত আছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা উপলক্ষ্যে গোপিনীদের সহিত রসচক্রে করিতেছেন এবং এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত নৃত্য করিতেছেন তে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গোষ্ঠলীলা, বস্ত্রহরণ, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি চিত্রগুলিও খ্য। এই সুন্দর মন্দির দুইটি কালের কবলে পড়িয়া ধ্বংসোন্মুখ। এইগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক ও সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি ণ করিতেছি।

ইলছোবা বারোয়ারীতলায় ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর শিবমন্দিরটি স্থাপত্য-শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। এইরূপ কারুকার্য সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এই গ্রামে শ্রীশ্রীতারামা একটি জাগ্রতদেবী। দেবীর "শবে শিবা মূর্তি"র সবগুলির প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত। উচ্চতা কিঞ্চিৎনূন ১॥ হাত। রাজা অশোকের সময়ে কোন বৌদ্ধ শিল্পীর দ্বারা খোদিত বলিয়া মনে হয়। দাঁড়া-গো-পান মানত করিলে এখনও পর্যন্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

বর্তমান সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত "উদ্বোধন" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ এই স্থানের অধিবাসী। স্বামী নিরাময়ানন্দের পিতৃ-প্রদত্ত নাম বিভূতিভূষণ। তাঁহার পিতৃ বাস ভূমি ইলছোবা। এখনও তাঁহার পিতামাতা জীবিত আছেন। কলিকাতার শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পূর্ব বাস ভূমি ছিল এই ইলছোবা গ্রামে। দক্ষিণপাড়ায় বারোয়ারীতলার নিকট তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শিব, নারায়ণ, এবং বাসুদেব এখনও বিরাজিত। মন্দির গাত্রে কারুকার্য পুরাকালের মৃৎশিল্পীর অসীম দক্ষতার পরিচয়।

ইলছোবামণ্ডলাই গ্রামের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ বিদ্যালয় থাকিয়া ইহাকে পৃথক করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের পূর্বে ইলছোবা পশ্চিমে মণ্ডলাই। কিন্তু উভয় গ্রাম পৃথক হইলেও এখনও উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগীতায় কি ডাকঘর, কি উচ্চ বিদ্যালয় ও তাহার প্রাথমিক বিভাগ, এবং ক্ষুদ্রতর উচ্চ (জুনিয়ার হাই) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এখনও শিক্ষার মান উন্নত করিয়াছে। ইলছোবা গ্রামের জনসংখ্যা ১৫৬৮ জন।

এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াছি তিনি ইলছোবা নামক একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক হইতে এই স্থানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইলছোবার পূর্ব সমৃদ্ধির বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

অদ্য ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশী. প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে (ইলছোবায়) যাত হইত। ঐ যাতের নাম ভগবতী যাত্রা। ভগবতী যাত্রা চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ এই তিন দিন থাকিত। কত দেশের কত লোক কতরূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই যাতে ক্রয় বিক্রয় করিত। তখন এই খানে যেন একটি নবনির্মিত নগর হইত। তখন কত রোগী আরোগ্য লাভাশয়ে, কত কন্যা পুত্র কামনায় এবং কত লোক অন্যান্য অভীপ্সিত সিদ্ধির বাসনায় আমার দ্বারে হত্যা দিত এবং সিদ্ধমনোরথ হইলে কত সমারোহে পূজা দিয়া যাইত। তখ কত স্থানে নৃত্যগীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কত স্থানে মল্লক্রীড়া কত স্থানে নৃত্যগীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কত স্থানে মল্লক্রীড়া কত স্থানে মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি পশুপক্ষীর যুদ্ধ, কত স্থানে কবিতা পাঠ ও কত স্থানে কত প্রকার আমোদ হইত। প্রান্তরের নিম্নভাগেই যে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, ঐ স্থানে তখন প্রবাহিনী নদী ছিল ঐ নদীর তীরে বিস্তর কঙ্ক পক্ষী দৃষ্ট হইত, এইজন্য উহাকে কঙ্কনদী কহিত। এই নদীতে বার মাসই জল থাকিত। তবে বর্ষাকালে যেরূপ বড় বড় নৌকা আসিত, অন্যকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত না।

তৎকালে নদীর তীরভুক্ত এই প্রান্তরের মধ্যে নানাজাতীয় লোকের বসতি ছিল। পৃষ্ঠ দিকে, এক্ষণে যে স্থানে ঝিটকীপোঁতা নামে খ্যাত ঐ স্থানে কয়েকঘর কুম্ভকারের বা ছিল। তাহারই অব্যবহিত পূর্বে নদীর ধারে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন। রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ, প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় বহু সংখ্যক নরনারী অবস্থান করিত। নদীগর্ভ হইতে সুধা-ধবলিত বিস্তৃত সৌধমালা কি সুন্দরই দেখাইত। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শে জটা-ভস্মধারী কত অবধূত সন্ন্যাসী বাস করিত। যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই তাহাদিগের সুনির্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে নদী

বন, গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল একভাবে থাকে না। সময়ে নদী তট হয়—তট নদী হয়—নগর বন হয়—বন নগর হয়—মরু জলাশয় হয় এবং জলাশয় মরু হইয়া যায়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তোমাদিগের গণনায় তাহা হয়ত ৫০০ বৎসর হইবে—কিন্তু আমার যেন সেই সৌন্দর্য—সেই সমৃদ্ধি—সেই জনাকীর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সকল আর কিছুই নাই—এ স্থান এখন জনশূন্য প্রান্তর হইয়াছে।

ইলছোবা গ্রামে একটি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় "প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল" এবং ২টী গ্রন্থাগার থাকিয়া বহুমুখী শিক্ষার বিস্তার করিয়াছে।

পল্লীগ্রামে "পাঞ্চুলাইটের" প্রচলন বহুদিনের। এই আলো প্রথম যিনি আমদানি করেন তাঁহার বাস ভূমি ইলছোবা তাঁহার নিজ নাম পঞ্চানন বা পাচু" হইতে পাঁচু-নাইট বা 'পাঞ্চলাইট' হয়। এই বংশেরই এক ডাক্তার "ক্যাপ্টেন" উপাধী লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রথম "রঞ্জনরশ্মি" প্রবর্তনের সময় অতিশয় উৎসাহান্বিত হন।

বহু স্বনাম খ্যাত ব্যক্তির মধ্যে শোনা যায় তারকনাথ পালিত (প্রফেসর টি, পালিত) এবং সার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জীর বাসভূমি এই গ্রামে ছিল। ইহা ছাড়া পঞ্চানন ঘোষ, শ্রীনাথ দাস ও বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চানন ঘোষ ও শ্রীনাথ দাসের নামে কলিকাতায় দুইটি রাস্তা আছে।

সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রামের পতন হয়। সে "কঙ্কনদী" গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহাও মজিয়া যায়।

॥ মণ্ডলাই ॥

মণ্ডলাই বা মল্লাই নামের যে কোথা হইতে উৎপত্তি তাহা সঠিক বলা কঠিন। তবে স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ষোড়শী পুস্তকে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক প্রাচীন ও প্রাচীনার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ইহা বহুদিন হইতে সমস্ত জায়গাকেই লোকে "ইলাসভা-মণ্ডলী" বলিত, তাহাতেই নাকি এক্ষণে "মণ্ডলী" হইতে মণ্ডলাই বা মল্লাই দাঁড়াইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন এখানে "মণ্ডল" উপাধিধারী লোক ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম মণ্ডলাই হইয়াছে।

মণ্ডালাই এককালে শ্বাপদসঙ্কুল জনমানবশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ইহার মধ্য দিয়া এককালে "কঙ্কনদী" নামে এক নদী গিয়াছিল। যেখানে এখন পথকালী মায়ের পূজা হয় তাহা নদীতীরস্থ শ্মশান এবং এখানে একজন নাকি কাপালিক থাকিত ও মধ্যে মধ্যে নরবলিও হইত। মহাকালী মা "পঞ্চমুণ্ডি"র আসনের উপর এখনও বিরাজিতা আছেন। কাছেই "যমুনা" নামক ডোবা নাকি নদীরই নিদর্শন। পথকালী মায়ের নিকট যে সব বাস-গৃহ ছিল তাহা এখন নদী গর্ভে চলিয়া গিয়াছে।

পথকালী মায়ের নিকট সরকারের বুড়োশিব আছেন। এই বুড়োশিবের গাজন উপলক্ষে বহুদিন হইতেই এই গ্রাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক চারি পাড়ায় যাত্রা হইত। এখনও দুই পাড়ায় হয়। দশহারার সময় পূর্বে ঝাপানের "মোস বলি" (মহিষ-বলী) হইত, সেজন্য এই যাত্রার তলাকে "মোষ-তলা" বলিত। মণ্ডলাই গ্রামের জনসংখ্যা ১,৯২২ জন।

মণ্ডলাই গ্রামের উত্তরপাড়ায় কর বংশের চালা ধরণের মন্দির একটি দেখিবার জিনিষ। ইহাতে কারুকার্য বিশেষ না থাকিলেও ইহার স্থাপত্যরীতি মুসলিম ধরণের বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চারদিকে খড়ের চালের মত ছাদ করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা নির্মিত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলাই দক্ষিণপাড়ায় একটি অল্পদিনের জন্য নিজ নাম "তারা" নামক প্রেস হইতে একখানি ছোট "তারা" নামক মাসিকপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

যখন পল্লীগ্রামে সখের থিয়েটারের যুগ খুব প্রবল, তখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলাই আর্য নাট্য সমাজ নামে এক থিয়েটার পার্টি খোলা হয়। এই থিয়েটারের সভ্যগণ কর্তৃক স্বদেশীযুগের বিপ্লবী নেতা মণ্ডলাই নিবাসী ডাঃ সি সি ঘোষের (ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষের) বিবাহ উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় হয়। ডাক্তার সি সি ঘোষ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পেশোয়ার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এই বিপ্লবী নেতাকে তেজস্বিনী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, বৃটিশ শাসকের সন্ত্রাসের সৃষ্টি হওয়ায় বহুবার কারা-বরণ করিতে হয়। তিনি গ্রামের ছেলেদের ব্যবসা শিখিবার জন্য কলিকাতা ক্লাইভ স্ট্রীটে ঔষধের দোকান খোলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় মণ্ডলাই কো-অপারেটিভ স্টোরের খুব প্রসার হয়। দুঃখের বিষয় কোনটিই আজ নাই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাঁহার ধনসম্পত্তি এবং ঔষধের দোকানাদি ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়া তাঁহার পরিবারবর্গ প্রাণ বাঁচান।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুর নিবাসী ভোলানাথ বসু তাঁহার স্ত্রীর এখানে জন্মস্থানের জন্য এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যারাকপুরেও ইহা অপেক্ষা বড় অনুরূপ একটি চিকিৎসালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহাই এক্ষণে বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এক সময়ে গ্রামে বহু চতুষ্পাঠী ছিল। ভট্টাচার্য বাড়ীর জনৈক পণ্ডিত বর্ধমান রাজসভার সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রামের পাবলিক লাইব্রেরীর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

ব্যবসার ফলে জামগ্রামের নন্দীবাবুরা বড় হইয়াছেন। এই ব্যবসার সমস্ত আয় তাঁহাদের কুলদেবতার সেবা-কর্ম করিয়া এখন পর্যন্ত "সেবাইত" হওয়ায় একান্নবর্তী আছেন। এই একান্নবর্তীতা হুগলী জেলার আদর্শ। এই ব্যবসার জন্যই কলিকাতা খিদিরপুরে যে গঙ্গাধর ব্যানার্জি লেন আছে, তাঁহারা ব্যবসার অজুহাতেই তাঁহাদের নিজগ্রাম মণ্ডলাই হইতে খিদিরপুর যান।

॥ আঁইচ্‌গড় ॥

ইলছোবা-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত আঁইচ্‌গড় একটী ক্ষুদ্র বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে এখানে হাট বসিত ও এখানে তাঁতের সুন্দর এবং সৌখীন গামছা প্রস্তুত হইত। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বুড়োপীর ও সুফী সাহেবের সমাধি আছে। সম্প্রতি এখানে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

॥ সোনাটিকি ॥

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত সোনাটিকি প্রাচীনকালে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া খ্যাত ছিল। এই গ্রামের দুর্লভরাম দত্তের পুত্র **অক্রুরচন্দ্র দত্ত** ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রের সন্তান ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গ্রাম ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরে যান এবং তথায় বর্গীদের হাত হইতে স্থানীয় জমিদারের পরিবারবর্গকে রক্ষা করায় তাঁহারা তাঁহাকে কিছু অর্থ ও রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা দেন। উক্ত অর্থ দিয়া তিনি পীরিতিরাম মাড়ের* সহিত একযোগে ব্যবসা করিতে সুরু করেন ও বহু অর্থ লাভ করেন। প্রথমে তিনি জাহাজে যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। হুগলী ডকিং তাঁহার ছিল। তাঁহার নামে কলিকাতায় রাস্তা আছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তিনি কমিশেরিয়েটে প্রবেশ করেন এবং বীরভূমের যুদ্ধে ইংরাজ সেনার সহিত তথায় গমন করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন। হুগলীতে তিনি রেশমের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার নাম বেঙ্গল সিল্ক মিলস। ইহা ছাড়া দত্ত লিনজি এণ্ড কোং, সেলিজি এণ্ড কোং, হুগলী টাগ কোং প্রভৃতি ত্রিশটি ব্যবসা পরিচালনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ বাংগালী শিল্পপতি বলিয়া সম্মান লাভ করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তিনি রামমোহন, রামনারায়ণ, রামময় ও রামচন্দ্র এই চার পুত্র ও কলিকাতায় ষাটখানি বাড়ি রাখিয়া যান। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ৫৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। খ্যাতনামা মহিলাকবি **গিরীন্দ্রমোহিনী** এই দত্ত পরিবারের বধূ ছিলেন।

অক্রুরচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র রামমোহন ব্যতীত আর সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। রামমোহনের পৌত্র **রাজেন্দ্র দত্ত** ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসার দ্বারা পরোপকার ব্রতে আত্মনিয়োজিত করিবার জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নিজ বাটিতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করেন। ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার তিনি প্রবর্তক ছিলেন এবং ইউরোপ হইতে আগত ডাঃ টনার ও ডাঃ বেরিনীকে ইহার প্রসারের জন্য তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কার্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাঈজী হীরাবুলবুলের পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করায় কলিকাতা শহরে যখন মহাআন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তখন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ" নামে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনকে এই কলেজে অধ্যক্ষতা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জ্যাঠামহাশয় দুর্গাচরণের পুত্র যোগেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। তাঁহার কাকা কালীদাস বিষয়কার্য ও ব্যবসায়াদি পরিচালনা করিতেন। তাঁহার সময়ে দত্তবংশের ৮৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল।

---

* রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র মাড়ের পিতা পীরিতিরাম মাড় হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন।

॥ মহিলাকবি গিরীন্দ্রমোহিনী ॥

মহিলাকবি গিরীন্দ্রমোহিনী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট ভবানীপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র, পানিহাটি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। দশ বৎসর বয়সে অক্রুরচন্দ্র দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়।

তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশিত হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে উহার সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন "ইহার অনেক স্থান এমন যে, তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। শৈশবে যে কবি প্রতিভার ক্ষীণ রশ্মি প্রকাশ পাইয়াছিল, কালে তাহাই বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছে।" ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। স্বামীকে হারাইয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয় যে গভীর শোকে ভরিয়া উঠিল, তাহারই 'অশ্রুকণা' লাভ করিয়া বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্য ধন্য হইয়াছে। অশ্রুকণা সেই সময় বাঙ্গলা দেশে এইরূপ যশোলাভ করিয়াছিল যে কবি অক্ষয়কুমার চৌধুরী ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন গিরীন্দ্রমোহিনীর উদ্দেশে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেনঃ

This is poetry in life and as expression of that poetry *Asrukana* is the history of the soul of a noble Hindu woman.

তিনি কবিতাহার, ভারতকুসুম, অশ্রুকণা, আভাষ, শিখা, অর্ঘ্য, স্বদেশিনী, সিন্ধুগাথা নামক কাব্য গ্রন্থ, জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী নামক গদ্যগ্রন্থ ও সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ নামে ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য রচনা করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট পরলোকগমন করেন। কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনার নিদর্শন হিসাবে নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইলঃ

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হবে যেতে?
পথে কি হবেনা দেখা সঙ্গে কভু তার!
কে বলে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার!

সোনাটিকরি গ্রামে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ **অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** জন্মগ্রহণ করেন

চাকলাই একটী ক্ষুদ্র বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে এখানে হাট বসিত, সে-জন্য ইহা হাট্-চাক্‌লই নামে খ্যাত। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সত্যপীরের সমাধি ও হাটের মা 'কালী' নামক জাগ্রতা পাষাণ-মূর্তি আছে। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে যাত্রী হয়।

॥ শিখিরা-চাঁপতা ॥

পাণ্ডুয়া থানার চৌদ্দটি ইউনিয়নের মধ্যে শিখিরা-চাঁপতা ইউনিয়নের জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম—মাত্র ৩,৮৭৯ জন। চাঁপতা গ্রামে বাঙ্গলা টপ্পা গানের প্রবর্তক নিধুবাবু ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া **চাঁপতা** গ্রাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত।

রামনিধি গুপ্ত

নিধুবাবুর প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। সাধক রামপ্রসাদ যখন দেহত্যাগ করেন তখন নিধুবাবুর বয়স ৩৪ বৎসর। রামমোহন রায় ইহার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। এই হিসাবে নিধুবাবু যুগসন্ধির কবি ছিলেন। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের মধ্যে নিধুবাবু যে কেবল যোগসূত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা নয় তিনিই এই দেশে সর্বপ্রথম ইংরাজী জানা সাহিত্যিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সর্বপ্রথম যাঁহারা ইংরাজী শিখেন এবং বিদেশে চাকুরী করিতে যান নিধুবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ছাপরার কালেক্টরীতে নিযুক্ত হন, কিন্তু শোনা যায় যে কালেক্টরীর হিসাবের খাতায় তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া কালেক্টার মণ্টোগুমারি সাহেব তাঁহাকে আঠারো বছরের পুরানো চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। গানটি এইঃ

কামদ খাম্বাজ

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর।
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥ ১॥

ছাপরায় কাজ করিবার সময় নিধুবাবু মুসলমান ওস্তাদের নিকট উচ্চাঙ্গের হিন্দী ও উর্দু সঙ্গীত চর্চা করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গান-বাজনার সখ ছিল—ছাপরায় মনের মত ওস্তাদ পাইয়া তিনি টপ্পা, গজল, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ছাপরার ওস্তাদরা পাঞ্জাবী শোরী মিঞার টপ্পা গাহিত। তিনি শোরী মিঞার টপ্পার অনুসরণে বাঙ্গলায় প্রাকৃত প্রেমের সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হন।

নিধুবাবুর উপর বঙ্গের অন্য কোন কবির প্রভাব পড়ে নাই। রচনার গঠন, পারিপাট্য ও বহিরাঙ্গের দিক হইতে তাঁহার ঋণ করিবার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ এই বিষয়ে তিনি হিন্দুস্থানী ওস্তাদের বিশেষতঃ শোরী মিঞার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, টপ্পা গানের প্রবর্তক মিঞা সাহেবের পত্নীর নাম ছিল শোরী। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে প্রেমগীতি রচনা করিয়া উভয়ে গানের দ্বারা হৃদয়ের ভাব-বিনিময় করিতেন। এই গানগুলিই অভিনব ঢঙে গীত হইয়া **শোরী মিঞার টপ্পা** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিধুবাবু মিতাক্ষরী বাণীর মধ্য দিয়া বাঙ্গলাদেশে টপ্পাসঙ্গীতের সৃষ্টি প্রবর্তন ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতকলা জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্গদেশে পূর্বে যে সকল গান প্রচলিত ছিল তাহাদের সবই ছিল ধর্মসঙ্গীত, তত্ত্ব-সঙ্গীত, পরমার্থসঙ্গীত বা ভজনসঙ্গীত। তাহাতে দেশের লোকের প্রেমের তৃষ্ণা মিটিত না। তিনি বাঙ্গলাদেশে সর্বপ্রথম প্রেমগীতি রচনার অগ্রদূত ও গুরুস্বরূপ। দেবতার স্বর্গীয় প্রেমকে তিনি কামনার ভোগবতীনীরে কখনও নামান নাই। নরনারীর রক্তমাংসময় প্রেমকে নিধুবাবু স্বর্গের মন্দাকিনী তীরে উন্নয়ন করিয়াছিলেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ নিধুবাবুর প্রেম সমস্ত দুঃখ নিজে সহিয়া প্রেমের

পাত্রের গায়ে পাছে আঁচ লাগে এজন্য সতর্ক। ইহাতে দেহের লোভ নাই। প্রতিদানের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। নিজ সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতও নাই। কেবল আছে প্রেমের পাত্রের পায়ে আত্মদান।

কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন যে, উত্তর-রামচরিতের কবি ভবভূতিকে এবং রজনীর বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি স্পর্শেন্দ্রিয়ের কবি বলা হয়, নিধুবাবুকে তবে দর্শনেন্দ্রিয়ের কবি বলিতে হয়। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার শব্দকোষে টপ্পা শব্দের মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পাগানের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘু প্রকৃতির গান" বলিয়া লিখিয়াছেন।

ডঃ সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন ঃ ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রভাব হইতে মুক্ত নূতন ধরনের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নয়।

১২৪৫ সালে নিধুবাবু দেহরক্ষা করেন। মৃতুর এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার টপ্পা গানের একখানি সঙ্কলিত পুস্তক **"গীতরত্ন গ্রন্থ"** নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি গীতরত্ন গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গীতরত্নের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙলাদেশে ইহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

বেলে-শিখিরা গ্রামে সরকারী অনুবাদক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত উল্লেখ্য সমস্ত গ্রামের বিবরণ কবি আবদুর রহমান "পাণ্ডুয়ার পল্লী" নামক পুস্তিকায় দিয়াছেন।

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোটসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বেড়েলা-কোচমালী	৪,৪১০	২,৩১৯	২,০৯১
বাটিকা-বৈঁচি	৬,৮০৫	৩,৬২৬	৩,১৭৯
জামনা	৩,৯৬১	২,০০৯	১,৯৫২
হরাল-দাসপুর	৭,০৯৪	৩,৫৯১	৩,৫০৩
রামেশ্বরপুর-গোপালনগর	৫,৫৫৩	২,৭৮০	২,৭৭৩
সিমলাগড়-ভিটাসীন	৬,১৮৪	৩,২১৮	২,৯৬৬
তোড়গ্রাম-পাঁচগড়া	৪,২১২	২,১০০	২,১১২
পাণ্ডুয়া	১০,৯৫৫	৬,০০৩	৪,৯৫২
জামগ্রাম-মণ্ডলাই	৫,৫১১	২,৭৯২	২,৭১৯
ইলছোবা-দাসপুর	৫,৪৪০	২,৭০৩	২,৭৩৭
শিখিরা-চাঁপতা	৩,৮৭৯	১,৯৩৫	১,৯৪৪
ইটাচুনা-খন্যান	৬,৫৬৫	৩,০৪৪	৩,২২১
বেলুন-ধামাসীন	৭,৭৫৫	৩,৮১৯	৩,৯৩৬
জায়ের-দ্বারবাসিনী	৬,৩৬৬	৩,২৫৮	৩,১০৮

॥ মগরা ॥

মগরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে হুগলী জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান প্রাচীন স্থান। হাওড়া হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অক্ষাংশ ২২°৫৯' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২২' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২২' পূর্বে অবস্থিত। মগরার দক্ষিণদিক দিয়া কানা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বে এই নদী খুব বেগবতী ছিল এবং ইহাই দামোদরের প্রাচীন খাত ছিল। দামোদর নদের গতি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পরিবর্তিত হওয়ায় এই অঞ্চলের সকল স্থান বালুকাময় হইয়া যায়। ৭৩ পৃষ্টায় প্রদত্ত দামোদরের প্রাচীন খাতের নক্সা হইতে দামোদরের গতি কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কানানদী এই অঞ্চলে বর্তমানে মগরা খাল বলিয়া কথিত হয়। মগরা থানার অন্তর্গত দুইটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। একটি হোয়েড়া দিগসুই, আর একটি মগরা। হোয়েড়া দিগসুই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৭,৫৯২ জন ও মগরা ইউনিয়নের জনসংখ্যা ১৪,৩৩৯ জন।

মগরা থানার মধ্যে বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং তিপ্পান্নটি ছোট বড় গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলির মধ্যে হোয়েড়া, তালাণ্ডু, দিগসুই, কোনা, দাদপুর, কবিরহাটি, রঘুনাথপুর, মহরপুর, আমোদঘাটা বেণীপুর, আলীখোজা ও গজঘণ্টা গ্রাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখ্য। ইহা ছাড়া সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া—হুগলী জেলার এই তিনটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানও মগরা থানার অন্তর্গত বলিয়া এই থানা হুগলীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূর্বে মগরাতে কোন থানা ছিল না। সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে (পৃষ্ঠা ৬৯৬-৭৯৩) লিখিত হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ের মগরায় একটি ষ্টেশন আছে। পূর্বে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে লাইনের সহিত ইহা একটি জংশন ষ্টেশন ছিল। মগরা হইতে ছোট রেল ত্রিবেণী ও অপরদিকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাইত। এই রেল পথের বিবরণ ৩২৪ পৃষ্টায় বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী পরিচালিত এই রেলপথটি এখন উঠিয়া গিয়াছে।

মগরা বহু প্রাচীনকাল হইতে একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। ভাল রাস্তা ও নদীর জন্য এই স্থান হইতে মালপত্র আদান-প্রদানের খুব সুবিধা ছিল। দামোদরের প্রাচীন খাতের উপর মের অবস্থান হেতু এই অঞ্চল সর্বত্রই বালুকাময়। মগরার বালি গৃহ নির্মাণে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রতি দিন লরী করিয়া এবং নৌকাযোগে মগরার সরু বালি ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় চালান দেয়। ইহা ছাড়া ধান, চাউল, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে যাহা এই অঞ্চলের আশে পাশে জন্মায় তাহাও জলপথে ও স্থলপথে অন্যত্র চালান যায়।

মগরার বালুস্তর এখন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। সেই জন্য সুলতানগাছা, দ্বারবাসিনী, মল্লিক প্রভৃতি স্থান হইতে এখন বালি তোলা হয়। বালির ব্যবসায়ে এই অঞ্চলের কি ক্ষতি হইতেছে তাহা ৫৬০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

ত্রিবেণীর সন্নিকটে সরস্বতী নদীর উপর দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন পুল নির্মিত হইয়াছে। ইহা নির্মিত হওয়ায় চুঁচুড়া হইতে বৈঁচি পর্যন্ত বাসগুলি যদি ত্রিবেণী, বাসুদেবপুর, বাগাটী প্রভৃতি অঞ্চলের নবনির্মিত পাকা রাস্তা দিয়া চলাচল

করে তাহা হইলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বহুদিনের একটি অভাবের সমাধান হইবে। বিশেষ করিয়া মগরা ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগাটীতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি হওয়ায় এই স্থানে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে যাতায়াত অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

মগরা গ্রামে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ দামোদরের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় পুরাতন মন্দির ও অট্টালিকাদি সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। গ্রামে পোষ্ট অফিস ডাকবাংলো, উত্তমচন্দ্র বিদ্যালয় এবং হরিসভা আছে। আনন্দকাননে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয়। দেবযান মাসিক পত্র এই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ মগরার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত। তিনি তাঁহার গৃহাদি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য দান করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন মগরায় চাতুর্মাস্য ব্রত করেন তখন ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ কানানদীর তীরে সুন্দর পরিবেশে তাঁহার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়া দেন। উক্ত ভবনে বর্তমানে দাশরথি দেবের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং প্রত্যহ ঐ স্থানে পূজা, পাঠ ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। এই ভবনের পাশে একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের একটি পাথরে "৩১ আষাঢ় ১৩৬৫" সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া লেখা আছে।

প্রাচীনকালে মগরার নিকট গোলা ঘর নামক স্থানে কোম্পানীর আড়ং বা কারখানা ছিল। সেই কারখানা হইতে তাঁতীদের দাদন দিয়া সুতি ও রেশম কাপড় প্রস্তুত করান হইত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রজার লেন ওরিকার্ড নামে একজন সাহেব এই কারখানার রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে প্রকাশিত "মিনিট্‌স অফ কন্সালটেশন" হইতে জানা যায় যে, গোলাঘরের সুবৃহৎ কারখানার কার্যাদি দেখিবার জন্য একজন গোমস্তা পাঠাইতে লেখা হইয়াছিল। সেই সময় কোম্পানীর গোমস্তাগণ কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া নিজেদের কারখানায় চালানীমাল তৈয়ারী করিয়া উহা কলিকাতায় পাঠাইত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোলাঘরের তাঁতীদের কাপড়ের জন্য ৩৮,৫১৮ টাকা অগ্রীম দেওয়া হইয়াছিল ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব কৃত 'হিন্দোস্তান' গ্রন্থে এই স্থানে তখনও কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। রেসিডেন্সী অবলুপ্ত হইবার পর মগরার বস্ত্র ও রেশম শিল্প নষ্ট হয় বলিয়া ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন।

রেনেলের মানচিত্রে মগরাঘাট 'ত্রিবেণী' 'বাশবেড়িয়া'র সহিত একটি রাস্তার দ্বারা বর্ধমানের সহিত যুক্ত বলিয়া দেখান আছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ কুন্তী নদীর উপর লোহার একটি ঝোলান পুল নির্মাণের জন্যে ছত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। 'হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' মগরার ব্যবসা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে উল্লেখ্য

Cotton fabrics are manufactured by hand looms in some quantities in the neighbourhood, but the chief exports are paddy, rice tobacco and fine sand. The latter is taken from the bed of the Kana Nadi near Magraganj and used for building. The river is evidently an old channel of Damodar, which must once have run straight across to Tribeni. After the abolition of Residency, though the manufacture of cotton and silk declined, there was a

development of trade owing to the construction of the Grand Trunk Road the Kana Nadi (old Damodar) at Magra *en route* to Burdwan.

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে মগরায় "গোপালচন্দ্র ব্যানার্জি কলেজ" স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বাগাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৩৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার কথা আছে।

মগরাগঞ্জ গ্রামে প্রায় ১০০ বৎসর হইতে রথযাত্রা উৎসব প্রতিপালিত হইয়া আসিলেও ১৩৬৮ সাল হইতে রথযাত্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শত বৎসর পূর্বে কৃষ্ণা জেলেনী কর্তৃক ই রথ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উৎসবে গ্রামাঞ্চলে বহু পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে। কিন্তু রথের মালিক শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র আদক অর্থনৈতিক চাপে আর রথ চালাইতে পারেন নাই। এই রথ বাংলার কৃষিজীবিদের জাতীয় উৎসবরূপে এতদিন প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল।

হুগলী জেলার আটাশটি ইউনিয়নে ছয় বৎসর হইতে এগার বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালকবালিকাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। মগরা ইউনিয়ন উক্ত আটাশটি ইউনিয়নের মধ্যে অন্যতম।

ত্রিবেণীর অনতিদূরে মগরা থানার অন্তর্গত **বন্দীপাড়া** ভাগীরথী তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে একখানি পাথর আছে, ইহাকে নেতা ধোপানীর পাঠ বলা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, বেহুলার স্বামী লখিন্দর এই স্থানে পুনর্জীবন লাভ করেন। এই পবিত্র পাথরখানি দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ বহু ভক্তের এই গ্রামে সমাগম হয়। গ্রামের জনসংখ্যা ৩২২ জন।

॥ দিগসুই ॥

দিগসুই মগরা থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গন্ড গ্রাম। গঙ্গার এক মাইল পশ্চিমে পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে গঙ্গা পূর্বদিকে অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের বাস এই গ্রামে ছিল, পরে মাতুলের সম্পত্তি পাইয়া তাঁহারা জিরাটে চলিয়া যান। তাহাদের ভিটা এখনও এই গ্রামে বিদ্যমান আছে।

ব্রাহ্মণ পন্ডিত অধ্যুষিত এই গ্রামে প্রাচীন কালে অনেকগুলি টোল ছিল। এখনও দুটি টোল গ্রামে আছে। একটি টোল পন্ডিত শ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ পরিচালনা করেন। ১৩২০ সালে "সাধন সমিতি" নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এই গ্রামের বহু কল্যাণকর কার্য করে। তন্মধ্যে স্থানীয় বিদ্যালয় অন্যতম। সাধন সমিতির মূলমন্ত্র ছিল ঃ

জীবে প্রেম দীনে দয়া ভক্তি ভগবানে।
সকলের সার ধর্ম রাখিও স্মরণে॥

দিগসুই গ্রামে দাশরথি দেব সাধন সমিতির পরিচালক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম সাধনায় চতুঃস্পার্শস্থিত গ্রামসমূহে ধর্মপ্রচার ও জনসেবা সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এবং বহু-লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হুগলীর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। দাশরথি দেব দিগসুই গ্রামে ২৪ ফাল্গুন ১২৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ সালে পরলোকগমন করেন।

তিনি সংস্কারপন্থী ছিলেন না বলিয়া তাঁহার নাম স্থানীয় কয়েকটি গ্রামের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে বিশেষ প্রচারিত হয় নাই। প্রাচীনকালের কূপমণ্ডকতাকে তিনি শাস্ত্রীয়-জ্ঞানের অভাবে সনাতনপন্থা বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং অব্রাহ্মণদের কোনরূপ সংস্কার কখনও অনুমোদন করিতেন না। এই সম্বন্ধে শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই সমস্ত বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেনঃ আমার গুরুদেব সনাতনপন্থী ছিলেন। কায়স্থ, উগ্র ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতীয়গণের অশৌচ-সঙ্কোচ অনুমোদন করিতেন না। আমি যদি অশাস্ত্রীয় ১২ দিন অশৌচ পালন-কারীগণকে শিষ্য বলে গ্রহণ করি তাহলে আমার গুরুত্যাগ করা হবে। স্তবকুসুমাঞ্জলী পৃঃ ১৬৫

একশ বছরেরও আগে এই হুগলী জেলা হইতেই যে-মহান বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা হইল—জীব শিব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় সমস্ত কিছুর উপরে মানুষ। কিন্তু আজও সংস্কারের ঘোলা জল যদি পূত পবিত্র হুগলী জেলার ভূমি স্পর্শ করে তা বাস্তবিকই লজ্জা এবং দুঃখের। হুগলী জেলার পক্ষে তা সম্মানহানিকরও বটে। কারণ কোনো সংকীর্ণতাকে হুগলী জেলা কোনোদিন সমর্থন করে নাই। হুগলী জেলার যে-বাণী, তা সর্বজনের বাণী। সুতরাং সেই রূপ সর্বজনগ্রাহ্য বাণী যদি হুগলী জেলা হইতে আবার উত্থিত হয় তাহা হইলে হুগলী জেলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

দিগসুই গ্রামের সুরবংশের দেওয়ান ব্রজলাল সুর একজন কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিবমন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুরবংশের কুলদেবতা যাদব রায়ের নবরত্ন মন্দির এই গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু। নয়টি চূড়াবিশিষ্ট এইরূপ বিরাট মন্দির বাক্‌সা ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরের সামনের দুইটি ইঁটের কারুকার্যখচিত স্তম্ভ বর্তমানে পড়িয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়া মন্দিরের অন্যান্য স্থানের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। মন্দিরটি সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। মন্দিরে একখানি প্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছেঃ

শ্রীকৃষ্ণ শকাব্দ ১৭১৪
বেদৈক সপ্তে কামতে শকাব্দে
শ্রী রাধয়ায়াদ বরায়কস্য
রাসায় রম্য নবরত্ন কুঞ্জ
শ্রীরামকান্তে কৃত বিভাতি
সন ১১৯৯ সাল

এই পাথরের আর এক স্থানে "নারায়ণ মিস্ত্রী" এই নামটি লিখিত আছে। ইহা হইতে নারায়ণ মিস্ত্রী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সাধন সমিতির প্রাঙ্গণে ১৩৬৫ সালে একটি রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী লক্ষ্মণ ও মহাবীরের শ্বেতপ্রস্তরের চারটি বিগ্রহ এবং চারকোণে চারিটি বৃহৎ আলমারিতে খাতায় লিখিত ১ শত ২৫ কোটি **'শ্রীরাম'** নাম প্রত্যহ পূজিত হয়। এইরূপ রামনাম পূজা ভারতের আর কোথাও হয় না।

রামমন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপাথরে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় মন্দির স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে। মন্দিরে উৎকীর্ণ বাঙলা লিপি এই স্থানে উদ্ধারযোগ্যঃ

যবে শ্রীওঙ্কারনাথ সীতারামদাস,
সমৌন করিতেছিল নীলাচলে বাস।
এই মন্দিরের শুভ কল্পনা তখন
তাহার অন্তরমাঝে লভে জাগরণ।
তেরশ পঁয়ষট্টি সনে মকরার্কদিনে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান সনে
স্থাপিলেন এ মন্দির দাশরথি দাস
স্বরায় ওঙ্কারনাথ সীতারাম দাস।
সংগ্রহ করিয়া যত্নে লিপিগ্রন্থসনে
একশ পঁচিশ কোটি রামনামধনে।
দিগসুই সাধনসভা পবিত্র প্রাঙ্গনে
স্থাপন করিলা এই মন্দির ভবনে।
এই তীর্থে ভক্তগণ হইয়া মিলিত
ধন্য হক্‌ নিজ হিত করিয়া সঞ্চিত।

এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। উহাতে মদনমোহন জীউ অধিষ্ঠিত হইবেন। সেয়ারসোলের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কাল কষ্টিপাথরের মদনমোহন জীউ ও শ্রীরাধিকার বিগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত বিগ্রহদ্বয় শ্রীরামমন্দিরে পূজিত হইতেছেন। নূতন মন্দির নির্মিত হইলে, উহাদের তথায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মদনমোহনের এইরূপ সুন্দর বিগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না।

দিগসুই গ্রামে শ্রীশ্রীহট্টেশ্বর মহাদেব জীউর প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে ১২৯২ সালে শ্রীমতী সুখদা দাসী তাঁহার স্বামী আনন্দচন্দ্র নিয়োগীর স্বর্গার্থে উহা সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া একটি পাথরে লেখা আছে। দিগসুই গ্রামের জনসংখ্যা ১,৫৮০ জন।

দিগসুই গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে পোস্ট-অফিস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ও হরিসভা আছে।

॥ হোয়েড়া ॥

খন্যানের নিকটবর্তী হোয়েড়া গ্রামখানি খুব ক্ষুদ্র হইলেও, হোয়েড়া গ্রামের রথযাত্রা পোলবা থানায় বিশেষ প্রসিদ্ধ; এই রথ স্থানীয় নিয়োগীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই নিয়োগী বংশেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত সাব-জজ স্বর্গীয় কালীপদ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দণ্ডধারী বিশ্বাস এই অঞ্চলের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি এবং দানধ্যানাদির জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দিগসুই ইউনিয়নের অধীন মগরা থন্যানের মধ্যে অবস্থিত হোয়েড়া একটি পুরাতন গ্রাম। গ্রামটি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইহা একটি সুসমৃদ্ধ পল্লী ছিল। পারসীক নাম হইতে হোয়েড়া নামের উৎপত্তি হয়। এই গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় তদানীন্তন কালে এই অঞ্চলের একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া বহু দূর হইতে ছাত্রগণ হোয়েড়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিত। বনমালী চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুবৎসর যাবত তিনি স্বয়ং এই শিক্ষালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা করেন। হোয়েড়া গ্রামের বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হোয়েড়া হইতে বনমালী চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষা' নামে একখানি মাসিকপত্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহার সম্বন্ধে ৫৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

হুগলী শহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র মনোজকুমার (অধ্যাপক), ডক্টর সরোজকুমার, সিরামিকের উপর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে থিসিস লিখিয়া প্রথম ভারতীয় ডক্টরেট উপাধি পান, নীহারকুমার (ইঞ্জিনিয়ার) এবং অশোককুমার ও প্রণবকুমার এম, বি, বি, এস ডাক্তার। সকলেই সাহিত্যব্রতী ও কৃতি। হোয়েড়া গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা ৬৯৫ জন।

হোয়েড়ার পাশ্ববর্তী শিখিরা গ্রামের রামলাল মুখোপাধ্যায় সেকালে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া জজ হন বলিয়া এই অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিখিরা পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৪৯০ জন।

॥ ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী ॥

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতপ্রবর সাহিত্য সমাজসেবী সুলেখক এবং বক্তা ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর হুগলী জেলার হোয়েড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষার প্রারম্ভ হয় স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে, এখানে তিনি সকল শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন! মাইনর ক্লাস পর্যন্ত পাঠ করিয়া তিনি ১১ বৎসর বয়ক্রমকালে কলিকাতায় আসেন এবং আর্য মিশন ইনষ্টিটিউশনে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ স্কুল হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স্ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৫্ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। ঐ স্কুলে পাঠ করিবার সময় তিনি দুইটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, একটি গীতায় ও দ্বিতীয় বিজ্ঞানে।

তারপর ১৯০১ সালে ডাফ্ কলেজ হইতে তিনি এফ, এ, পাশ করিয়া ২০্ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। তিনি ঐ পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বহু পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তিনি বি, এ, পাশ করেন মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) কলেজ হইতে। এই পরীক্ষায় ফিজিকস্ ও কেমিষ্ট্রিতে, প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং উড্রো স্কলারসিপ ও গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এম, এ, পরীক্ষাতেও তিনি রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ বৃত্তিতেও প্রথম হইয়া মাউণ্ট পদক পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে এফ এ হইতে প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ পরীক্ষা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে তিনি কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই।

এম, এ, পরীক্ষায় ১০০্ টাকার সরকারী বৃত্তি পান এবং আচার্য ডাঃ পি, সি, রায়ের নিকট রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ সময় তিনি কয়েকখানি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য "গ্রিফিথস্ প্রাইজ" প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর হইতে তিনি রাজসাহীতে অধ্যাপক জীবন আরম্ভ করেন এবং রাজসাহীতে তিনি ১৪ বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় Iron in ancient India এবং Copper in ancient India প্রকাশিত হয় এবং এই দুইখানি গ্রন্থ শুধু ভারতবর্ষ কেন, ইউরোপ, আমেরিকা ও নানাদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। এই সময় আয়ুর্বেদীয় ধাতুগঠিত ঔষধের রাসায়নিকের স্বরূপ ও প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেও গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে "শতপুটিত" ও "সহস্রপুটিত" লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তিনি কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তিনি এই সময় "বৈজ্ঞানিক জীবনী" শীর্ষক একটি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তিনি ইহাতে প্রাচীন প্রসিদ্ধ ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ছাড়া তিনি অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'তুফান' শীর্ষক পুস্তকে হাস্যরসাত্মক বাঙ্গলা রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ অনন্যসাধারণ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং আরও কয়েকজন ভারতীয় অধ্যাপকের সহিত ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে উন্নীত হন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন এবং সেখানে চার পাঁচ মাস অবস্থানের পর বপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে এই কলেজে ইংরাজ ছাত্রদেরই ঐ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থায়ীভাবে কলেজে বদলী হন। এখানে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বহু বিষয়ের গবেষণা করিয়াছিলেন। অজৈব রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অনেক আবিষ্কার আছে। সেইগুলির ভিতর আবিষ্কার 'গ্যালিয়ম' ধাতুর বহু যৌগিক। তিনি ১৯২৮ সালের ২৩শে তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। ইংরাজী এবং বাঙ্গলায় এই দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা করিবার তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সহ সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান বিভাগের দুইবার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে সদ্গোপ এবং সদ্গোপ যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ জন্য "সদ্গোপ যুবক সংঘ" স্থাপন করেন ও সদ্গোপ পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ধানের পূর্বে তিনি বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৯ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশনের কন্‌ভোকেশনে প্রধান অতিথিরূপে বক্তৃতা দিবার

সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

তিনি রোটারী ক্লাবের ন্যায় "মিলনী" নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্লাব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইবার খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম কীর্তি শ্যামবাজারে 'মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের' প্রতিষ্ঠা। মৃত্যুর সময় অবধি তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনি চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা এই কলেজটিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এক্ষণে এই কলেজটি আমাদের দেশের একটি বৃহৎ শিক্ষায়তনে পরিণত হইয়াছে। এই কলেজ উত্তর কলিকাতায় বহুদিনের অভাব মোচন করিয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ মগরায় মিউনিসিপ্যালিটি ॥

মগরা ইউনিয়ন বোর্ডকে পৌরসভায় পরিণত করিবার জন্য মগরা ইউনিয়নের জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করিয়াছেন এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই স্থানে পৌর সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এই ইউনিয়নের সর্বত্র বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন। ব্যবসায়ের দিক হইতে মগরা খুবই উন্নতিশীল এবং এই অঞ্চলের জনসংখ্যা এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই গ্রামে একটি কলেজও আছে। আমরা এই গ্রামে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী কারণ পৌরসভা হইলে মগরার সামগ্রিক উন্নতি হইবে।

॥ রামগোপাল ঘোষ ॥

ত্রিবেণীর নিকটস্থ মগরা থানার অন্তর্গত **বাঘাটি** গ্রাম হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের পৈত্রিক বাসস্থান। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। রামগোপাল বহু গুণের আধার ও তাঁহার সমসাময়িককালে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং বাংলাদেশের বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অপূর্ব বক্তৃতাশক্তির জন্য লোকে তাঁহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্কের সহিত তুলনা করিত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী সরকার কলিকাতায় নিমতলা শ্মশানঘাটে শবদাহ বন্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। যদিও তিনি পৌত্তলিকতা ও গঙ্গাতীরে শবদাহ এইসব মানিতেন না তথাপি তিনি বাকপটুতা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে গঙ্গাগর্ভে হিন্দুর শব সৎকারের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তিনিই সর্বপ্রথম রাজনীতিতে জনমত গঠন না করিলে কোন কাজ হইবে না, ইহা অনুভব করেন। বাকল্যান্ড সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

He was one of the first to take up the line of political agitation. It was he who first matured a plan and established a society for political agitation in England with the assistance of Mr. Adams, for the purpose of drawing the attention of the British public to Indian question .... As a promoter of education, a patriot, a politician, a speaker, a social reformer, as a successful merchant, and in force of character, Babu Ram Gopal Ghose was one of the foremost men of his time and did much for the enlightenment of Hindu Society, (Bengal under the Lieutenant Governors).

নিমতলা শ্মশানঘাটে একটি মর্মরনির্মিত "স্মৃতিফলকে" রামগোপাল ঘোষের কথা লিখিত আছে। বাঘাটি গ্রামে 'ডাকাতে কালী' নামে এক প্রাচীন কালী আছে। পূর্বে ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিত। ডাকাতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

কলিকাতা নিমতলা শ্মশানে বাগ্মি রামগোপাল ঘোষের সম্বন্ধে প্রস্তরফলকে যাহা লিখিত আছে তাহা এইরূপঃ

অপূর্ব বাগ্মিতাবলে
সনাতন প্রথার গণ্ডীগর্ভে হিন্দুর সংস্কার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া
যিনি হিন্দুসমাজকে চিরঋণী করিয়াছেন
সেই বাংলার জাতীয় জীবনের মন্ত্রগুরু
লোকশিক্ষার অকৃত্রিম সুহৃৎ
বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সাধক
দেশপূজ্য জননায়ক কর্মবীর বাগ্মিপ্রবর
মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের
পুণ্যস্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহারই প্রযত্নরক্ষিত শ্মশানতীর্থে
এই স্মৃতিচিহ্ন
তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসিগণ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।

জন্ম ৬ই কার্তিক ১২২১ মৃত্যু ৮ই মাঘ ১২৭৪

যে সময় পাশ্চাত্ত্যদেশে নেপোলিয়নকে নির্বাসিত করিয়া পাশ্চাত্ত্যবাসী শান্তি অন্বেষণ করিতেছিলেন, প্রাচ্যে লর্ড ময়রা (মার্কুইস অফ হেস্টিংস) নেপাল আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, হুগলী জেলায় খৃষ্টান মিশনারীরা ধর্মান্দোলন তুলিতেছিলেন এবং যে সময়ে রাজা রামমোহন একেশ্বরবাদ লইয়া ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় বাংলা ১২২১ সালের ৬ই কার্তিক শুক্রবার (২১শে অক্টোবর ১৮১৪*) রামগোপাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

রামগোপালদের আদি নিবাস—হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রাম। তাঁহার পিতামহ জগমোহন ঘোষ হুগলী বাঘাটির মিত্র বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া কৌলিন্যানুযায়ী যৌতুক পাইয়া বাঘাটিতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। জগমোহন মেসার্স কিং হ্যামিলটন কোম্পানীর অফিসে কার্য করিতেন। জগমোহনের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র। তিনি কলিকাতা নিবাসী দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পিতার ন্যায় কৌলিন্যের সম্মান—বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কলিকাতা ঠনঠনিয়ায় ৯৮।১নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। গোবিন্দচন্দ্র চীনাবাজারে সামান্য একটি দোকান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কুচবিহার রাজ্যের এজেন্টের কার্য করিতেন এবং পূর্ববঙ্গে

* বাকল্যান্ড সাহেব রামগোপালের জন্ম "অক্টোবর ১৮১৫" লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নয়।

সামান্য জমিজমাও ছিল। রামগোপাল গোবিন্দচন্দ্রের একমাত্র সন্তান। রামগোপাল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চারিটি জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছিল, তন্মধ্যে প্রথমা ভগিনী স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অন্য শিশুগণের তুলনায় বাল্য হইতে রামগোপালের স্বাস্থ্য এবং শরীরের গঠন অতি উত্তম ছিল। শিশুকাল হইতেই তাঁহার সাহস উপস্থিতবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ৫।৬ বৎসর বয়সেই রাত্রে চোরে একদিন তাঁহার কোমরের গহনা কাটিয়া লইতে আসিয়া শিশুর সাহসে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। আর একবার শিশুবস্থায় তিনি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়া ভৃত্যের শাণিত ছুরিকার আঘাত হইতে প্রাণরক্ষা করেন। তখন কলিকাতায় এখানকার মত অট্টালিকায় নগর পরিপূর্ণ হইয়া যায় নাই। এখন যেখানে মার্কস স্কোয়ার নামক উদ্যান রহিয়াছে, তখন সেই স্থানে এক বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদির বাহুল্যে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ স্থানে সেই সময় চোর-ডাকাতেরা অবাধে হত্যাকাণ্ড সংসাধিত করিত। ইহা ছাড়া পল্লীগ্রামের ন্যায় তখনকার কলিকাতার স্থানে স্থানে পতিত জমির উপর লতাগুল্মাদি জন্মিয়া দুষ্ট লোকের অসদ্‌ভি-প্রায়ে সহায়তা করিত। তখন ঠনঠনিয়ায় একটি মাত্র খাবারের দোকান ছিল। একদিন এক ভৃত্য রামগোপালকে লইয়া পথে বাহির হয়; কিন্তু ঠনঠনিয়ার খাবারের দোকান অতিক্রম করায় শিশু রামগোপালের সন্দেহ জন্মে। ভৃত্যের কোমরে একখানি ছুরি ছিল। তাহা রামগোপালের পায়ে স্পর্শ হওয়ায়, রামগোপাল চাকরের অসদ্‌ভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। প্রথমে রামগোপাল ভৃত্যকে বালকসুলভ অনুযোগ করিয়া বাটী ফিরিতে চাহেন এবং অবশেষে উচ্চ ক্রন্দনের শব্দে লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান।

রামগোপাাল প্রথমে ঠনঠনিয়ার এক পাঠশালায় প্রবেশ করেন কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা তখন তাঁহাকে কপাটী খেলায় অধিক মনোযোগী দেখা যাইত। তাহার পর তাঁহাকে চিৎপুর রোডে ব্রাহ্ম সমাজের বাটীর সন্নিকটে শার বোর্ন সাহেবের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। শার বোর্ন সাহেব বাঙ্গালী ও ইংরাজের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া উভয় জাতির ভাষার সংযোগে একটি নব্য সম্প্রদায় গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শার বোর্ন সাহেব দুর্গাপূজার সময় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বার্ষিকী আদায় করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানেও রামগোপাল বিদ্যা অপেক্ষা 'ডাং'-গুলি অথবা 'গুলি-ডাণ্ডার' অধিক চর্চা করিতেন। এই সময় একটি সামান্য ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন পথে চালিত হইতে থাকে। রামগোপালের মাতুল কন্যার সহিত এই সময় লর্ড ড্যালহাউসি কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম বাঙ্গালী পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ হরচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। বিবাহ সভায় হরচন্দ্র রামগোপালের বাক্‌পটুতা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ভর্তি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পঞ্চ মুদ্রা মাসিক বেতন দিয়া পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা গোবিন্দচন্দ্র পারিয়া উঠিলেন না। অতঃপর গোবিন্দচন্দ্র দুইটি এবং রাম-গোপালের পিতামহী তিনটি মুদ্রা মাসিক ব্যয় করিয়া তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। আবার শুনা যায়, কিং হ্যামিলটন কোম্পানীর রজার্স নামক এক সাহেব রামগোপালের

মাহিনার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মেধা ও অধ্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়া মহাত্মা ডেভিড হেয়ার রামগোপালকে তাঁহার বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন।

পূর্বে রামগোপালের নাম ছিল গোপাল। নয় বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগে প্রবেশ করিবার সময় কলেজের হেডমাষ্টার ডি, এনসেলম তাড়াতাড়ি গোপালকে নাম জিজ্ঞাসা করেন। গোপাল তাহার নাম বলেন, কিন্তু এনসেলম সাহেব তাহা না বুঝিয়া গোপালের পরিবর্তে রামগোপাল লিখিয়া লন। সেই হইতে তাঁহার নাম রামগোপাল হয়। এখানে রামগোপাল অচিরে শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। কলেজের সেক্রেটারী ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে লজ্জা দিবার জন্য রামগোপালের এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ইংরাজী প্রবন্ধগুলি উচ্চশ্রেণীতে লইয়া যাইয়া পড়িতেন। ইতিহাস ও ভূগোলে রামগোপালকে অধিক মনঃসংযোগ করিতে দেখা যাইত। বাল্যের ন্যায় এখানেও মারামারিতে তিনি সর্বাগ্রে থাকিতেন; কিন্তু শক্তি ছিল বলিয়া কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন না। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনার একাদশ বর্ষে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময় বিখ্যাত পর্তুগীজ যুবক হেনরী ডিভিয়ন ডিরোজিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে নিযুক্ত হন। ইনিই হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। তখনকার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ডিরোজিও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিজে অধ্যাপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেনঃ—(১) পোপ অনুদিত হোমরের ইলিয়ড ও অডেসি (২) ড্রাইডেনের ভার্জিল (৩) সেক্সপিয়রের একখানি বিয়োগান্ত নাটক (৪) মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট (৫) গে'র ফেবল্স (৬) গোল্ডস্মিথের গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস (৭) রাসেলের মডার্ণ ইউরোপ এবং (৮) রবার্টসনের পঞ্চম চার্লস।

ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাটিতে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি সম্মিলনী গঠিত হয়। এখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চা হইত। রামগোপাল এই সভাব উৎসাহী সভ্য ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এই সভার রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন এবং রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্রদেব, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ) প্রভৃতি শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন।

পাঠদ্দশাতেই রামগোপালের সহযোগিতায় রসিককৃষ্ণ "জ্ঞানান্বেষণ" নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন। পরে রামগোপাল স্বয়ং "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামে একখানি পত্র বাহির করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই কার্যে রামগোপালের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-প্রসঙ্গে ৪৯৪ পৃষ্ঠায় রামগোপালের সংবাদপত্র সেবার কথা আলোচিত হইয়াছে।

সতের বৎসর বয়সেই অর্থোপার্জনের জন্য রামগোপালকে লেখাপড়া ছাড়িতে হয়। প্রথমে তিনি মিঃ জোসেফ নামক ইহুদী ব্যবসায়ীর কার্যে যোগদান করেন। পরে জোসেফের সহিত মিঃ কেলসল নামে এক সাহেব যোগ দিলে রামগোপাল মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর জোসেফ ও কেলসলে বিচ্ছেদ ঘটিলে রামগোপাল কেলসল কোম্পানীর বেনিয়ন হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। ক্রমে তিনি উক্ত কোম্পানীর অংশীদার হন এবং কোম্পানীর নাম রাখা হয়—কেলসল ঘোষ এণ্ড কোং। পরে কেলসল কোং দেউলিয়া হইলে

রামগোপাল স্বয়ং আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর নামে স্বাধীন কারবার আরম্ভ করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটিলে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুরা তাঁহার বিষয় সম্পত্তি বেনামী করিয়া দিতে উপদেশ দেন; কিন্তু রামগোপাল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলেন—সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব, কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।

স্বদেশের বিষয়েও তিনি কখন উদাসীন ছিলেন না। তিনি নেটিভ বেনিভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসনের সভাপতি ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে বাঘাটি গ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। বেথুনের সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং শুনা যায়, তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী সরকার হইতে স্কুল-কলেজে সাহায্যের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তিনি স্বয়ং নানাস্থানে বৃত্তি, পুরস্কার প্রভৃতি সাহায্য করিতেন। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ চারিজন ছাত্রকে বিলাত পাঠাইবার সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত বিলাত হইতে আগত মিঃ জর্জ টমসন রাজনীতি আলোচনার জন্য ফৌজদারী বালাখানায় যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন, রামগোপাল তখন হইতে এই সভায় প্রবেশ করিয়া রাজনীতিক বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তদানীন্তন শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্র লিখিয়াছিলেনঃ—"এখন দুইদিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসাবে এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে।"

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর টাউনহলে এক সভায় তাঁহার স্মৃতি স্থাপনের জন্য রামগোপাল এক পূর্ণ মূর্তি গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন। তাহাতে কয়েকজন ইংরাজ আপত্তি করায়, তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এমন বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া যায়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বরের ইংরাজদিগের মুখপত্র স্বরূপ এক সংবাদপত্র রামগোপালের নাম দিলেন—"ইণ্ডিয়ান ডিমিস্থিনিস।" ইহা ব্যতিরেকে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনরায় মঞ্জুর করা উপলক্ষে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ উপলক্ষে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক নিমতলার শ্মশান ঘাট স্থানান্তরিত করিবার বিপক্ষে, তিনি বক্তৃতা করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কমিটিভুক্ত হন।

প্রায় ইলবার্ট বিলের অনুরূপ ইংরাজদিগকেও ফৌজদারী আদালতের দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্য ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ তাহাকে "ব্ল্যাক এ্যাক্ট" নাম দিয়া বিরোধী আন্দোলন করেন। ইহার সপক্ষে তখন একমাত্র রামগোপাল দণ্ডায়মান হন এবং "A few Remarks on certain Draft Acts commonly called Black Aets" নামে একখানি পুস্তক লেখেন। তাহাতে ইংরাজেরা রাগ করিয়া তাঁহাকে 'এগ্রি-হর্টিকালচার্ল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতির পদ হইতে খারিজ করেন। এই সভা শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী কর্তৃক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। রামগো সভা হইতে অপসৃত করার প্রতিবাদকল্পে মিঃ সিসিল বিডন (পরে স্যর এবং বঙ্গের

লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর হন) এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ঐ সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটলাটের সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

১২৭৪ সালের ৮ই মাঘ* (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী) এই মহাত্মা লোকান্তরিত হন। রামগোপালের দুই সংসার ছিল; কিন্তু জীবদ্দশাতেই তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান গতায়ুঃ হয়। মৃত্যুকালে তিনি তিন লক্ষ টাকার মধ্যে একলক্ষ স্ত্রী ও পোষ্যবর্গকে দশ হাজার ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর দেশীয় শাখায়, এবং চল্লিশ হাজার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া যান। তাহা ছাড়া তাঁহার বন্ধুগণকে তিনি ৪০ হাজার টাকা যে ঋণদান করিয়াছিলেন, তাহার কাগজপত্র পোড়াইয়া তিনি বন্ধুগণকে ঋণমুক্ত করেন।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার এবং বোম্বাইয়ের হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর ডিরেক্টর শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি তাঁহার আদি বাসস্থান মগরা থানার অন্তর্গত বাঘাটি গ্রামে তাঁহার স্বর্গত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। অধ্যবসায়, সততা, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা থাকিলে অতি নিম্ন স্থান হইতেও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করা যে সম্ভব তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হুগলী জেলার অন্যতম সুসন্তান কর্মবীর শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

॥ মাকালপুর ॥

মাকালপুর পোলবা থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বেলমুড়ি ষ্টেশনের দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে হরিপাল বা তারকেশ্বরের মধ্যে যে সকল বাস যাতায়াত করে, সেই বাসে করিয়াও গ্রামে যাওয়া যায়। বাসের রাস্তা হইতে গ্রামের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। এই এক মাইল রাস্তা ও বেলমুড়ি ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল রাস্তা এখনও কাঁচা থাকার দরুণ বর্ষাকালে মাকালপুরে যাতায়াতের একটু অসুবিধা আছে। মাকালপুর প্রাচীনকালে বাগদি জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। কিম্বদন্তী যে এই স্থানের বাগদিদের মাছের ব্যবসা ছিল এবং মাছের দেবতা হইতেছেন মাকাল ঠাকুর। তাহারা এই অঞ্চলে মাকাল পূজা করিত বলিয়া গ্রামের নাম মাকাল ঠাকুরের নামানুসারে মাকালপুর হইয়াছে। এখনও এই গ্রামে বহু বাগদি বাস করে।

ছত্রী সিংহরায় বংশের জন্যই মাকালপুরের প্রসিদ্ধি। মাকালপুরের সিংহরায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাই সিংহের প্রপিতামহ ভোলান সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঠেলান সিংহ চকদিঘীর সিংহরায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং এই প্রসিদ্ধ বংশ জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের পূর্বপুরুষ মুসলমানদের অত্যাচারে আউদ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। রাই

* বহু পুস্তকে তাঁহার মৃত্যু তারিখ "১২ই মাঘ" লেখা আছে, কিন্তু নিমতলা শ্মশানের স্মৃতিফলকে তাঁহার মৃত্যু ৮ই মাঘ খোদিত আছে বলিয়া উহাই আমরা গ্রহণ

সিংহের সময় হইতেই মাকালপুর প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে মাকালপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সমাজে প্রখ্যাত হন। তাঁহার সময়ের দুর্গাপূজার ঠাকুরদালানের সম্মুখভাগ এখনও ধূলিস্যাৎ হয় নাই। রাই সিংহের পুত্রের নাম দয়ারাম ও নাথু সিংহ। নাথু সিংহের পুত্র ঈশ্বর সিংহ। ঈশ্বর সিংহের বহু কীর্তি এখনও গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে **দ্বাদশ শিব মন্দির** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাণী রাসমণী প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে এই মন্দিরগুলি ১২২৮ সালে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ লিপি এইরূপঃ

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

শকাব্দ ১৭৪৩

সন ১২২৮ সাল

মন্দিরগুলির মধ্যে ছয়টি মন্দির ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কার করা হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। **ঈশ্বর সিংহ** ১১৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৫ সালে পরলোকগমন করেন। দাতা বলিয়া তিনি এই অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন এবং রাসযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে গ্রামে যাত্রা কবিগান প্রভৃতি আনন্দবিধায়ক অনুষ্ঠানাদি করিতেন। ঈশ্বর সিংহের পুত্র পরাণ সিংহ ও ছক্কনলাল সিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন বলিয়া উভয়ের কন্যা সর্বেশ্বরী দেবী ও শশীমুখী দেবী সম্পত্তির মালিক হন। হরিপাল থানার অন্তর্গত অলিপুর ইউনিয়নের মণিরামপুর গ্রামের বৈকুণ্ঠনাথ সিংহের সহিত সর্বেশ্বরীর ও হরিপাল থানার ভুরকুল গ্রামের উদয়চাঁদ সিংহের সহিত শশিমুখীর বিবাহ হয় এবং উভয় জামাতাই মাকালপুরে আসিয়া পরে বাস করেন।

সর্বেশ্বরীর বংশে হুগলী জেলা বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য শ্রীযামিনীকান্ত সিংহরায়, ভোলানাথ সিংহরায়, অচিন্ত্যকুমার সিংহরায়, আদিত্যকুমার সিংহরায় বর্তমান আছেন এবং কলিকাতায় তাঁহারা বাস করেন। তাঁহাদের বিরাট অট্টালিকা এখন খালি পড়িয়া আছে। পত্রপুষ্পশোভিত উদ্যান এখন লতাগুল্মের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। যামিনীবাবুর পিতা নিকুঞ্জবিহারী সিংহরায় প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। ১৩৫৪ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি যখন তাঁহার বাড়ির সামনে বাগানে বসিয়াছিলেন তখন চন্দনপুরে তাঁহার হিন্দু প্রজাদের উপর মুসলমানগণ আক্রমণ করিয়াছে এই কথা শুনিয়াই তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি যে স্থানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই স্থানটি ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে ও একখানি পাথরে এই কথাগুলি লেখা আছে ঃ

নিকুঞ্জবিহারী

জন্ম সন ১৩০৬ ১লা বৈশাখ

মৃত্যু সন ১৩৫৪ ২৬শে বৈশাখ

ত্যজিলে সংসার তুমি মৃত্যু আহবানে

রচিলে অন্তিম শয্যা এ পুণ্যস্থানে।

শশীমুখীর পুত্র জ্যোতিপ্রসাদের চারপুত্র মনোমোহন, সুধাকৃষ্ণ, অমরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র।

ইহাদের মধ্যে **মনোমোহন** এই অঞ্চলে খুব সুনাম অর্জন করেন। গ্রামে চাষের যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য তিনি খুব চেষ্টা করেন। "কৃষিপ্রসঙ্গ" নামে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে। তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য, ইম্পিরিয়্যাল কাউন্সিল অফ্ এ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চের সভ্য, ও প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ফ্লাউড কমিশন ও লিনলিথগো কমিশনে যে সকল বাঙ্গালী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তিনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জনসেবার পুরস্কারস্বরূপ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। তাঁহার এক পুত্র অজয়প্রতাপ জেলার বিখ্যাত শিকারী ও চিত্রাশিল্পী। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পদক ও পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার চিত্রশালায় যে সকল চিত্র আছে তাহার মধ্যে তাজমহল, মাউণ্ট এভারেস্ট, বাঘের মুখ ও ফুলের সাজি উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাসবিহারী সিংহরায় এই বংশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী।

সুধাকৃষ্ণের পুত্র অমরেন্দ্র ও বীরচাঁদ এবং অমরেন্দ্রের পুত্র দেবীপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ গ্রামে বাস করেন এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় এখন আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছেন। ব্রজেন্দ্রের পুত্র সলিলকুমার ও তাহার ছয় ভ্রাতা ইংলণ্ডে ব্যবসায়াদির জন্য তথায় বাস করেন। ইহাদের বিরাট অট্টালিকা ও অতিথিদের থাকিবার জন্য বহির্বাটি একটি দর্শনীয় বস্তু।

সিংহ পরিবারের কুলদেবতা শ্রীধরজীউর মন্দির নির্মাতার মৃত্যু হওয়ায় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বাৎসরিক দুর্গা পূজা, দৈনিক শিবপূজা ও শ্রীধরের পূজার জন্য হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে অবস্থিত দেবত্র সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক ১৯৭০্ টাকা সরকার হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ঠাকুরের পূজা নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

পুত্রের ধারায় মাকালপুরে দয়ারামের বংশেও অনেক কৃতি ব্যক্তি আছেন। তাহাদের মধ্যে এ্যাসিস্টেণ্ট ডিরেক্টর অফ্ হেলথ সার্ভিস ডাঃ শঙ্করীপ্রসাদ সিংহরায় ও কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট কালোবরণ সিংহরায়ের নাম উল্লেখ্য। ইহাদের পূর্বপুরুষদের অনেক কীর্তিও গ্রামে আছে। তন্মধ্যে নেত্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত **জোড়া শিবমন্দির** ও তাহার ভাই চিত্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত **পঞ্চরত্ন মন্দিরও** উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি "শকাব্দ ১৭২৩" সন ১২০৮ সালে নির্মিত বলিয়া পাথরে লেখা আছে। ইহাদের নারায়ণের মন্দির এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া শালগ্রাম বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

মাকালপুর গ্রামখানি ছোট হইলেও গ্রামের সমৃদ্ধি এক সময় কিরূপ ছিল, তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। গ্রামে পোষ্ট অফিস, সাধারণ পাঠাগার, হরিসভা, সিবনশিক্ষণ কেন্দ্র, জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং পোলবা থানার মধ্যে প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার (অস্থায়ী) একমাত্র এই গ্রামে আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৫৫৯ জন।

পূর্বে গ্রামে ঘোষ ও বসু বংশীয় কায়স্থগণের বাস ছিল। এখন তাহাদের কেহই গ্রামে নাই। গ্রামে ময়রাপুকুর, নাপিতডাঙ্গা প্রভৃতি নাম হইতে ইহাদেরও বাস ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এখন কয়েকঘর কলু ও বাগদি এবং ত্রিবেদী ও চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যজাতির বাস নাই। তবে আদিম বাসিন্দা বাগদিগণ এখনও গ্রামে আছে।

সিংহ বংশের লক্ষ্মীর কৌটায় একটি বহু পুরাতন সোনার মোহর ও দুইটি রূপার টাকা আছে। মোহরটি গুপ্তযুগের বলিয়া মনে হয়। স্বর্ণমুদ্রাটির ব্যাস ¾″ ইঞ্চি, ওজন

এক ভরি। মুদ্রাটির দুই দিকে দুইটি মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি দেখিয়া সম্ভবতঃ একটি শিবমূর্তি আর অন্যটি বিষ্ণুমূর্তি বলিয়া মনে হয়।

রৌপ্যমুদ্রা দুইটির ব্যাস এক ইঞ্চি এবং ওজন দেড় ভরি। দুইটি মুদ্রারই একদিকে রাম-লক্ষ্মণের বনগমন আর অন্য দিকে রামাভিষেকের চিত্র অংকিত আছে। একটি মুদ্রার তলায় "রাম লছমন জনক জাবালা হনমক্" এই কথাগুলি সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত আছে। ইহার নীচে একটি সাল লেখা ছিল, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে উহার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। রামের অভিষেক চিত্রটির নীচে মহাবীর হনুমান বসিয়া আছেন দেখা যায়।

মাকালপুরের পার্শ্ববর্তী **হাসনান** প্রাচীনকালে রাজা হংসধ্বজের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। পূর্বে গ্রামে নীলকুঠি ছিল। কুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৬০১ জন। অলিপুরও পূর্বে খুব বসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল। এই গ্রামের জনসংখ্যা ১,০৫৫ জন। হাসনান ও অলিপুর এই দুই গ্রামেই পোষ্ট-অফিস ও বিদ্যালয় আছে।

॥ বলাগড় ॥

হুগলী সদর মহকুমায় বলাগড় থানার অন্তর্গত ৮টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। উহাদের নাম গুপ্তিপাড়া, ধোপাপাড়া-বাকুলিয়া, সোমড়া, শ্রীপুর-বলাগড়, সিজে-কামালপুর, ডুমুরদহ-নিত্যানন্দপুর, একতারপুর ও মহীপালপুর। এই স্থান অক্ষাংশ ২৮° ৮´ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ২৮´ পূর্বে অবস্থিত।

বলাগড় এই থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম; কলিকাতা হইতে ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের জনসংখ্যা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭৬৩ জন ছিল দেখা যায়। চরে বহু প্রকারের শাক-সব্জীর ফসল এই স্থানে হয় বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। পূর্বে চন্দ্রা গ্রামে থানা ছিল, বর্তমানে এইস্থানে থানা হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্তী তেঁতুলিয়া গ্রামে একটি চিকিৎসালয় আছে। রেনেলের মানচিত্রে এইস্থান গঙ্গার ধারে বলিয়া অংকিত আছে, কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমানে এই স্থান গঙ্গা হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে বলাগড় ইউনিয়ন কমিটির প্রধান কার্যলয় ছিল ও উক্ত কমিটির কার্য ত্রিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এক সময় এইস্থানে বসবাস করিত। এইস্থানের রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ; এতদ্ব্যতীত একটি চণ্ডীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের ইষ্টকগুলি দুই ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া, সম্ভবতঃ ভগ্ন কোন প্রাচীন মন্দিরের মালমশলা লইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছিল। কাঠের 'পিলারে' বহু কারুকার্যও দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমুণ্ডী আসনযুক্ত এই চণ্ডী মন্দির বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জিরাট গ্রামে জন্মগ্রহণ কনের। কলিকাতার সুবিখ্যাত উচ্চবিদ্যালয় "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার উল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থের নাম গোলাপগুচ্ছ, শেফালিগুচ্ছ ও অশোকগুচ্ছ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ইহা ছাড়া কবি ও সাহিত্য-সমালোচক **মোহিতলাল মজুমদার** ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বপনপসারী, বিস্মরণী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও শ্রীমধুসূদন নামক সমালোচনা পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু

হয়। সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থানে নৌকা তৈয়ারী হয়। বলাগড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে মীরমদন জন্মগ্রহণ করেন উক্ত গ্রাম 'মীরডাঙ্গা' বলিয়া পরিচিত। বলাগড়ের বর্তমান জনসংখ্যা ৫৫৬ জন। গ্রামে পোষ্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। বলাগড় সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন ঃ

সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তফীর বাস
বড় পল্লী বলাগড়, বল্লালের দাস,

॥ সোমড়া ॥

বলাগড় থানার অন্তর্গত সোমড়া খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সোমড়ার বর্তমান জনসংখ্যা ১,০০৭ জন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সোমড়া গ্রামে নিয়মিতভাবে নরবলি হইতে দেখা গিয়াছে। এই গ্রামে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এখানকার **'রাধাগোবিন্দের'** মন্দিরে প্রতিদিন দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ এবং ৫০ জন ভিক্ষুককে নিয়মিতভাবে খাইতে দেওয়া হয়। এখানে একটি ইংরাজী স্কুল আছে। সোমড়া গ্রামে বহু বৈষ্ণব এবং বৈদ্য জাতর বাস। এ গ্রামে দুইটি টোল আছে। সেখানে ন্যায়শাস্ত্র পড়ানো হয়। জিরাটে ত্রিশটি গোঁসাই পরিবারের বাস। **সুদাম, রাধানাথ এবং স্বরূপ** এইতিনজন দুর্দান্ত নরঘাতক ডাকাত এই গ্রামের অধিবাসী। গোকুলগঞ্জ বাজার দেড়শ বৎসর আগে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গোকুল ঘোষ স্থাপন করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাসের জন্য একটি বাংলো তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে সোমড়া, শ্রীপুর, বলাগড়, ডুমুরদহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপঃ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম
সোমড়া শবিড়া বৈদ্যনিকরের ধাম,
ডাকাতে ডুমুরদহ, এবে ভয় নাই,
খালের উপর সেতু নবীন সরাই।

সোমড়ার **আনন্দ ভৈরবাণী মন্দির** বাঙ্গলাদেশে প্রাচীন শিল্পকলার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মন্দিরের গঠনপদ্ধতি নাগারার ভাস্কর্যের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের স্তম্ভগুলি হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ। কালী, বেণুগোপাল, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতির মূর্তি টেরাকোটায় অঙ্কিত আছে। এই মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা অজন্তা ও বাগের মূর্তিগুলির সমগোত্রীয় বলিয়া কথিত। মন্দিরে খোদিত কারুকার্য সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই মন্দির অচীরে সংরক্ষিত হওড়া প্রয়োজন।

সোমড়া গ্রাম প্রাচীনকালে গুপ্তিপাড়ার মঠের সম্পত্তি ছিল। গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে সোমড়া অবস্থিত। কিম্বদন্তী যে গুপ্তিপাড়ার রাজা বিশ্বেশ্বর রায় এই জমিদারী ঠাকুরের নামে দেবোত্তর করিয়া দেন। গুপ্তিপাড়া মঠের বিরাট কাছারীবাড়ি এখনও ভগ্নাবস্থায় সোমড়ায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের দেওয়ান রামশঙ্কর রায় ও **রায়রায়ণ রাজা রামচন্দ্র সেন** খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। মোগল আমলে রামচন্দ্র সেন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার গড়বেষ্টিত প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকা এই

গ্রামের দর্শনীয় বস্তু। তাঁহার বাড়ির ফটকে একটি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উল্লিখিত আছেঃ

Here Lived
Rai Raian Raja Ram Chand
(Dewan Bengal Behar and Orissa)

রাজা রামচন্দ্রের প্রাসাদ বর্তমানে ভগ্ন হইয়াছে। এখনও তাঁহার বংশধরগণ গ্রামে মহা-সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করেন। এই বংশের দুর্গাপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য যে দেবীর দশভুজা মূর্তির তিনটি হাত কেবল সামনে থাকে, বাকি সাতটি হাত পিছনে অদৃশ্য থাকে। এইরূপ ত্রিভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি হুগলী জেলায় আর কোথাও দেখা যায় না। রাজা রামচন্দ্র সোমড়া গ্রামে মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠের চণ্ডীমণ্ডপের অনুকরণে কারু-কার্যখচিত একটি সুন্দর চণ্ডীমণ্ডপ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বর্তমানে উহার কোন অস্তিত্ব নাই।

রামচন্দ্র সেন ১১৪৯ সালে সোমড়ায় আসিয়া প্রথম বসবাস করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীবিপিনমোহন সেন তাঁহার 'চাঁদরানী' নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

রামচন্দ্র সেন ১১৪৯ সালে বলরাম রায়ের বাটিতে আসিয়া উপনীত হয়েন এবং তথায় পরিখা পরিবেষ্টিত হর্ম্য নির্মাণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। উপযুক্ত আবাসবাটী নির্মাণ জন্য ব্যস্ত হইলে, জানিতে পারিলেন যে, এইস্থান গুপ্তপল্লীস্থ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত। ইহা শুনিয়া তিনি ঠাকুরের সেবায়েত দণ্ডী গোস্বামীর নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

এই গ্রামে রামশঙ্কর রায়ের ভবনও একসময় দ্রষ্টব্য ভবন বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহার গড়খাদবেষ্টিত বিরাট অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একাধিক মন্দিরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে **পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন** মন্দির দুইটি উল্লেখযোগ্য। নবরত্ন মন্দিরে জগদ্ধাত্রী মূর্তি আছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছেঃ

বাজি-দ্বিপ-ধরাধার সুতাশেষ সুতাননৈঃ
ভুবা পরিমিতে শাকে মন্দিরাং শঙ্করোহকরোৎ।

পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১১৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বঙ্গের আদি শ্রীশ্রীমহাবিদ্যা নামে খ্যাত। মন্দিরের ছাদ পিরামিডের ন্যায় দেখা যায়। এইরূপ মন্দির বাঙলার স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণও প্রাচীন বংশ। ইহাদের গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর নিত্য পূজা হয়। পিতলের মূর্তি রামশঙ্কর রায় প্রতিষ্ঠিত ত্রিভূজা সিংহবাহিনী মূর্তির অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। 'দেবগণের মর্তে আগমন' রচয়িতা **দুর্গাচরণ রায়** সোমড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

সোমড়া গ্রামের ষোলচালা জগদ্ধাত্রী মন্দির সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় [৫ অক্টোবর ১৯৬০] যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এইস্থানে উদ্ধারযোগ্যঃ

॥ সোমড়া গাঁয়ের অভিনব মন্দির স্থাপত্য ॥

সোমড়া ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার একটা গাঁ। বর্তমানে পূর্ব রেলপথের হাওড়া-ধুলিয়ান শাখার একটা রেল স্টেশন। স্টেশনে নেমে আপনি সোজা চলে যাবেন পাকা রাস্তা ধরে একেবারে গাঁয়ের ভিতরে; খানিকদূর যাবার পর হঠাৎ রুদ্ধ হবে আপনার গতি। চোখে পড়বে একটা বিরাট প্রাসাদতুল্য পাকাবাড়ীর ধ্বসাবশেষ। যদি ঢুকতে যান ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতরে চোখে পড়বে মর্মরফলকের একটা লেখাঃ

এখানে বাস করতেন রায় রায়ান রাজা রামচন্দ্র দেওয়ান বাংলা-বিহার।

ইংরাজীতে লেখা এই স্মৃতিফলক। এই শ্বেতপাথরের লেখাটি ও ইঁটের তৈরী বাড়ীর ভাঙা পাঁজরাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা-বিহারের দেওয়ান রাজা রামচন্দ্র রায় মশায়ের গৌরবময় অতীতের কথা। সাক্ষী হিসেবে বর্তমান রয়েছে ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ইটগুলো।

গাঁয়ের ভেতরে কাঁটা ও বন-জঙ্গলে ঢাকা ভাঙাচোরা অনেকগুলো ইটের তৈরী মন্দির রয়েছে। তন্মধ্যে যেটা ভালো ও অভিনব বলে বোধ হয় তা হচ্ছে ষোলচালাবিশিষ্ট জগদ্ধাত্রী দেবীর ও অষ্টকোণাকৃতি আট চালার মন্দিরটি। পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের মন্দিরগুলোর বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। তথাপি ষোলচালা ও আটচালার মন্দিরদ্বয় বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানের দাবি রাখে। পশ্চিম বাঙলায় আটচালা, বারোচালা ও ষোলচালার মন্দির চারচালার মতন সচরাচর বেশী চোখে পড়ে না। আবার যা পাওয়া যায় তাও জরাজীর্ণ অবস্থায়। মন্দিরটি বঙ্গের আদি শ্রীশ্রীমহাবিদ্যা নামে খ্যাত শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর মন্দির, দেওয়ান রায় রামশঙ্কর কর্তৃক ১১৭২ বঙ্গাব্দে স্থাপিত। মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রবিশিষ্ট। গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু এর অন্যতম আকর্ষণীয় হলো মন্দিরের পিরামিডাকৃতি ছাদ। দক্ষিণ-ভারতের পহ্লব মন্দির-স্থাপত্যের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। দূর থেকে দেখতে অনেকটা উল্টানো নৌকার তলার মতো। যদিও এটির মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্য রীতির ছাপ পড়েছে তবুও উড়িষ্যার পীরা ভদ্রদেউলের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি বাঙ্গালী শিল্পী। উড়িষ্যার ভদ্রদেউলের গণ্ডীর উপরিভাগকে এককথায় মস্তক বলা হয়। মিনারগুলির মস্তকের উপরে উড়িষ্যার দেউলস্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মন্দিরটা একটা চতুষ্কোণ ঘরের মতন দেখতে। দেওয়ালে না আছে কোন উৎকীর্ণ ভাস্কর্য, না আছে কোন কারুকার্য আছে শুধু চুন-বালির সাদা পলেস্তারা।

এখানকার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির হলো ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা আট-চালার মন্দিরটি। এরূপ ভাল অষ্ট কোণাকৃতি আটচালার মন্দির সাধারণত দেখা যায় না। অনুরূপ একটা জীর্ণ আটচালা মন্দির হুগলীর ইলছোবা-মণ্ডলাই গাঁয়ে আছে। মন্দিরের বাইরে থেকে সমগ্র মন্দির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিকট অনুরোধ তাঁরা যেন এটির সংরক্ষণের দায়িত্ব অচিরাৎ গ্রহণ করেন। পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরগুলো অধিকাংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিলো তা বোঝা যায় নবরত্নমন্দিরের খোদিত তারিখ (১৬৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ

শিক্ষার্থিগণ গুপ্তিপাড়ার চতুষ্পাঠীগুলিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তখন এই স্থানের যথেষ্ট সুনাম ছিল।

"শ্যামকল্পলতা"-প্রণেতা শোভাকরবংশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত-কবি মথুরেশ গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতসভার শিরোমণি গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রুতিধর পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা ও বাকপটুতা তৎকালে বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাকপটুতার নিদর্শন-স্বরূপ একটি ঘটনা ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২২৫ সালের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে উল্লেখ্যঃ

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন। তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সংকেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজ তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা, ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।"

গুপ্তিপাড়ার টোলগুলি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের "ক্যালকাটা মানথলি রেজিষ্ট্রার" নামক কাগজে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী হইতে সে-যুগে নদীয়া, শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়া কিরূপ সংস্কৃতশিক্ষার কেন্দ্র ছিল তাহা জানা যায়। সে-যুগে একজন সাহেব নদীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে "হিন্দু অক্সফোর্ড" বলেন।

গুপ্তিপাড়ার সাধারণ ব্যক্তিও তৎকালে পণ্ডিতগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া সঙ্গগুণে বহু শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। আজও গুপ্তিপাড়ার বালকগণ খেলার ছলে যে-সকল প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করে তাহা এইরূপঃ

১। "গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে
দেবের ভাষা মানুষ জানে।"

২। "বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত
আর্কফলার লম্বা বোঁটা নেড়া মাথা যত।"

৩। "বাদর শোভাকর মুদের ঘড়া
তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।"

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার "ট্রেভেলস অফ এ হিন্দু" নামক ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-বানরী আনাইয়া অর্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেন এবং তদুপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণ দ্বাদশ পাঠে শ্যামসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন; দ্বাদশ পাঠের মধ্যে চারটি পাঠ হুগলী জেলায় অবস্থিত। তাঁহাদের ভক্তগণ বঙ্গদেশে—

আর সতেরটি পাট-বাটি প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করেন। গুপ্তিপাড়ার সত্যানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবনচন্দ্রের, সেবা করিতেন এবং এই অঞ্চলে তাহার বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিল। এই সম্বন্ধে পাট-পর্যটনে লিখিত আছে :

"বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনপাড়াবাসী শ্রীরামাই ঠাকুর॥
গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি॥
জিরাটে মাধবাচার্য আর গঙ্গাদেবী।
যশড়াতে জগদীশ নিত্য বিনোদী॥"

॥ বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ॥

গুপ্তিপাড়াতে বহু দেবায়তন আছে, তন্মধ্যে "বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; ইহা "গুপ্তিপাড়ার মঠ" বলিয়া খ্যাত। সেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হয়। ইহার কারুকার্য অতি অপূর্ব। লাল ইট দিয়া নির্মিত মন্দিরগাত্রে গ্রথিত বহু দেব-দেবীর মূর্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি দৃশ্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। এই মন্দিরের চিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন যে, শান্তিপুরের পরপারে গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়ার লোকেরা স্বভাবতঃ বেশ চালাক। পূর্বে এই স্থানে বেশ রহস্য আলাপ হইত। মাতালেরা মদ খাইয়া এক্ষণে ঐরূপ করিয়া থাকে। গ্রামটি বানরের জন্য বিখ্যাত। বানরেরা বড় উপদ্রব করে এমন কি স্ত্রীলোকের কক্ষ হইতে জলের কলসী লইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। কোন লোককে 'তুমি কি গুপ্তিপাড়া হইতে আসিতেছ?' বলিলে বানর বলা হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গুপ্তিপাড়া হইতে একটি বানর লইয়া গিয়া অতি সমারোহে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বানরের বিবাহে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি হইতে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় কয়েকটি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহ বড় জাগ্রত। কেহ ইহার জমী, কি বাগান ও পুষ্করিণী ফাঁকি দিয়া লইয়া ভোগ করিলে নিবংশ হয়। বৃন্দাবনচন্দ্রের রথে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। এই গুপ্তিপাড়ায় বাণেশ্বর বিদ্যাল-[illegible] জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পিতার নাম পণ্ডিত রামদেব তর্কবাগীশ। ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাষদ ছিলেন। রাজা কলিকাতায় [illegible] বিদ্যালঙ্কারকে একটি বাড়ী কিনিয়া দেন। ইনি কলিকাতায় বসাক বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ যাওয়ায় রাজা কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন। ইহাতে বাণেশ্বর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমানে যান এবং তথাকার রাজা চিত্র সেন ইহাকে সাদরে নিজ সভায় পণ্ডিত করেন।

গুপ্তিপাড়ার মঠ দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের মঠ এবং তারকেশ্বরের মোহান্তের অধীন। সত্যানন্দ সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে আনিয়া

গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটী নামক বিজন অরণ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ঠাকুরের জন্য যাবতীয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। যে স্থানটিতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করেন—স্বভাব-সৌন্দর্যে সেই স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয় এবং এজন্য উহা "গুপ্তবৃন্দাবন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের ছাদ চালা-ঘরের ধরণে নির্মিত—সেই চালার উপরে আবার একটি ছোট থাক আছে; তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপিত। মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়াগুলি গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত শান্তিপুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বাগবাজার নিবাসী গঙ্গা-নারায়ণ সরকার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। শ্রীরাধিকার মূর্তি পরে মোহান্ত রামানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা বিশ্বেশ্বর রায় বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণে সোমড়া গ্রাম দেবোত্তর হিসাবে দান করেন। গুপ্তিপাড়া মঠের বিরাট কাছারীবাড়ি এখনও সোমড়ায় ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে। মঠের মোহান্তগণ পূর্বে এই কাছারী হইতে জমিদারী দেখাশুনা করিতেন।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা গুপ্তিপাড়ার অন্যতম প্রধান পর্ব; এইরূপ অত্যুচ্চ রথ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। একমাত্র পুরী ব্যতীত আর কোন রথ নাকি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে না। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এই স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। তখন গুপ্তিপাড়া একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। রেভারেণ্ড লং 'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং উক্ত স্থানের মেলা দেখিতে যাইবার সময় একখানি নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় পঁয়তাল্লিশ জন লোকের জীবন-নাশ হয়। উল্টোরথের আগের দিন দেবতার ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিবার পর পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেন এবং জনসাধারণ সেই প্রসাদ লুট করে। ইহাকে "ভাণ্ডার লুট" বলা হয়।

গুপ্তিপাড়ার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। এইরূপ কারুকার্য-খচিত মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। দিনাজপুরের কান্তজীউর মন্দির ও বাঁশ-বেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের গড়ন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উত্তরে গঙ্গার দিকে এই মন্দির অবস্থিত এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮২২ সনে এই মন্দির নির্মিত হয়। রামচন্দ্রের মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অপূর্ব কারুকার্য আছে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আর একটি জোড়ামন্দির আছে। ইহা 'জোড়-বাংলা' বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র ভারতে একমাত্র গুপ্তিপাড়া ব্যতীত দণ্ডীস্বামীদিগের সেবায় মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও হয় না। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। ইহা বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত।

এতদ্ব্যতীত সেন-পরিবারের জোড়াশিবমন্দিরও গুপ্তিপাড়ার দেবালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্দির ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে। রামধন সেন ইহার নির্মাতা।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" নির্মিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের ৫ই মাঘ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৩৫৭ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দিরের দারোদ্ঘাটন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রত্যহ হরিনাম-সঙ্কীর্তন, শাস্ত্রানুশীলন, নীতিশিক্ষা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্বামীজীর প্রিয় বিষয়সমূহের ধারা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও মন্দিরগাত্রে প্রস্তরফলক গ্রথিত আছে। প্রতরফলকের লিপি এইরকমঃ

॥ ওঁ হরি ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

গত শতাব্দীতে সনাতনধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা ও অদ্বিতীয় ধর্মবক্তা যিনি ভারত সন্তানগণের সুনীতিশিক্ষা দেশপ্রেম উদ্দীপনা ও স্বধর্মভাববৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন যাঁহার সুমধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইত যাঁহার কণ্ঠের ভাষা ঝঙ্কার ও হরিনামধ্বনি এখনও ভারতগগনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে যিনি শ্রীমদ্ভগবতগীতার সারগর্ভ ব্যাখ্যা এবং নীতিধর্ম জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ও হৃদয়াকর্ষিণী সুললিত সাধন সঙ্গীতাবলী সকলকে আস্বাদন করাইয়া বরণীয় হইয়াছেন সেই মহাপুরুষ গুপ্তিপাড়ার এই প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হন।

আবির্ভাব—ঝুলন দ্বাদশী ১৭ই শ্রাবণ ১২৫৬ বঙ্গাব্দ

কাশীধামে তিরোভাব—৩রা আশ্বিন ১৩০৯ সাল

তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ও উপদেশামৃত রক্ষার জন্য সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলীতে এই শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। ৫ই মাঘ ১৩৫৭ সাল

অদ্বিতীয় ধর্মবক্তা ও প্রচারক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা বিশেষ আনন্দের বিষয়। উক্ত হরিমন্দিরে তাঁহার পূর্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্তী-কালে [illegible] স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ মহাশয়ের মূর্তি তাঁহার অগ্রজের পার্শ্বে রক্ষিত হইলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে সর্বতোভাবে সকল কার্যে সহায়তা করেন এবং বেদান্তবিজ্ঞান, দেবী-জীবন, জীবনযজ্ঞ, সাধনশিক্ষা সোপান, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল লীলা, উপনিষদ পঞ্চক প্রভৃতি বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কবি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বিদ্যালঙ্কার

চিরঞ্জীবের ছাত্রজীবন কাশীতে অতিবাহিত হয়। চিরঞ্জীব কাশীর প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বুদ্ধদেব ন্যায়ালঙ্কার (১৬৫০ খৃঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন শেষ করিয়া কাশীতেই বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সম্ভবতঃ চিরঞ্জীব বারাণসীতে মীর্জা রাজা জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে

সংযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি স্থানীয় রাজন্যগণের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে গোঁড়া রাজা কৃপারামের পৌত্র ও গোবর্ধনের পুত্র যশবন্ত সিংহের (যশোবন্ত সিংহ নন) নাম পাওয়া যায়। চিরঞ্জীব যশবন্ত সিংহের হিতার্থে "বৃত্তরত্নাবলী" নামে ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থরচনা করেন।

চিরঞ্জীব অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন ঐ গ্রন্থগুলি সর্বভারতে সমাদর লাভ করে। কিন্তু দুঃখের কথা, তাঁহার সকল গ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী" "মাধবচম্পু" "বৃত্তরত্নাবলী" ও "কাব্যবিলাস" এই চারখানি মাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চিরঞ্জীবের "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী" বাংলা অনুবাদ সমেত ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। "মাধবচম্পু" তাঁর বাল্যকালের রচনা এই গ্রন্থ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'সত্যব্রত সমাশ্রয়ী মহাশয়ের "প্রত্নকর্মনন্দিনী"তে প্রকাশিত হয়। "বৃত্তরত্নাবলী" ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে "ছন্দোমঞ্জরী" গ্রন্থের সঙ্গে একত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। "তাজিকরত্ন" নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে একজন চিরঞ্জীবের নাম পাওয়া যায়। এই পুঁথির একখন্ড সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক চিরঞ্জীবই আমাদের কবি চিরঞ্জীব কি-না, সে বিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে চিরঞ্জীবের পিতামহ একজন প্রসিদ্ধ সামুদিকাচার্য ছিলেন, কাজেই চিরঞ্জীবের পক্ষে জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা কিছু অসম্ভব নয়।

চিরঞ্জীবের বংশের শেষ পুরুষ গুপ্তিপাড়া নিবাসী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (শোভাকর বংশীয় হেমচন্দ্র নন)। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর চিরঞ্জীবের বংশ লোপ পায়। চিরঞ্জীব "শৃঙ্গারতটিনী"র "হৃদয়কল্পলতা" ও "শিবস্তোত্র" এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে এবং একদা ভারতখ্যাত এই কবি ও মনীষি সম্বন্ধে আলোচনারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য "সঙ্গীতসাধক কালী মির্জা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

সঙ্গীতসাধক কালী মির্জা

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালী মির্জার নাম নিধুবাবু, হরুঠাকুর প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালী মির্জা উচ্চস্তরের কবি এবং সঙ্গীতসাধক। কবি হিসাবে কালী মির্জা বহুক্ষেত্রে অলঙ্কার শাস্ত্রসিদ্ধ কবিত্ব অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ সমাসোক্তি, যমক, রূপক উৎপ্রেক্ষা, উপমা, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারে তাঁর কবিতাকে ভূষিত করেছেন, তিনি যে যুগের কবি, সে যুগের কবিধর্ম পালন করেছেন। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও (এই ভাবের গানের সংখ্যা অল্প) তাঁর অধিকাংশ গানগুলি রচনাপারিপাট্য। প্রাঞ্জলতা ও স্বভাব-কবিত্বের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। রাগ-রাগিনী ও তালের বিশুদ্ধতা তাঁর গানগুলিকে বাংলার সঙ্গীতভান্ডারের অমূল্যসম্পদ পরিগণিত করেছেঃ

আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্ভুক্ত গুপ্তিপাড়া মহাগ্রামে কালী মির্জা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রামের দুই পুত্র—কালিদাস ও রঘুনাথ। বিজয়রামের বংশে বর্তমানে রঘুনাথের দৌহিত্রপুত্রগণ জীবিত আছেন। বাল্যকালে কালিদাস মেধাবী ছিলেন।

তিনি গুপ্তিপাড়াস্থ রামনিধি ভট্টাচার্যের টোলে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের পাঠ আরম্ভ করেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্যের কূটার্থ আবিষ্কার এই ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগের ব্যাপার ছিল। প্রবাদ যে—কোন এক সময় উনানে ভাত বসিয়ে অধ্যাপক মহাশয় কূটার্থের সিদ্ধান্ত নিরূপণে মগ্ন ছিলেন, সিদ্ধান্ত নিরূপণান্তে দেখেন হাঁড়ির ভাত মাত্রাতিরিক্ত সিদ্ধ হ'য়ে পক্কান্নের মত একটি দলায় পরিণত হয়েছে।

সেই পর্যন্ত রামনিধি ভট্টাচার্য বংশানুক্রমে "পক্কান্ন" এই মৌখিক উপাধিলাভ করেন। যাই হোক, এই 'পক্কান্ন' ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের পাঠ শেষ করে কালিদাস ১৯/২০ বৎসর বয়সে একখানা যাত্রীর নৌকায় 'কাশীধাম চলে যান—উদ্দেশ্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা। কাশীধামে কালিদাস বেদান্তদর্শন শিক্ষা করেন। এখানেই তাঁর সংগীতবিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ। তারপর কালিদাস লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে কিছুকাল সংগীত-শাস্ত্রের অনুশীলন করে উচ্চাংগ সংগীতে পারদর্শী হ'ন। এই সময় পারশী ও উর্দ্দু ভাষাতেও দক্ষ হ'ন। দীর্ঘদিন পশ্চিমাঞ্চলে থাকার জন্য এবং পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় দখলের জন্য ও হিন্দুস্থানী বেশভূষার জন্য কালী মির্জা বলে পরিচিত হ'ন।

প্রায় বার বৎসর পরে কালিদাস গুপ্তিপাড়ায় ফিরে আসেন এবং এক রূপবতী ধর্মপরায়ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করে সংসারী হ'ন। গুপ্তিপাড়া হ'তে তিনি বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপচাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি না হওয়ায় তিনি বর্ধমান ত্যাগ করে কলিকাতায় আসেন ও গোপীমোহন ঠাকুরের সভাসদ হ'ন। প্রতাপচাঁদ কালিদাসকে বিশেষ স্নেহ করতেন, তাঁর অজ্ঞাতবাসের পূর্ব পর্যন্ত মাসিক ১৫৲ টাকা করে বৃত্তি তিনি কালিদাসকে পাঠাইতেন। তাঁহার একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা।
দক্ষিণে কালিতে কৃষ্ণে ভেদ করো না॥
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভূজ মুরলীধারী লোলরসনা।
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শশীভালী,
মকরাকৃতি কুন্তল, কভু শব শিশুবালি,
কমলাক্ষ নিত্রয়না যোগাসন শবাসনা।
দেখি এই কৃষ্ণকালী করি মননা॥

কালিদাস গৌরবর্ণ ও কিছু রোগা ছিলেন। কিন্তু আকৃতিতে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও বিশাল বক্ষ ছিলেন। মুখমণ্ডল ঈষৎ দীর্ঘ (আমের মত), নাসা দীর্ঘ, ক্ষীণ ও উন্নত ছিল। ভ্রূযুগল নিবিড় ও আয়ত, চক্ষু ঈষৎ লোহিত, ললাট উচ্চ ও সুপ্রশস্ত ছিল। তাঁহার কেশকলাপ ঘন কুঞ্চিত ও পিছনদিকে প্রলম্বিত ছিল।

কালিদাস প্রায় সত্তর বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। শেষ জীবন তিনি কাশীবাসে কালিদাসের গানগুলির প্রত্যেকটিই অমূল্য। কতকগুলি গান "বংগবাসী" প্রকাশিত একখানি স্বরচিত সংগীত গোপীমোহন ঠাকুরের গান করে শোনান। কথিত আছে—গানে গভীরভাবে সন্তুষ্ট হয়ে গোপীমোহন ঠাকুর কালিদাসকে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করে তাঁর কাশীধাম যাবার উপায় ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উপায় করে দেন। কাশী যাত্রার আগে কালিদাসের স্ত্রীবিয়োগ ও সন্তানসন্ততির মৃত্যু হয়। দেশে কনিষ্ঠ রঘুনাথের পরিবারবর্গ রেখে ঠাকুরদাস নামে একজন জ্ঞাতিকে সংগে করে কালিদাস কাশীবাসী হ'ন। ১৮২০ সালে 'কাশীধামে কালিদাস দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি কাশীর কোন এক

ধার্মিক মাড়োয়ারীর কাছে ছ'হাজার টাকা গচ্ছিত রেখে যান, ঐ টাকা মৃত্যুর পর কালিদাসের ভ্রাতৃবধূ পান এবং কালিদাসের শেষ অভিপ্রায় মত ঐ টাকায় পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করেন।

কালী মির্জার গানগুলি "সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুমে" প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম সন ১২৫২ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থে প্রকাশিত কালিদাসের গানগুলি প্রত্যেকটিই অমূল্য। কতকগুলি গান বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট হয়। এই গ্রন্থও এখন পাওয়া যায় না। হুগলী জেলার এই সঙ্গীতসাধকের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা এবং তাঁর সঙ্গীতাবলী প্রকাশিত করা একান্ত প্রয়োজন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' গ্রন্থে কালী মিজার নাম কালিদাস মুখোপাধ্যায় লেখা আছে, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন। কালিদাস বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের শিষ্য ছিলেন।

॥ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ॥

কথিত আছে যে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিদায় দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালে ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা ছিলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদ দরবারে কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! হিন্দুদিগের ন্যায় আমিও মাতামহের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিব। তোমরা সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া যেরূপে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ কর, আমিও সেইরূপ করিব। অতএব এক মাসের মধ্যেই শ্লোক লিখিয়া আমার দরবারে আসিবে, এবং কত টাকা খরচ পড়িবে তাহাও বলিবে।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র "যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা!" বলিয়া চলিয়া আসিলেন, গুপ্তিপাড়া নিবাসী 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই নিম্নলিখিত শ্লোকটি আলীবর্দীর শ্রাদ্ধে পণ্ডিত বিদায়ের জন্য রচনা করেন। শ্লোকটি উল্লেখ্য ঃ

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়। আলীবন্দীনবাবো বিবিধ গুণযুতোহল্লা মুখঃ পশ্চিমাস্যঃ। অর্ত্যং দেহং জহৌ স্বং মুনসর মুলুকঃ সীরাজদ্দৌলনামা। যাচেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনো শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্॥

আলীবন্দী খাঁ নবাব বাঙ্গলার পতি,
মহা গুণবান্ বলি' ছিল তার খ্যাতি,
খোদার শ্রীপাদ-পদ্মে মন স'পে দিয়া
পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া
'আল্লা' 'আল্লা' পুণ্য নাম বলিতে বলিতে
দেহত্যাগ করেছেন তিনি বিধিমতে।

শ্রাদ্ধের সময় তার উপস্থিত প্রায়
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে করিব বিদায়,
তিনি মাতামহ,—আমি দৌহিত্র সিরাজ
গল-লগ্নী কৃত বাসে এই ভিক্ষা আজ,
কৃপা করি মোর গৃহে করি' পদার্পণ
শুদ্ধ করি' দাও মোরে হে ব্রাহ্মণগণ!*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কালনার একটু দক্ষিণে গঙ্গার

---

* বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হুগলী জেলার ভদ্রকালী নিবাসী পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর মহাশয় করিয়াছেন।

ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড়ই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়ই রসিক ছিলেন। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলো, এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বাঙ্গলাদেশকে অনেকদিন সজাগ রাখিয়াছিলেন। শান্তিপুরের লোক গুপ্তিপাড়ার লোককে বাঁদর বলিত গুপ্তিপাড়ার লোক উলো শান্তিপুরের লোককে পাগল বলিত। তাহা লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলিত।

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ী শ্রেণীর বড় বড় কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়. সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেইগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড় বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কালনা হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক-একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এদিক-ওদিক করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ নানা রকম। সে সব পুরাণ কাশ্যন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এইরূপে ছত্রিশটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়।

শোভাকর ২/৩ দিন দেবীবরের কার্যকলাপ দেখিয়া একদিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবীবর! আমার কি কুল হইল? তাহাতে দেবীবর উত্তর করিলেন,—

ডাক দিয়ে কয় দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর।

শোভাকর বলিলেন,— ডাক দিয়ে কয় শোভাকর।
নির্বংশ দেবীবর॥

শোভাকরের কুল হইল না বটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে বাঙ্গালায় খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল। শোভাকরের বংশ আয়দার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বংশে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের জন্ম।

আয়দা হইতে গুপ্তিপাড়া বেশী দূর নয়। সেখানে শোভাকরের বংশ থাকা বিচিত্র নয়। গুপ্তিপাড়া একটি গণ্ডগ্রাম। সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে এক ঠাকুর আছেন। তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি। একজন সন্ন্যাসী সেই সম্পত্তির মালিক সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বার মাসে তের পার্বণ হয়। রথে বেশ জাঁক হয়। রামসীতারও একটি মন্দির আছে। মন্দিরের কিছু সম্পত্তি আছে। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে ছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে ৫/৭ খানা পত্র প্রায় দিতে হইত। একখানি মাত্র পত্র দিতে হইলে একজন বড় নৈয়ায়িককে দিতে হইত; তাঁহাকে একপত্রী বলিত।

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাঁহাকে

সিংহের মত বলিয়া মনে হইত; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তাঁহার খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্র ও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যার যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

দীনবন্ধু মিত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধার করি:

গুপ্তিপাড়া অহঙ্কার অমূল্যভূষণ,
বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
"বানুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে।"
ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইল পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

॥ মাণিক্যচন্দ্র ॥

চিত্রসেন রাজার মাণিক্যচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন; তাঁহার বাড়ীও গুপ্তিপাড়ার ছিল। কারণ, প্রেম-ভক্তি দেবী যখন চিত্রসেন রাজাকে স্বপ্নে নানা তীর্থ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি গুপ্তিপাড়ার উপর হইতে মাণিক্যচন্দ্র ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,—তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিও। বড় রাজার দেওয়ান হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক মাণিক্যচন্দ্রের সে সকলই ছিল। বাণেশ্বর বলিয়াছেন তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যখন ধনু হইতে বাণ ছাড়িতেন অথবা তরবারি চালাইতেন, তখন শত্রুর মুণ্ডে পৃথিবী ছাইয়া যাইত। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান—ইঁহাদের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তিনি দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। বর্ধমান রাজের প্রকাণ্ড জমিদারী তিনি নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারিতেন। তিনি যাহার উপর সুনজর করিতেন, সে অট্টালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে হাতী বাঁধা থাকিত। একজন কবি তাহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

রে বিদ্যা বিবিধাঃ কলাশ্চঃ সঙ্গীতনৃত্যাদয়ো
রে বৈদগ্ধ্যবিলাস দেবি কবিতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ।
ব্রূত ব্রূত কথং কুতঃ ক্ব নু ভবেদ্বিশ্রান্তিলেশোঽদ্য বঃ
শ্রীমান্ বিজ্ঞশিরোমনিঃ ক্ষিতিতলে মাণিক্যচন্দ্রো নচেৎ॥ *

* আলীপুর বেলভেডিয়ারে মাণিক্যচন্দ্রের যে স্থানে বাড়ি ছিল তথায় পরবর্তীকালে বড়লাটের জন্য ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ঐ ভবনে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে গুপ্তিপাড়া সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্টোভোরিনাসের মানচিত্রে গুপ্তিপাড়া গঙ্গার পূর্বদিকে ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় নবদ্বীপের ন্যায় এই স্থান গঙ্গার পশ্চিম দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চোর-ডাকাত এবং বাঁদরের জন্য এই স্থান প্রাচীনকালে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই স্থানে ১৫টি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য টোল ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা এই স্থানে খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইত এবং দেশদেশান্তর হইতে উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলায় বহু যাত্রী সমাগত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। অদ্যাপি উক্ত অনুষ্ঠানাদি হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য দর্শন শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" রচনা করিয়া ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হন।* ১২৩২ সালে রাধা-মোহন সেন উক্ত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উহার সংস্কৃত শ্লোক সমন্বিত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিনী নামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তপল্লী নিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য তাহার ঐ অনুবাদ অতি উত্তম নৈপুন্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব অনুবদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।"

রাধামোহন সেন উক্ত গ্রন্থের যে অনুবাদ করেন, নিম্নে তাহার নিদর্শন প্রদত্ত হইলঃ

একদিন ভূপতি বিক্রমসেন রায়।
পাত্র মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায়॥
হেনকালে স্বসজ্জায় হইয়া মণ্ডিত।
ক্রমে উপস্থিত হৈলা বিবিধ পণ্ডিত॥
প্রথমতঃ পরম বৈষ্ণব একজন।
সভামধ্যে আসিয়া দিলেন দরশন॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ সভ্য কোনজন।
রাজাকে শুনান ক্রমে সবার বর্ণন॥

সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রভূমি গুপ্তিপাড়ায় একসময় অসংখ্য টোল ছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু কালক্রমে সমস্ত টোল উঠিয়া যায়। বিগত ৩ বৈশাখ ১৩৬৯ সালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দিরে "শ্রীকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ" নামে একটি চতুষ্পাঠী শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে মহিলাদের সংস্কৃত অধ্যয়নের ব্যবস্থা

* এই পুস্তকখানি গুপ্তিপাড়া শিশির বাণীমন্দির পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

আছে এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কুমারী শীলা সেন ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চন্ডীকাব্যে গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

বাহ বাহ বল্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।
বাম ভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥

কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে কুলীন কন্যাদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপঃ

গুপ্তিপাড়া গন্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে।
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
"ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে।"
যে কন্যা কুমারীভাবে চিরদিন রয়,
কুলীন-মহলে তারে "ঠ্যাকা-মেয়ে" কয়।
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দয় নীচ পামর কুলীন,
আপন ভবনে বসি ভাবনা বিহীন।
অশন-বসন-হীনা দীনা দারাদল
পিতৃগৃহে কাঙ্গালিনী চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃজায়া ভালমুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা, কভু দাসী হয়।
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয়?

গুপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিত, বাঁদর এবং চোর ডাকাতের জন্য প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। সমগ্র বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিশহরের তেঁদড়" অর্থাৎ উলায় বহু পাগল, গুপ্তিপাড়ার বানর ও হনুমান ও হালিশহর মাতালের জন্য বিখ্যাত। গুপ্তিপাড়ায় বহু ও বাঁদরের জন্য বিদ্রূপ করিয়া এই স্থানের লোকদিগকে "গুপ্তিপাড়ার বাঁদর" বলিয়া অদ্যাপি পরিহাস করিয়া থাকে।

As Guptipara is noted for its monkey, Halishahar for its drunkards so is Ulla for fools, as one man said to become a fool every year at the mela. (The banks of the Bhagirathi by Rev. J. Long)

সার্বজনীন পুজা আজ বঙ্গদেশে প্রচলিত; কিন্তু সর্বপ্রথম এই সার্বজনীন বা বারোয়ারী পুজা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়া হইতে প্রথম সুরু হয়। এই সম্বন্ধে

১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' On the Present Celebration of the Hindoo Poojas শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল

"A new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years called Barowaree About thirty years ago at Gooptipara near Santipoora, a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges a number of Brahmins formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscription in all sorrounding villages. Finding their collections idadequate they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many according to current report, have never returned. Having thus obtained about 700 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such splendor, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindoo ritual, but beyond this the whole was formed on a plan not recognised by the shastrs. They obtained the most exeellent simgers to be found in Bengal, entertained every Brahmin who arrived and spent the week in all the intoxication of festivity and enjoyment. On the successful termination of the scheme, they determined to render the Pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity."

গুপ্তিপাড়া গ্রাম বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার জন্য, স্থানীয় লোকের রসাভাষ এবং সর্ববিষয়ে উৎসাহী ও কৃতী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখানকার পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন।

গোপাল ভাঁড় ও আশানন্দ ঢেঁকি এই স্থানে বিবাহ করেন বলিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্থানের গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীকে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন।

'তীর্থমঙ্গলে' বিজয়রাম সেন লিখিয়াছেন :

"গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণের কি করিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত॥"

গুপ্তিপাড়া গ্রাম বানরের জন্য কুখ্যাত। এ গ্রামের বানরেরা যেমন আকারে বড়, তেমনি উৎপীড়নে দক্ষ, সময় সময় মহিলাদের জলের কলসী পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। সে সময়ে লোকে গুপ্তিপাড়ার লোকজনকে গুপ্তিপাড়ার 'বাঁদর' বলিয়া পরিহাস করিত। কথিত আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে এক বাঁদর আনিয়া কৃষ্ণনগরে সেই বাঁদরের বিবাহ দেন। সেই বাঁদরের বিবাহোপলক্ষ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিবাহে নদীয়া, উলা ও শান্তিপুরের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গঙ্গার পূর্ব তীরের গ্রামগুলিতে বাঁদর ও হনুমান উভয় শ্রেণীর বান্দর বংশীয়দেরই দেখা যাইত। বিষ্ণুপুরের রাজা বাঁদরের উৎপাতে খাদ্য দ্রব্যাদি নিরাপদে রক্ষা করিতে না পারিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একদল সিপাহী নিযুক্ত করেন। স্টাভোরিনাস তাঁহার

বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে—গুপ্তিপাড়ার জঙ্গলে ভাবাকৃতির বহু বাঁদর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

॥ ভাণ্ডার লুট ॥

গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ মঠের মোহন্ত মহারাজের পরিচালনায় গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ ভাণ্ডারলুঠ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব যথারীতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ভাণ্ডারলুঠ উৎসবটির বিশেষত্ব—এই উৎসব পশ্চিমবাংলার অন্যত্র দেখা যায় না। গুণ্ডিচা বাড়ীতে বিশ্রামরত জগন্নাথদেবের ভোগগৃহ পুনর্যাত্রার পূর্বদিন গোপ সম্প্রদায়ের জনগণ কর্তৃক বলপূর্বক লুণ্ঠন—ইহাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই উৎসবে প্রায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী নরনারীর সমাগম হয়। ইহা কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান নয়, লোকানুষ্ঠান।

আশানন্দ ঢেঁকি গুপ্তিপাড়ায় বিবাহ করিয়া এই স্থানের বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহের বাড়ীতে গোমস্তাগিরি চাকুরী করিতেন। তাঁহার ন্যায় বলবান ব্যক্তি তৎকালে খুবই অল্প ছিল; একদিন তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের কয়েকশত টাকা লইয়া হুগলী হইতে গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমন কালে ডুমুরদহের দীঘির ধারে বসিয়া ফলার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, দুইজন লাঠিয়াল দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দাঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলে যে ডুমুরদহে কিসের ভয় তাহা কি জান না? আশানন্দ তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদের হাত হইতে লাঠিগুলি কাড়িয়া লন এবং তাহাদিগকে দুই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় লইয়া আসেন। তাহার বগলের চাপে লাঠিয়ালদ্বয় অচৈতন্য হইয়া পড়ে; পরে মুখে জলের ছিটা দিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করা হয়।

ডুমুরদহে বিশ্বনাথবাবু আশানন্দের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া তাহাকেও ডাকাতের দল-ভুক্ত করিয়া লন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। ইহারা অগ্রে সংবাদ দিয়া শিবিকারোহণে ডাকাতি করিতে যাইতেন। বিশ্বনাথবাবু 'বিশে ডাকাত' বলিয়া আজও প্রসিদ্ধ আছেন।

গুপ্তিপাড়ায় রাধাবল্লভ জাগ্রত দেবতা; কারুকার্যখচিত সুবৃহৎ মন্দির এই অঞ্চলে প্রধান দ্রষ্টব্য এবং স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। মন্দির প্রতিষ্ঠাতার পুত্রগণ অতিথি অভ্যাগতের পানাহারের সুব্যবস্থা জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে অদ্যাপি অতিথিসেবা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

॥ ভোলা ময়রা ॥

বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলানাথ মোদকের (ভোলা ময়রা) আদি নিবাস গুপ্তিপাড়া; তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল মোদক। রামগোপালের বাগবাজারে একখানি খাবারের দোকান ছিল এবং এই স্থানে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ভোলানাথের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে—তাহাদের নাম চিন্তামণি, চন্দ্রনাথ, রসিকলাল ও মাধবচন্দ্র। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণের কোন সন্তানাদি হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভোলনাথের পুত্র হয়। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে রায় সাহেব দিবাকর দে এবং ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দে এম-বি মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বাগবাজারের রসগোল্লার আবিষ্কারক স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশ (নবীন ময়রা) তাঁহার নাৎ-জামাই হইতেন।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "কবি পাঁচালী ও বুলবুলীর লড়াই" তৎকালে ধনীগণের মধ্যে প্রধান আমোদের সামগ্রী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতা সহরে হরু ঠাকুর, ও তাঁহার প্রধান চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল দলে প্রায় এক এক জন দ্রুত কবি থাকিত। ইহাদের নাম সরকার বা 'বাঁধনদার'। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি গান বাঁধিয়া দিত।

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ভোলানাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অল্প বয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে মহারাজাকে তিনি প্রীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভোলানাথ স্বয়ং সুকবি এবং তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অদ্ভুত ছিল; বিশেষ করিয়া গালাগালির গান বাঁধিতে তাঁহার ন্যায় কেহই দক্ষ ছিল না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম-প্যাঁচার লেখকের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

ভোলানাথ কিরূপ সংহত ও তীব্র ভাবে গালাগালি দিতেন তাহার একটি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দে-উদ্ভটসাগর লিখিত ভোলা-ময়রা নামক প্রবন্ধ হইতে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে ভোলানাথ কবিগান করিতে গিয়াছেন। তাঁহার বিপক্ষে ছিল কবিওয়ালা রাম বসুর রক্ষিতা যজ্ঞেশ্বরী; তিনি মহিলা হইলেও রাম বসুর ন্যায় সুকবি ছিলেন এবং তাহারও একটি কবির দল ছিল। আসরে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন যে, অদ্যকার আসরে ভোলানাথের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য তিনি সর্বাগ্রে প্রকাশ্য ভাবে কহিলেন "ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা"। যজ্ঞেশ্বরীর এইরূপ বলিবার অর্থ যে, তাহা হইলে ভোলানাথ আর তাহাকে বিশেষ গালাগালি দিতে পারিবে না। যাহা হউক ভোলানাথ পুত্র সাজিয়াও কিরূপ কৌশলে শাস্ত্র রক্ষা করিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে তীব্রভাবে গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত ও তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। ভোলানাথ আসরে গিয়াই পুলকিত কণ্ঠে গান ধরিলেনঃ

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্বকার্যে শুভকরি
তোমার ঐ পুরানো এ'ড়ে রাম বোস বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে খাপ॥
এখন মা! সুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক॥

তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা* শাস্ত্রে শুনতে পাই,
তুমি আমার গাভীমাতা, তোমায় ধরাতে যাই॥

স্বর্গীয় বিজয়রাম সেন ১১৭৭ সালে তীর্থ-মঙ্গল রচনা করেন; তিনি যখন গুপ্তিপাড়া আসেন, তখন গুপ্তিপাড়ার মঠে প্রত্যহ দশমহাবিদ্যার পূজা হইত। কিন্তু এখন এই পূজা বন্ধ হইয়াছে। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"সেই দিন বলাগড়ি মোকাম করিয়া।
সোমড়া বামেতে রাখি দিনেক বাহিয়া॥
পাম্বাগ্রাম বামে রাখি করিলা গমন।
গুপ্তিপাড়ায় আনি নৌকা দিল দরশন॥
দশমহাবিদ্যা আর রামলক্ষণ সীতা।
রামশঙ্কর রায় কৈলা অপূর্ব নির্মিতা॥
বৃন্দাবনচন্দ্র আছেন দেবের নির্মাণ।
তথাকারে মহাশয় করিলা প্রস্থান॥"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের সেবায়েৎ শ্রীমদ কৃষ্ণানন্দের বিরুদ্ধে নারী হরণ, নৌকায় দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাচারের জন্য হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ সাহেব তাঁহাকে মোহান্তের গদি হইতে অপসারিত করিয়া তিন মাস কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সম্বন্ধে ১২৪২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ" যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহাদের সদুপায় দর্পণ দ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কয়েক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মানদান করিবেন। জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি মোকাম গুমিপাড়ায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাঁহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীকৃষ্ণানন্দ নামে একজন দন্ডী ছিলেন তিনি প্রজাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজাসকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণণে বর্ণাভাব। যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতি ধার্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দন্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার

* **পঞ্চপিতা**—অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, উপনয়নকর্তা ও জন্মদাতা পঞ্চপিতা।
"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
উপনেতা জনয়িতা পঞ্চৈত পিতরঃ স্মৃতা॥"
সপ্তমাতা—গর্ভধারিণী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজপত্নী, গবী, ধাত্রী ও পৃথিবী।
"আত্মম তা গুরোপত্নী ব্রাহ্মণী রাজ পত্নীকা।
গবী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতা॥"

কর্ণগোচর হইবার তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। তৃতীয়তঃ দুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল।

সম্প্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবরা তজবিজ করিয়া ঐ গদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে জেলায় কালেক্টরীতে অনুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশতেহার জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহারা একজন পরমানন্দ নামে অতি জ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচুত্যানন্দ ঐ দুষ্কর্মান্বিত দণ্ডির চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দ নামে এক দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কয়েক জন উপস্থিত হইবার কালেক্টার সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডীকে অতি বিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহ্য করতঃ অচুত্যানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়েছেন তুমি সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃস্বল সুরতহালের অনুমতি লইয়া কয়েকজন মফঃস্বলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট গদিচ্যুত রকনে তাহাকে কোন হুকুম প্রমাণে এ বিষয়ের মধ্যে বসাইয়া সুরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারিতে কি প্রকারে বসাইয়াছিলেন ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডীর এরূপ পরামর্শ করাতে এই জনরব উঠিল যে তাহারা চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও দুষ্ট লোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াাছে। এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মাকাম সোশাই-ডাঙ্গার নিকটে দুই তিন খান মহাজনী নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অতি সদ্বিবেচক কিন্তু ঐ দণ্ডির চেলা পুনর্বার গদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্বক দর্পনপার্শ্বে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে ধর্ম আছে অলমতিবিস্তরেন। কস্যাচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।

গুপ্তিপাড়ায় সিরাজ-সেনাপতি মোহনলাল, জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত আছে। এই সম্বন্ধে আলোচনা ৯৬৪ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংস বজরায় এই স্থানে বিপর্যস্ত হন।

থানাকুল-কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ গ্রন্থে গুপ্তিপাড়ার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন; তাহা এইরূপঃ

"এইখানে হাট বাজার করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া এক ক্রোশ পরে সাতগেছে, ২ ক্রোশ পরে গুপ্তিপাড়া। আড়পার শান্তিপুর অতি বৃহৎ গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের বাস। অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুর গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুভদ্র গ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্বে লগান করিয়া থাকা হইল।"

গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা বাচাল, শান্তিপুরের মেয়েরা মুখরা, উলার মেয়েরা কুলের বড়াই করে এবং নদীয়ার মেয়েরা খোঁপার পরিপাট্যের গর্ব করে বলিয়া একটি প্রবাদ বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে বচনটি উদ্ধৃত হইলঃ

"উলার মেয়ে কুল কুনুটি।
নদের মেয়ের খোঁপা॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়।
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ "খাসামোণ্ডা" বলিয়া খ্যাত এবং বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। এখনও কলিকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি কাজে-কর্মে গুপ্তিপাড়া হইতে সন্দেশ আনাইয়া থাকেন।

গুপ্তিপাড়ায় বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পণ্ডিত শোভাকর, পণ্ডিত দেবীবর, পণ্ডিত বাণেশ্বর, পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিত মধুরেশ প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। সেকালে এবং একালেও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজা বিশ্বেশ্বর রায়, কবিওয়ালা ভোলা ময়রা, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, মহিলা-দার্শনিক ও বিদুষী ফুলকুমারী গুপ্তা, সতীশ-চন্দ্র সেন ও তদীয় পুত্র সুশীলচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভোলা ময়রা বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ 'কবি' গায়ক। কবি-গান করিবার জন্য বঙ্গদেশের সর্বত্র তিনি পরিভ্রমণ করেন। একবার বঙ্গদেশের কোন স্থানে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে; তিনি যাহা বলেন নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইলঃ

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল দই,
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুলী ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই।
শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে,
মাণিককুণ্ডের মুলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে।
দিনাজপুরের কয়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি,
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্ধমানের ঢাকী ভাল, চব্বিশ পরগণার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিশ ভাল, কিন্তু বংশ লোপ,

হুগলীর ভাল কোটাল-লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল, হরি হরি বোল।

বর্তমানে গুপ্তিপাড়ার জীবিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের নাম উল্লেখ্য। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেনও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তিপাড়ায় বহু প্রাসাদতুল্য বাড়ি আছে, তন্মধ্যে সুশীলচন্দ্র সেন ও 'চার্টার্ড ব্যাঙ্কের' কেশিয়ার স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সেনের সুরম্য ভবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগার আছে। প্রাচীন ভবনের মধ্যে হাটখোলা পাড়ায় "সেন বাড়ী"র দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা এখনও হইয়া থাকে।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই দেশে প্রথম ভারতীয় ইংরাজী-অধ্যাপক, প্রথম হেড-মাষ্টার, প্রথম অধ্যাপক গুপ্তিপাড়া গ্রামের আয়দা পল্লীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সুসন্তান ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গা বেহুলার সঙ্গম সন্নিকটে অদ্যাপি তাঁহার ভদ্রাসনের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অর্ধশতাব্দী পূর্বে (১৮১৪) খৃষ্টাব্দে) ২৬শে ভাদ্র ১৭৩৬ শকাব্দে ঈশানচন্দ্র গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৎকালীন প্রাচীন রীতি অনুসারে হাতে খড়ির পর, গুরু মহাশয়ের কাছে বাঙ্গলা এবং মুন্সী বাবুর কাছে ঈশানচন্দ্রের পারসী শিক্ষা সুরু হয়। বার বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে চিৎপুর রোডের উপর রেভারেণ্ড পিয়ার্স সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জন পামার এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী সুরু করেন। সেই সময় উচ্চ শিক্ষা লাভে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তথাকার জনৈক সাহেব তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন।

অতঃপর তিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শিক্ষার্থে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং পরবর্তীকালে ঈশানচন্দ্রের চেষ্টায় গুপ্তিপাড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরামপুরের ডাক্তার ম্যাকে সাহেবের নিকট তিনি ইংরাজী ও গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে (এ্যাস্ট্রোনমি) বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাজারিবাগ মিশন স্কুলে চাকুরী লইয়া হাজারীবাগ চলিয়া যান এবং তথায় এডুকেশন সার্ভিসের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক স্থানে শিক্ষা বিভাগে কার্য করেন এবং বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর কলেজে সাময়িক ভাবে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকার কর্তৃক স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া হুগলী কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশ্যে অন্যতম প্রধান ঋত্বিক রূপে চুঁচুড়ায় প্রেরিত হন।

তাঁহাকে সারা জীবন ধরিয়া বহু পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইউরোপীয়দের তখন যে সমস্ত পদ একচেটিয়া ছিল, তিনি উক্ত পদে প্রথম ভারতীয় নিয়োজিত হন এবং ইংরাজগণ তাঁহাকে বিব্রত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হয় নাই।

ঈশানচন্দ্র হুগলী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু গণিত ও জ্যোতিষেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল বলিয়া, আর্ক ডেকন প্রাট্ সাহেব লিখিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্র এবং তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তখনকার দিনের অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং একমাত্র রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত প্রত্যেকেই তাঁহার পরবর্তীকালের লোক ছিলেন।

তৎকালে পণ্ডিত হিসাবে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন, এবং অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসাবে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি ঈশানচন্দ্রের অধ্যাপনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং কোন ভারতীয়ের পক্ষে ঐরূপ শুদ্ধ ইংরাজী অধ্যাপনা করা সম্ভব দেখিয়া, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন তারিখের "রেইস এ্যাণ্ড রায়ত" পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত হইয়াছিলঃ

He was one of the Bengalis who, before the Universities were established, distinguished themselves by their proficiency in the English language. As an old Calcutta Reviewer, he wrote English like an accomplished Englishman. (Reis & Rayyet)

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মহলে তিনি "জ্যোরিয়ান" বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধাদি ইণ্ডিয়ান মিরার, ইণ্ডয়ান খৃষ্টয়ান হেরাল্ড, রেইস-এ্যাণ্ড-রায়ত, ইণ্ডিয়ান নেশন, হিন্দু পেট্রিয়ট, ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, বেঙ্গলী, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ প্রভাকর, ফরাসীভাষায় প্রকাশিত লা পাতি (লা-পাতি) প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার সেই সমস্ত অমূল্য রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলে দেশের তৎকালীন অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

ছত্রিশ বৎসর সরকারী কার্যের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার ন্যায় সরকারী মহলে বা সাধারণ মহলে শ্রদ্ধা আকর্ষণ খুব অল্প ভারতীয়ের ভাগ্যেই তখন ঘটিত। একবার স্যার রোপার লেথব্রীজ কে-সি-আই-ই কে, তিনি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

॥ ভূপতি মজুমদার ॥

স্বদেশী যুগের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূপতিবাবুর ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠা সম্ভ্রমের সহিত স্মরণযোগ্য। পুলিশের প্রহরাধীনে ট্রেনে করিয়া যাইবার সময় চলন্ত গাড়ী হইতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একবার তিনি পলাইয়া যান। বিভিন্ন সময়ে

বহু বৎসর কারাবাসকালে তিনি নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ক্রীড়া জগতেও তিনি সুপরিচিত। বিনা আয়াসে কবিতা লিখিতে ও গান বাঁধিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচনা বিবিধ সাময়িকপত্রে ও আকাশবাণীতে প্রচারিত হইয়াছে। বহু বৎসর যাবত তিনি পশ্চিম বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের বহু মঙ্গলসাধন করেন। হুগলী জেলার প্রতি তাঁহার টান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লবী বীরের অবদানের আলোচনা স্বাধীনতা যুদ্ধে হুগলী জেলা প্রসঙ্গেই করা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত 'মহুয়া' পত্রে (মাঘ, ১৩৬০) গুপ্তপল্লী নাম দিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইলঃ

গুপ্তপল্লী

গুপ্তপল্লী! তোমারে নমঃ হুগলী জেলার সার,
তীর্থ পল্লী! মনীষা ক্ষেত্রে তুমি যুগ অবতার।
জগন্নাথের প্রণাম জানাই বৃন্দাবনের নামে,
সত্যদেবেরে প্রণাম জানাই দণ্ডীশ্রেষ্ঠ গ্রামে।
ধন্য দণ্ডী, তোমার পূজায় তুষ্ট নিখিলপতি,
শান্তিপুরেতে পূজারত ছিল কোন্ সে বিধবা সতী?
সেথা হোতে এলে হে বৃন্দাবন! গুপ্তপল্লী ভালো?
গুপ্তপল্লী অথবা দণ্ডী, কোনটি ভাল হে কালো?
হেথা জাহ্নবী শ্রীপদ চুমিয়া বহে মন্দির তলে,
বেহুলার তীরে বেহুলা কাঁদিল রুদ্ধ অশ্রুজলে,
তীর্থ এ ভূমি গুপ্তপল্লী, গর্ভে রত্ন ধরিল শত;
বাণী-কমলার সেবায় তাঁহারা ছিলেন সতত রত।
কৃষ্ণানন্দ শোভাকর আর বানেশ্বরের জন্মভূমি,
বীর মোহনের মীরমদনের পুণ্য স্বদেশ তুমি।
দেশ কালীমাতা বিরাট তীর্থ, ডাকাত পূজিতা দেবী,
মূর্তিবিহীন মহামায়া হেথা, আমরা নম্রে সেবি।
পাট মহলেতে রঘুনাথ আছে মস্ত মূর্তি তার,
অবতার যত ধর্মদীপ্ত কর্মেতে ছিল অধিকার।
পুণ্যতীর্থ গুপ্তপল্লী, বৃন্দাবনের চরণতলে,
বসিতেন যত পল্লীবৃন্দ, শুনিতেন পাঠ কৌতূহলে।
তীর্থের সেরা গুপ্তপল্লী, এ গ্রাম দেবতা বৃন্দাবন,
প্রতি বৎসর নব কলেবরে রথে দেখি নারায়ণ।
বারোয়ারীতলা বারোটি ইয়ারে প্রথম গঠিল গুপ্তিপাড়া,
বিন্ধ্যবাসিনী মহাদেবীমাতা, সন্তান ডাকে দিলেন সাড়া।

এণ্টনি কবি ময়রা ভোলার বিখ্যাত গান বঙ্গদেশে,
খ্যাতি ও প্রীতিতে ভরিয়াছে দেশ গুপ্তপল্লী সুযশে হেসে।
হেথা আশুতোষ গুপ্ত কবির শ্বশুর কুলের ভিটা,
ঢেঁকি অবতার আশানন্দের এইখানে ছিল ঢেঁকিটা।
গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়টি এখানে ষষ্ঠীতলার পাড়া,
দাঁড়াও পথিক, দেখে নাও সব, এই যে গুপ্তিপাড়া।
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর জেলে মৃত্যুরে নিল বরি',
এই গ্রামে তাঁর মাতুল আলয়, আমরা সে শোকে মরি।
আজিকার গ্রাম স্বন্দ্বমত্ত, গুপ্তপল্লী হায়রে হায়,
কীর্তি গরিমা, পুরাতন যত সকলি লুপ্ত প্রায়।
শেষ সন্তান আছে এক তার ভূপতি মজুমদার,
স্বাধীনতা তরে সংগ্রাম দিল, গুপ্তপল্লী নমস্কার!

॥ মোহনলাল ॥

রাজা মোহনলাল নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনেক গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার বাসভূমির কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কি-না সে-সম্বন্ধে এই লেখকের কিন্তু সন্দেহ আছে। সে-বিষয়ে পরে আলোচনাযোগ্য। তবে সিরাজদ্দৌলা ইঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এই বীরবর পলাশীক্ষেত্রে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ইতিহাসে অক্ষয় সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, সত্যপরায়ণ, ন্যায়মার্গানুসারী কার্যদক্ষ ব্যক্তি বিরল।

নবাবী আমলে দেওয়ান-ই আলি এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং একান্তসচিবের কার্যে সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণের নিয়োগের নিয়ম ছিল। কেবল একমাত্র মোহনলালই নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক উক্ত উচ্চতম পদে নিযুক্ত হন। সিরাজদ্দৌলার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মোহনলাল দেশত্যাগী হন। কেহ কেহ বলেন মিরজাফর ইঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহার শেষ জীবনের কোন খবর জানা যায় না।

মোহনলালকে যাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। 'রিয়াজুস সালাতীন' গ্রন্থে মোহনলাল কায়স্থ বলিয়া লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয় তাঁহাকে বাঙ্গালী অনুমান করা হইয়াছে। বাংলাদেশের কায়স্থগণের উপাধি লেখা বিধি কিন্তু অবাঙ্গালী কায়স্থগণ কেহই উপাধি ব্যবহার করেন না। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কায়স্থ হইলেও কখনও কৌলিক উপাধি ব্যবহার করিতেন না। সুতরাং তিনি কায়স্থ হইলেও বাঙ্গালী ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

মোহনলালের ভগিনীর নাম ছিল ফৈজী বা ফয়জান। তিনি দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসা করিতেন। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী মহিলা তৎকালে ভারতবর্ষে দেখা যাইত না বলিয়া সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে তাঁহার ওজন মাত্র বাইশ সের ছিল এবং

তিনি এত সুন্দরী ছিলেন যে যখন তিনি পান খাইতেন, তখন পানের লালরঙ গলা দিয়া যাইবার সময় তাঁহার কণ্ঠমধ্যে দেখা যাইত।

When she ate *Paan*, you might have seen through the skin the coloured liquor ran down her throat and she was so delicate, as to weigh only twenty-two seers.

বলা বাহুল্য ফৈজীর রূপের কথা শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন। কিন্তু ফৈজী সিরাজের ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ-র সহিত প্রেমে পড়েন বলিয়া সিরাজ তাঁহাকে বারাঙ্গনা বলিয়া তিরস্কার করিলে ফৈজী নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বলেন "এইরূপ তিরস্কার আপনার মাকে করিলে শোভা পাইত।" সিরাজের মা আমিনা বেগম ও মাসিমা ঘসেটি বেগমের সহিত হোসেন কুলী খাঁর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায় তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। সিরাজ ফৈজীর কথায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া তাহার দরজা ইট দিয়া গাঁথিয়া দেন। তিন মাস পর ঘরের দরজা খোলা হইলে তাঁহার কঙ্কাল ঘরে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ফৈজীর কৃশাঙ্গিত্বের জন্য কাহারও মনে বিভৎস ভাবের উদয় হয় নাই। ইহার পর হোসেন কুলী খাঁ-কে সিরাজ হত্যা করেন, তাহা ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন।

মোহনলাল যদি বাঙ্গালী হন, তাহা হইলে তাঁহার ভগ্নী দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসা করিবেন ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আর বাঙ্গালী মহিলা অত সুন্দরীও কখন হয় না। এখানে উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের সময় তখন যে সমস্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থান এখনও নির্দেশ করা যায়। কিন্তু মোহনলালের ন্যায় উচ্চপদাভিসিক্ত ব্যক্তির বাসস্থানের কোন নিদর্শন কেবল গুপ্তিপাড়া নয়, বাংলাদেশের কোথাও কোন প্রাচীন ও প্রামাণ্য স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না।

সিরাজদ্দৌলার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য মোহনলাল তাঁহার ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ইহাও মুস্তাফা মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

This Mohonlal had made a present of his sister to Seradj-uddowlah.

ইহা বাঙ্গালীর দ্বারা হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সিরাজের সহিত তাঁহার ভগিনীর জন্য মোহনলালের পরিচয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি নিজগুণে যে নবাবের বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হন, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নাই।

মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ লুৎফউন্নিসাকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া লিখিয়াছেন। বেভারিজ সাহেবও এইরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা লিখিয়াছেন ঃ সিরাজের প্রিয়তমা এখনও মুর্শিদাবাদে বাস করেন। তাঁহাকে নবাবের অন্যতমা প্রেয়সী ফৈজী বা ফয়জান বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন। নিখিলনাথ রায়-ও ফৈজীকে মোহনলালের ভগ্নী বলিয়াছেন কিন্তু মোহনলাল যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা বলেন নাই।

তৎকালীন গ্রন্থাদিতে মোহনলাল ও তাঁহার ভগিনীর বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে মোহনলাল বাঙ্গালী ছিলেন ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে মন যেন চায় না।

গুপ্তিপাড়ায় কিন্তু শ্রীশ্রীবৃন্দাবনজীউর মন্দিরের নিকট ১৩৫৯ সালে মোহনলালের জন্য একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

মোহনলাল স্মৃতি স্তম্ভ

ইমান রাখিলে তুমি সেনাপতি
তোমারে নমস্কার
বীর প্রতিভায় তুমি যে বাঙ্গালী
তোমারে নমস্কার।

প্রস্তাবক ঃ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত
জন্মস্থান—গুপ্তিপাড়া, হুগলী

শ্রীযোগশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ম্যানেজার শ্রীশ্রী বৃন্দাবনজীউ এস্টেট) মহাশয়ের ব্যয়ে ও ঈশ্বর পাঠাগারের উদ্যোগে নির্মিত। ১৩ই পৌষ ১৩৫৯, ইং ২৮-১২-১৯৫২

॥ অনাথনাথ সেন ॥

গুপ্তিপাড়ার সুসন্তান শ্রীঅনাথনাথ সেন কলিকাতায় **"প্রেমানন্দ কুষ্ঠ চিকিৎসালয়"** প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী অনেক চিকিৎসালয় আছে—সেখানে বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত শত সহস্র ব্যক্তি চিকিৎসিত হয়, কিন্তু এই দেশে দুরন্ত কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর চিকিৎসার কোন প্রতিষ্ঠান নাই দেখিয়া সর্বপ্রথম অনাথনাথ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। জাতিধর্ম ও ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত নরনারীর বিনাব্যয়ে বর্তমানে "প্রেমানন্দ কুষ্ঠ চিকিৎসালয়" একমাত্র প্রতিষ্ঠান। মানিকতলা ও কালীঘাট উহার দুইটি শাখায় প্রতিবৎসর লক্ষাধিক রোগী চিকিৎসিত হয়।

অনাথনাথ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৮৪) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উমানারায়ণ সেন। বাল্যকালে তিনি গুপ্তিপাড়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের পরহিতে আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। প্রেমানন্দ তাহার খৃষ্টান নাম। তিনি বহুদিন কলিকাতা ওয়াই এম সি-এর কলেজ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শারীরিক সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

"প্রেমানন্দ"* নামে তাঁহার একখানি আত্মজীবনী আছে। উহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, পরে 'ভারতীয় খৃষ্টতত্ত্ব প্রচার সমিতি' কর্তৃক উহা বাঙ্গলা প্রভৃতি আরো তিনটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রী অণিমা বসু।

---

* **'প্রেমানন্দ'** গ্রন্থে অনাথনাথ তাঁহার জন্ম "১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ" লিখিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার জন্মপত্রিকা দেখিয়াছি, উহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইবে। উহাতে 'সৌর বৈশাখস্য দ্বিতীয় দিবসে শুক্রবাসরে শকাব্দ ১৭৯৯ রাত্রি ১১টা ৪৭মিঃ' লিখিত আছে।

কলিকাতার বিশপ ও মেট্রোপলিটান শ্রী অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় বলিয়াছেন ঃ প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন বঙ্গদেশের এবং বিশেষ কলিকাতা সহরের সুপরিচিত বিশিষ্ট একজন পুরোহিত ছিলেন। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক করুণা সঞ্চার ও বৃদ্ধির পরিণামে তিনি তাঁহাদের জন্য মানিকতলায় কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই চিকিৎসালয় প্রতিনিয়ত কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি প্রেমানন্দের প্রেম, পরিশ্রম ও সহানুভূতির প্রতীক হইয়া থাকিবে।

অনাথনাথের ধর্মমূলক বহু কবিতা লিখিত আছে। এই স্থানে তাঁহার "বিরহ" নামক কবিতার কয়েক পঙক্তি উল্লিখিত হইল ঃ

ফাঁকি নাহি দিও মোরে ওহে প্রাণনাথ,
মম সম ভাগ্যহীন না আছে ধরায়
বুঝিয়া মরম কথা,
দিও নাকো আর ব্যথা
অসহ্য হয়েছে এবার এ-জীবন ভার
এস মোর প্রাণেশ্বর ডাকি বার বার।

॥ ডুমুরদহ ॥

ডুমুরদহ ত্রিবেণীর পাঁচ মাইল উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ব্রাহ্মণবংশীয় জমিদার প্রধান একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডুমুরদহ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শব্দকোষে লিখিত আছে ঃ—

প্রদ্যুম্নস্য হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা।

প্রদ্যুম্ন হ্রদের দক্ষিণে এবং সরস্বতীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এখানে গঙ্গা হইতে যমুনা গমন করিয়াছে। ইহাই মুক্তবেণী ত্রিবেণী।

প্রদ্যুম্ন হ্রদই দ্যুম্নহ্রদ বা দ্যুম্ন দহ এইরূপ অনুমান হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরিক্রমন প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস এই দুমুনা দহের উল্লেখ করিয়াছেন জানা যায়। আরও জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই দুমুনাদহের ঘাটেই তীর্থস্নান সারিয়াছিলেন। দুমুনাদহই কালক্রমে ডুমুরদহ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

ডুমুরদহ সম্বন্ধে 'পল্লীগাথা' কাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

'একদিন বটে ছিল এ পল্লী সম্পদ-সুখ-স্বর্গ,
শান্তির লীলা বিলাস-কুঞ্জ ধর্মের ভীম দুর্গ।'

রাজা হরিপালের ভ্রাতা অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ডুমুরদহে বাস করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সপ্তগ্রামের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া দিগ্বিজয় প্রকাশের কিল্লা বিবরণে লিখিত আছে। এই স্থানটি পূর্বে একটি দ্বীপের ন্যায় ছিল সেই জন্য ইহা ডুমুর দ্বীপ বলিয়া প্রখ্যাত হয়। এককালে গ্রামটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও আভিজাত্য পূর্ণ ছিল।

দুঃখদৈন্যের সর্বনাশা প্লাবনে গ্রামখানিকে শ্রীহীন করিয়া ফেলিলেও তাহার সেই পূর্ব গৌরবের নিদর্শন একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই।

অহিপালো মাহেশে চ রাজ্য ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ
ডুমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা।

রায় রত্নেশ্বর মজুমদার মহাশয় ডুমুরদহের জমিদারবংশের আদি পুরুষ। ডুমুরদহের তৎকালীন ভূম্যাধিকারী গিরিধর চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি ডুমুরদহ গ্রামেই বসবাস করেন। রত্নেশ্বর কানুনগো রাজা দর্পনারায়ণের অধীনে হেড মোহরার ছিলেন। সম্রাট আলমগীর তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়া তিনি সম্রাটের নিকট হইতে বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে বাবু, রায় ও মজুমদার উপাধি দান করেন। রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, কিন্তু দরবারে তিনি রায়জি নামেই পরিচিত ছিলেন। জমিদারী সেরেস্তায় তাঁহার বংশধরগণ রায় উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সম্রাটের দেহাবসানের পর বৃদ্ধ রাজা দর্পনারায়ণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ রত্নেশ্বর সমুদয় কার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি কানুনগোর পাঞ্জাও ব্যবহার করিতেন। তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ একবার এক মিথ্যা হিসাবপত্রে কানুনগোর পাঞ্জা দিবার জন্য প্রলুব্ধ করেন। সত্যাশ্রয়ী রত্নেশ্বর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অস্বীকার করিয়া বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশনে আপন সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা অক্ষুন্ন রাখিয়া শেষে দেহত্যাগ করেন। এই সম্বন্ধে পল্লীগাথায় বর্ণনা উল্লেখ্যঃ

'যবে শত প্রলোভন হইল ব্যর্থ নবাব মর্মহীন,
করিয়া বন্দী আধার কক্ষে দীর্ঘ সপ্ত দিন,
রাখিলেন তাঁরে, মরিলেন তিনি, তাঁর যে ধর্ম-মত,
নড়িল না তিল, না দিলেন তবু মিথ্যা দস্তখৎ।'

তাঁহার সহধর্মিণী আনন্দময়ী দেবীর ধর্মনিষ্ঠা আজও সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। তাঁহাদের বাটীর একপাশ দিয়া কলুষনাশিনী সন্তাপহারিণী গঙ্গা প্রবাহিতা। একদিন এক সৌম্যবপু সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে আসন করিয়া বসিয়া আছেন সকলে দেখিতে পাইল। সন্ন্যাসীর সম্বল লোটা-কম্বল আর কালো পাথরের রাধারমণজীউর একটি সুন্দর বিগ্রহ। সন্ন্যাসী কখনও তাহাকে কোলে করেন, কখনও পাশে শোয়ান, কখনও তাহার সহিত কথা বলেন। এককথায় এই বিগ্রহই সন্ন্যাসীর সঙ্গী। আনন্দময়ী একদিন গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসেন এবং জমিদার বাটী হইতে তাঁহার ও বিগ্রহের যথাযোগ্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কিছুদিন পর যখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝোলাঝুলি বাঁধিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বিগ্রহ তুলিতে গেলেন, তখন বিগ্রহ এরূপ গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইল যে, তিনি বারবার চেষ্টা করিয়াও সেই অচল অনড় রাধারমণকে তুলিতে পারিলেন না। মুহূর্তমধ্যে সারা গ্রামে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। বহু ব্যক্তি আসিয়া বলপ্রয়োগ করিয়া বিগ্রহ তুলিতে

গেলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আনন্দময়ী আসিয়া সন্ন্যাসীর অনুমতিক্রমে অনায়াসে বিগ্রহ তুলিয়া বুকে করিয়া রাখিলেন। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বিগ্রহ তাঁহাকে দিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে সেই স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া রাধারমণজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

'মিথ্যার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় এ মন্ত্র যাঁহার ইষ্ট
ভক্তিরূপিণী পত্নী যাঁহার ভক্তিতে করি তুষ্ট
করিয়া বন্দী বিশ্ব-বিধাতা ভক্তির ভগবান,
রেখেছেন ওই মন্দির মাঝে এখনও বর্তমান।
সেই পুণ্য হাতের গঠিত এ ভূমি সে পুণ্য হাতের অর্ঘ্য
রত্নেশ্বর সাধনা ক্ষেত্রে আনন্দময়ীর স্বর্গ।'

আনন্দময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত রাধারমণজীউর মন্দির এখনও বর্তমান আছে। রত্নেশ্বর হইতে নবমপুরুষ পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ সেই জমিদারীর উপসত্ব ভোগ করিয়া বর্তমানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে নিঃসত্ব হইয়াছেন।

স্বামী উত্তমানন্দদেব তাঁহার 'আনন্দময়ী' পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ 'এই সম্পত্তি যে ন্যায় ও ধর্মকে অতিক্রম করিয়া অর্জিত হয় নাই তাহার সুন্দর প্রমাণ এই যে এখনও তাঁহার বংশধরগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।'

রত্নেশ্বরের বংশধরগণ আজিও হুগলী জেলার ডুমুরদহ, কামালপুর গ্রামে নদীয়ার মুরতিপুর গ্রামে ও মুর্শিদাবাদ জেলার খিদিরপুর ও রাজবীরপাড়া গ্রামে বসবাস করিতেছেন। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নবীনকৃষ্ণ রায়বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (জন্মঃ ১৮২৪, মৃত্যুঃ ১৮৯৬) ইনি ইংরাজী, পারসী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিছুকাল তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার লিখিত প্রাকৃততত্ত্ব বিবেক ১৮৬৪ সালে বাংলার বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল।

॥ ডুমুরদহ ও ডাকাতি ॥

বহু কাহিনী ও কিম্বদন্তীর সহিত ইতিহাস-জড়িত হইয়া পরবর্তীকালে ডাকাতে-ডুমুরদহ গ্রাম এই অখ্যাতি রটে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেনঃ

নদীর উপরে শোভে নবীন সবাই
ডাকাতে ডুমুরদ গ্রাম এবে ভয় নাই।

বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমিদার বংশোদ্ভব বলিয়া একাধিক স্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। বহু ঐতিহাসিক তাঁহাকে বিশ্বনাথ রায় বলিয়াই লিখিয়াছেন। বিশ্বনাথ বাগদী এরূপ কাহিনীও চলিত আছে। জমিদারবংশের দীর্ঘ নাম-তালিকায় বিশ্বনাথ বলিয়া কোন নাম পাওয়া যায় না। হয়ত তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন এরূপও

হইতে পারে। বিশ্বনাথ যে একজন অসীম সাহসী দরিদ্রবন্ধু দস্যু ছিলেন এ-বিষয়ে অনেকেই একমত। ইংলণ্ডের তৎকালীন নাইটগণ বা বিখ্যাত মানব-প্রেমিক দস্যু রবিনহুডের সহিত তাঁহাকে এক পর্যায়ে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। বিশ্বনাথ দস্যুতা করিলেও বাবু উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জমিদারবংশোদ্ভব বলিয়া ভুল করিবার ইহাও অন্যতম কারণ হইতে পারে।

তৎকালীন সময়ে লাঠির ভরসায় জমিদারী রক্ষা করিতে হইত। সর্দারদের মধ্যে অনেকেই দস্যুতা দ্বারা অর্থোপার্জন করিত। গোপ জাতীয় কেনারাম সর্দারের নাম ডুমুরদহ ও সন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। কেনারাম হুগলী জেলের সশস্ত্র প্রহরীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিরুদ্দেশ হয়। ডুমুরদহের ডাকাতরা জলদস্যু বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ডাকাতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ২৯৬ পৃষ্ঠায় আছে।

বর্তমানে ডুমুরদহ গ্রাম বঙ্গবিখ্যাত সাধু নামপ্রেমীঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার-নাথের পৈতৃক বাসভূমি বলিয়া সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামাশ্রম ও কুলদেবতা ব্রজনাথজীউ এই গ্রামেই অবস্থিত।

স্বামী উত্তমানন্দদেবের প্রতিষ্ঠিত 'উত্তমাশ্রম'ও এই গ্রামেরই একপ্রান্তে বিরাজ করিতেছে। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের প্রধান শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বর্তমানে আশ্রমের মঠাধীশ। রামাশ্রম ও উত্তমাশ্রম সদর মহকুমার দুইটি উল্লেখ-যোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই দুইটি আশ্রমের বিষয় পরে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রামে বহু দেবমন্দির, উচ্চবিদ্যালয়, স্টেশন, পোস্ট অফিস, সাধারণ পাঠাগার ও রাধারমণ সম্মিলন সমিতি নামে একটি দীর্ঘদিনের পল্লী-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আছে। সুসাহিত্যিক শ্রীপুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ও মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের মধ্যে নিত্যানন্দপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। যে সাতটি গ্রাম লইয়া প্রাচীনকাল সপ্তগ্রাম গঠিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দপুর তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রামের বিষয় ৭৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিদাস দাস "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ" গ্রন্থে নিত্যানন্দপুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

নিত্যানন্দপুর ॥ হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামের নিকট, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমতী বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানে কিছুদিন ছিলেন। একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীধর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধর ও বাণীনাথ দুই ভাই সুবর্ণবণিক ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে ৭ নৌকা বাণিজ্যদ্রব্য ভরিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে আসেন। আইন্দানগরে ইহাদের বাস ছিল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ইঁহারা স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীধর-প্রণীত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপটল" এবং বীণানাথ-প্রণীত "শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দচৌত্রিশা" প্রভৃতি গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

॥ স্বামী উত্তমানন্দ প্রতিষ্ঠিত উত্তমাশ্রম ॥

ডুমুরদহ গ্রামে ভাগীরথী তীরে তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ শান্তরসাস্পদ উত্তমাশ্রম দেখিলে প্রাচীন

ভারতের তপোবনের কথা স্মৃতিপথে উদয় হয়। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কোটালপুর নিবাসী নীলকান্ত সিংহরায়। প্রবল প্রতাপান্বিত একদা বিলাসব্যসনে মগ্ন জমিদার নীলকান্ত গুরুকৃপায় স্বামী উত্তমানন্দে রূপান্তরিত হইয়া দিব্যজীবন লাভ করেন।

১২৬৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ নীলকান্তের কোটালপুরে জন্ম হয়। তারকেশ্বরের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোপীনাথপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত এই কোটালপুর গ্রাম। ইহাদের পূর্বপুরুষ রাজপুতানা হইতে বাঙলাদেশে আসিয়া বাস করেন। ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। মুসলমান রাজত্বকালে জিজিয়া কর এবং অন্যান্য নানা প্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া বহু ক্ষত্রিয় বংশ তাঁহাদের আপন আপন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া হুগলী ও বর্ধমান জেলার নিভৃত শান্ত পল্লীতে আসিয়া বসবাস করেন বা উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই বংশও পূর্বোক্ত উপদ্রুত বংশগুলির মধ্যে অন্যতম।

নীলকান্তের পিতার নাম শ্রীনাথ সিংহরায় ও মাতার নাম কিশোরীবালা দেবী। শ্রীনাথ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং আদর্শ হিন্দুগৃহের যাহা প্রতিপাল্য তাহা শ্রীনাথের গৃহে আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বাল্যকাল হইতে নীলকান্তের দেহে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত তেজ ও বল বিরাজ করিত। সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। শ্রীমদ্ভগবদগীতার তিনি যে ব্যাখ্যা করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া অষ্টাবক্রসংহিতা, স্তোত্রমালা, পাগল গুরুর পাগল চেলা, ও দেবমতি নামক ধর্মমূলক নাটক উল্লেখযোগ্য।

১৩১৬ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া জগতের হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করেন এবং ১৩১৮ সালের ৩রা কার্তিক উত্তমাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ডুমুরদহ গ্রামের জমিদার বংশের যোগীন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়, কামালপুর গ্রামের শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, গাজীনগর গ্রামের রজনী ঘোষ প্রভৃতি সহায়তা করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর উত্তমানন্দের উত্তরসাধকবৃন্দ যাহারা একে একে আসিয়া সমবেত হন, তাহাদের নাম স্বামী ধ্রুবানন্দ, স্বামী মহিমানন্দ, অচলানন্দ, অসিতানন্দ, প্রেমানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ভক্ত কর্মবীরগণ। তাঁহাদের আগমনে নিভৃত আশ্রমের কলেবর পুষ্ট হইল। ১৩২৩ সালের ৩রা বৈশাখ তিনি নরদেহ ত্যাগ করেন। ডুমুরদহে স্বামী উত্তমানন্দের সমাধিমন্দির আছে। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে ডুমুরদহ গ্রামের পল্লীকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে গীত রচনা করেন, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

কর আশীর্বাদ হে ধর্মবিশ্বাসী, জাল জ্ঞানদীপ অভয় আশ্বাসি,
দাও পদধূলি, হে মুক্ত সন্ন্যাসী! লুপ্ত কর হাহাকার।
এ ভবপাথারে অবিদ্যা আঁধারে, তরাতে পাতকী রেখে গেছ যাঁরে,
সে চির প্রণম্য ধ্রুবপদ ধরে, যেন বঙ্কিম হয় গো পার॥

এই আশ্রম কর্তৃক ধ্রুবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, যতীন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়, দাতব্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়, নিত্যানন্দ পাঠশালা প্রভৃতি পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া বাঁকুড়া জেলার কাপিস্টা গ্রামে কাঁড়ো পাহাড়ে উত্তমাশ্রমের শাখা তপোবনাশ্রম ও ক্ষীরপাই গ্রামেও একটি শাখা

আছে। উত্তমাশ্রম বেদান্তের জ্ঞান ও তন্ত্রপুরাণের ভক্তির এক মহা সমন্বয় ক্ষেত্র। এই আশ্রমের শান্ত পরিবেশ সাধু-সন্ন্যাসীর হৃদয়ে অধ্যাত্মআকুতি ও তাপদগ্ধ গৃহীর অন্তরে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

স্বামী উত্তমানন্দের কবিতা রচনার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

"সামাদানের উপর দাঁড়িয়ে সেজের ভিতর বাতি,
বাতির মাথায় জ্বলছে আগুন, পুড়ছে জগৎ হাতি।"

॥ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ॥

ডুমুরদহের সুসন্তান নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ১২৯৮ সালের ৬ই ফাল্গুন কেওটায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম মাল্যবতী দেবী। ১৩১৯ সালে ত্রিবেণীতে তাঁহার দীক্ষালাভ হয়। তাঁহার গুরুদেবের নাম দাশরথি দেব। হুগলী বালিটোলে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন তারপর বেদান্ত, সাংখ্য, উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ভারতের অন্যতম শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

১৩৪৩ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ওঙ্কারনাথ এই নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে জয়গুরু সম্প্রদায় হরিনামকীর্তন লইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। মহাপ্রভু যেমন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে হরিনামকীর্তন করিয়া ভ্রমণরত হইয়াছিলেন, ওঙ্কারনাথ সেইরূপ হুগলী জেলায় আবির্ভূত হইয়া নাম-মহিমার আবার মহারোল তুলিয়াছেন। এই কীর্তন-পরায়ণ মহাসাধক ডুমুরদহে **"শ্রীরামাশ্রম"** প্রতিষ্ঠা করিয়া গুহার মধ্যে মৌনকালে নাম-প্রচারের আদেশ পান। গঙ্গাতীরে অবস্থিত 'শ্রীরামাশ্রম' সাধনার এক অপূর্ব স্থান। তিনি কঠোর বর্ণাশ্রমী বলিয়া 'বিপরীত পথগামী-গণকে' মন্ত্র দেন না। তাঁহার রচিত শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহার যে চরিত্র ও চিত্র পাঠকের ভাবদর্পণে ধরা দেয়, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কিছু আভাস দেখা যায়। তাঁহার পুস্তকাবলীতে তিনি সহজ সরল কথার মাধ্যমে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 'দেবযান' নামক বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার অগণিত শিষ্যবর্গের ও অনেক অবিশ্বাসীর মনে ভগবদ্‌বিশ্বাস অঙ্কুরিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** রচিত কয়েকখানি কবিতা পুস্তক আছে। তন্মধ্যে "পল্লীগাথা" ও "নামের জয়" উল্লেখ্য। ঠাকুর সীতারামদাসের একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ সুপণ্ডিত ও দেবযানের সহযোগী সম্পাদক।

॥ শ্রীপুর ॥

শ্রীপুর হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম; প্রাচীনকালে ইহা "আঁটিশেওড়া" নামে খ্যাত এবং পরবর্তীকালে বেনীপুর নামক থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১১১৪ সালে উলার প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন মুস্তৌফী বংশবাটীর রাজা

রঘুদেব রায়ের নিকট পঁচাত্তর বিঘা মহত্তরাণ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন আঁটিশেওড়া গ্রামে বসবাস করেন। তিনি এই প্রাচীন বৈষ্ণব নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রীপুর নামকরণ করেন।

"Ramesvar had ten sons Raghuanndan, Anantaram, Shivaram and Mukundaram were highly reputed for their wealth, liberality, love of learning and devotion to the Hindu religion. Raghunandan and Anantaram first separated from their brothers and settled in Zilla Hughli, the former in Sripur and the latter in Sukria. Raghunandan was a good Sanskrit scholar and astronomer of his day."

(The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars By Lokenath Ghosh.)

শ্রীহরিদাস দাস "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন: আটিশেওড়া গ্রাম হুগলী জেলা বলাগড়ের পার্শ্ববর্তী ভাগীরথীতীরস্থ গ্রাম। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুনন্দন (?) ১১১৪ সালে আটিশেওড়া নামের পরিবর্তে শ্রীপুর নামকরণ করেন। তদবধি বলাগড়-শ্রীপুর নাম চলিয়া আসিতেছে। ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব একটি কুঁচিলা গাছের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ পুরী যাত্রাকালে) এজন্য ঐ স্থানটি বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে শ্রীপুর ও বলাগড় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তফীর বাস
বড় পল্লী বলাগড়, বল্লালের দাস।"

পূর্বে শ্রীপুরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া যাইত; কিন্তু, বর্তমানে উহা প্রায় অর্ধ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে হাট গোবিন্দগঞ্জ নামক একটি বাজার আছে; উহা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দদেব বিগ্রহের দেবত্র সম্পত্তি এবং উহা রাজা রাজবল্লভের মহত্তরাণ বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচীন পুঁথি পত্রে লিখিত আছে। শ্রীপুরে **গোবিন্দজীউর** মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরটি একচূড় বিশিষ্ট এবং সম্মুখে দুর্গা দালানের ন্যায় প্রশস্ত চাতাল আছে। বর্তমান মন্দির ১৭১৯ শকাব্দে নিধিরাম মুস্তৌফী নির্মাণ করিয়া দেন। কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত গোবিন্দজীউর ও অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীরাধিকার বিগ্রহ মন্দির মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং রঘুনন্দন ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, বিগ্রহের পাদদেশে **'রঘুনন্দন মিত্র দাসস্য'** এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। এই অঞ্চলে গোবিন্দজীউ অতীব জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রখ্যাত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষে গোবিন্দজীউর মন্দিরে বহু জনসমাগম অদ্যাপিও হইয়া থাকে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, বর্গীর আক্রমণকালে গোবিন্দজীউকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়; পরে তিনি ধীবরের জালে উঠিয়াছিলেন বলিয়া, প্রতিবৎসর গোষ্ঠযাত্রার দিন গোবিন্দজীউ গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া গমন করেন। সচ্চিদানন্দ দাস "মোগল সম্রাট আকবরের সময় রঘুনন্দন মুস্তৌফী শ্রীশ্রী৺গোবিন্দরায় জীউকে স্থাপনা করিয়া সমারোহে রাস যাত্রাদি উৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন" বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ আকবরের রাজত্বের বহু পরে সম্রাট আওরেঙ্গজেবের সময়ে রঘুনন্দন শ্রীপুরে বাস করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক রঘুনন্দন মুস্তৌফীকে প্রদত্ত তায়দাদখানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি; উহার আলোকচিত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল। উহাতে লেখা আছেঃ

শ্রীরামঃ শরণং

সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুস্তৌফী সদন্তকরণেষু পরমশুভাশীঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ—আমার অধিকারে 'পূর্ব' কুলেসেওয়ায় পলাসী বেলগ্রাম কলিকাতা ও হাবিলিসহর পরগণা বাগ করিতে জঙ্গল ভূমি ৩০ ত্রিশ বিঘা লায়েক দিলাম চারা আর্জিয়া বাগ করিয়া ভোগ করহ। রাজস্ব মাফ ইতি সন ১১৩৭ ১৬ ভাদ্র।

গোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকটে একটি সুন্দর দোলমঞ্চ আছে; ইহা রুদ্ররাম মুস্তৌফীর সহধর্মিণী ১৬৬৮ শকাব্দে নির্মাণ করিয়া দেন। দোলমঞ্চে নিম্নোক্ত লিপি খোদিত আছেঃ

১৬৬৮ শক

শাকাব্দে [illegible]তামতে গোবিন্দপাদাম্বুজে
ন্যস্ত স্বাস্ত বিশুদ্ধ মিত্র কুলজ শ্রী রুদ্ররামান্বয়ঃ।
জায়া তস্য সুশীলশীলনবতী সাধ্বী বিচিত্রংহরে
দোলার্থং গৃহমিষ্টিকাদিভিরিদং নির্মায় তস্মৈ দদৌ॥

দোলমঞ্চের উত্তরে ইষ্টক নির্মিত বারোয়ারী গৃহ ও তাহার নিকটে একটি শিবমন্দির আছে। শ্রীপুরের বারোয়ারী বা সার্বজনীন পূজা বঙ্গদেশের প্রাচীনতম বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম বারোয়ারী পূজা গুপ্তিপাড়ায় প্রবর্তিত হয়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; পরে গুপ্তিপাড়ার অনুকরণে উলা, চাকদহ ও শ্রীপুরে বারোয়ারী পূজার প্রবর্তন হয়। অদ্যাপি শ্রীপুরের বারোয়ারী গৃহে মহাসমারোহে গ্রামবাসিগণ কর্তৃক রাস-পূর্ণিমা হইতে তিন দিবস কার্তিক গণেশসহ জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়িয়া পূজা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মধ্যে কারুকার্য খচিত দক্ষিণ দুয়ারী পঞ্চচূড় বিশিষ্ট দুইটি ভগ্ন শিব মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এইরূপ সুন্দর মন্দির এই অঞ্চলে খুব অল্পই আছে। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গের গাত্রে "১৭২২ শকাব্দে দুর্গাচরণ মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২০৭ সালে বর্ধমানের অন্তর্গত কাইগ্রাম নিবাসী ধর্মদাস বসুর পিতামহ তাঁহার মাতামহের নামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার সেবার জন্য যশোহর জেলার গঙ্গানন্দনপুর নামক তালুক দান করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বংশধরগণ উক্ত তালুকের আয় হইতে বঞ্চিত করায় বর্তমানে এই মন্দিরের এইরূপ দূরবস্থা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহা ধূলিস্যাৎ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমানে শ্রীপুর বনজঙ্গলে পূর্ণ একটি সামান্য স্থান হইলেও এক সময় ইহা সুসমৃদ্ধ পল্লী বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুস্তৌফীদিগের গৌরবে এই গ্রাম পূর্বে গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে উক্ত বংশের কেহই বর্তমানে গ্রামে বাস করেন না।

শ্রীপুরের পার্শ্বস্থিত তেঁতুলিয়া গ্রাম এক সময় ডাকাতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই স্থানের বাগদী জাতীয় ব্যক্তিগণ লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। এই গ্রামের ধীবরগণ প্রাচীনকালে সুন্দর সুন্দর নৌকা নির্মাণ করিত। শ্রীপুরের নৌশিল্প সম্বন্ধে ৫৫৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এইস্থানে আর লিখিত হইল না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মহামারী ভাগীরথী পার হইয়া সর্বপ্রথম শ্রীপুর ও বলাগড় প্রভৃতি স্থানে দেখা দেয় এবং এই স্থানগুলিকে বিধ্বস্ত করে।

সুখড়িয়া ॥ ভাগীরথী তীরস্থ সোমড়া ও বলাগড়ের মধ্যস্থিত সুখড়িয়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু প্রাচীন দেবালয় অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উলার মুস্তৌফী বংশের একটি শাখা এই স্থানে বসবাস করায়, এই গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সুখড়িয়া হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আনন্দরাম মুস্তৌফীর মনোমালিন্য ঘটায়, বর্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদ তাঁহার বাস-স্থানের জন্য তদানীন্তন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুখড়িয়া, গোপীনগর প্রভৃতি স্থানগুলি তাঁহার পুত্রের নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১৬৭ সালে এই গ্রামে বসবাস করেন এবং নিজ নামানুসারে অনন্তদেব নামক বহুচক্র শোভিত একটি শালগ্রাম শিলা, শ্যামরায় রায় নামক যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এবং দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন; সেগুলি অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে।

সুখড়িয়া গ্রামে গঙ্গেটিয়া নামক খালের ধারে নিস্তারিণী কালীর সুবৃহৎ মন্দির একটি

দর্শনীয় বস্তু। মন্দির আধুনিক হইলেও, মন্দির মধ্যে দেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত মূর্তি সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। কাশীপতি মুস্তৌফী ১২৫৪ সালে অর্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্মাণ করেন; মন্দিরের উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট হইবে।

এই স্থানের আনন্দময়ীর মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির বলিয়া খ্যাত। ১৭৩৫ শকাব্দে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বীরেশ্বর মুস্তৌফী ইহা নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ৭০ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার পঁচিশটি চূড়া আছে। মন্দির গাত্রে টালির উপর নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, সিংহবাহিনী, রামসীতা প্রভৃতির মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। মন্দির মধ্যে বেদীর উপর শায়িত শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা আনন্দময়ী কালী আছেন; দেবীর উচ্চতা প্রায় তিন ফুট হইবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সর্বোচ্চ পাঁচটি চূড়া ভাঙ্গিয়া যাইলে, পরবর্তী কালে রাধাজীবনের দৌহিত্রগণ চূড়াগুলি পুনরায় নির্মাণ করিয়া দেন।

হরসুন্দরী কালীর মন্দিরও এক সময় দেখিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রী সমাগম হইত। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ায় ইহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দ্বিতল ও নয়টি চূড়ায় শোভিত ছিল এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে মন্দিরের উপরের সমস্ত চূড়াগুলিই ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে। হরসুন্দরী কালী মন্দিরের উঠানের মধ্যে দুইটি পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট মন্দির এবং দুই সারিতে বারটি মন্দিরের মধ্যেই শিবলিঙ্গ আছে। তোরণ দ্বারের বহির্গাত্রে কৃষ্ণ প্রস্তর ফলকে নির্মাতার নাম নিম্নোক্তরূপে খোদিত আছে:

"শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং
এ দেবালয় দেওয়ান রামনিধি মুস্তৌফী কর্তৃক নির্মিত
শকাব্দ ১৭৩৫"

এতদ্ব্যতীত গ্রামের মধ্যে বহু ভগ্ন শিবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে গীতবাদ্যবিশারদ যোগীন্দ্রপতি মুস্তৌফী, গুরুদাস মুস্তৌফী বিখ্যাত ব্যবসায়ী নলীন্দ্রনাথ মুস্তৌফী, ক্ষেত্রপতি মুস্তৌফীর নাম উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী লিখিত "উলার মুস্তৌফী বংশ" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীপুর ও সুখড়িয়ার বিষয় অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।* মহিলা কবি নগেন্দ্রবালা সরস্বতী মুস্তৌফী বংশের বধু ছিলেন। তাঁহার কথা ৪৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

* ২০শে নভেম্বর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে শ্রীপুরের বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্তী শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারোয়ারী পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানোর অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।"

চিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (পৃষ্ঠা ৭১৫)
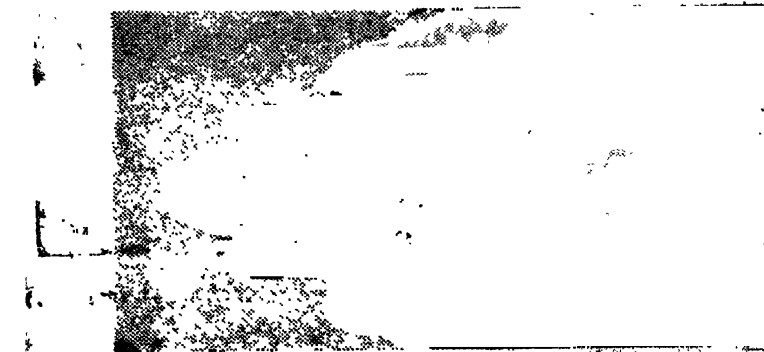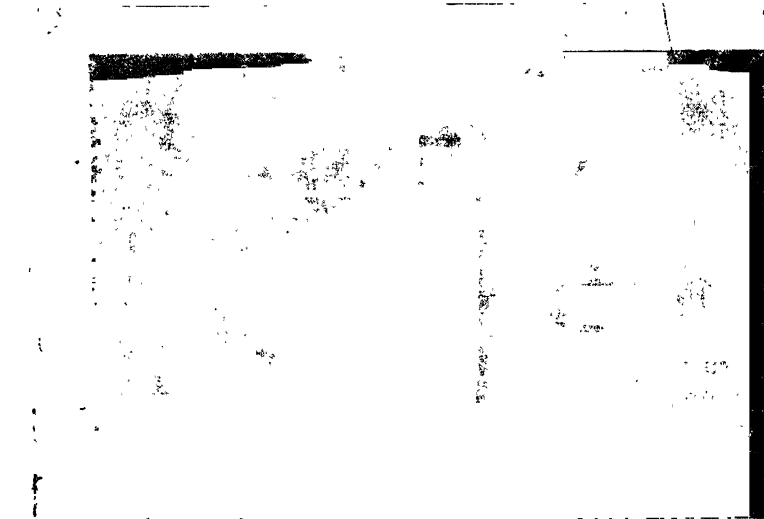
প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন—(পৃঃ ৯৬৬)   ভূপতিচরণ ঘোষ—গড়বাড়ী (পৃঃ ৭১৭)

ব্রহ্মময়ী দেবীর মন্দির—মহানাদ (পৃষ্ঠা ৩

বেণীমাধব মন্দির—ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৭৭৯)

রামসীতার মন্দির, ভদ্রেশ্বর (পৃষ্ঠা ১০৪৭)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির—হরিপাল (পৃষ্ঠা ১০৭৯)

বাবা তারকনাথের মন্দির—তারকেশ্বর (পৃষ্ঠা ১১১০)

কান্দড় (পাণ্ডুয়া) হইতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি (পৃষ্ঠা ৯০৭)

সপ্তগ্রামের প্রাচীন মসজিদ (পৃষ্ঠা ৭২০)

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রসূতি সদন—সিঙ্গুর (পৃষ্ঠা ১০৬৮)

স্বয়ম্ভূদেবের মন্দির—ভাস্তাড়া (পৃষ্ঠা ৮১২)
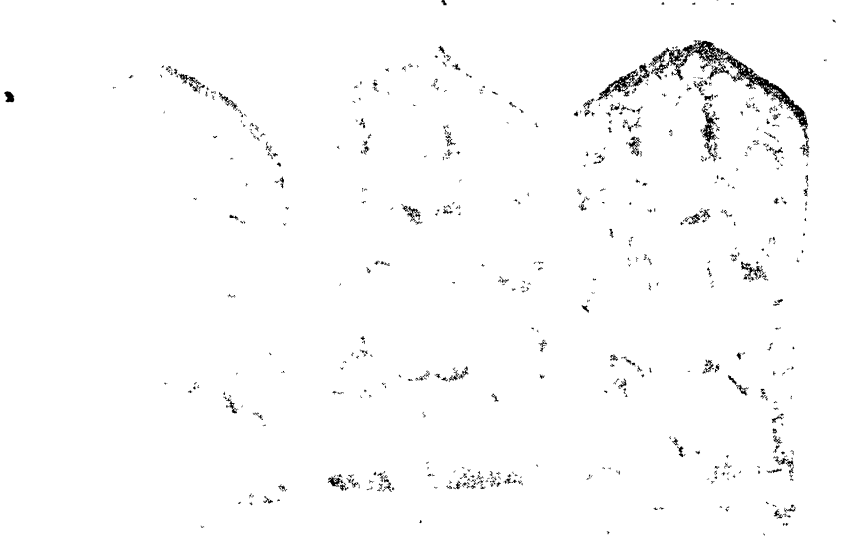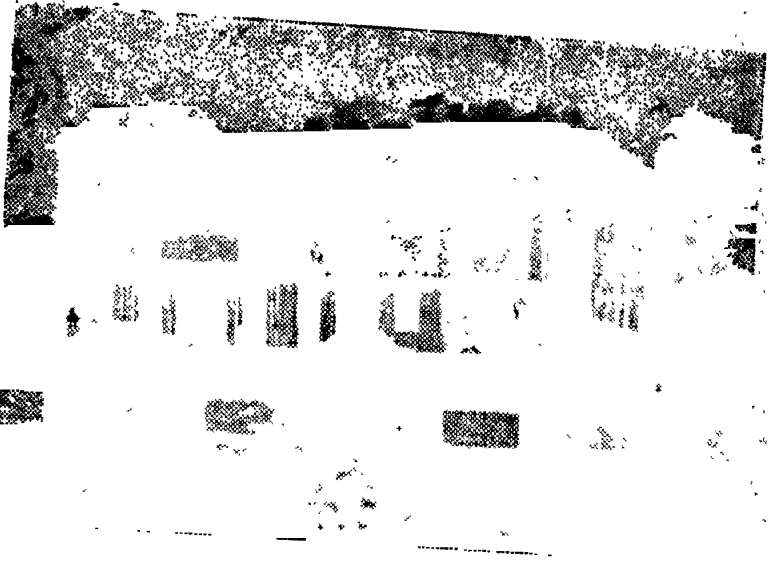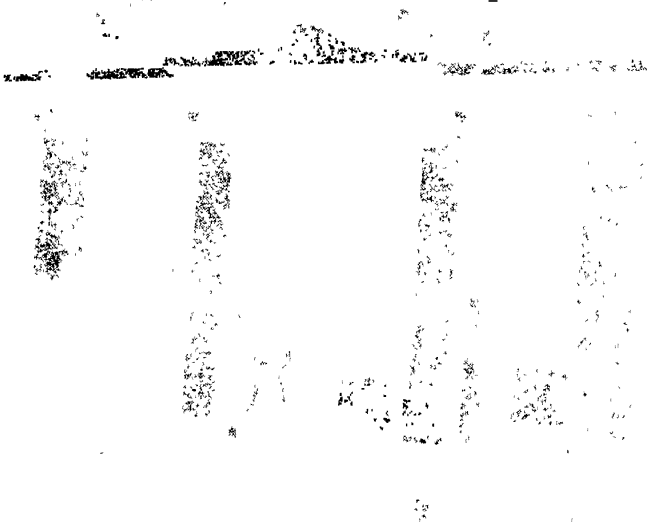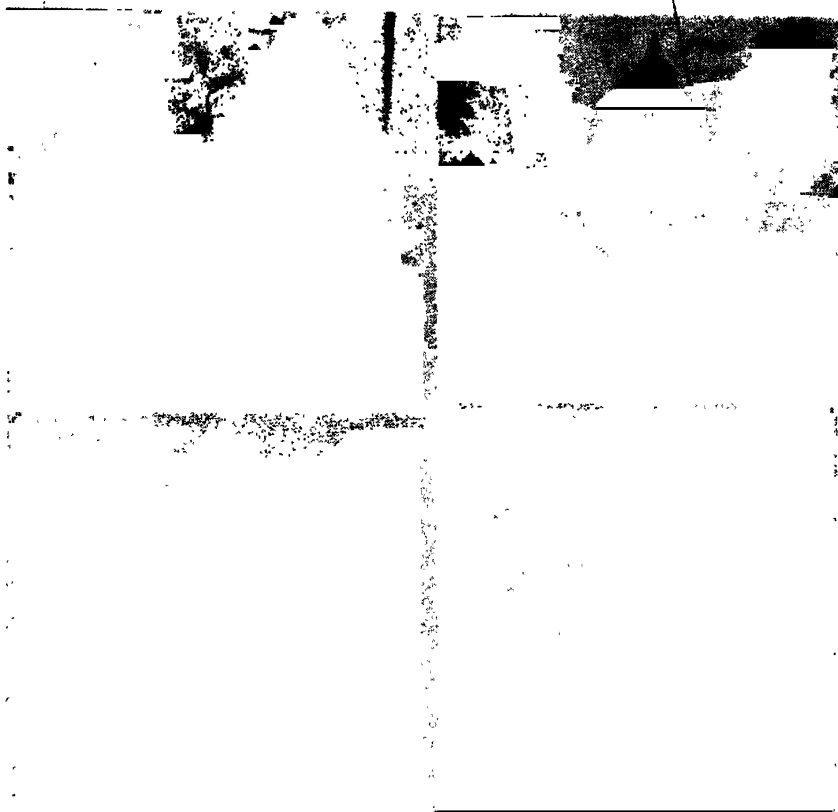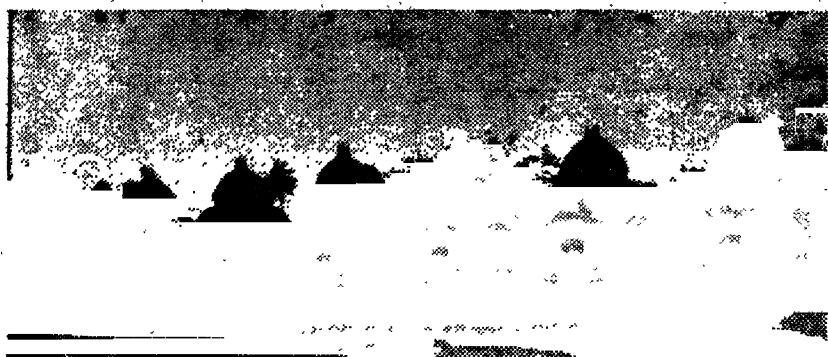
১। সপ্ত শিব মন্দির—সিঙ্গুর (পৃষ্ঠা ১০৬২); ২। জোড়া শিব মন্দির—চোপা (পৃঃ ৭৯৭); ৩। [illegible] দোলমঞ্চ—গড়বাড়ি (পৃঃ ৭৯৮); ৪। রাধা-গোবিন্দের মন্দির—গড়বাড়ি (পৃঃ ৭৯৮); ৫। চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ি, গড়বাড়ি (পৃষ্ঠা ৭৯৮)
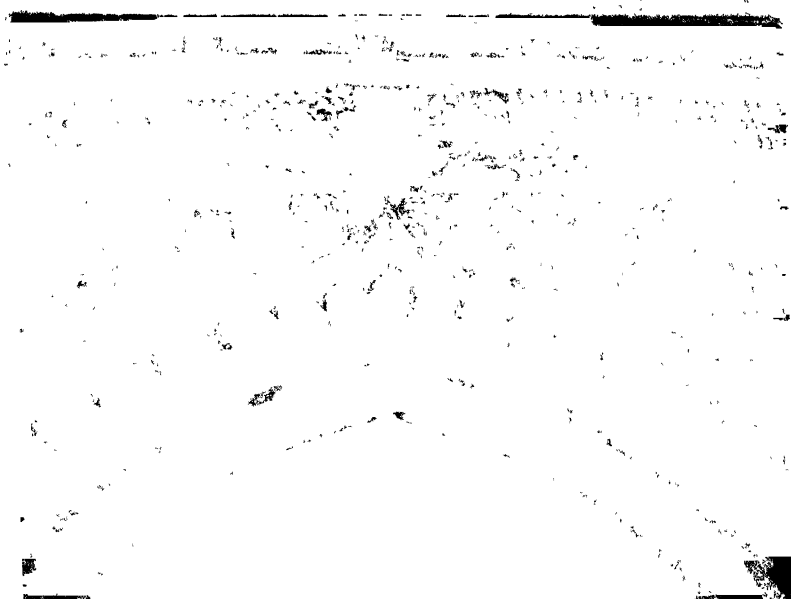
রামচন্দ্রের মন্দিরে কারুকার্য—গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ১৯৪৬)
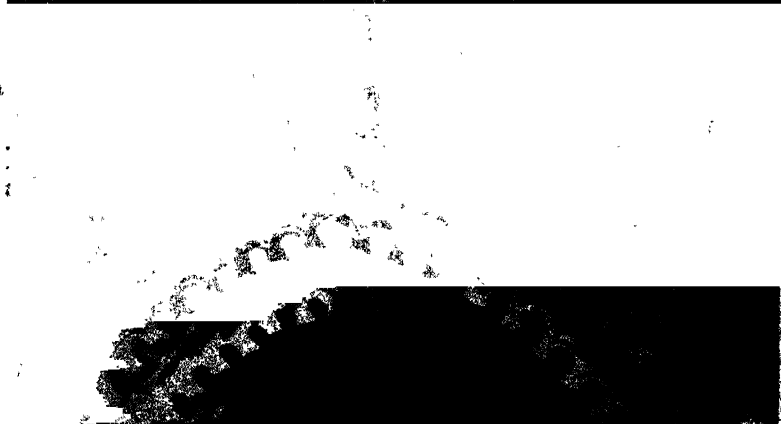
রাধাগোপীনাথের মন্দিরে কারুকার্য—দশঘরা (পৃষ্ঠা ৮২৯)
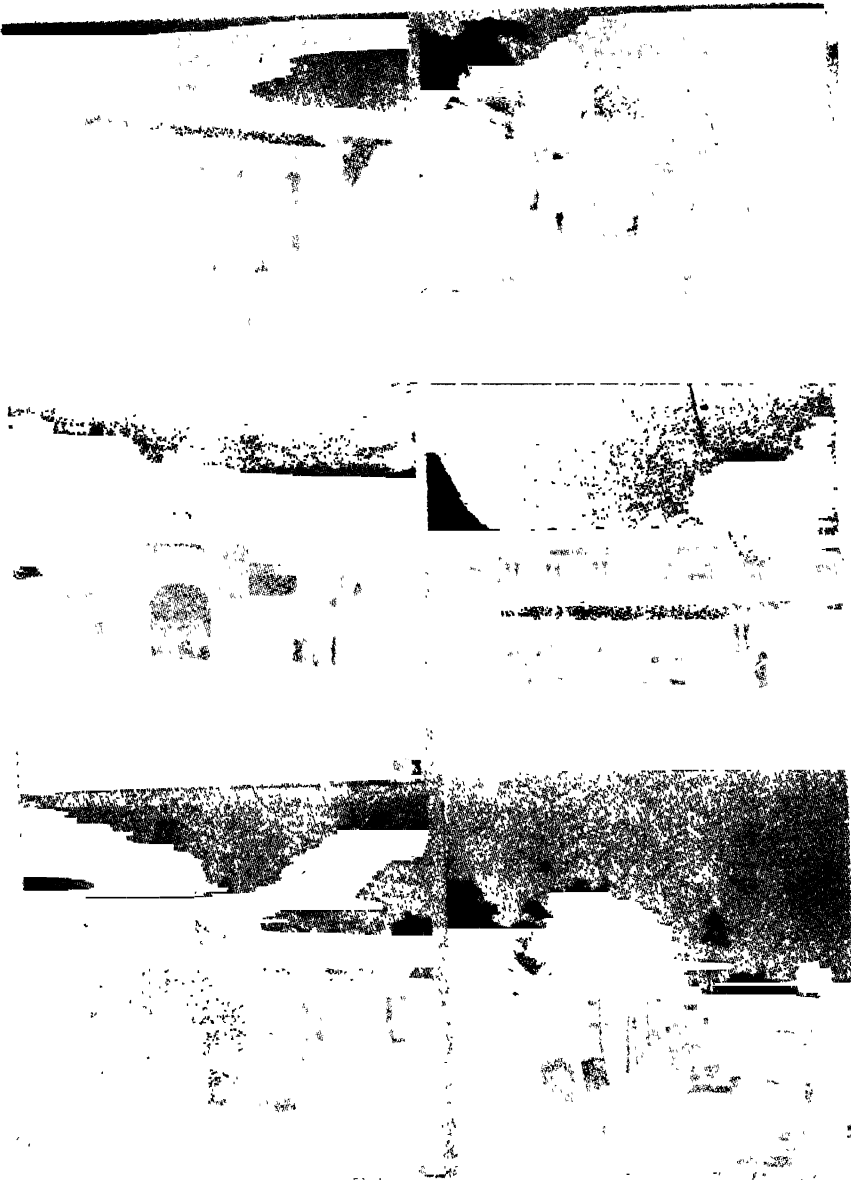
তারকেশ্বর (পৃষ্ঠা ১১০৯)

১। মোহান্তের প্রাসাদ; ২। জগন্নাথ আশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়; ৩। নহবৎখানা; ৪। মোহান্তের প্রাসাদ সংলগ্ন সাধুদের আবাস; ৫। লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমঞ্চ; ৬। মোহান্তের প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাস্তা।
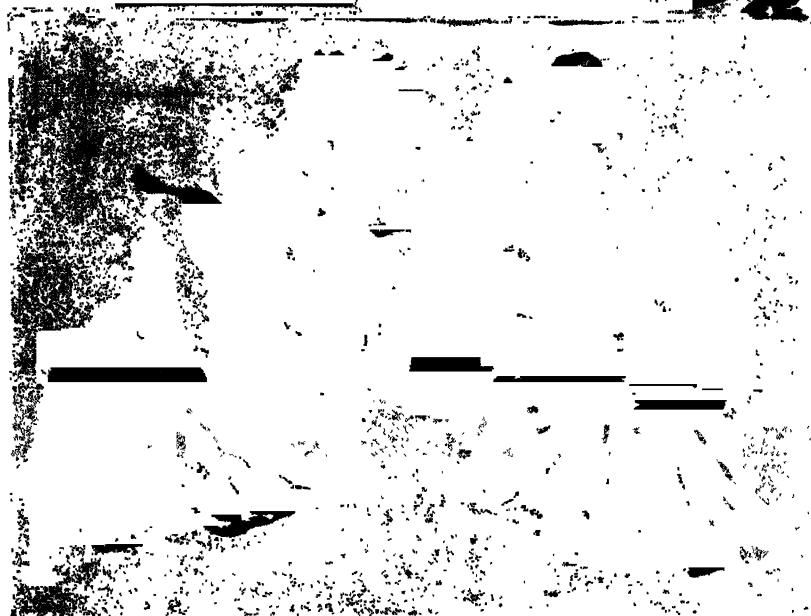
লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (পৃঃ ৮৬১);

শহীদ নির্মলজীবনের মাতা প্রভাসরঞ্জিনী ঘোষ (পৃষ্ঠা ১১০৮)

শহীদ কানাইলাল দত্ত (পৃষ্ঠা ১১০৮)

শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ (পৃষ্ঠা ১১০৮)

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা ৯৬৯

কবিভূষণ নগেন্দ্রনাথ সোম (পৃষ্ঠা ৬১৪

যোগীন্দ্রনাথ সেন (পৃষ্ঠা ১০১৫)

হরিহর শেঠ (পৃষ্ঠা ১০১৬)

দীননাথ ধর (পৃষ্ঠা ৬১৫)
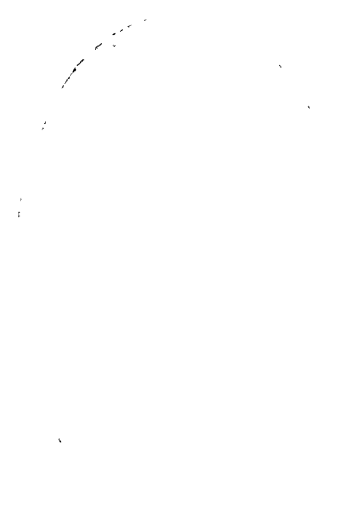
উপাসনা দত্ত (পৃষ্ঠা ৭২৭)

নীলমণি দে (পৃষ্ঠা ৮৬৭)
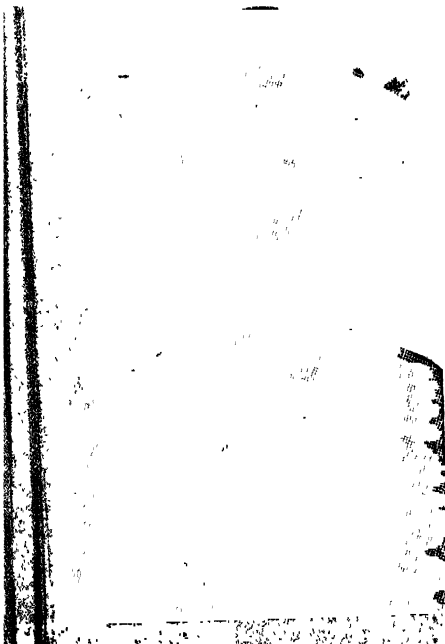
দ্বারকানাথ মিত্র (পৃষ্ঠা ৬১৫)

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (পৃষ্ঠা ৭১৪)

গঙ্গাচরণ সরকার (পৃষ্ঠা ৬১৫)

করুণাময়ী দেবী—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬১০)

দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি—কৈকালা (পৃষ্ঠা ১১০২)

দুর্গার মন্দির—[illegible] (পৃষ্ঠা ১০৪৫)

৬৩

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (পৃষ্ঠা ১০৬৭)

॥ জীরাট ॥
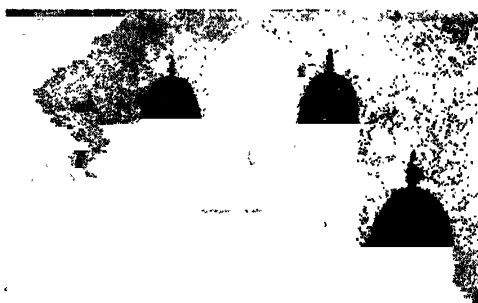
জীরাট ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লুপ লাইনের একটি ষ্টেশন; কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। জীরাট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের ধারনা যে ফরাসী 'জিরায়ৎ' শব্দ হইতে জীরাটের নামকরণ হইয়াছে। জিরায়ৎ শব্দের অর্থ ক্ষেত। ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে গ্রামের অবস্থিতি ছিল। এখন গঙ্গা পূর্বদিকে আরও সরিয়া গিয়াছে। অতীতকালে জীরাটের নাম মহম্মদপুর ছিল। পরবর্তীকালে গোপীনাথজীউর জন্য এই গ্রাম বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয় এবং গোপীনাথজীউর "জীউ" হইতে জীরাট নাম হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রামের পত্তন হয়। জীরাটের চক্রবর্তী, গোস্বামী, মুখোপাধ্যায় ও নাগ বংশ প্রসিদ্ধ বংশ বলিয়া খ্যাত। চক্রবর্তী বংশের পূর্বপুরুষ অভয়রাম সার্বভৌম সপ্তদশ শতাব্দীতে জীরাটে আসিয়া বাস করেন। গোস্বামী বংশের পূর্বপুরুষের নাম রামকানাই গোস্বামী। তিনি ও অভয়রাম ঐ সময় কালীগড় গ্রামের সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত কাশীনাথ অধিকারীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

॥ পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম ॥

জীরাটের চক্রবর্তীবংশে সর্বপ্রথম **পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম** এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত রামেশ্বর বিদ্যারত্ন ত্রিবেণীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন। অভয়রাম ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া তৎকালে খ্যাত ছিলেন। অভয়রাম ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তাঁহার গৃহে মৃণ্ময়ী কালীমাতার বিগ্রহ স্থাপন করেন। দেবীর মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও পৌত্র মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা করেন। অভয়রাম বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন এবং পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া শক্তি সাধনা করিতেন। অভয়রামের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে পাণ্ডিত্যের জন্য 'চক্রবর্তী' উপাধি পান। অভয়রামের পৌত্র মুকুন্দরাম পরে পাষানময়ী কালী প্রতিষ্ঠা করেন।

এই চক্রবর্তী পরিবার পর্তুগীজ, ইংরাজ, ডাচ ও দিনেমারদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। অভয়রামের পৌত্র মুকুন্দরাম হুগলীতে ইংরাজদের সঙ্গে কমিশন এজেণ্টের কাজ করিতেন। অভয়রামের পৌত্র বিষ্ণুরাম সার্বভৌমের শাখায় **ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী ও মথুরামোহন চক্রবর্তী** কলিকাতায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া তৎকালীন ধনিকসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

ফকিরচাঁদ কলিকাতার ৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীটস্থ তদানীন্তন বিখ্যাত ঝাড়লণ্ঠন ব্যবসায়ী মেসার্স দা-সুজা কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি বা 'বেনিয়ান' ছিলেন এবং ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। ডাকটিকিট প্রচলিত হইবার আগে ভারতবর্ষে খামবিহীন পত্রের একখানি প্রতিলিপি ৩৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পত্রখানি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মির্জাপুর হইতে ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীকে দা-সুজা কোম্পানীর ঠিকানায় লিখিত হইয়াছিল দেখা যায়। কলিকাতার 'ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী লেন' নামে একটি রাস্তা তাঁহার জীবদ্দশাতে হয়। উক্ত

রাস্তা উত্তর কলিকাতা গরাণহাটায় এখনও আছে। জীরাটে ও কলিকাতায় তিনি প্রাসাদতুল্য ভবন নির্মাণ করেন এবং জীরাটে দুর্গাপুজার জন্য ঠাকুরদালান ও জোড়া শিবমন্দির ও হিন্দু ধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজা আজও অনুষ্ঠিত হয়। জোড়া শিবমন্দিরের গায়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

বিপ্র ফকিরচন্দ্রেন কৃতং শ্রীশিবমন্দিরম্

শকাব্দ ১৭৬৩, ১২৪৮ সাল

ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর পৌত্র মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে প্রথম ভারতীয় ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নয়নপুরে কাজ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশের দেবসেবায় দান করিয়া যান। সেই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এখন চক্রবর্তীবংশের পুজাপার্বন নির্বাহ হয়।

॥ গোস্বামী বংশ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর রামকানাই গোস্বামী গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন এবং জীরাটে **"রাধাগোপীনাথ"** বিগ্রহ স্থাপন করেন। জীরাটের বুড়োশিব মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর পরে রাধাগোপীনাথ ও মৃন্ময়ী কালী প্রাচীন বিগ্রহাদির মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিনয় ঘোষ লিখিয়াছেন। জীরাটের গোস্বামীদের বিবরণ বিবৃত করিতে হইলে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে আরম্ভ না করিলে তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীমদ নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু পুরীধামে জীবনের শেষ ষোল বৎসর বাস করেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে নাম প্রচারার্থে পাঠাইয়া দেন। প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় তীরে তাঁহার নাম ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম" প্রচারের প্রধান বাহকরূপে নিত্যানন্দ নীচ, পতিত, অনাদৃত, ধনী-দরিদ্র সকলকে হরিনাম কীর্তন দ্বারা জীব উদ্ধারের সহজ পথ দেখাইলেন। তাঁহার প্রচারের প্রবল স্রোতে দেশের লোকের বিষয়লিপ্সা ভাসিয়া গেল।

সেই সময় অম্বিকা কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেহত্যাগ করেন। সূর্যদাস কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দের সাক্ষাত পাইয়া তাঁহার নিকট কন্যাদের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তিনি বলেনঃ "এই কন্যা যদি মুঞি জীয়াইতে পারি। তবে মোরে কন্যা দিবে কহ সত্য করি।"

সূর্যদাস রাজি হইলেন এবং প্রভুর স্পর্শে মৃতের পুনর্জীবন লাভ হইল। নিত্যানন্দ দুই কন্যাকেই বিবাহ করেন।

বিবাহের পর নববধূদ্বয়সহ শ্রীনিত্যানন্দ কুমার কৃষ্ণদাসের বড়গাছী রাজবাড়ীতে কিছুদিন মহানন্দে অবস্থান করিলেন। উদ্ধারণ দত্ত প্রভুর বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকের অতুল ঐশ্বর্য—প্রভুর আদেশ পাইয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্রীপাট খড়দহে প্রভুর বাসের জন্য অট্টালিকা নির্মিত হইল। কথিত আছে সস্ত্রীক নিত্যানন্দ তত্রস্থ

ভূস্বামীর নিকট বাসস্থানের উপযোগী জমি প্রার্থনা করিলে জমিদার মহাশয় বিদ্রূপচ্ছলে গঙ্গার 'দহে' একখণ্ড খড় ফেলিয়া দেন ও বলেন ঐস্থানে বাস করিতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাবে দহের মধ্যে চর উত্থিত হয় এবং সেই সূত্রে উহার নাম হইল খড়দহ। খড়দহে আনন্দোৎসবের অভাব নাই, সুবর্ণবণিকগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেন, বিবিধ রত্নালঙ্কার ও বস্ত্রাদিদ্বারা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীর আনন্দ বর্ধন করিলেন। তথায় প্রভু পৈতৃক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সংসার করিয়া কিরূপে সংসারমুক্ত হইতে হয় তাহার একটি আদর্শ জনসমক্ষে ধরিলেন। এইরূপে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভসঞ্চার হইল এবং ক্রমে ক্রমে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু শ্রীঅভিরাম গোস্বামী প্রণাম করায় মরিয়া গেল। দ্বিজগোবর্ধন লিখিয়াছেন ঃ

"প্রভু ভৃত্য অভিরাম শুনিয়া সে পূর্ণকাম
প্রভু সন্তান প্রণমিতে যায়।
প্রণমিতে মৃত হয় এইরূপে ছয় যায়
বিষাদিত নিত্যানন্দ রায়॥"

অবশেষে বীরচন্দ্র নামে পুত্র ও গঙ্গা দেবী নামে কন্যা জীবিত রহিলেন। হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুভ দশহরা যোগে শ্রীবসুধা দেবীর অঙ্কে শ্রীগঙ্গা দেবী প্রকাশিত হইলেন। অভিরাম তাহাকেও প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। প্রবাদ আছে, অভিরামের প্রণামে যাহাতে দেবত্ব নাই এমন অনেক প্রতিমা ফাটিয়া-চটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। নিত্যানন্দের প্রিয় ছাত্র ও শিষ্য মাধবাচার্যের সহিত গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধবাচার্যে প্রভু কৈল কন্যা দান॥
বিবাহ করিল মাধব গুরুর আজ্ঞাতে।
গুরু আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে॥"

এই মাধবাচার্য কাশ্যপগোত্র সম্ভূত কমলনয়ন ভাগবতাচার্য মহাশয়ের পত্নী মহালক্ষ্মীর পুত্র এবং মহালক্ষ্মীর প্রিয় বান্ধবী জয়দুর্গার (গৌরীদাসের তৃতীয়া ভার্যা) পালিতপুত্র।

বিবাহের পর মাধবাচার্য শ্বশুরালয়ে সকলের আগ্রহাতিশয্যে কিছুকাল বাস করেন। তৎপরে প্রভু জামাতা চিরদিন শ্বশুরালয়ে থাকিলে পাছে তাহার কোনরূপ অযত্ন হয় এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সমৃদ্ধস্থান সুখসাগর গ্রামে তাঁহার বাসোপযোগী সুন্দর বাড়ী ও সম্পত্তি দান করেন। মহাপ্রভুর আদিষ্ট সংসার ধর্ম যতদূর সম্ভব সমাধা করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ বীরচন্দ্রের যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্বেই মহাপ্রস্থান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ সংসারে অবস্থানের শেষ কিছুদিন কৃষ্ণচৈতন্যের বিরহে দিবানিশি বিলাপ করিতেন এবং সময় সময় সংজ্ঞাও হারাইতেন। সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় কি ভাবে প্রভু অপ্রকট হন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

॥ সিদ্ধপুরুষ রামকানাই গোস্বামী ॥

গঙ্গাদেবীর নয়নানন্দ, প্রেমানন্দ ও গোপালবল্লভ নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গোপালবল্লভের রামকানাই, অনন্ত, কৃষ্ণ ও যাদবেন্দ্র নামে চারিটি পুত্র হয়। কালক্রমে

যখন সুখসাগর ভাগীরথীর গর্ভে নিপতিত হয় তখন রামকানাই গোস্বামী প্রভু গঙ্গার পশ্চিম তীর নির্জন ও ভজনোপযোগী মনে করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরাট গ্রামে উপস্থিত হন এবং কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, তিনি গামছা পাতিয়া খড়ম পায়ে দিয়া ভাগীরথীর পূর্বপারে অবস্থিত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম হইতে ভিক্ষা লইয়া শ্রীজাহ্নবীদেবীকে দিতেন এবং অপ্রাকৃতশক্তি প্রভাবে সামান্য ভিক্ষার সাহায্যে অতিথিসেবার ত্রুটী হয় নাই। রামকানাই প্রভু সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং ভজনপ্রভাবে অনেক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

যখন তিনি ঐ গ্রামে বাস করিতে থাকেন তখন সেখানে বিশেষ লোকবসতি ছিল না। সেই সময়ে গ্রামের নাম ছিল খোরদসা মহম্মদপুর এবং নবাবের এক কাছারীবাড়ী ছিল। রামকানাই প্রভু তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউকে লইয়া ঐ গ্রামে সাধনা আরম্ভ করিয়া গ্রামটিকে অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত করেন এবং গোপীনাথজীউর নাম হইতে গ্রামের নাম "জীউ" যত্র রাজতে শোভতে ইতি জীরাট হয়। রামকানাই প্রভু আজন্ম সংসার-বৈরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, জাহ্নবীদেবীর ভাতের হাঁড়ির কাঠি হইতে শ্রীমন্দিরের নিকটবর্তী সুবৃহৎ তেঁতুল গাছটী জন্মগ্রহণ করে—এই সিদ্ধ তেঁতুল গাছটীর কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ অদ্যাপিও বর্তমান। কয়েক বৎসর পূর্বে গাছটি নষ্ট হইয়া যায়। গাছটির গোড়ায় একটি গোফার মত ফোকর দেখা যাইত, যাহার ভিতর একজন লোক অনায়াসেই বসিয়া থাকিতে পারিত। এই গাছটির তলায় বহুদিন শ্রীবিগ্রহসহ বাস করিবার পর বর্তমান মন্দিরে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যাঁহার কৃপায় জঙ্গলাকীর্ণ খোরদসা মহম্মদপুর শ্রীপাট জীরাট নামে খ্যাত হইয়া অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থে পরিগণিত হইল, সেই শ্রীগোপীনাথের সেবার অধিকারী রামকানাই প্রভু এবং তাঁহার পর গঙ্গাবংশীয় গোস্বামী ও তাঁহাদের দৌহিত্রগণ কিরূপে অধিকারী হইলেন তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতমা পত্নী জাহ্নবীদেবী আখন্ড বন্ধ্যা ছিলেন এবং বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীভক্তমাল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে :

"কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীরূপ। অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবীস্বরূপ ॥"

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত শ্রীনরোত্তমের পঞ্চবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিখ্যাত খেতুরী গ্রামে মহামহোৎসব হয়। তাহাতে জাহ্নবীদেবী বিশেষ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। খেতুরী উৎসবের পর প্রভু-সন্তান বীরচন্দ্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করেন। কিছুদিন পর জাহ্নবীদেবীর উপস্থিতিতেই বসুধাদেবী স্বর্গারোহণ করেন। জাহ্নবীদেবী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ যেখানে আছেন সেই ঘেরায় বাস করিতে থাকেন এবং প্রতিদিন পরমপ্রীতি সহকারে শ্রীমূর্তি দর্শনাদি করিয়া থাকেন। কিছুদিন শ্রীধামে অবস্থান করিবার পর গৌড়দেশে প্রত্যাগমনের সংকল্প স্থির হইলে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, "তুমি গৌড়দেশে গমন করিয়া তোমার এক প্রতিমূর্তি এখানে পাঠাইয়া দিবে এবং সেই মূর্তি আমার বামে থাকিবে। এক্ষণে যিনি বামে আছেন তিনি দক্ষিণে বসিবেন।" নরোত্তম বিলাসে আছে :

"ঈশ্বরী অনেক রাত্রে করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিলেন দরশন॥
আপন গলার মালা দিয়া জাহ্নবীরে।
লহ লহ হাসিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে॥
মোর প্রিয়া দেখিয়া মনে করিয়াছ যাহা।
গৌড়দেশে গিয়া শীঘ্র পাঠাইবে তাহা।
তে'হ বামে বসিবেন এ'হ দক্ষিণেতে।
হইব যে শোভা তাহা পাইব দেখিতে॥
ঐছে কত কহি করে মন্দিরে গমন।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাহা করিলা দর্শন॥
শ্রীগোপীনাথের মালা রাখি সংগোপনে।
চলিলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দরশনে॥"

প্রতিমূর্তি গঠন সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ শ্রীজীব গোস্বামী ও পরমভক্ত নয়নভাস্করের সহিত আলোচনা করেন। শ্রীজাহ্নবীদেবী গৌড়ে আসিয়া শ্রীগোপীনাথজীউর আদেশমত সমস্ত কার্য করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিজ প্রতিমূর্তি প্রেরণ করিলেন। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে লিখিত আছে:

"সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিল সভাকারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী ই'হো আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না করি॥"

নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন:

"শ্রীপরমেশ্বরী দাস কহে ধীরি ধীরি।
নির্বিঘ্নে গেলাম বৃন্দাবনে শীঘ্র করি॥
সেবাধিকারীরে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা।
লৈয়া গেনু যাঁরে তাঁরে বামে বসাইলা॥
পূর্বে ঠাকুরাণী হর্ষে বসিলা দক্ষিণে।
হইল অদ্ভূত শোভা দেখিনু নয়নে॥"

অদ্যাপিও শ্রীগোপীনাথজীউর বামভাগে ঐ মূর্তি বিরাজিত আছে।

অতঃপর জাহ্নবীদেবী নিজেও গোপীনাথের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তদনুরূপ একটী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শ্রীগোপীনাথের প্রত্যাদেশ হইল—"তুমি যে প্রেমসেবা স্থাপন করিবে আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করিব কিন্তু তোমাকে এক কার্য করিতে হইবে, আমারজনকে অর্থাৎ অতিথিকে কখনও বিমুখ করিও না। অতিথিসেবা হইলেই আমার সেবা হইবে।" সেই হইতে একাল পর্যন্ত শ্রীগোপীনাথের সেবাইতগণ অতিথির বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। এখনও সর্বাগ্রে অতিথিকে প্রসাদ দিয়া তৎপর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে দিবার ব্যবস্থা আছে। জাহ্নবীদেবী বসুধার কন্যা গঙ্গাদেবীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে সুখসাগরেই তাঁহার আবাসে বাস করিতেন। গঙ্গাদেবীর স্নেহে বশীভূত হইয়া তিনি শ্রীগোপীনাথজীউর প্রেমসেবা তাঁহাকে অর্পণ করেন। সুখসাগরেই শ্রীগোপীনাথজীউর পাটবাড়ী ছিল। গঙ্গাদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র নয়নানন্দ প্রভু উদাসীন ছিলেন, সংসার আশ্রম করেন নাই। প্রেমানন্দ প্রভুও প্রথম অবস্থায় জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেন, সুতরাং গোপাল বল্লভই শ্রীগোপীনাথের সেবাধিকারী হন। ও তৎসূত্রে রামকানাই প্রভৃতি পুত্রগণ সেবাপ্রাপ্ত হন। দ্বিজ গোবর্ধন লিখিয়াছেন:

"গোপালের পুত্র চারি রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি
নামে যার গঙ্গা পার কৈল।
দামোদর গোপীনাথ কণ্ঠেতে করিয়া সাথ
তেঁতুল তলায় বাস কৈল॥
কল্পবৃক্ষ বর্তমান প্রভু পাশ বিদ্যমান
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল।"

শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর পৌত্র সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীরামকানাই প্রভু কর্তৃক আনীত শ্রীপাঠ জীরাটের এই প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থস্থান কালস্রোতে বড়ই শোচনীয়।*

॥ মুখোপাধ্যায় বংশ ॥

জীরাটের মুখোপাধ্যায়বংশে 'বাঙলার বাঘ' **স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ** করেন। এই বংশের আদি নিবাস দিগসুই গ্রামে ছিল। রামজয় মুখোপাধ্যায় জীরাটের গোস্বামীবংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ মাতার সহিত জীরাটে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। বিশ্বনাথের চার পুত্র হয়। দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, ও রাধিকাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র আশুতোষ। গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে ভবানীপুরে "গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড" নামে একটি রাস্তা আছে। তিনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে জীরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

॥ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাউথ সুবারবান স্কুল হইতে আশুতোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীবিনয় ঘোষ 'আশুতোষ বলাগড় উচ্চ বিদ্যালয়' হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন লিখিয়াছেন—তাহা ঠিক নয়। তাঁহার কন্যা কমলার বিধবা বিবাহের সময় জীরাটের কুলীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি জীরাটে যাওয়া বন্ধ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাড়ি বহুদিন পরিত্যক্ত ছিল এখন তাঁহার অন্যতম পুত্র বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জীরাটে বাস করেন এবং তথায় "আশুতোষ স্মৃতিমন্দির" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। স্যার আশুতোষ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে পরলোকগমন করেন। আশুতোষের গৌরবপূর্ণ জীবনের কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র বলিয়া বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

* ১৩৪৩ সালের ২৯শে শ্রাবণ স্বর্গীয় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 'সেবকবৃন্দে'র অবস্থা এবং ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি এদিকে পূর্ববৎ না থাকায় শ্রীমন্দিরের অবস্থা ও বিগ্রহ সেবা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এক আবেদন করেন। তাঁহার আবেদনে জনসাধারণ অর্থসাহায্য করায় মন্দিরের আংশিক সংস্কার হয়। ১৩৫৬ সালে ডাঃ জীবানন্দ গোস্বামী, বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় মন্দির সংস্কারকল্পে "শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউ মন্দির সংস্কার ও সেবাফণ্ড" গঠিত হইয়াছে।

আশুতোষকে দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতীয়তার অহঙ্কার করিতে পারে। সমাজে, আইনসভায়, বিচারালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র আশুতোষের খ্যাতি, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার ন্যায় শ্রমশীল ও পাঠানুরাগী ব্যক্তি একালে আমাদের দেশে বিরল। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদের ব্যক্তিগত পুস্তকাগারের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই পুস্তকালয়ে গণিতবিদ্যা-বিষয়ক বহু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থ আছে। তাঁহার পিতার জ্ঞানোজ্জ্বল ও স্নেহমধুর স্মৃতিতে বিমণ্ডিত বলিয়া তিনি এই পুস্তকালয়ের পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি এই অমূল্য পুস্তকসমূহ তাঁহার পুত্রগণ কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। কলিকাতা এ্যাসপ্লানেডের মোড়ে সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীগণের অর্থে একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার নামে কলিকাতার একটি প্রধান রাস্তা ও একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী যোগমায়াদেবীর নামেও কলিকাতায় একটি মহিলা কলেজ আছে। আশুতোষের মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "জগত্তারিণী পদক" তাঁহার স্মৃত্যার্থে প্রতিষ্ঠিত।

আশুতোষের নশ্বরদেহ কালীঘাট কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যে স্থানে ভস্মীভূত করা হয়, তথায় একটি মর্মর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে ঃ

স্মরণীয়

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর।
তোমার জীবন তাঁর মহিমা ঘোষিল নিরন্তর॥
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়।
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়॥

আশুতোষের চার পুত্র রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ, ও বামাপ্রসাদ পিতার ন্যায় বিনয়ী পবিত্রচেতা ও কর্তব্যকুশল। তন্মধ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত বলিয়া প্রখ্যাত। ভারতের শ্রমমন্ত্রী থাকাকালে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি "চিত্তরঞ্জন" নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতকে অন্যতম ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করিয়া দেন। তাঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্য, মহত্ব, বিনয়, নিরহঙ্কার ও রাজনীতিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অধুনা দুর্লভ। ভারতীয় জনসঙ্ঘ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের উন্নতিকল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভবানীপুরে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন কাশ্মীরে তিনি আটক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি কলেজ ও একটি বড় রাস্তা এবং চুঁচুড়ায় ও কলিকাতায় শ্যামাপ্রসাদের নামে দুইটি বিদ্যালয় হইয়াছে।

স্যার আশুতোষ তাঁহার কন্যা [illegible] পরলোকগমনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

একটি বক্তৃতামালার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধারযোগ্য :

স্যার আশুতোষের দান ॥ চল্লিশ হাজার টাকা

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোন ভারতীয় বিষয়ে প্রোফেসারশীপের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ৪০,০০০ দান করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে বাৎসরিক একহাজর টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহাকে দুই শত টাকা মূল্যের একটি মেডেলও দেওয়া হইবে। এই অধ্যাপক প্রত্যেক বৎসর নিযুক্ত হইবেন। স্যার আশুতোষের মৃতা কন্যা কমলাদেবীর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইবে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীরাটের অধিবাসী। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং বলাগড় হাই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে তিনি ওকালতি করেন। অশোকগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার কাব্যশক্তির পরিচায়ক। ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এবং ৪৫৯ পৃষ্ঠায় চারুচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে পুনরুল্লিখিত হইল না।

সুসাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদার জীরাটে জন্মগ্রহণ করেন।

জীরাটের নাগবংশ যশোহর জেলার সামন্তাবাশবেড়ে (পরে নদীয়া জেলা) গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। নাগবংশের পূর্বপুরুষ রাধাকান্ত নাগের জ্যেষ্ঠ পুত্র **রামরাম নাগ** শেওড়াফুলি দশ-আনি রাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি জীরাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং গোস্বামী ও চক্রবর্তীদের আগ্রহে পিতাকে গঙ্গাযাত্রার প্রলোভন দেখাইয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। নাগ বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ নাগ গোপীনাথজীউর নামানুসারে জীরাট নামকরণ হয় বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জীউ-এর "জী" "রা"-অর্থ দান করা এবং "ট" অর্থ পদ। প্রভু চরণ দান করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম জীরাট হয়। পদকল্পতরু অভিধানে "র" এবং "ট" শব্দের এই অর্থ আছে।

নাগ বংশের বসবাসের জন্য শেওড়াফুলির রাজা মহাশয় ১৯ একর ৭৬ শতক মহাত্রাণ জমি দান করেন। রামরাম নাগ তাঁহার দুই ভ্রাতা রামশঙ্কর ও শ্যামসুন্দরসহ জীরাটে আসেন। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীধরজীউ জাগ্রত দেবতা বলিয়া কথিত। জীরাটে নাগ বংশের দুর্গোৎসব সুপ্রাচীন। হরিপ্রসন্ন নাগ তাঁহার পিতার স্মরণার্থে লক্ষ্মীনারায়ণ শিব প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যা, বিনয়, সততা প্রভৃতি গুণের জন্য এই বংশ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্যামসুন্দরানন্দ ও হরিস্মরণানন্দ অবধূত এই বংশের সন্তান।

॥ পাটুলি ॥

বলাগড় থানার মধ্যে পাটুলি প্রাচীনতম গ্রাম। জীরাট স্টেশনের পশ্চিমে এক মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। পাটুলির মঠবাড়ি হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। মঠবাড়িতে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গার দুইটিমাত্র হাত বাহিরে দেখা যায়। বাকি আটটি হাত পিছনে অপ্রকট থাকে। ইহা ছাড়া দুর্গার দক্ষিণে কার্তিক ও বামে গণেশ থাকে। এই ধরনের অদ্ভুত দুর্গাপূজা জেলার আর কোথাও হয় না। পূজার ছাগবলি

হয় এবং বলির পর ছাগলটিকে ছাড়াইয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হয় এবং উহার সহিত মাসকলাই, দই, দূর্বা মিশাইয়া চতুষ্কোটি যোগিনীদের উৎসর্গ করা হয়। দুর্গা-পূজার সময় সন্ধিপূজা হয় না। পূর্বে এই স্থানে তান্ত্রিক আচারে পূজা হইত এবং নরবলি হইত। এখন পিটুলির নরপুত্তলিকা পূজায় বলি দেওয়া হয়। মঠবাড়ির দেবী "মঠের মা" বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামের দুর্গাপূজা একটি দেখিবার জিনিস। এই বংশের পূর্বপুরুষ বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বর্ধমান জেলায় এই নামে আর একটি গ্রাম আছে। ভারতের অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র পাটলিপুত্রের নামের অনুকরণে গ্রামের নাম পাটুলি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

॥ বাকুলিয়া ॥

বাকুলিয়া হুগলী জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত। জি. ডি. ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানীর পরিচালনায় মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় রবার, ফায়ার-ব্রিক্‌স্‌ প্রভৃতির ব্যবসা দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। হুগলী জেলা বোর্ডের সভা-পতি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের সন্তান। দান-ধ্যানের জন্য এই বংশের খ্যাতি বহুদিন হইতে আছে। ৫৬৯ পৃষ্ঠায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগে ইঁহাদের কথা লিখিত আছে।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে স্বাধীনতা আন্দো-লনের মঙ্গল-ঘট তিনিই প্রথম স্থাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ৪৩৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। গ্রামে বাজার, পোষ্ট অফিস, বিদ্যালয়, পাঠাগার আছে।

॥ সিজা ॥

বলাগড় থানার মধ্যে সিজা একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত গণ্ড গ্রাম। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দীক্ষাগুরু দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামকানাই বাচস্পতি দিগসুই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি খামারগাছির ব্রাহ্মণদের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার আট পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পুত্রগণ সকলেই কৃতি পণ্ডিত বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তাহাদের টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিত। রামকানাই-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পণ্ডিত রামধন ন্যায়পঞ্চানন ও মধ্যম পুত্রের নাম পণ্ডিত রামরতন তর্কালঙ্কার। রামরতন আড়াই বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। সেই আড়াই বৎসরের শিশুর নাম দুর্গা-চরণ, যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত হন।

দুর্গাচরণ সিজায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বসবাস করেন। একবার কাশ্মীরের মহারাজা ত্রিবেণীতে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। তিনি বহু অধ্যাপক লইয়া আসেন এবং এই দেশের বহু অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হন। সেই সভায় দুর্গাচরণের নিকট সকল অধ্যাপক পরাস্ত হন। তাঁহার কাদম্বরী ও নব্যন্যায়ের টীকা পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় হইয়াছিল। ষড়দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপ হইতে তিনি "ন্যায়লঙ্কার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ৯৫ বৎসর বয়সে তিনি সস্ত্রীক পরলোক-

গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র ডাক বিভাগের ইন্সপেক্টর ও নিবারণচন্দ্র পোস্টমাস্টার ছিলেন।

সিজা গ্রামে আরও কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ বংশ আছে। এই সব বংশেও বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়, সাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। রঘুনাথ শতাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া নীলকুঠির দেওয়ান হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাবজজ শ্যামাধন মুখোপাধ্যায়, পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে সৎকর্মাদি করেন বলিয়া শুনা যায়। গ্রামে তিলি বংশীয় নন্দীগণ এক সময় দানধ্যানাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহাদের বিরাট দুর্গাপূজার দালান ও বসতবাটি এখনও বর্তমান আছে। নন্দী বংশে গোবিন্দ নন্দী, গোপীনাথ নন্দী, রামচন্দ্র নন্দী ও তাঁহার পুত্র মুন্সেফ মহেন্দ্রনাথ নন্দী খুব পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

সিজা গ্রামে দুই ঘর বর্ধিষ্ণু কায়স্থ বংশও আছে। এ ছাড়া গ্রামে 'মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার', বাজার, ডাক্তারখানা, পোস্টঅফিস আছে। সিজার পশ্চিম দিকে **কামালপুর** গ্রাম এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামের রত্নেশ্বর খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। রায় বংশ বড় বাড়ি, সাতানী বাড়ি, ছোট বাড়ি এবং নূতন বাড়ি বলিয়া গ্রামে পরিচিত। সাতানী বাড়ির ধুবড়ির প্রসিদ্ধ উকিল উপেন্দ্রনাথ ও তাহার পুত্র যতীন্দ্রনাথ (উকিল) এবং সৌরেন্দ্রনাথ চিকিৎসা ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করেন। ইহা ছাড়া বিলাসীপাড়া স্টেটের দেওয়ান মাখনলাল ও তাহার দুই পুত্র পোর্ট কমিশনারের ইঞ্জিনিয়ার বিমলনাথ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের জিওলজির অধ্যাপক নির্মলনাথও সর্বত্র সুপরিচিত।

ছোটবাড়ির সুবোধচন্দ্র রায় পাটনা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমোদচন্দ্র কটক হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। নূতন বাড়ির হীরেন্দ্রনাথ আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই বংশের সুনীলচন্দ্রের ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরে কোর্ট-মার্শাল হইয়া ২৩ বৎসর বয়সে প্রাণদণ্ড হয়। তিনি কম্যান্ডিং এ্যাসিটেন্ট ছিলেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁহার শাস্তি হয়। কামালপুরের লোকসংখ্যা ৭৮০ জন।

কামালপুরের পশ্চিমে বেহুলা নদী তীরে **চন্ডীগাছা** ও দক্ষিণে **দাদপুর** গ্রাম চন্ডীগাছায় স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পূর্বে টোল ছিল। বহু ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিত। এখন সে টোল আর নাই। দাদপুরে সদ্গোপ বংশীয় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অঘোরচন্দ্র ঘোষ সাবজজ ছিলেন। অঘোরের পুত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ জজ হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের পুত্রগণ কলিকাতা পুলিশের পদস্থ কর্মচারী এবং সকলেই কলিকাতায় বাস করেন। দাদপুরের জনসংখ্যা ৩৬২ জন।

॥ খামারগাছি ॥

খামারগাছি এই অঞ্চলে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। খামারগাছির বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের নাম স্ব-সমাজের গন্ডী অতিক্রম করিয়া বাংলার বাহিরে পর্যন্ত গিয়াছে। জনশ্রুতি কৃষ্ণনগরে কোন বিবাহ সভায় 'মালা-

চন্দন' দান উপলক্ষে কৃষ্ণনগরের রাজার সম্মান কিছু খর্ব হয় বলিয়া তিনি 'কেশুরকুলী' দোষযুক্ত করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া বহু কুলীন তথা হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন গঙ্গায় নৌকাডুবি হইয়া বিপন্ন হন। পরে তাঁহারা কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিয়া বাগেশ্বরপুরে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হন এবং খামারগাছি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের পূর্বপুরুষ জয়রাম চক্রবর্তী পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধর তারিণীচরণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হাজারিবাগে যান। তখন রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন ছিল এবং পূর্বোক্ত অঞ্চল সমূহ 'নন রেগুলেটেড' স্থান ছিল।

হাজারিবাগে এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে **কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের** নাম উল্লেখ্য। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা ২৬ সাদার্ন এভিনিউ-তে বাস করেন এবং "হুগলী জেলা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়া জেলার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার "রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন" নামে একখানি পুস্তক আছে।

খামারগাছির পার্শ্ববর্তী গ্রাম **মোক্তারপুর** পূর্বে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৭৮২ জন। কিন্তু খামারগাছি গ্রামের পূর্বসৌন্দর্য এখন আর নাই। গ্রামের জনসংখ্যা ১৮৮ জন।

খামারগাছির পূর্বে **বাগেশ্বরপুর** গ্রামের বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ধুবড়ীর সরকারী উকিল এবং নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. বি ডাক্তার ছিলেন। পূর্বে জগৎচন্দ্র মজুমদার এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহার বংশধরগণ গ্রামে বাস করেন। এই বংশের অন্য ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদারের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম কমলাকান্ত ও রাধাকান্ত। রাধাকান্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বাগেশ্বরপুরে গঙ্গার চড়ায় রেলওয়ে কোম্পানীর একটি ইটখোলা আছে। বাগেশ্বরপুরের লোকসংখ্যা ৪২৭ জন।

বাগেশ্বরপুর গ্রামের উত্তরে **রুকেশপুর** মুসলমান ও মাহিষ্য অধ্যুষিত গ্রাম। রুকেশপুরের নিকট **হাতীকান্দা** এক সময় বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। কায়স্থ মজুমদার ও মিত্র বংশ এই স্থানের জমিদার ছিলেন। বহুবিধ সৎকর্ম ও দানধ্যানের জন্য তাহাদের সুনাম ছিল। বর্তমানে তাহাদের বংশধরগণ কলিকাতায় বাস করেন বলিয়া গ্রামের পূর্বসৌন্দর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রুকেশপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৭৬২ জন। হাতীকান্দা গ্রামের লোকসংখ্যা ২৭১ জন।

॥ পারাম্বুয়া ॥

সদর মহকুমায় পারাম্বুয়া প্রাচীনকালে শাঁখারী-অধ্যুষিত একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম বলিয়া খ্যাত ছিল। শাঁখারী ও গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বহু কীর্তিকলাপের চিহ্ন এখনও এই গ্রামে বিদ্যমান আছে। পূর্বে প্রায় সাতশত ঘর শাঁখরীর পারাম্বুয়ায় বসবাস ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কলেরা মহামারীরূপে গ্রামে আবির্ভাব হওয়ায় সমস্ত শাঁখারী সম্প্রদায় এক

সপ্তাহে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও তখন ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। বর্তমানে মাত্র সাত ঘর শাঁখারী গ্রামে বাস করে।

গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তাহার মধ্যে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের **বিশ্বনাথ দত্তের** পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **চণ্ডীমন্দির**, কালিকামোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত **কালীমাতার মন্দির** এবং তারাচাঁদ দত্তের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **কৃষ্ণবলরাম জীউর** দোলমঞ্চ ও নাটবাংলা উল্লেখ্য। চণ্ডীমন্দিরে অবস্থিত দুর্গামূর্তি এখন আর মন্দিরে নাই। মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকার্য একসময় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কিন্তু কালপ্রবাহে মন্দির এখন ধ্বংসোন্মুখ। মন্দিরের গায়ে "শ্রীরাম শুভমস্তু—শকাব্দ ১৬৯৪" এই কথা উৎকীর্ণ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব একটি স্থাপত্যরীতি আছে, আজ তাহা চিরদিনের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষের দেখিবার চক্ষু বর্তমানে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যরীতি চিরকালের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। হুগলী জেলার সর্বত্র সে রীতির নির্দর্শনগুলি প্রায় সমস্তই এখন ধ্বংসোন্মুখ। এইগুলি ধ্বংস হইলে সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় চিরতরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবে।

কালীতলায় কালীমাতার মন্দিরের উপরিভাগ ভগ্ন হইলে উহ ফেলিয়া দিয়া মন্দিরটি ছোট করা হয়। মন্দিরের মধ্যে বহু চিত্র অঙ্কিত আছে। উপরের সারিতে চারখানি চিত্রের শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই চারখানি চিত্রের মধ্যে প্রথমটি কদম্ব-বৃক্ষের তলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্তি, দ্বিতীয়টি শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মূর্তি ও তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ, তৃতীয়টি কালীমাতার মূর্তি এবং চতুর্থটি রামের রাজ্যাভিষেকের চিত্র।

ইহা ছাড়া নীচের সারিতে আটটি কুলুঙ্গীর মধ্যেও আট রকমের চিত্র আছে। তার মধ্যে মঙ্গলঘট, শিবলিঙ্গ ও ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দর্শনীয় বস্তু। সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, দোলমঞ্চ এবং দুর্গাপূজার ঠাকুর দালান এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ দত্তের পূর্বপুরুষ কর্তৃক এইসব দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর দালানের গায়ে "সমাধা ১৭৫১ সন ১১৫৭—এই দালান তৈয়ার করে" বলিয়া লেখা আছে। ইহাদের এখন আর পূর্বাবস্থা নাই; শ্রীকানাইলাল দত্ত বর্তমানে এই বংশের বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি। পারাম্বুয়া-সাহাবাজারের অন্যান্য বিবরণ ৮১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

পূর্বে গ্রামে রায় ও চৌধুরী বংশের অবস্থা ভাল ছিল। আজও গ্রামের মধ্যে নন্দ চৌধুরীর নাম সকলে ত্রাসের সহিত স্মরণ করে। তাঁহার নামে একটি বড় দীঘি আছে। রায়-বংশের লোকেরা এই গ্রাম ছাড়িয়া নলথোবায় যাইয়া বসবাস করেন। ইহারা জাতিতে কায়স্থ। গ্রামে এখন আর কোন কায়স্থ নাই। দুই-ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন—এক ঘর চক্রবর্তী ও আর এক ঘর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাটতলার ব্রহ্মঠাকুর বহু প্রাচীন বলিয়া কথিত। এই স্থানে প্রতিবৎসর বারোয়ারী পূজা হয়। গ্রামের মধ্য দিয়া কানানদী প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর অপর পারে সরমপাড়া গ্রামে কৃষ্ণবলরাম জীউর সুন্দর বিগ্রহ আছে। প্রতিবৎসর দোল ও রাসের সময় বিগ্রহকে শোভাযাত্রা করিয়া পারাম্বুয়ায় আনা হয় এবং তদুপলক্ষে যাত্রা, কথকথা প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান বহু

প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাঁখারী সম্প্রদায়ের দ্বারা দোলমঞ্চ ও নাটবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন শাঁখারীদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় গ্রামবাসিগণ সমবেতভাবে প্রাচীন উৎসবগুলি পরিচালনা করেন। গোপালচন্দ্র দত্ত ও পূর্ণচন্দ্র দত্তের পূর্বপুরুষ এই সকল কীর্তির প্রবর্তক ছিলেন।

গোপীনগর বাস স্ট্যান্ড হইতে পারাম্বুয়ার দূরত্ব প্রায় চার মাইল। কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় অবস্থাপন্ন লোক সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বি-পি-রেলওয়ের গোপীনগর স্টেশন এই গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। রেলটি উঠিয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলের দুর্দশা আরও বাড়িয়াছে।

পারাম্বুয়া যাইবার পথে বান্না একটি তন্তুবায় প্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে জোড়া শিবমন্দির ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তন্তুবয়াগণ সমবেতভাবে গ্রামে দোল-দুর্গোৎসব ও জনহিতকর কার্যে সর্বদা অগ্রণী বলিয়া গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বান্নার পর গোবিন্দপুর গ্রামে একটি ছোট মসজিদ আছে। উহার গঠনপ্রণালি হিন্দু-মন্দিরের মত।

॥ বলাগড়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ॥

বলাগড় থানার সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন: বাংলার প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায়—আর্য ও অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণে ও তার সঙ্গে পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে রাঢ়ের নিজস্ব এক ধর্মের উদ্ভব হয়,—যাকে বলা হয় তন্ত্রধর্ম। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এই তন্ত্রধর্মকে কেন্দ্র করে রাঢ়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, রাঢ়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, রাঢ়ের গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের 'বলরামগড়' (আধুনিক কালের বলাগড় থানা) অঞ্চল এই নব-রূপা সংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করেছে।

উত্তরে ও পূর্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হুগলী জেলার মগরা থানা ও পশ্চিমে বর্ধমান জেলার কালনা থানা—এই চতুঃসীমার মধ্যে ৪৮৩২১·১৪ একর পরিমিত স্থলভাগ ও তার সঙ্গে ভাগীরথী নদীর ২৫৮৩·৬৫ একর জলভাগ—সর্বমোট ৫০৯০৪·৭৯ একর বা ৭৯·৫৪ বর্গমাইল পরিমিত ও ৬৭,৬১০ জন অধিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে হুগলী জেলার সদর মহকুমার বলাগড় থানা বিস্তৃত। বলাগড়ে থানা সৃষ্টির পূর্বে এই অঞ্চল বেণীপুর থানার (বর্তমানে মগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম) অন্তর্ভুক্ত ছিল। নদীর মধ্যে প্রধান হলো ভাগীরথী—যার 'পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল' বলে বিদ্বৎসমাজের বসতিতে পরিণত হয়েছিল আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী হ'তে। এর পরেই উল্লেখযোগ্য—একদা বিপুলকায় ও অধুনা শীর্ণকায় সরস্বতী নদী,—যার তীরস্থিত সপ্তগ্রাম খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও রাঢ়বঙ্গের রাজধানী ও আন্তর্জাতিক বন্দর ছিল। আরও দুটি নদী আছে, —একটি দামোদর কন্যা বেহুলা—পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে ভাগীরথী ও দামোদরের মিলিত জলরাশি বহন করতো স্ফীতকায়া হ'য়ে; অপরটি কুন্তী,—যার প্রচলিত নাম মগরা খাল। হ্রদের মধ্যে দেকোল হ্রদ,—পশ্চিমবাংলার অতিকায় হ্রদ, অধুনা ম্রিয়মাণ। এ ছাড়া অসংখ্য বিল, বাঁওড় ও খাল বলাগড় থানার নদীগুলির পরিবর্তিত গতিপথের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আট মহাগ্রাম (union) নিয়ে বলাগড় থানা গঠিত। মহাগ্রামগুলির নাম,—বাকুলিয়া,

ধোবাপাড়া, গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, শ্রীপুর-বলাগড়, সিজা-কামালপুর, ডুমুরদহ-নিত্যানন্দপুর, এক্তারপুর ও মহীপালপুর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে নবদ্বীপরাজ রাঘব রায়ের পীড়ন হ'তে কৌলীন্য রক্ষার জন্য ফুলিয়ার কুলীন বলরাম মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া ত্যাগ করে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে আটিসেওড়া গ্রামের একাংশে বর্ধমান মহারানী প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিতে গড়-বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস করেন। বলরামের নামানুসারে ঐ অঞ্চলের নাম হয় 'বলরামগড়'—অপভ্রংশে দাঁড়ায় 'বলাগড়'।

বলাগড় থানার সংস্কৃতিধারায় বৈষ্ণবধর্মোদ্ভূত সংস্কৃতির ধারাও মিশেছে। তন্ত্রধর্মের প্রাবল্যে এই সংস্কৃতি থানার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু অনেক জায়গাতেই তন্ত্রধর্মের সঙ্গে এর সহাবস্থান লক্ষণীয়। গুপ্তিপাড়ার শৈবমঠে সত্যানন্দের পাট, জিরাটে মাধবাচার্যের পাট ও যশড়াতে জগদীশের পাট—এই সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বলাগড় থানার বিশেষ আকর্ষণ এর দেবদেউলগুলি। পঞ্চদশ শতাব্দী হ'তে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে "বাংলারীতি" বলে রাঢ়ের মন্দির স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছিল ও বহির্বঙ্গেও জনপ্রিয় হয়েছিল, সেই বাংলা রীতিতেই এই মন্দিরগুলি নির্মিত। গুপ্তিপাড়া ও সুখড়িয়ার জোড়বাংলা, এবং সোমড়ার আটবাংলা ও ষোলবাংলা মন্দিরগুলি বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যরীতির গৌরবময় ও অধুনা অবহেলিত এবং ধ্বংসোন্মুখ নিদর্শন। ষোলবাংলা মন্দিরটির মধ্যে বাংলারীতির সঙ্গে দক্ষিণের দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির ও উড়িষ্যার পীরা বা ভদ্রদেউলরীতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া থানার বিভিন্ন অঞ্চলের পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরগুলি ও গুপ্তিপাড়ার রামসীতা, সুখড়িয়ার আনন্দময়ী প্রভৃতি মন্দিরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির কারুকার্য বলাগড় থানার মন্দির স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন।

মিথিলার অধীনতাবিমুক্ত হয়ে রঘুনন্দন যে নব্যন্যায় চর্চার প্রবর্তন করেন, বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়া তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এই নব্য ন্যায়কে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালে বলাগড় থানার বিদ্বৎসমাজের প্রতিভা—থানার গণ্ডী ছাড়িয়ে বহির্বঙ্গে,—সুদূর কাশী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান্ পুরুষ হলেন রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য।

রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য (আঃ ১৫৮০-১৬৬০) গুপ্তিপাড়ার অবসথী চট্টোপাধ্যায় বংশোদ্ভূত। ইনি নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের ছাত্র। ইনি আশ্চর্য কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন ও এই কবিত্বশক্তির জন্য 'শতাবধান' উপাধি পান। ইনি প্রথমে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হ'ন ও পরে সেখান হ'তে আগ্রার অনতিদূরে ইন্দুরখী নগরে গৌড়রাজ কৃপারামের রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত হন। রাঘবেন্দ্রের দু'খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়—'রামপ্রকাশ' ও 'মন্ত্রার্থ দীপ'। শেষোক্ত গ্রন্থের পুঁথি অনাবিষ্কৃত। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'রামপ্রকাশে'র পুঁথি নবদ্বীপে আবিষ্কার করেন। কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাঘবেন্দ্রের পুত্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বিদ্যালঙ্কার (আঃ ১৬১০-১৬৭০ খৃঃ) পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হন। ইনি প্রথমে পিতার কাছে, পরে কাশীর প্রখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনন্দন ন্যায়ালঙ্কারের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। পাঠশেষে কাশীতে অধ্যাপনা বৃত্তিতে

তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন ও পরে গৌড়রাজ কৃপারামের পৌত্র যশোবন্ত সিংহের রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি গ্রন্থ,—'বিম্বন্মোদতরঙ্গিনী', 'মাধবচম্পু' 'বৃত্তরত্নাবলী ও 'কাব্যবিলাস' মুদ্রিত হয়। কাশীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বলাগড় থানার বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে দেবীবর ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও ভরত মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা উভয়েই গুপ্তিপাড়ার সন্তান। দেবীবরের প্রবর্তিত কুলীন সমাজের মেলবন্ধন দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ভরত মল্লিক ভুরশুটরাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভাপতি ছিলেন ও 'চন্দ্রপ্রভা', 'রত্নপ্রভা' এবং ভট্টিকাব্যের টীকা লিখে যশস্বী হন।

বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে সিদ্ধ মহাত্মা সত্যানন্দ সরস্বতীর শঙ্কর মঠের (শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মঠের) প্রতিষ্ঠা বলাগড় থানার সংস্কৃতির ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়। এই অধ্যায়ে নূতন ধারা যোজিত হয়,—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ মঠের মঠাধীশ সিদ্ধ রামানন্দ আশ্রমের 'দোকালিকাপীঠের প্রতিষ্ঠায়।

বলাগড় থানার বিংশশতাব্দীর বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে জিরাটের সন্তান স্বনামধন্য পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কোম্পানী আইনের সংশোধক গ্রন্থ রচয়িতা গুপ্তিপাড়ার সুশীলচন্দ্র সেনের নাম স্মরণীয়। এ ছাড়াও আছেন—লেখক দুর্গাচরণ রায় (সোমড়া), বিপিনমোহন সেন (সোমড়া), নাট্যকার ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (সোমড়া), নাট্যকার প্রদ্যুম্নচন্দ্র ভট্টাচার্য (গুপ্তিপাড়া), উপন্যাস লেখক শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গুপ্তিপাড়া) ও লেখক ডাঃ গুরুদাস রায় (বলাগড়)।

বলাগড় থানার মেলা ও লোকোৎসবের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ভাণ্ডার লুঠ, রামনবমী মেলা ও দোলযাত্রা, শ্রীপুরের রাসযাত্রা, সোমড়ার বুড়ো-শিবের গাজন, মুণ্ডুখোলার ধর্মের জাত ও ইনছুড়ার ঝাঁপান মেলা প্রসিদ্ধ। বলাগড় থানাই বারোয়ারী পুজোর প্রবর্তক এবং বাংলার গ্রাম-বারোয়ারী 'বিন্ধ্যবাসিনী জগদ্ধাত্রী পূজা ইংরেজী ১৭৫৯-৬০ সালে গুপ্তিপাড়ায় আরম্ভ হয়ে আজও চলছে।

প্রাচীনকালে শিল্পে ও বাণিজ্যে বলাগড় থানার স্থান নগণ্য ছিল না। বলাগড় যে এককালে নৌ-শিল্পের কেন্দ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই নৌ শিল্প আজও আছে তবে ম্রিয়মাণ। বলাগড় থানার তাঁতের কাপড়, কাগজ, চিনি ও কাঁচাগোল্লা নামে গুপ্তিপাড়ার মিষ্টান্ন একদা বিদেশে রপ্তানী হতো। গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গাতীরে দেওয়ান গোকুল ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত গোকুলগঞ্জ ও শ্রীপুর, বলাগড়, মহাগ্রামে রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত হাট দেওয়ানগঞ্জ প্রাচীনকালে বলাগড় থানার উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

বলাগড় থানার সংস্কৃতি বিদ্বৎসমাজ ও মহাপুরুষ সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এর সংগ্রামী ঐতিহ্যও আছে। তার এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবরণ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। সপ্তগ্রামকে রাজধানী করে খৃঃ পূঃ ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে যে দুর্দ্ধর্ষ গদাধরড়ীরা দক্ষিণ রাঢ় শাসন করতো, বলাগড় থানা অঞ্চল নিঃসন্দেহে তাদের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এই গদাধরড়ীদের ইতিহাসে আজও অনাবিষ্কৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীরা বলাগড় থানার চাঁদরা গ্রাম লুণ্ঠন করেছিল, সে সময় বাঁশবেড়িয়া রাজ তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে

বিতাড়িত করেন। গুপ্তিপাড়ার বাগ্দী অধিবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে তীর ধনুর সাহায্যে বাগ্দীদের প্রতিরোধ চেষ্টা করেছিল—এ কাহিনী আজও গ্রামবৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেনাপতি মাণিকচাঁদ (গুপ্তিপাড়া) ও বিংশ শতাব্দীতে শ্রীভূপতি মজুমদার (গুপ্তিপাড়া) ও আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় (গুপ্তিপাড়া) বলাগড় থানার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক। সোমড়ার রামচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী 'চাঁদরাণী' নাগা আক্রমণকালে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা হয়ে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। গুপ্তি-পাড়ার অধিবাসিগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক জনশ্রুতি আছে—পলাশীর সেনাপতি রাজা মোহনলাল ও মীরমদন গুপ্তিপাড়ার সন্তান ছিলেন। এই জনশ্রুতির সমর্থনে কোন প্রামাণ্য তথ্য অবশ্য আবিষ্কৃত হয় নি।

বিপ্লববাদ ও জাতীয় আন্দোলন বলাগড় থানায় ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হয় নি। সম্ভবতঃ এর কারণ বলাগড় থানার বিদ্বৎকেন্দ্রিক গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বলাগড় থানা সক্রিয় অংশ গ্রহণে বিরত ছিল না। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বলাগড় থানার শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গুপ্তি-পাড়া) হুগলী জেলা অন্যতম প্রধান কর্মী ও যুবনেতা ছিলেন। শিশিরকুমারের মতো প্রতিভাশালী, তেজস্বী, নৈষ্ঠিক কর্মী ও সংগঠক আজকাল বিরল। বলাগড়ের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ গুরুদাস রায় অসহযোগ আন্দোলনে এবং খামারগাছির চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালের ও ১৯৩৯ সালের জাতীয় আন্দোলনে রতিকান্ত ঠাকুরের বংশীয় সোমড়া-কোলড়ার ডাঃ শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায়, মশড়ার জৈনুদ্দিন, শ্রীপুরের শ্রীরাধানাথ মুস্তাফী, গুপ্তিপাড়ার উৎসব রাউৎ, ইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি অনেক কর্মী কারাবরণ করেন। হুগলী বিদ্যামন্দিরের অক্লান্ত কর্মী রতনলাল গাঙ্গুলীর কর্মকেন্দ্র ছিল বলাগড় থানা। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়ায় শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে ৭২ ঘণ্টা অজ্ঞাতবাস করেছিলেন।

বলাগড় থানার ঐতিহাসিক উপাদান আজ বিক্ষিপ্ত ও অবহেলিত। এগুলি সংগ্রহ করে, বিচার করে সূত্রবদ্ধ করলে প্রাচীন হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বলাগড়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা পাওয়া যাবে।

চন্দননগর
স্কেল
0
মাইল
উত্তর
পূ
দ
জি টি রোড
ইস্টার্ণ রেলওয়ে
চন্দননগর ষ্টেশন
ষ্টেশন রোড
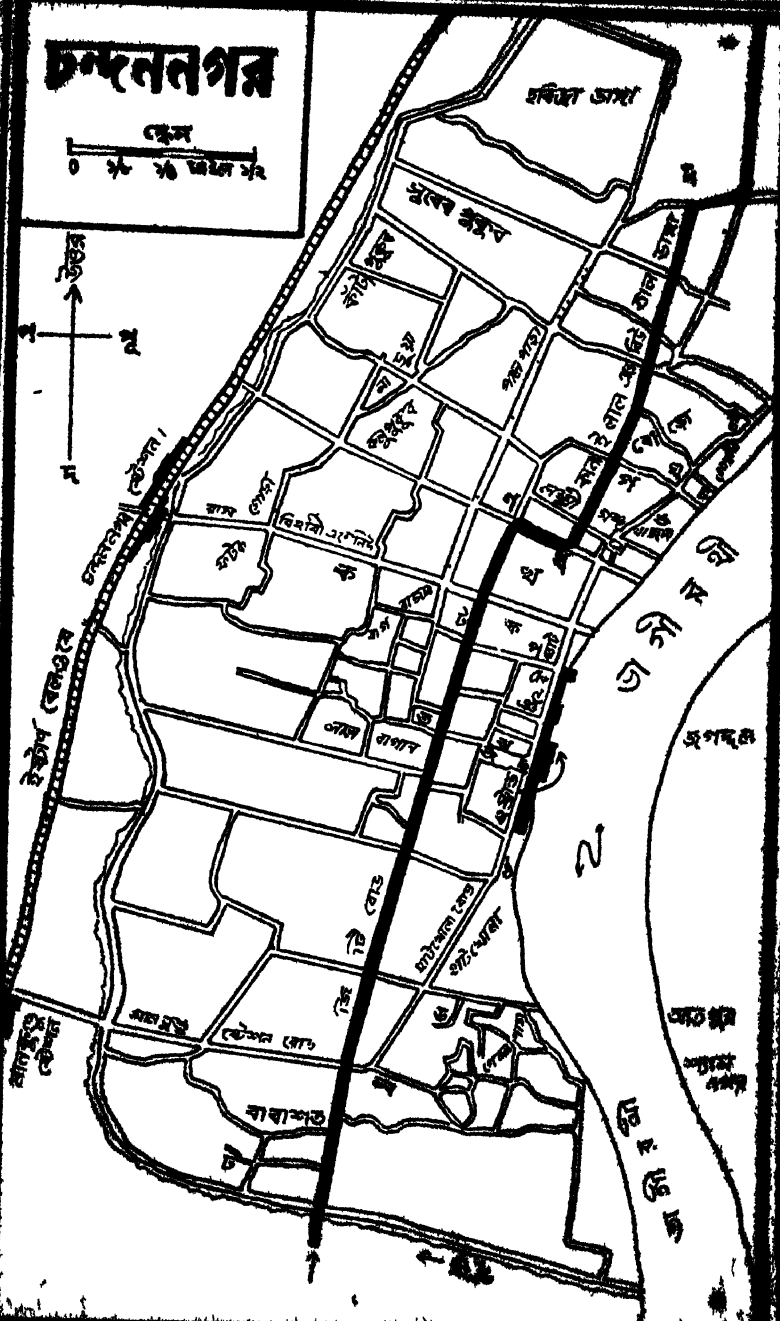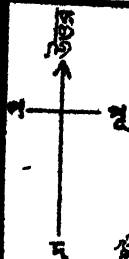
মানচিত্র-পরিচয়

ক—মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু এইস্থানে বাস করিতেন।

খ—লালদীঘি ও অধুনালুপ্ত অরলেয়াঁ দুর্গের অবস্থান-স্থল।

গ—শহীদ কানাইলাল দত্তের নিবাসস্থল ও তাঁহার প্রতিমূর্তি।

ঘ—প্রবর্তক সঙ্ঘ আশ্রম—ঋষি অরবিন্দের আত্মগোপন কক্ষ।
বিপ্লবী মতিলাল রায়ের আবাসস্থল।

ঙ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির।

চ—শ্রীশ্রীবোড়াইচণ্ডীমাতার মন্দির।

ছ—শহীদ কানাইলাল দত্তের প্রস্তরমূর্তি।

জ—গির্জা।

ঝ—কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর কলেজ।

ঞ—বারদুয়ারী টাওয়ার ক্লক।

ট—নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার

ঠ—শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মন্দির।

ড—টেগার্ট সাহেবের গুলীতে শহীদ মাখনলাল এইস্থানে নিহত হন।

ঢ—শ্রীশ্রীদশভুজা মন্দির।

ণ—হাসপাতাল।

ত—শ্রীশ্রীনন্দদুলালের মন্দির।

থ—কনভেন্ট ও তদ্‌সংলগ্ন গির্জা।

দ—তাউৎখানার বাগান। ফরাসীরা সর্বপ্রথম এইস্থানে কুঠি স্থাপন করেন।

ধ—যাদু ঘোষের প্রাচীন রথ। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দেবালয় সংঘ কর্তৃক নূতন লোহার রথ নির্মিত হয়।

ন—অম্বিকাচরণ স্মৃতিমন্দির, গোন্দলপাড়া।

প—চন্দননগর আদালত।

ফ—কুঠীর মাঠ।

চন্দননগর মহকুমা

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত স্থান ছিল এবং আয়তনে ছোট হইলেও ইহা ঐতিহ্যে মুখর। সমগ্র বঙ্গদেশ যখন বৃটিশ-শাসিত ভারতের একটি প্রদেশরূপে ইংরাজ রাজত্বের অধীন, তখন এই ক্ষুদ্র অঞ্চল ফরাসী-শাসনের অধীনে এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বাঙলার এই শহরটি তখন বাঙালীর কাছে বিদেশ বলিয়া গণ্য হইলেও প্রাকৃতিক বিন্যাসে বাঙলার এই অবিচ্ছেদ্য অংশ শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাঙলার সহিতই অন্তর-সংযোগে যুক্ত ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে বাঙলার এই বিশিষ্ট ফরাসী শহরটির উপর বৈদেশিক শাসনের অবস্থান বাঙালীর অন্তরকে আন্দোলিত করে বলিয়া চন্দননগরের মুক্তি আন্দোলন বহ্নিমান হইবার আগেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ফরাসী সরকার চন্দননগরকে ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করেন। ইহার পূর্বে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে চন্দননগরে গণভোট গ্রহণ করা হয়। এই গণভোটে চন্দননগরের শতকরা ৯৯ জন অধিবাসী এই শহরকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির জন্য ভোট দেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভারতসরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অধীনে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' দ্বারা চন্দননগর শাসিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণানুযায়ী শ্রীসুনীলবরণ রায় চন্দননগরের শাসন পরিচালক ও পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং শ্রীবিমলচন্দ্র সেন পুলিশ অধিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুনের পূর্বে ফরাসী ইউনিয়নের যে সব নাগরিক ও ফরাসী প্রজা চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন তাঁহারা ভারতীয় নাগরিক হন।

মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিবস ২রা অক্টোবর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসী চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ভারত সরকার চন্দননগরের শাসনভার পশ্চিমবঙ্গের উপর অর্পণ করেন। শাসনপরিচালক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীনির্মলকান্তি রায় চৌধুরীর হাতে চন্দননগরের যাবতীয় শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি সেই দিন প্রাক্তন শ্রীরামপুর মহকুমার **হরিপাল, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর** ও **ভদ্রেশ্বর** এই চারটি থানাসহ চন্দননগরকে লইয়া হুগলী জেলার অধীনে নূতন **"চন্দননগর মহকুমা"** গঠন করিয়া দেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত আইন সেই দিন থেকে চন্দননগরে প্রযোজ্য হয়। পূর্বে যে সব আইন বলবৎ ছিল তাহা সমস্তই চন্দননগরে এখন রদ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরিহর শেঠ ও দেবেন্দ্রনাথ দাস যথাক্রমে চন্দননগর শাসন পরিষদ ও পৌরসভার প্রথম ও দ্বিতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন।

মুক্তিসাধনায় চন্দননগর পুস্তকে শ্রীহরিহর শেঠ মুক্তিলাভের জন্য চন্দননগরবাসিগণ যে সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও সংগ্রাম করেন তাহা লিখিত আছে। ফরাসী চন্দন-নগরের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককালের বিস্তারিত বিবরণও তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশের জন্য দিয়াছেন।

॥ চন্দননগর ॥

ফরাসী চন্দননগরের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে,—কিন্তু ফরাসীদের সহিতই ইহার পরিচয়। ইংরাজী ১৪৯৫ অব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসা-মঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিতে বা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত পাণ্ডব-দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে, ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্টে ইহার প্রাচীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও, কতিপয় পল্লী একত্র করিয়া চন্দননগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল সম্ভবতঃ ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর।

"খলসানি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবর"—দিগ্বিজয় প্রকাশ

গঙ্গা-বক্ষ হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি--ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় সহরের আকৃতি থাকায় চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর এবং তাহা হইতে চন্দননগর, অথবা চন্দন কাষ্ঠের ব্যবসা বা প্রচুরতা হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়। শেষোক্ত কারণ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চন্দন কাষ্ঠের কাজ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরে এখানকার কর্তৃপক্ষ মার্টিন, দেলান্দ এবং পেল্এ স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রে।

ফরাসী কোম্পানীর প্রথম অধিনায়ক মঁসিয়ে দেলান্দ মোগল বাদসার নিকট হইতে ৪০,০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের অনুমতি প্রাপ্তির অনেককাল পূর্বে প্লেসি নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে সহরের উত্তর প্রান্তে বোড় কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ১০ আরপাঁ পরিমিত জমি ৪০১৲ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।*

দেলান্দ এখানে কুঠি স্থাপনের পর এই নূতন উপনিবেশে কোম্পানীর কার্য-পরিসর দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় কোম্পানী বলিতে ডিরেক্টর ১ জন, ৫ জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সিল, ব্যবসাদার ও দোকানদার ১৫ জন, নতের ২ জন, পাদরি ২ জন, ডাক্তার ২ জন ও সূত্রধর ১ জন মাত্র ছিল; এবং পদাতিক ১০৩ জন, তন্মধ্যে ২০ জন ভারতীয়—ও ৩টি কামান ছিল। (২) চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ আরলাঁ দুর্গ ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহা সহরের মধ্যস্থলেই ছিল এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ ও কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মজবুত ও জমকাল ছিল। (৩) কিন্তু উহার প্রসিদ্ধি ইহাতে নহে। যে বৃটিশ জাতি একদা জগতের অদ্বিতীয় জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ এই দুর্গপাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর দুপ্লে যে নীতি ধরিয়া এই চন্দননগরে বসিয়া এক দিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই বহুদিন তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্বপ্রধান জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ভাগ্যচক্রের গতি ভিন্নরূপ হইলে আজ ভারতেতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

*ফ্রান্সের জমির এক প্রকার মাপ। এক আরপাঁ প্রায় তিন বিঘার সমান।

ফরাসীদের প্রথম অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের মূল কোম্পানীর অমনোযোগিতা ও এখানকার অর্থাভাবে কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইতে থাকে তৎপরে কিঞ্চিদধিক প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইলে ইংরাজি ১৭৩১ অব্দে দুপ্লের ডাইরেক্টররূপে এখানে আগমনের সহিত শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সম্ভ্রমে দশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে এ স্থান নবীন শ্রী ধারণ করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্তী অপর সকল পাশ্চাত্য জাতি সকলের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। এই সময় এখানকার সহিত সুরাট জেড্ডো, বসোরা, তিব্বত, পারস্য এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় তখন সমস্ত বাঙ্গলার উপর এখানকার বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন এই উন্নতিশীল উপনিবেশটিকে বেশ সুরক্ষিত দেখিয়া এবং এখানে ব্যবসাদি কার্যের সুবিধা বিবেচনায় অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতার শোভা-সম্পদ-বাণিজ্য সর্ব বিষয়ই এ স্থানের তুলনায় হীন ছিল। এই সময় এখানে সুন্দর রাজবর্ত্ম বেষ্টিত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকা ও অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। (৪)

দুপ্লের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পর পর্যন্ত এ স্থানের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে পূর্বোক্ত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর ইহা বৃটিশদের হস্তগত হয় এবং সেই সঙ্গে ফরাসী জাতির ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ক্লাইভের আদেশে দুর্গের তলদেশ পর্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয় এবং সহরের প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া সহরের পূর্ব শ্রী লুপ্ত করা হয়। ইংরাজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যার্পিত হয়। এইরূপে আরও কয়েকবার ইংরাজ হস্তে পুনঃ ফরাসীদিগের হস্তে যাওয়ার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষবার ফরাসীদিগের হস্তে আসে। এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ফরাসীদিগের হাতেই ছিল। ভাগীরথীতীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহারা সকলেই ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

॥ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ॥

পূর্বকালে এখানে অহিফেন, বস্ত্র, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশী ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন ইউরোপে পর্যন্ত রপ্তানি হইত। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রধান। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রমে ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম যশোহরের কোন স্থান হইতে তাঁহার বিধবা মাতার সহিত এখানে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ফরাসী কোম্পানীর অধীনে সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া শেষে প্রধান সহায় রূপে কোম্পানির বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং কোম্পানির মাল খরিদ-বিক্রয় দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ সম্মানেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং দুইটি সুবর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ১৭৫৬

খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবরোধের পর ইংরাজ সেনা কেবল তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়াই প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। এই সময় ক্লাইভের গোলায় তাঁহার বিশাল বাসভবন চূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে চৌধুরী-বংশ একেবারে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে; আছে কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চৌধুরী ঘাট" **"নন্দদুলালের মন্দির"** প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্জ করিবার জন্য সর্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় চাকুরীর উমেদারীর জন্য আসিতেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পাঁচ পুত্র ছিল। তাহাদের নাম জগন্নাথপ্রসাদ, শিবনাথ, কৃষ্ণপ্রসাদ, বলরাম ও আত্মারাম। কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্দ্রনারায়ণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দননগরের পতনের পর তাঁহাদের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়ে তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও কৃষ্ণপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। তিনি প্যারিসে ফরাসী মন্ত্রীর নিকট নিজের দুর্দশার কথা ও তাঁহার পিতা ও তিনি স্বয়ং ফরাসী কোম্পানীর কি উপকার করিয়াছেন সেই কথা জানাইয়া আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করেন। কিন্তু ফরাসী কোম্পানী তাহার কোন অনুকূল উত্তর দেন নাই।

কৃষ্ণপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম কাশীনাথ। তিনি পর্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের বংশ সমাজে পতিত ছিল। নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় বংশীয় দেওয়ান রামপ্রসাদ কাশীনাথ চৌধুরীকে উদ্ধারের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে কাশীনাথকে সমাজে পুনস্থাপিত করেন। কাশীনাথ নামক একটি শিব এখনও আছে।

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই এখানকার মধ্যে ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসু মহাশয়-দিগের পূর্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে আসিয়া প্রথমে বেলকুলি, পরে বেলকুলির নবাবের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত জমিতে খলিসানী গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই বংশ প্রাচীনতায় ও ধর্মকর্মের জন্য এখানে বিশেষ খ্যাত। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যের জন্য ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বসু-বংশ অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া যাইলেও যথারীতি দোল, দুর্গোৎসব ও পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী, নন্দনন্দন, বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। হালদার মহাশয়ের আদি পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা **শ্রীশ্রীবড়াইচণ্ডী** ও **শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী** অতি প্রাচীন ও জাগ্রত। এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বর্ধিষ্ণু বংশের মধ্যে বারাসাতর শ্রীমানী ও দে, বাগবাজারের সরকার, নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষ, পালপাড়ার পাল, বেড়োর পালিত, পাল, বসু ও কুণ্ডু প্রভৃতি এবং দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দেবী সরকার, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোল্লা হাজি, কাশীনাথ কুণ্ডু, রামকানাই সরকার, নবকৃষ্ণ দে দুর্গাচরণ রক্ষিত, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, অদ্বৈতচরণ মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম শুনা যায়।

পূর্বকালে কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কথক, যাত্রাওয়ালা এখানে যত ছিল এত আর কোথাও ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ রাসু, নৃসিংহ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা; চিন্তে মালা, নবীন গুঁই প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালা; রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক এবং মদন মাষ্টার, বৌ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্তী, ব্রজ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ, এই স্থানেই বাস করিতেন। এই সহরে এতাবৎ যতগুলি শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, লেখক ও গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যত্র তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকত্রয়ের অন্যতম **"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"** নামক গ্রন্থ চন্দননগরের পাদরি গেরাঁ দ্বারা শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরী হইতে রোমান অক্ষরে এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। লেখক মনো-এল্-দা আস্সুম্পসাম্ ঢাকা জেলায় তাঁহার ধর্মপ্রচার ক্ষেত্রে ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপভাষা ইহাতে প্রয়োগ করিয়ছেন। ইহাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক। এই লেখকই পর্তুগীজ ভাষায় সর্বপ্রথম বাঙ্লা ব্যাকরণ (১৭৩৪ খৃঃ) এবং বাঙ্লা কোষ প্রণয়ন করেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'-এর ভাষার নমুনা ঃ

"পিতা আমারদিগের, পরমস্বর্গে আছ; তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হোক্;"

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড, বর্মার রাজকুমার মাইন্গুন্, ম্যাডাম ওয়াটস্, জাল প্রতাপচাঁদ, জন বুল্টো, মহারাজ নন্দকুমার, বৈকুণ্ঠ মুন্সি, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়াছেন। বিশপ কুরি, বিশপ হিবার, গ্রাঁপ্রে, স্ট্রাভোরিনাস, হ্যামিল্টন, উইলিয়াম হজ, এলবার্ট মেটো রিপা প্রভৃতি পর্যটকগণও এ স্থানে আসিয়াছিলেন।

॥ ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড ॥

ইতিহাসপ্রসিদ্ধা রূপলাবণ্যময়ী ম্যাডাম গ্রাণ্ড যাঁহার রূপবহ্নিতে এক সময় বাঙলা ও ফ্রান্সের বহু লোক দগ্ধ হইয়াছিল, যাঁহার কথা কবি তাঁহার ছন্দে "Queen of the Ganges, Queen of the Siene" বলিয়া গাহিয়াছেন, যাঁহার একটু একটু মধুর হাসির পরিবর্তে মহামান্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁহার সমস্ত পদমর্যাদা তৎপদে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি ফ্রান্সে যাইয়া প্রিন্সেস দে টালিরন্ত নামে পরিচিত হইবার পূর্বে চন্দননগরে বাস করিতেন।

পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন অতি অল্পই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি' ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জা, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ৎখানা বাগানের ডাচ নির্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা, যাদুঘোষের রথ ও বারোয়ারীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাও বহু দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যাস্তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ফরাসীগণ চলিয়া যাইবার পর এই উৎসবটি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত সহরটি বহু পল্লীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গোন্দলপাড়া, বারাসাত, দিনেমারডাঙ্গা, হাটখোলা, হাজিনগর, মানকুণ্ডু, দিগলসপটী, বড়বাজার, বাগবাজার, লালাবাগান, উড়েপাড়া, হালদারপাড়া, ভাকুন্ডা, খলসানি, কলুপুকুর, নাড়ুয়া, বোড়, সরিষাপাড়া, গোস্বামীঘাট, কাবারিপাড়া, বক্সীর বেড়, চাঁপাতলা, বোড়াই চন্ডীতলা, হরিদ্রাডাঙ্গা, সুরের পুকুর, কাঁটা-পুকুর প্রভৃতিই প্রধান। অন্যান্য স্থানের পল্লী সকলের নাম যেমন দেব-দেবী, ব্যক্তি, জাতি, বৃক্ষ, জলাশয় বা ঘটনাবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এখানেও সেইরূপে অনেকগুলি পল্লীর নাম হইয়াছে, গোন্দলপাড়া, খলিসানী ও বোড় নামক স্থানগুলি অতি পুরাতন। গোন্দলপাড়া নবাব খান্‌জা খাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, দিনেমাররা উহা ছাড়িয়া দিবার পর ফরাসীরা ইজারা লয়। নবাব খান্‌জা খাঁর বিষয় ৬৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

দিনেমারডাঙ্গা নাম—দিনেমারদের শ্রীরামপুর যাইবার পূর্বে প্রথম ঐ স্থানে বসবাস ও কুঠীস্থাপনা হইতে। মানকুন্ড,—রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা যাত্রাকালে এই স্থানে আগমন হইতে। মানসিংহের স্মৃতি-বিজড়িত একটি পুষ্করিণীর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি শুনা যায়। দিগলেস্‌পটী দুপ্লেক্সের নাম হইতে। লালবাগান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শুভ্র লাল-মোহনের নাম হইতে। (৫) পালপাড়া, গোস্বামীঘাট, বক্সীর বেড় কুন্ডুঘাট প্রভৃতি পাল, গোস্বামী, কাবারি, বক্সী প্রভৃতি হইতে নামের উৎপত্তি। বেহারা বা উড়েপাড়া নামটি ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর উড়িষ্যা হইতে আনীত পাল্কীর বেহারাদের বাসস্থান হইতে।

সেইরূপ রথের সড়ক নামোৎপত্তি ইন্দ্রনারায়ণের রথ হইতে হইয়াছে। পঞ্চাননতলা, ষষ্ঠীতলা, **বোড়াইচন্ডীতলা**, কালীতলা, বিশালক্ষ্মীতলা, সনাতনতলা প্রভৃতি স্থানগুলি ঐ সকল নামীয় দেবদেবীর নাম হইতে। চাঁপাতলা, বাদামতলা, শাউলিবটতলা, খেজুরতলা, প্রভৃতি গাছের নাম হইতে। সুরের পুকুর, বেণেপুকুর, পদ্মপুকুর, কলশপুকুর, বিদ্যালঙ্কার পুকুর ও মুন্সীপুকুর প্রভৃতি স্থানগুলি এবং ঐ পার্ক, মেরি, পুলিস আফিস বড় বড় হোটেল প্রভৃতি গাছের নাম হইতে। সুরের পুকুর, বেণেপুকুর, পদ্মপুকুর, কলুপুকুর, বিদ্যালঙ্কার ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্বে চন্দননগরের অবস্থা ধ্বংস-প্রায় হইয়াছিল, এ কথাও এক জন লেখিকা বলিয়াছেন।(৬)

বোড়াই চন্ডীমাতা চন্দননগরের অন্যতমা প্রাচীনা দেবী বলিয়া কথিত আছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর দেবীর যাবতীয় অলঙ্কার অপহৃত হয়। পরে চন্ডীমাতার পুনরভিষেক হয়। এই সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় [৩রা ও ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৭] প্রকাশিত দুইটি সংবাদ উল্লেখ্য ঃ

বোড়াই চন্ডীমাতার অলঙ্কার অপহৃত

চন্দননগর, ২রা অক্টোবর ১৯৫৭—গতকল্য রাত্রে **বোড়াই চন্ডীমাতার** মন্দির হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। দুষ্কৃতকারী মন্দিরের ফটকের তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে।

জনগণের বিশ্বাস প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে সিংহলে আটক পিতাকে মুক্ত করার উদ্দেশে শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাত্রাকালে তাঁহার মাতার নির্দেশানুযায়ী ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিগ্রহের মস্তকটি মন্দির হইতে ২০০ গজ দূরে পাওয়া যায়। উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি শুচীকরণের পরে অর্চিত হইতেছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ৩-১০-৫৭

বোড়াই চণ্ডীমাতার পুনরভিষেক—শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী রাত্রে মন্দিরের তালা ভাঙিয়া বোড়াই চণ্ডীমাতার মস্তক অপহরণের পর গতকল্য বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা দেবীমূর্তির আবশ্যক অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হোম যজ্ঞ প্রভৃতি হয় এবং প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগমে ও কোলাহলে মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব মুখরিত হইয়া উঠে। দেবীর যে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার এবং বস্ত্রাদি অপহৃত হইয়াছিল তাহা পুনরায় সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২৯-১০-৫৭

এখানে কয়েকটি বেশ প্রশস্ত এবং সোজা বড় রাস্তা আছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এই সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরটিতে পাকা পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল এবং কাঁচা পথ মোট ১০ মাইল। ১৭৫১—৫২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায়, তখন পাকা পথ প্রায় ১০ মাইল এবং কাঁচা পথ প্রায় ১½ মাইল মাত্র ছিল। (৭)

এখানকার বিশেষত্বের কথা বলিতে হইলে পুষ্করিণীর আধিক্যের কথা উল্লেখ করিতেই হয়। পূর্বোক্ত মানচিত্র হইতে গণনায় মোট প্রায় ১ হাজার ৪ শত ৫০ জলাশয় পাওয়া যায়। বোধ হয়, এত অধিকসংখ্যক পুষ্করিণী এ প্রদেশে এই পরিমাণ স্থানের মধ্যে অন্যত্র নাই। দেবমন্দির ও ভাগীরথীতীরে ঘাটের সংখ্যাও অধিক। ছোট বড় মন্দিরের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১শতের কম নহে এবং বাঁধাঘাটের সংখ্যা মোট ২৯টি। গৃহাদির সংখ্যা যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখা যায়, কিন্তু পুষ্করিণীর সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং কিছু কমিয়াই থাকিবে।

কতিপয় ব্যবসার জন্য চন্দননগরের এখনও খ্যাতি আছে। সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। দেশী মদ, গুলীর আড্ডা, তুরংও কতকটা বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পূর্বে এ স্থান যাত্রা, কবি পাঁচালীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৪ই জুলাইয়ের জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা স্বর্গীয় যাদবেন্দু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "যাদু ঘোষের রথ", রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী (গাঙ্গুলী) প্রতিষ্ঠিত খুন্তির মহোৎসব নামক মেলা এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার ধূম এখানকার বিখ্যাত বাৎসরিক উৎসবরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। যাদু ঘোষের উপর জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ হওয়ায় এই রথ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে। এখানে যেরূপ বৃহদায়তনের সুন্দর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গঠিত হইয়া মহাসমারোহে ৩ দিন পূজো হইয়া বিসর্জন হইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। উপস্থিত এরূপ ঠাকুর বহু পুরাতন। চাউল-ব্যবসায়ীদের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রথম প্রতিষ্ঠিতা কে এবং কোন্ সময় হইতে এই পূজো আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। শুনা যায়, কাপড়েপটীর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় শত বৎসর পূর্বে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রথম এই পূজো আরম্ভ করেন। পূর্বে সহরের উত্তরাংশে গোন্দলপাড়া ও ডাঁশপুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি বড় বড় ঠাকুর হইত। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ইতিহাস ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া

এখানে আর উল্লেখ করা হইল না। এখানে কার্তিক ও সরস্বতী পূজায়ও যথেষ্ট ধূম আছে।

॥ রাজরাজেশ্বরী পূজা ॥

জগদ্ধাত্রী পূজার ন্যায় চন্দননগর গড়বাটীতে রাজারাজেশ্বরী পূজা বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পূজা সম্বন্ধে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্য ঃ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উত্তর চন্দননগর গড়বাটীতে রাজরাজেশ্বরী পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। সর্বজনীন ভিত্তিতে রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা এতদঞ্চলে একমাত্র এখানে হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজা শুক্রবার সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ হইয়া সোমবার দশমী পর্যন্ত চলিবে।

চড়ক, পাটভাঙ্গা, স্নানযাত্রা, দ্বাদশ গোপাল, ঝাঁপান প্রভৃতিতেও পূর্বে বেশ লোক সমাগম হইত, এখন পর পর কমিয়াই যাইতেছে। ভাল আম্রের জন্যও চন্দননগরের একটু প্রসিদ্ধি আছে। সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বনাথ চাটুয্যে' নামক আম্রের উৎপত্তি এই স্থানেই এবং 'হিমসাগর' নামক অত্যুৎকৃষ্ট আমের আদিস্থান গরুটির বাগান বলিয়া শুনা যায়।

চন্দননগরের অবস্থা সম্বন্ধে যত দূর বুঝিতে পারা যায়, বর্তমানে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহের তুলনায় অনেক বেশী হইলেও ইহার উন্নতি যুগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সহরের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা অনেক অংশেই এক্ষণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু অন্য দিকে কতকগুলি স্থান ক্রমশঃ লোকশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে। শত বৎসর পূর্বে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন বিশপ হিবার এই স্থান দর্শন করেন, তখন ইহাকে জনবিরল, কর্মবিরল, নিস্তব্ধ, নিভৃত স্থান বলিয়া গিয়াছেন। (৮) বৃটিশ সংঘর্ষে উহার পতনের পর হইতেই ক্রমে এই দশা প্রাপ্ত হয়। উহার অদূর ভবিষ্যৎ হইতেই চন্দননগর পুনরায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। উহার প্রাচীনকালের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে এখনও অনেকটা বাকী থাকিলেও, বহুদিন হইতেই নগর ভাগীরথী তীরবর্তী অন্যান্য নগর-সমূহের তুলনায় শোভা, সৌন্দর্য ও সুবিধায় উন্নত।

প্রজাতন্ত্র চন্দননগরে প্রজার অধিকার, রাজ্যপরিচালনা-পদ্ধতি, বিচার শাসন প্রভৃতি পূর্বে অন্যান্য লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিত। এখানে যাতায়াতের জন্য রেল, নৌকা ও স্থলযানাদিই প্রধান। কিছু দিন হইতে ষ্টীমারের ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার নিকট যাতায়াতের সুবিধা, বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন। খোদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পূর্বে বাৎসরিক কিছু খাজনা দিতেন। এই খাজনা কিসের জন্য দিতেন, তাহা ঠিক মত জানিতে পারা যায় না। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এক সময় চন্দননগরের সমস্ত জমি ইজারা লইবার কালে গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সব সর্ত নির্ধারিত হয়, তন্মধ্যে একটি সর্ত ছিল, মোগল সম্রাটকে যে রাজস্ব দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ইজারাদারদের দেওয়ানী প্রাপ্তির সহিত পুরাতন স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া, তাঁহারা এই রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন, কি না, বলিতে পারি না। যে ৬০ বিঘার কথা উল্লিখিত হইল, উহাই সম্ভবতঃ সেই ৬০ বিঘা,—যাহা জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, বাসের স্বল্প

প্রায় সাধারণতঃ সকল দ্রব্যই পাওয়া ও অন্যান্য বিবিধ সুবিধা হেতু এখানে সময় সময় বহু লোক আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। শত বৎসর পূর্বেও এখানে বাসের খরচ ও দ্রব্যাদির মূল্য খুবই কম ছিল। তখন এক জন বিশিষ্ট ক্রিয়াবান্ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মাসিক সংসার-খরচ দেড় শত টাকায় সুনির্বাহ হইত। একজন সাহেবের মদ ছাড়া থাকিবার ও খাইবার খরচ মাসে ৩৫৲ টাকাতেই হইত জানা যায়। (৯)

ফরাসীদের চন্দননগরের প্রকৃত রাজসত্ব সম্বন্ধে শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ২ হাজার ৩ শত ৭৭ একারের মধ্যে প্রায় ৬০ বিঘা মাত্র জমী ফরাসীদের কতকটা নিজস্ব বলিতে পারা যায়। অবশিষ্টের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ঔরংগজেবের নিকট হইতে কুঠীস্থাপনের জন্য ফরাসীরা প্রথম জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ভিতরেই ফরাসীরা তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, বাকী তালুকদারী জমি ছিল। সে সময় বোড় বিশনপুর, চক নসিরাবাদ, সাকনোড়া এই কয়টি মহল লইয়া সেই তালুকদারী। কেহ কেহ বলেন, ফরাসীদের ঠিক নিজস্ব বলিতে মাত্র ৭ বিঘা। (১০) যাহা হউক, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিয়া সমস্ত সহরটির শাসনাধিকার পূর্বে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে চন্দননগরের অধিবাসিগণ এই অঞ্চল বিদেশীর শাসনাধীন থাকিবে তাহা না চাওয়ায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ফরাসী সরকার চন্দননগরকে মুক্তনগরী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণের উপর শাসন ও পৌরব্যবস্থার ভার অর্পণ করেন। অতঃপর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তাহারা চন্দননগরকে ভারত সরকারের নিকট কার্যত হস্তান্তরিত করেন। এই সনদে ফরাসী পক্ষে মঁসিয়ে তাইয়ার ও ভারতের পক্ষে চন্দননগরের নবনিযুক্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর করেন। যে সনদখানিতে উভয়ে স্বাক্ষর করেন তাহা এই ঃ

STATEMENT OF SERVICE TRANSFER

In accordance with the agreement concluded during the conference held in Calcutta on 18th April 1950, ratified later on by the Government of India and the Council of French Ministers on April 28, 1950.

To-day, May 2, 1950 the Administrator G. H. Trailleur, Delegate of the Commissioner of the Republic for French India, Chandernagore has transferred his power to Mr. B. K. Banerjee Administrator appointed by the Government of India to replace him.

The inventory of furniture has been taken charge of without remarks.

It has been given to B. K. Banerjee the remaining records and the keys ot the Treasury Cash-room.

(Sd) G. H. Tailleur	(Sd) B. K. Banerjee
Administrator-delegate retiring	Administrator in-coming

এখানে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের মোট আয় প্রায় সওয়া ৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৪৮, উহার পূর্ব বৎসর ছিল ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৫৬ টাকা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩২ হাজার ১ শত ৫৪ টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইত জানা যায়। (১১) ১৭৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত চন্দননগর ইজারা দিয়া বৎসরে প্রায় ১২ হাজার টাকা আয় হইত। এখানে কার্যক্ষম ব্যক্তির বৎসরে ৮ আনা হেড ট্যাক্স ভিন্ন আয়কর, বাড়ীর কর প্রভৃতি অন্য কোন কর দিতে হয় না। এমন কি, পার্শ্ববর্তী বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল নগর সমূহে আলো, জল, পথ প্রভৃতির ট্যাক্স আছে, এখানে ঐ সকল সুবিধা থাকিতেও কোন ট্যাক্স নাই। তাহা সত্ত্বেও এখানে মিউনিসিপ্যালিটির আয় কম নহে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আয় ৯৪ হাজার ৬ শত ৪৮ টাকা, পূর্ব বৎসর ছিল ৮২ হাজার ৯ শত ৬২ টাকা। এই আয়ের মধ্যে বাজার, খেয়াঘাট, কসাইখানা, জমীর জমা, বাড়ীর ভাড়া, আমদানী মালের উপর খাজনা প্রভৃতিই প্রায় ৬৫—৭০ হাজার টাকা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ হাজার ১ শত ৭ ফ্রাঙ্ক মিউনিসিপ্যালিটির আয় ছিল। (১২)

॥ সরকারের আয়ের প্রধান অংশ ॥

সরকারী আয়ের প্রধান অংশ আবগারী বিভাগ হইতে পাওয়া যাইত। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যে বিষয়ে যে আয় হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে।

বিভিন্ন রাজস্ব	২৩৯০৬৲
আবগারী ও অন্যান্য	৪৩৯৮৫৫৲
রেজেষ্ট্রারী ফি	৪১৭৲
জল কলের ট্যাক্স	১১০৫৭৲
ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট আফিং ও লবণের দরুণ পাওয়া	২৮৪০৮৲
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন	১১৩৯২৲
মিউনিসিপ্যালিটীর দেয়	৭৬৫৭৲
অন্যান্য	৬৯৲
	৫২২৭৬১৲

চন্দননগরের সমস্ত আয় পূর্বে যদি এই স্থানে ব্যয় হইত, তাহা হইলে এখানকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সৌন্দর্য আরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। ১৯২১, ২২ ও ২৩ খৃষ্টাব্দে ২ লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত ৫৯৲, ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫ শত ৭৭৲ ও ২ লক্ষ ১ শত ৩৫৲ টাকা যথাক্রমে এখানে মোট ব্যয় হইয়াছে। এখানকার অবশিষ্ট আয়ের টাকা ফরাসী ভারতের অন্যান্য নগরীতে ব্যয় করা হইত। পূর্বেও চন্দননগরের আয় হইতে অন্য উপনিবেশে ব্যয় হইত। ৪৬ বৎসর পূর্বে এখানকার আয় ছিল ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ৫ ফ্রাঙ্ক, ব্যয় ১৪ হাজার ১১ ফ্রাঙ্ক।

ভারতের অন্য তিনটি ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশের ন্যায় চন্দননগর পণ্ডীচেরীর অধীন। সমস্ত ফরাসী ভারতের গভর্ণর এক জন মাত্র। তিনি প্রধান নগরী পণ্ডীচেরিতে থাকিতেন,

কখনও কখনও উপনিবেশ সকল পরিদর্শনার্থ গমন করিতেন। গভর্ণরের অধীনে প্রত্যেক উপনিবেশে এক একজন এডমিনিষ্ট্রেটর ছিল। এখানে আদালত ও হাকিম থাকিলেও সেসন মোকদ্দমার জন্য পন্ডীচেরী হইতে স্বতন্ত্র বিচারক আসিতেন। আপিলের জন্য পন্ডিচেরীতে উচ্চ আদালত ছিল। কালেক্টরি, শিক্ষাবিভাগ, পূর্তবিভাগ প্রভৃতি সমস্তই পন্ডিচেরীর উক্ত বিভাগের অধীন। সমস্ত বিষয় পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর ফ্রান্স হইতে এখানে এক জন ইন্‌স্পেক্টর আসিতেন। কলিকাতায় যে ফরাসী কন্সুল থাকিতেন, চন্দননগরের শাসন বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না।

সহরের শান্তিরক্ষার সহায়তাকল্পে গবর্ণমেণ্ট এখানে পূর্বে এক দল সিপাহী রাখিতেন, এখন কতকগুলি পুলিসের কনেষ্টবল ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বেও এখানে কতকগুলি সিপাহী থাকিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পন্ডিচেরী বা ঐ দিকের থাকে। ১৭৪৩—৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে দুই দল পদাতিক সৈন্য ছিল জানা যায় (১৩) সন্ধির সর্তানুসারে ১৫টির অধিক সৈন্য রাখিবার চন্দননগরে উপায় ছিল না।

এখানকার আইন স্বতন্ত্র নহে, সমস্ত উপনিবেশের জন্য আইন একই এবং উহা প্রধানতঃ ফ্রান্সেরই মিনিষ্টার অব দি এ্যান্‌তিরিয়ার দ্বারা প্রণয়ন করা হইত। ফ্রান্সের দেপুতে ও সেনেতার সভায় ফরাসী ভারতের নাগরিক ও প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিত। দেপুতে ও সেনেতার সভায় কোন ভারতবাসী স্থান না পাইলেও, চন্দননগরের নাগরকদেরও সেই পদে নির্বাচিত হইবার অধিকার ছিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট এখানে মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়। প্রথম মেয়র হন চার্লস ডুমেন। এখন চন্দননগরে কর্পোরেশন হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতের রেজেষ্টারের ন্যায় এখানে 'নতের' বলিয়া একটি পদ আছে। ইহার দ্বারা উইল খরিদ-বিক্রয়, দেনা-পাওনা প্রভৃতি সকল প্রকার লেখাপড়া হইয়া থাকে।

এখানে পূর্বে মোট ৮টি থানা ছিল। এক জন পুলিশ কমিশনার ও তদধীনে ১ জন কোতোয়াল এখানকার প্রধান পুলিস কর্মচারী। সকল বিভাগেই কর্মচারীদের মধ্যে সাহেবের পরিবর্তে পন্ডিচেরীর লোকই অধিক দেখা যাইত। এখানকার সাধারণ অধিবাসিগণ পন্ডিচেরীর লোকদের এতাধিক প্রভুত্ব আদৌ পছন্দ করিতেন না।

এখানে বিচারে প্রাণদন্ডের আদেশ খুব কমই হইত। প্রাণদন্ডের জন্য গিলোটিন নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। উহার দ্বারা শিরচ্ছেদন করা হয়। পূর্বে প্রাণদন্ডের আদেশপ্রাপ্ত অপরাধীকে রি-ইউনিয়নে লইয়া যাওয়া হইত। গিলোটিন যন্ত্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই শেষবার এখানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে সেখ আবদুল পাঁজারি ও হীরু বাগদী নামক দুই ব্যক্তির ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী প্রথম প্রাণদন্ডের আদেশ হয়। পূর্ব যে তুরুণ্ডের কথা উল্লেখ হইয়াছে, জেলখানার বা কোন মাতাল বা ধৃত অপরাধীকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। উহা কাষ্ঠ-নির্মিত এক প্রকার যন্ত্রবিশেষ, উহার মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাতে অপরাধী পদদ্বয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়।

॥ শিক্ষাব্যবস্থা ॥

যত দূর জানিতে পারা যায়, এক শত বৎসর পূর্বে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্থানীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং সেরূপ পাঠশালার অভাবও ছিল না। তৎপরে ক্রমে য়ুরোপীয় পাদ্রী মিশনারীরা এখানে শিক্ষাবিস্তার মানসে চেষ্টা করেন ও দুই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়েও প্রথম একমাত্র বাঙ্গলাই শিক্ষার বিষয় ছিল। পরে ক্রমে ফরাসী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

বর্তমান কনভেণ্টের দক্ষিণে—যে স্থানে এক্ষণে স্বর্গীয় ছক্কনলাল সিংহ রায় মহাশয়ের বাটী আছে, শুনা যায় ঐ স্থানে বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল। লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে যে বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়, উহা সম্ভবতঃ এক শত বৎসর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। ঐ স্থানে অবৈতনিক ভাবে বাঙ্গলা ও ফরাসী পড়ান হইত। পিরু সাহেব নামক ঐ বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। প্রাক্তন দুপ্লে কলেজ—যাহার প্রথম নাম ছিল সেন্ট মেরিস ইনষ্টিটিউশন, উহাও মিশনারীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যূন এক শত বৎসর পূর্বে ফাদার বার্থের দ্বারা স্থাপিত হয়। প্রথম বর্তমান রু জেনারেল মারত্যাঁ যাহার পূর্বে রুদে বড়বাজার নাম ছিল, ঐ রাস্তার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, লালদীঘির কোণের বিদ্যালয়টিই ঐ স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। দুপ্লে কলেজ নামক বিদ্যালয় এক্ষণে গবর্ণমেন্টের অধীন। ইহাতে একটি ফরাসী বিভাগ আছে, তাহা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য লটারী করা হইয়াছিল। ইহার উন্নতি-প্রসঙ্গে ফাদার বার্থে ও ফাদার আলফন্সোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকের মধ্যে নন্দদুলাল বসু ইহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরের এই প্রাচীন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় [২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩] যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইল :

চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের শতবার্ষিকী উৎসব

ভদ্রেশ্বর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের তিনদিনব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে শেষ হইয়াছে। তিনদিনব্যাপী বহু মনীষীর আগমনে চন্দননগর ধন্য হয় এবং তাঁহাদের বাণী গ্রহণ করিয়া সার্থক রূপ দিবার জন্য সকলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

১৮৬২ সালে ফরাসী শাসনাধীনকালে চন্দননগরে যখন এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার নাম ছিল 'সেণ্ট মেরীস্ ইনষ্টিটিউশন' আর ডাক নাম ছিল ফরাসী স্কুল। সেদিনের ছোট স্কুলটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া চলে। ফাদার বার্থে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। একটির পর একটি শ্রেণী বৃদ্ধি পাইয়া যখন এফ্ এ ক্লাশ খোলা হয় তখন ইহার নাম হয় দ্যুপ্লেক্স কলেজ। চন্দননগরের প্রাক্তন ফরাসী শাসক খ্যাতনামা দ্যুপ্লের নামেই এই নামকরণ হয় পরে কলেজ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা দ্যুপ্লে স্কুল নামেই

চলিয়া আসিতে থাকে। সম্ভবত ১৯০১ সাল হইতে এই স্কুলের নামকরণ দ্যুপ্লের নামে হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মে ফরাসী শাসন মুক্তির অব্যবহিত পূর্বেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিপ্লবী কানাইলালের নামে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় কানাইলাল বিদ্যামন্দির। প্রথম দিনে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ব্রজকান্ত গুহ। ডঃ গুহ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে আবক্ষ কানাইলালের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন ও মাল্যদান করেন। পরে নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

বর্তমান আদালতের পশ্চাতে একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সম্বন্ধে প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই।

এখানে পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষাপ্রবর্তন প্রসঙ্গে ফাদার ফ্রিচ্, ফাদার বার্থে ফাদার এলফন্সো ও ব্রাদার হানোরিয়েরে নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, ফাদার ফ্রিচ্ এখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম উদ্যোগী। অন্যান্য কোন কোন স্থানের ন্যায় এখানেও মিশনারীরাই পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। প্রায় শত বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দুপ্লে কলেজের পর 'বঙ্গবিদ্যালয়' এখানকার প্রধান বিদ্যালয়। ১২৮৮ সালের ২০শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বারাসত তে-মাথায় কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ৩টি মাত্র বালক লইয়া উহা স্থাপিত হয়। বারাসত নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রথম গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয়ের আস্তাবলে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তিনি নিজে উহা পরিচালনে সমর্থ না হওয়ায়, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্থানীয় বালকদের শিক্ষাবিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। রাখাল বাবু গোন্দলপাড়ানিবাসী কালিদাস বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলেনীপাড়া নিবাসী অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় এই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান বিদ্যালয়ভবন নির্মাণকল্পে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ রক্ষিত ও কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইহা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রসংখ্যা অনূন ২৫০। একটি বে-সরকারী কমিটির দ্বারা উহা চালিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে সামান্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

কানাইলাল দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমানে "ডুপ্লে স্কুলের" নাম পরিবর্তন করিয়া কানাইলাল বিদ্যামন্দির নাম রাখা হইয়াছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ব্রজকান্ত গুহ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে কানাইলাল দত্তের আবক্ষ মর্মরমূর্তির উন্মোচন করেন। কানাইলাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আর একটি স্মৃতিফলক নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

চন্দননগরের স্বেচ্ছা সৈনিক

• মনোরঞ্জন দাস

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল তারিখে
স্বদেশের জন্য বিজার্ত (BIZERTE) নগরে যিনি
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই
স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রস্তাব ফলক সংস্থাপিত হইল

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যে হত্যা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১৪) চন্দননগরের ষ্ট্যাণ্ডে তাঁহার একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে

শহীদ
কানাইলাল দত্ত

জন্ম—১৫ই ভাদ্র ১২৯৫ (জন্মাষ্টমী) মৃত্যু—২৫শে কার্তিক ১৩১৫

ভারতের মুক্তি যজ্ঞে
হে বিপ্লবী শহীদ কানাই,
যে কীর্তি রাখিয়া গেছ
প্রাণবীর্যে আত্মাহুতি দিয়া
সে পুণ্য অমর স্মৃতি
জন্মক্ষেত্রে যাক উদ্ভাসিয়া
অনন্তকালের বুকে
হে যাজ্ঞিক তব মৃত্যু নাই।

॥ শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ ॥

কানাইলালের মতো আর একজন শহীদ হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী বীর নির্মলজীবন ঘোষ। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য ২৬ অক্টোবর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ফাঁসি হয়। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ধামাসিন গ্রামে মাতুলালয়ে পালিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। খগেন্দ্রনিধন পালিতের কন্যা রত্নপ্রসবিনী প্রভাসরঞ্জিনীর পঞ্চম পুত্র শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ। তাঁহার পিতা যামিনীজীবন ঘোষ মেদিনীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ঘোষপরিবারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। শহীদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনয়জীবন ঘোষ হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুস্তকে এই সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা উল্লেখ্য :

My mother Shrimati Pravas Ranjini Ghosh came from the Palit family of village Dhamasin in the district of Hooghly. I was born there. In the same village of Dhamasin was also born my fifth younger brother, Nirmal Jiban Ghosh who was hanged on the 26th

October 1934 in the Midnapur Central Jail in connection with the Burge Murder Conspiracy Case. (Murder of British Magistrates)

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজ নামে এবং "নিত্যগোপাল শেঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামে আর দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উভয় বিদ্যালয়ই অবৈতনিক এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। শেষোক্তটি শ্রীযুত হরিহর শেঠের দ্বারা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে বেসরকারী ছোট ছোট পাঠশালা অনেক আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত আশুতোষ নিয়োগী মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে দুইটি পাঠশালা আছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। আশু বাবুর পাঠশালাটি অবৈতনিক, বালকদিগের সহিত ছোট মেয়েরাও এখানে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

মেয়ে এবং ছোট ছেলেদের জন্য এখানে কনভেণ্ট একটি শিক্ষালয় আছে, তাহা রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত নানদের দ্বারা পরিচালিত। ইহার সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিবার আবাস সংযুক্ত আছে। এখানে সকল জাতির ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকিলেও সাধারণতঃ সাহেবদের ছেলেমেয়েরাই শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকদিগকে এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয় না। মেয়েরা অনেক বড় বয়স পর্যন্ত এখানে থাকে। বাঙ্গালার মধ্যে এই শ্রেণীর শিক্ষালয় যে কয়টি আছে, তাহার মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি যে বাটীতে আছে, তাহা এলফ্রেড কুর্জন নামক চন্দননগরবাসী এক জন প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার দান করিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য পূর্বে এখানে সরকারী একটি অবৈতনিক এবং 'কাশীশ্বরী পাঠশালা' নামে আর একটি বেসরকারী পাঠশালা ছিল। প্রথমটি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি 'চন্দননগর শিক্ষাসমিতি' নামে একটি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইত। শেষোক্তটি গোন্দলপাড়া নিবাসী ম্যাণ্ডালের এড্ভোকেট যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই সহস্র টাকা অর্থসাহায্যে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ১৩১৮ সালের ২৫শে শ্রাবণ স্থাপিত হয়। ইহার বর্তমান বাটীটি অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত জমিতে, প্রধানতঃ কমলকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে। স্থানীয় বালিকাদের জন্য এইটিই প্রধান বিদ্যালয়। সম্পাদক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

এই দুইটি ভিন্ন পালপাড়া ও বিবিরহাট নামক স্থানে আর দুইটি মেয়েদের অবৈতনিক ছোট পাঠশালা ছিল। প্রথমটি পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি এবং দ্বিতীয়টি সন্তানসঙ্ঘ দ্বারা চালিত হইত। এই উভয় পাঠশালাই দুইটি মহীয়সী রমণীর যত্নে ও পরিশ্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই রমণীদ্বয় হইতেছেন আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের পত্নী এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। পালপাড়ার পাঠশালাটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম কৃষ্ণকিশোর দত্ত মহাশয়ের দ্বারা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি সাধারণ পাঠশালারূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি শরৎবাবুর পত্নীর দ্বারাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'অঘোরচন্দ্র শেঠ প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়' নামে এখানে আর একটি অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পরিচালনভার গবর্ণমেণ্টের উপরেই ন্যস্ত আছে। বালিকা এবং অপেক্ষাকৃত বড় মেয়ে, এমন কি, বয়স্থা রমণীগণও ইহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারেন, সে জন্য ছাত্রী আবাস-সংবলিত একটি নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। উহার জন্য সহরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে কিছু কম ৪ বিঘা জমি খরিদ করিয়া উপযুক্ত আবাসাদি নির্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত ভিন্ন প্রবর্তক-সংঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি বিদ্যাপীঠ আছে। এখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই থাকিবার ও শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে পূর্বে যে যে বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্থানেই কিছু ফরাসী শিক্ষার ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট ছিল। ফরাসী আইন, চিকিৎসা বা উচ্চশিক্ষার জন্য এখান হইতে পণ্ডীচেরীতে যাইতে হইত। কিন্তু ঐ সকল শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জনের বিশেষ সুবিধা না থাকায় কেবল আইন পরীক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিচেরী যাইতেন।

বৈদ্য-বেদ বিদ্যালয় নামে ১৩২৮ সালে কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা এখানে একটি প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে ছাত্র-দিগের থাকিবার এবং আয়ুর্বেদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কতিপয় ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক বিনা পারিশ্রমিকে এখানে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১২৫০ সালে চন্দননগরে একটি **সংগীত-বিদ্যালয়** ছিল। উহা বসন্তলাল মিত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম শিক্ষক ছিলেন রাজ রাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২০ সালে উহা উঠিয়া যাওয়াতে চন্দননগরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। উহার বিষয় পরে বিবৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে চতুষ্পাঠী পূর্বকাল হইতেই আছে। শুনা যায়, ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত লালবাগানে, যে স্থানে এক্ষণে ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উদ্যান আছে ঐ স্থানে একটি টোল ছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে নন্দদুলালের মন্দিরে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক পণ্ডিত একটি টোল স্থাপন করিয়াছিল। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও পঞ্চাননতলার শিরোমণির টোল প্রসিদ্ধ ছিল। নাড়ুয়া অঞ্চলে 'ভবদেব শিরোমণি টোল' নামে একটি টোল ছিল। অনেক দিন পূর্বে শেষোক্ত পল্লীতে শ্যামাচরণ গোস্বামী ও তৎপূর্বে তাঁহার পিতার টোল প্রসিদ্ধ ছিল। এই গোস্বামী মহাশয়েরা পিতা-পুত্র উভয়েই বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। সহরের মধ্যে গোস্বামীঘাট নামক স্থানেই শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকের বাস সর্বাপেক্ষা বরাবরই অধিক। শতাধিক বৎসর পূর্বে গোন্দলপাড়া পল্লীতে ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন হইত। জানা যায়, তৎকালে এখানে দশটি ন্যায়ের বিদ্যালয় ছিল। (১৫)

এক্ষনে এখানে দুই পাঁচটি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এমন ভট্টাচার্যের অভাব না থাকিলেও অধুনা একমাত্র কালিদাস-চতুষ্পাঠীই উল্লেখযোগ্য। ইহা কালীচরণ দাস মহাশয়ের দ্বারা ১৮৩২ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাশ মহাশয় এই কার্যে ৩০।৩২ সহস্র টাকা দান

করিয়াছেন। তিনি এক জন বিশিষ্ট ধনী নহেন, অল্পশিক্ষিত ব্যবসাদার কিন্তু ইদানীং শিক্ষার জন্য তাঁহার পূর্বে আর কেহ এখানে একালীন এতাদৃশ দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায় ও ভুবনেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা পূর্বে এই চতুষ্পাঠীর ট্রাস্টি ছিলেন।

॥ গ্রন্থাগার ॥

পুস্তকাগার বলিতে **'চন্দননগর পুস্তকাগারই'** সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ পালিত মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পালিত মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, মতিলাল শেঠ প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়ের চেষ্টায় এখানে একটি সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহাতে 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়-সমিতির অভিনয় স্পৃহা শেষ হইলে উহার ষ্টেজ ও সরঞ্জামাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ত্রিগুণাচরণ পালিত, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, হরিমোহন সুর প্রভৃতি মহাশয়গণের উদ্যোগে এই পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহার দীর্ঘজীবনীর বিবিধ অবস্থার ইতিহাস বিবৃত করিবার স্থান নাই। ইহার শৈশবাবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত সকল সময়েই সহরের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার পরিচালনের ভার ন্যস্ত থাকিলেও, মধ্যে অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া যায়। তৎপরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার নবগঠিত কার্যনির্বাহক সভার হস্তে আসার পর হইতে ইহা পুনরুন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইহার ৫০ বৎসর বয়সের সহিত ক্রমে এখন চন্দননগরের মধ্যে পুস্তকাগার একটি গৌরবের বস্তু হইয়াছে। ইহার হিতৈষী ও বন্ধুগণের মধ্যে আমি এখানে এক জনের নাম করিব,—যিনি সুদীর্ঘকাল ইহার সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত থাকিয়া, ইহার সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিনে ইহাকে বুকে করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র। তাঁহার বড় সাধের পুস্তকাগারের জন্য তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহার কতটা ভগবান দিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পুস্তকাগার এখানে ওখানে কতিপয় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া, এক্ষণে সহরের মধ্যস্থলে, **'নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার'** নামে ইহার আপন বাড়ী হইয়াছে। অর্থভাণ্ডারের অবস্থাও অসচ্ছল নহে এবং পুস্তকের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সহিত যে পাঠাগার আছে, তাহাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। লোক-শিক্ষা, বালক এবং যুবকদিগের মধ্যে পাঠস্পৃহা ও মৌখিক রচনার উৎকর্ষ-লাভের জন্যও কর্তৃপক্ষগণ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এক্ষণে মফঃস্বলের বে-সরকারী পুস্তকাগারসমূহের মধ্যে ইহা একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি, ইহার সমকক্ষ পুস্তকাগার এখন এ প্রদেশে আছে কি না সন্দেহ।

এখানে অন্য উল্লেখযোগ্য পুস্তকাগারের মধ্যে 'দশভূজা সাহিত্য-মন্দিরের' নাম করা যায়। ইহা ১৩২৯ সালে ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত সাতকড়ি সুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের উদ্যোগে মানকুণ্ডু নামক পল্লীতে শ্রীশ্রীদশভূজা দেবীর মন্দির সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

চন্দননগর পুস্তকাগারের পূর্বে অন্য কোন সাধারণ পুস্তকাগার এখানে ছিল বলিয়া জানা যায় না। শুনা যায়, বড়বাজার নামক পল্লীতে এক সাহেবের একটি পুস্তকাগার ছিল। উহা সাধারণের জন্য কি পারিবারিক, তাহা বলা যায় না। পরে উহা খরিদ করিয়াই তদ্দ্বারা ও যদুনাথ পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থ-সমূহের দ্বারা চন্দননগর পুস্তকাগার আরম্ভ হয়। উহা সম্ভবতঃ দেড়শত টাকায় ক্রীত হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া সম্মেলন ও পাঠাগারের এই স্থানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে 'অম্বিকাস্মৃতি মন্দির' নির্মাণ করিয়া দেন।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এখানে যে সকল লাইব্রেরীর উদ্ভব ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গোন্দলপাড়ার 'বান্ধব লাইব্রেরী, কাঁটাপুকুরের 'ন্যাসন্যাল লাইব্রেরী' সাউলির 'সরস্বতী লাইব্রেরী, এবং 'বীণাপাণি লাইব্রেরীর' নাম করা যাইতে পারে। বান্ধব লাইব্রেরী গোন্দলপাড়া সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়।

দীর্ঘকালস্থায়ী পাঠাগার বা শিক্ষাবিষয়ক অন্য সমিতি এখানে একটিও ছিল না এবং এখনও নাই। আনুমানিক শত বৎসর পূর্বে বড়বাগান পল্লীতে মতিলাল শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে সম্ভবতঃ 'চন্দননগর লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি ছিল বলিয়া জানা যায়। রায় প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুর, সিদ্ধেশ্বর বসু ও ডাক্তার নিত্যানন্দ নন্দী যথাক্রমে উহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। উহা তিন বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার এক উৎসব সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়েই বাদামতলা নামক পল্লীতে আর একটি শিক্ষানুশীলনের জন্য সমিতি ছিল, তাহার নাম জানিতে পারা যায় না। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে 'সাহিত্য-সভা' নামক একটি সাহিত্য বিষয়ের সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। উহা উঠিয়া যাইবার অনেক পরে আরও দুইটি সভা ঐ নামে গঠিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। শেষবার যে সাহিত্য সভার সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বর্গীয় প্রাণধন ভড় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 'লিটারেরি সোসাইটি' নামে সহরের উত্তরাংশে আর একটি শিক্ষা বিষয়ক সমিতির কথা শুনা যায়। ইহার সম্পাদক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী। 'গোন্দলপাড়া হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সভা ছিল। উহাতে সাহিত্যবিষয় আলোচনা হইত শুনা যায়, 'প্রজাবন্ধু' নামক সংবাদপত্র প্রকাশে এই সভার বিশেষ উদ্যোগ ছিল এবং স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র বসু উহার অন্যতম পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

'গোন্দলপাড়া রিডিং ক্লাব' নামে আর একটি সমিতি ছিল, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'বান্ধব-সম্মিলনী' নামে গোন্দলপাড়ায় আর একটি সমিতি ছিল। উহা প্রধানতঃ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ডিবেটিং ক্লাব, সারস্বত সম্মিলন, পালপাড়া সান্ধ্যসমিতি ও কতিপয় ক্লাব প্রভৃতি ছিল।

এক্ষণে চন্দননগর পুস্তকাগার সংশ্লিষ্ট পাঠাগার বা 'দশভূজা সাহিত্য-মন্দির' ভিন্ন চন্দননগর শিক্ষা সমিতি, সন্তান-সম্প্রদায় ও পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি নামে তিনটি সমিতি

আছে। প্রথমটি ১৩১৮ সালে বালকবালিকাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। 'কাশীশ্বরী পাঠশালা' নামক বালিকা বিদ্যালয়টি এই সমিতির দ্বারা চালিত হইতেছে। কর্মজীবনকে আদর্শ করিয়া, দেশ সেবার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অরুণ-চন্দ্র দত্তের দ্বারা সন্তান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার দ্বারা একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি ইহার লক্ষ্য। পালপাড়া সুহৃদ সমিতি ১৩২৮ সালে হরিহর শেঠের উদ্যোগে এবং কালীপ্রসন্ন বসু, মাণিকলাল বড়াল, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও প্রিয়নাথ দত্তের সহায়তায় স্থাপিত হয়। শিক্ষার উন্নতি ও সহায়তা ভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতির এই সমিতির কার্যান্তর্ভুক্ত। এই সমিতির চেষ্টায় ও ব্যয়ে এক্ষণে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে এবং পালপাড়া 'বালক-সম্মিলন' নামক বালক ও কিশোরদের একটি সান্ধ্য পাঠাগার পরিচালনার সহায়তা হইতেছে। 'গোন্দল-পাড়া-সম্মেলন' নামে আর একটি সমিতি কয়েকটি যুবক দ্বারা কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা 'প্রথম স্রোতের ফুল' নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিক নিজেদের মধ্যেই প্রকাশ করিতেন। এক্ষণে একটি পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চন্দননগরের মধ্যে ইহাই একমাত্র নৈশ বিদ্যালয়। গোন্দলপাড়ায় 'শিশুসাহিত্য সংসদ' বারাসতে 'সাহিত্য সংসদ' ও সাউলিতে 'বালক সঙ্ঘ' নামে আর তিনটি ছেলেদের সমিতি আছে। শিশু-সাহিত্য সংসদ হইতে 'অরুণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইত।

॥ শ্রীশচন্দ্র বসু ॥

গোন্দলপাড়ার বসু বংশ সম্ভূত শ্রীশচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন পরে ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। প্রজাবন্ধু নামক সংবাদপত্রের একজন সহায় এবং Amateur Workshop নামক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 'লীলা' (১২৯৫) নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও 'প্রতাপ' নামক এক-খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সংসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিন মাসিক পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। স্বর্গীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের ইনি গৃহচিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে দু-একখানি পুস্তকও রচনা করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা প্রকাশিত হয় নাই। দরিদ্রের দুঃখে ইঁহার হৃদয় সর্বদা দ্রবীভূত হইত। তাঁহার সম্বন্ধে ৫৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

চন্দননগরের "অঞ্জলি-সমিতি" শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষের পরিচালনায় প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত সুন্দরভাবে চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া এই অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

গোন্দলপাড়ার "ফ্রেন্ডস ক্লাবও" একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসর যাবত ইহারা নিখিল বঙ্গ বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শরীর চর্চা, ব্রতচারী, ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় কার্যেও ইহারা অগ্রণী। ইহাদের একটি থিয়েটার ক্লাবও আছে এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় ইহারা অভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রভাত বসু'র সম্পাদনায় "সংহতি" বলিয়া একখানি পাক্ষিক পত্রও ইহারা কিছুকাল প্রকাশ করেন।

॥ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু জাপানে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী পরলোকগমন করেন। তাঁহার চিতাভস্ম জাপানে সংরক্ষিত হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন জাপানে যান, তখন তিনি রাসবিহারীর কন্যা শ্রীমতী ভারতী বসুর (ইঁহার জাপানী নাম তেতেকু) নিকট রাসবিহারীর অস্থিভস্ম ভারতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীমতী ভারতী ডাঃ রায়কে বলেন যে, তিনি তাঁহার অভিভাবকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পরে এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইবেন।

রাসবিহারীর চিতাভস্ম তাঁহারা ভারতে পাঠাইবেন বলিয়াছেন—এই সংবাদ সকলেই অবগত আছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জাপান হইতে ভস্ম প্রেরণের যাবতীয় খরচা ও ভারতবর্ষে উহা সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ভারত সরকার হইতে করিবেন বলিয়াছেন। এখন ভস্ম কোথায় সংরক্ষিত হইবে, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীভূপতি মজুমদারকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় "রাসবিহারী স্মারক সমিতি" এবং পালাড়ায় "রাসবিহারী স্মৃতিরক্ষা সমিতি" গঠিত হইয়াছে।

রাসবিহারী বসুর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে হইলেও তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত, ভদ্রেশ্বর থানার অধীন, বিঘাটি-খলিসানি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে পালাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাসবিহারীর শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাঁহার পিতা বিনোদবিহারী বসু ও মেসোমহাশয় বামাচরণ ঘোষ চন্দননগরে ফটকগোড়ায় পাশাপাশি বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। কারণ বামাচরণবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ রাসবিহারীর মাসীমার তাহা হইলে তাঁহাকে দেখাশুনা করিবার সুবিধা হইবে। শিশু রাসবিহারী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুশীলাবালা সরকারকে তাঁহাদের মাসীমাই লালন-পালন করেন।

চন্দননগরের প্রবীণ জননায়ক শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় ও প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সহিত আমার এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই রাসবিহারী যে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে আমার সহিত একমত।

বর্ধমানের শ্রীদাশরথি তা এবং সুবলদহ গ্রামের শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বর্ধমান জেলার আরও কয়েকজন ভদ্রলোক রাসবিহারীর জন্মস্থান সুবলদহ গ্রাম বলিয়া তথায় চিতাভস্ম সংরক্ষণের দাবী জানাইতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত একমত নহি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি হুগলী জেলার পালাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিতাভস্ম চন্দননগর, কলিকাতা, বারাণসী ও দিল্লীতে সংরক্ষণ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। চন্দননগরের দাবী সর্বাগ্রে—এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ এই স্থানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল এবং এই স্থানই তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। কলিকাতায় মহাজাতি সদনে কিম্বা স্ট্রাণ্ড রোড ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোডের (ক্যানিং স্ট্রীটের পরিবর্তিত নাম) সংযোগস্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তথায় ভস্ম রক্ষিত হইলে ভাল হয়। এইরূপ জনবহুল স্থানে মন্দির নির্মিত হইলে উহা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

তারপর বারাণসী ও দিল্লী রাসবিহারীর উত্তর-ভারতের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা ফেলা হয়, তাহা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং রাসবিহারী ছিলেন উহার নায়ক। বারাণসী হইতে তিনি পুলিশের চক্ষে ধুলা দিয়া পাঞ্জাবীর বেশে পলায়ন করেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তি সংরক্ষণ করাই কর্তব্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হন, সেই স্থানে যদি কোন স্মৃতি রাসবিহারীর থাকে, তাহা হইলে ভাল হইবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে উহা প্রেরণা দিবে।

সুবলদহে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান, এই স্থানের দাবী আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু রাসবিহারীর ন্যায় মহাবিপ্লবীর স্মৃতি যাহাতে শহরের মধ্যে হয়, সেই বিষয়ে রাসবিহারী স্মারক স্মৃতি সমিতি ও সরকারের দেখা কর্তব্য। ভদ্রেশ্বরের নিকট বিঘাটি ডাকঘরের নাম **"রাসবিহারী"** ডাকঘর করিবার জন্য আমি আবেদন করিতেছি। ইহা পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। **পালাড়ায়** রাসবিহারীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে। ভদ্রেশ্বরের মধ্যে পালাড়া গ্রামের বিষয় বিবৃত আছে।

আমি আশা করি, রাসবিহারীর চিতাভস্ম সংক্রান্ত সমস্ত দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া রাস-বিহারীর চিতাভস্ম সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে কাহারও মন ক্ষুণ্ন না হয়।

রাসবিহারী বসুর আদি নিবাস সুবলদহ গ্রামে হইলেও তিনি পালাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব চন্দননগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় এই স্থানেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা হয়। তাঁহার জীবনী শ্রীসুধীরকুমার মিত্র রচিত "মহাবিপ্লবী-রাসবিহারী" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

যোগেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম যে বাঙ্গালী জীবনদান করেন, তিনি হইতেছেন চন্দন-নগরের যোগেন্দ্রনাথ সেন। এই বাঙ্গালী বীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বি. এস-সি পাস করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিলাত যান। সেই সময় বিলাতে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বিশেষভাবে ব্যগ্র হন। যোগেন্দ্র সেন, পরেশলাল রায়, ইন্দ্রলাল রায়, ডবলু. সি. ব্যানার্জীর পৌত্র কে. ব্যানার্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী ভীরু এই বদনাম ঘুচাইবার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। যদিও ভারতীয় ছাত্রগণ তখন সেনাবাহিনীতে যোগদান করিলেও বৃটিশ অফি-সারের সমান মর্যাদা লাভ করিতেন না তবুও তাহারা যোগদান করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

যুদ্ধের নেশায় পাগল হইয়া বিজ্ঞানের ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ "ওয়েষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজি-মেন্ট"-এ যোগ দেন এবং ফ্রান্সের রণাঙ্গনে প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সামরিক মর্যাদায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার কোম্পানীর অধ্যক্ষ লিখিয়াছিলেনঃ

He was one of the best in the Company and died like a soldier, doing his duty and doing it well.

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী

বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখানে অনেক আছেন এবং পূর্বেও ছিলেন। প্রত্যেকের বিষয় এই স্থলে না বলিলেও একজনের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তিনি হইতেছেন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি কাব্যনন্দ ও মহীশূর দরবার হইতে প্রাপ্ত রাজ-মন্ত্র-প্রবীণ উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তিনি যে কোন পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গণিত, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁহার রচিত বহু গবেষণাপূর্ণ অন্যান্য গ্রন্থাদির কথা, কতিপয় কলেজ অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া মহীশূর রাজার অর্থসচিব ও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্তপ্রদেশের কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদ প্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত কৃতিত্বের কথা বলিয়া শেষ করিবার এখানে স্থান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে কণ্ট্রোলারের পদ খুব অল্প লোকই পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন-কালের মধ্যে অনেক গ্রন্থাদিতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত কথা এবং একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর বহুসংখ্যক সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

চন্দননগরবাসীদের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে পূর্বোক্ত নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে পুস্তকাগারের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ভিন্ন সাধারণের ব্যবহারের জন্যও একটি সুবৃহৎ হল আছে। এই স্থানে সর্বদা সভাসমিতি হইয়া থাকে। শিক্ষাপ্রদ বা নির্দোষ আমোদের জন্যও স্থান আছে। ইহার ভিতর প্রায় ৭ শত ৫০ জন লোকের একসঙ্গে স্বচ্ছন্দে বসিবার ব্যবস্থা আছে। ভদ্রমহিলাদের আসন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষার্থী বিদেশীয় ভদ্রলোকদের অল্পদিন থাকিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। শ্রীহরিহর শেঠের দ্বারা ১৩২৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র দে ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা ইহার বর্তমান ট্রাস্টি। স্বর্গীয় তিনকড়ি বসু মহাশয় ইহার আর একজন ট্রাষ্টি ছিলেন, স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্বেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দননগরের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশন এই "নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে" অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি ১৩৫০ সালে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ কর্তৃক আহূত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে মহা-সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনেই বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি বঙ্গদেশে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন।

রামলাল দাস দত্ত

চন্দননগরে সুগায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা রামলাল দাস দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কে চাকুরী করিতেন ও কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার রচিত গীতগুলি সুললিত ও মধুর ছিল বলিয়া উহা যখন তাঁহার নিজ

কণ্ঠে গীত হইত তখন সকলেই মুগ্ধ হইত। শেষ জীবনে তিনি কাশীতে বসবাস করেন ও তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

শ্যামাসংগীত

খাম্বাজ—মধ্যমান

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বে যেথা নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
সদায় আগুন জ্বলছে চিতে।
(ওমা) চিতাভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি।

॥ নিত্যানন্দ দাসবৈরাগী ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিওয়াল নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি ডুগডুগী বাজাইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হয় এবং একটি কবির দল সৃষ্ট করয়া সমগ্র বঙ্গদেশে সুনাম ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার দল 'নিতে বৈষ্ণবের দল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। **কবিসংগীত ও প্রণয়সংগীত** নামে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজার রাজবাড়িতে কবিগান করিয়া ফিরিয়া সামান্য জ্বরে পরলোকগমন করেন। তিনি নিজের দলের জন্য গান রচনা ছাড়া গোঁর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর এই দুইজনের জন্যও গান বান্ধিয়া দিতেন। নিতাই সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেনঃ

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন, পরাজিত হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়ার ঠাকুর-মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিতাইয়ের এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।

নিত্যানন্দ রচিত ও গীত একটি গান নিম্নে লিখিত হইলঃ

শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নইলে কেন অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে।
যমুনা জল বহিছে তরঙ্গ তরু হেলে বিনা পবনে॥
একি একি সখি, এ কিগো নিরখি, দেখি দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন চেতনে॥

হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদরিয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী, বেজেছিল কাননে।
কুললাজ ভয়, হরিলো তাহাতে, মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

সিপাহী বিদ্রোহের একটি কাহিনী

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে **চন্দননগর খলিসানি** নিবাসী **তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় ফরাক্কাবাদে যাইয়া তথায় তাহার স্বগ্রামবাসী রামচাঁদ মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তারিণীবাবুকে ডাক বিভাগে একটি কর্ম করিয়া দেন; এই বিভাগে যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তারিণীবাবু অবসর গ্রহণ করেন এবং আলীগড়ে সুবৃহৎ আবাস বাটি নির্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। খলিসানিতে তাঁহার পিতা রামকানাই মুখোপাধ্যায় শস্যাদির ব্যবসায়াদি করিতেন এবং কালনা, ফরাসডাঙ্গা ও ভদ্রেশ্বরে তাহার চাউলের বৃহৎ গোলা ছিল। তারিণীবাবুও পিতার ন্যায় চাকুরী করিতে করিতে আলীগড়ে শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং তথায় তিনি বহু জমিদারী খরিদ করিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেন।

তারিণীবাবুর তিনটি পুত্র—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র, মধ্যম ঈশানচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শান্তচন্দ্র। তারিণীবাবুর মধ্যম পুত্র ঈশানচন্দ্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় আলীগড়ের মুসলমানগণ ইংরাজ ও বাঙালীদের হত্যা করিবার জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা করেন তাহা ঈশানচন্দ্রের চেষ্টায় কিভাবে ব্যর্থ হয় তদ্বিষয়ে কিছু বলিব। অসমসাহসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহ নিবারণে ইংরাজদের সহায়তা না করিলে আলীগড়ে একজনও হিন্দু বাঁচিয়া থাকিত না।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ঈশানচন্দ্র পোস্ট অফিসে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি পোস্টমাস্টারের পদে উন্নীত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাক্কাবাদের ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন, পরে আজমীরের এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ও ট্রেজারি অফিসার পদেও কার্য করেন। ইনি তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জমিদারী বৃদ্ধি করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় তখন ঈশান চন্দ্র প্রমুখ চার-পাঁচ ঘর প্রবাসী বাঙালীর যে কিরূপ দুর্দিন গিয়াছিল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যখন আলীগড় হইতে সমস্ত সাহেবগণ পলায়ন করেন, তখন নসীরউল্লা নামক জনৈক মুসলমান নগরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের উপর যেরূপ অকথ্য অত্যাচার করে- ইতিহাস পাঠকগণ তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অত্যাচারের মাত্রা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার নিদর্শন আজও স্থানীয় প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের পাষাণশিল্পের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের শেষে বিদ্রোহ দমন হইল বটে, কিন্তু এই কয়মাসের মধ্যে যে কত

শত হিন্দু পরিবার আলীগড় হইতে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, আজ আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

আলীগড় বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের প্রধান সহায় ছিলেন দুইজন বাঙালী—ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামকুমার রায়। কোয়েলের মুসলমানগণ ৩০শে জুন ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার সমস্ত স্থির করিয়াছিল, ঈশানচন্দ্র তাহা অবগত হইয়া মদ্রকে অবস্থিত ওয়াটসন সাহেবকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই সংবাদে অনেকেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হন; কিন্তু বিদ্রোহীরা ঈশানবাবুকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে দৈবক্রমে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

বিদ্রোহীদের নেতা ঘোষ খাঁ ঈশানবাবুকে ধরিতে না পারিয়া তাহার মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ঈশানবাবু প্রথমে কোয়েল নামক স্থানে মুসলমান ফকিরের বেশে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি ও অবস্থিতির বিষয় আগ্রায় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতেন।

আলীগড়ের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাম্লে ঈশানবাবু সম্বন্ধে মীরাটের কমিশনার সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

During the whole time he kept almost daily communication with Eshan Chandra who was concealed at Coel or its neighbourhood. He was of great assistance in procuring Cossids for Dr. Clarke. For this he was plundered by the rebels, and if seized, would no doubt have been put to death. He was the first to send news to Mr. Watson and party to Mediuc, June 30 of the intended attack of the Coel Mahommedans.

বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত প্রায় হইয়া আসিলে, তাহার সদা সঙ্কটময় জীবন লইয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, অশান্তিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া আগ্রার দুর্গে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। তথায় দুর্গ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য যে ছাড়পত্র বাবু ঈশানচন্দ্র মুখার্জী পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত হইল ঃ

In and Out Pass

Fort Agra, 9th September, 1857.

No.	Name	Description
Government	Baboo Eshan Chandra Mukherjee Dy. Post Master of Allyghur (Sd.) J. H. Grames Asstt. Supdt. of Passses.	

ঈশানচন্দ্র ধন ও প্রাণপণ করিয়া অকপটে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য রাজ্যের দুর্দিনে যেভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

বিপ্লবী ধর্মসাধক ও রাষ্ট্রসাধক মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত "প্রবর্তক সঙ্ঘ" কেবল বাঙলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। এই প্রতিষ্ঠানে বহু বিপ্লবী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রবর্তক সঙ্ঘে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তক সঙ্ঘে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে ২১ বৈশাখ ১৩৩৪ সালে শুভাগমন করেন। প্রবর্তক সঙ্ঘের যে ঘরে বসিয়া তিনি একটি গান রচনা করিয়া তথায় গাহিয়াছিলেন, উক্ত গানটি প্রবর্তক সঙ্ঘে উৎকীর্ণ আছে। নিম্নে উৎকীর্ণ গানটি উদ্ধৃত হইল:

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে—
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে' লও খেয়ার নেয়ে
ভেঙে এলাম খেলার বাঁশী, চুকিয়ে এলেম কান্নাহাসি
সন্ধ্যা-বায়ে শ্রান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আছে ছেয়ে।
ও-পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে রে
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে।
এস এস শ্রান্তিহরা, এস শান্তি সুপ্তিধরা,
এস এস, তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে॥"

১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন এবং ভাগীরথী তীরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে মোরান্ সাহেবের বাড়িতে 'কিছু দীর্ঘকাল যাপন' করেন। চন্দননগরে তাঁহার কবিজীবনের উদ্বোধন হয় বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে নদীর প্রভাব বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। জীবনস্মৃতি-তে চন্দননগরের এই মধুর দিনগুলির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। অধ্যাপক মৃণাল ঘোষ "চন্দননগরে বিশ্বকবি" পুস্তিকায় নদীর উপর কবির যে সহজাত আকর্ষণ ছিল তাহা লিখিয়াছেন। নদীর প্রভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন:

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ॥

॥ মতিলাল রায় ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজরক্ষার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেদিন চন্দননগরে যে যুগব্যাপী অসাধারণ প্রচেষ্টার সূচনা হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন মতিলাল ও তাঁহার সহকর্মিগণ। বিপ্লব ও সংগঠন, তাঁহার এই দুই পর্বের প্রবাহেই চন্দননগর ও তাহার বীর সন্তান মতিলাল যে অবদান ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহা নব ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

রহিবে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরও তিন ঋত্বিক্ ও জন্মবীর—কানাইলাল, রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র চন্দননগরেরই সুসন্তান। ইঁহাদের কর্মের ও মর্মের সহিত মতিলালের সংযোগ ও সম্বন্ধ অবিস্মরণীয়।

কানাইলালের বীরকীর্তি—আলিপুর জেলে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য রিভলবার সংগ্রহ করার প্রস্তাব বন্দী কানাইলাল প্রথম করেন—মতিলালের কাছে। আর সেই রিভলভার সরবরাহের ব্যাপারে যে কয়েকজন দুঃসাহসী মানুষ জড়িত থাকিয়া জেলে কানাইলালের হাতে তাহা সুকৌশলে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অন্যতম ছিলেন মতিলাল। এই ঘটনায় লিপ্ত অন্য তিনজন হইতেছেন—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কানাইলাল তাঁর শেষ ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন মতিলালের কাছে। রিভলভার হাতে লইয়া কানাই বলিয়াছিলেন "আমি মরিব—নরেনের রক্ত তর্পণের কথা তোমরা সংবাদপত্রে পড়িও। কেবল একটি অনুরোধ—আমার মৃতদেহ বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া যেন শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা আমার মহিমার জন্য নয়, মির্জাফর, উমিচাঁদের দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাসঘাতক আমার হাতে গ্রহণ করিল, ইহার গৌরব যেন দেশ বুঝিতে পারে।" বীরের মনস্কামনা দেশবাসীই পূর্ণ করিয়াছিল। শ্মশানে অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং উচ্চারিত হইয়াছিল তুমুলরবে—"বন্দেমাতরম্।"

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর আত্মায় আগুন ধরাইয়াছিলেন একদিন শ্রীমতিলালই। অরবিন্দের প্রচারিত গীতার যোগের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়া রাসবিহারী মুগ্ধ চিত্তে মতিলালকে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমার আত্মসমর্পণ যোগের অর্থ—অটোমেশন। যাহা কিছু হয়, তাহা ঈশ্বর করেন—এই অর্থে অটোমেশন।...আমি যে এইমাত্র ভোজন করিলাম বা এই যে তোমার সহিত কথা বলিতেছি—ইহার কর্তা আমি নহি—সব অটোমেশনে হইতেছে। এই অটোমেশনের দ্বারাই আমি বুঝিতেছি—ভারতের বিপ্লব সাধন আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতাই ঈশ্বর চাহিতেছেন—আমার ভিতর দিয়া।"

বীর রাসবিহারী যে অগ্নিবীর্য্য লইয়া ভারতব্যাপী বিপ্লবান্দোলন গড়িয়া তুলিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাহার মূলশক্তি নিহিত ছিল এই অধ্যাত্মযোগেই। গীতার সিদ্ধ আত্মসমর্পণ যোগীর ন্যায় মহাকর্মরত এই রাষ্ট্রবীর চন্দননগর হইতে প্রস্তুত বোমা লইয়া দিল্লীর রাজদরবারে বসন্ত বিশ্বাস মারফৎ লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষেপ করিলে, সে ঘটনায় দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ-রাজের হৃৎকম্প সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা আজ ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবতন্ত্রের এই যুগান্তকারী ঘটনার পর শ্রীঅরবিন্দ উদ্বুদ্ধ উদ্বুদ্ধ চিত্তে তদ্বিষয়ে পণ্ডিচেরী হইতে চন্দননগরে মতিলালকে পত্র দিয়াছিলেন।

শুধু রাসবিহারী নয়, সে যুগে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বভারতের বিপ্লবী কর্মীগণ বৃটিশরাজের তাড়া খাইয়া চন্দননগরেই গোপন-বাসের জন্য ছুটিয়া আসিতেন। ইঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়দাতা ছিলেন—শ্রীমতিলাল। সে গোপন যুগের অজ্ঞাতবাস-কাহিনী বলিতে

গেলে মহাভারতই রচনা করিতে হয়। তাহার ক্ষেত্র ইহা নহে। তবে রাসবিহারী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০১৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। এবং সর্বভারতের বিপ্লবীগণ যাঁহারা চন্দননগরে আশ্রয় লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ১০২৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

এই অজ্ঞাতচারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আগন্তুক যিনি আসিয়া ভগবদাদেশে শ্রীমতিলালের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং। তাঁহার সহিত শ্রীমতিলালের পরিচয় ও মিলনের কথাও ভারতেতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা। কি ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে, কি তাহার অধ্যাত্মেতিহাসে, উভয় দিক্ দিয়াই এই মহতী যোগাযোগ-ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ধর্ম ও জাতীয়তার দিগদর্শনের প্রয়োজনেই একদিন উহার প্রকৃত তাৎপর্য ও ফলাফল-নিরূপণে নিশ্চয় যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশেই বিপ্লবী মতিলাল তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভা ও প্রেরণা লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে ধর্মক্ষেত্রে, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিক সংগঠনের সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—'রয়েলক্লেমেন্সী'-ঘোষণার পর হইতে। এই সময়েই তিনি বিপ্লবী সহতীর্থ—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি অজ্ঞাতচারী বীরগণকে গোপনবাস পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও ইঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বিপ্লবী নায়কগণও তদবধি মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধের নবীন অধ্যায় রচনায় অগ্রসর হওয়ার পথ পাইয়াছিলেন।

শ্রীমতিলাল রায়ের আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধীজী চন্দননগর আশ্রমে প্রথম শুভাগমন করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দের আরব্ধ সংগঠনী প্রেরণা মহাত্মাজীর সংস্পর্শে নূতন সংবেগ ও গতি পাইল—শ্রীমতিলাল ও তাঁহার অনুবর্তী প্রবর্তক সঙ্ঘের জীবনে। স্বয়ং টেগার্ট সাহেবকে গান্ধীজী পত্র দেন—মতিলালের বৈপ্লবিক গতির পরিবর্তন সম্বন্ধে স্বকীয় দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করিয়া এবং তদবধি মতিলাল ও সহকর্মিগণ চন্দননগরের বাহিরে আসিয়া সংগঠনযজ্ঞ সম্প্রসারিত করার নূতন সুযোগ ও প্রেরণা লাভ করেন। বিপ্লবী মতিলাল অতঃপর প্রবর্তক সঙ্ঘের মধ্য দিয়া যে অভিনব কর্ম ও মর্ম-রচনার সূত্রপাত করিলেন তাহা এক কথায় বলিতে গেলে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

"to revolutionise the brain of the nation."

জাতির মস্তিষ্ক ও চরিত্রের পরিবর্তন—মানুষের চিন্তা ও প্রবৃত্তির শোধনে ও রূপান্তরে দিব্য জন্মলাভ ও এরূপ দিব্যচরিত্র নর-নারী লইয়া অভিনব মহাজাতির অভ্যুত্থান —এই বিরাট লক্ষ্য ও প্রেরণা লইয়াই, সঙ্ঘের গতিপথ আজ সুচিহ্নিত হইয়াছে। বিপ্লবী মতিলাল পরমপূজ্য সঙ্ঘগুরুরূপে সঙ্ঘের জীবনে এই মহত্তর অধ্যাত্মবিপ্লবের মহাদীক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তাঁর অশরীরিণী শক্তি ও আশীর্বাণী এই সিদ্ধ পথেই জাতিকে অলক্ষ্যে পরিচালিত করিতেছে ও করিবে। মতিলাল ৬ জানুয়ারী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ই এপ্রিল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

১৯০৮ হইতে ১৯২০ খৃঃ পর্যন্ত সর্বভারতের বিপ্লবী কর্মিগণ যাঁহারা চন্দননগরে মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে ও আবাসে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ঃ

বিপ্লবীবৃন্দ ঃ অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল দত্ত, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, সৌরেন্দ্রমোহন বসু, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাপ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যচরণ কর্মকার, ননীলাল দে, নলিনচন্দ্র দত্ত, মাণিকলাল রক্ষিত, নটবর দাস, হারাধন বক্সী, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দাস, যোগেন্দ্রনাথ শেঠ, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বিশ্বাস, অতুলচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম, এন্, রায়), অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, আশুতোষ নিয়োগী, নির্মলচন্দ্র বক্সী, সাগরকালী ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, অরুণচন্দ্র দত্ত, রামেশ্বর দে, দুর্গাদাস শেঠ, অরুণচন্দ্র সোম, জ্যোতিশচন্দ্র সিংহ, ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপলাল নন্দী, আশুতোষ দাস, পঞ্চানন সিংহ, ভূপতি মজুমদার, মন্মথকুমার বিশ্বাস, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল হাজরা, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনুকূল চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ কাহেলী, হরিশচন্দ্র সিকদার, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র আচার্য, সুশীলকুমার সেন, বাবুরাম পরারকর, আউধবিহারী, প্রতাপ সিং, বালরাজ, নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমৃতলাল সরকার, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নিত্যকেশী ঘোষ, নলিনীকিশোর গুহ, শ্রীশচন্দ্র সরকার, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র দাসগুপ্ত, সীতানাথ দাস, সুশীলকুমার লাহিড়ী, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, আমীর চাঁদ, কর্তার সিং, বালমুকুন্দ, নরেশচন্দ্র সেন, অমরনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ সরকার, রামচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রমোহন সেন, লাড্‌লিমোহন মিত্র, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রক্ষিত, বিনোদিনী ঘোষ, রাধারাণী রায়।*

॥ স্বভাবকবি চন্ডীকাণা ॥

চন্দননগরের তন্তুবায় বংশীয় স্বভাবকবি চন্ডীচরণ 'চন্ডীকানা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্বরচিত গান ছাড়া অন্য কোন গান তিনি গাহিতেন না। তিনি চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। তাঁহার রচিত ও গীত অসংখ্য গান আছে। ৬১৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

নিম্নে চন্ডীকাণার একটি গান উল্লিখিত হইল ঃ

"চক্ষু বিনে ভাই, যত দুঃখ পাই, বলে কি জানাব, আমি তা জানি।
অন্ধের যত কষ্ট, জানেন ধৃতরাষ্ট্র, আর জানেন বিশিষ্ট অন্ধমুনি।

* ২৫-এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চন্দননগর প্রবর্তক সংঘমন্দিরে সমাগত এই ১০১ জন বিপ্লবীদের নামের স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন।

দৃষ্টিহীন জন্য নামটি আমার কাণা, নামের এমনি দোষ আদর করে না।,
জগৎ পূজ্য কড়ি, সেও যদি হয় কাণা, চলে না গো—ওগো ইক্ষু
হলেও কাণা, অগন্য তিনি॥
সম্পূর্ণ দুঃখেতে বলে চণ্ডীকাণা কাণার দুঃখ কিঞ্চিৎ জানে গো রাতকাণা।
ভেবে দেখলাম চিতে কাণার দোষ নানা—জগতে গো!
কেবল কাণা পুত্রের আদর করেন জননী॥
কষ্টে, সৃষ্টে করি পথে আনাগোনা, বালকেরা বলে কোথায় যাসরে কাণা।
স্বহস্তে কেটেছিস্ মহাপাপের খানা, তোর কি মনে নাইরে!
কাণা, খানায় প'ড়ে কেন হারাবি প্রাণী॥
জন্মাবধি আমার মরণ পর্যন্ত, হলো না হবে না এ দুঃখের অন্ত,
জীবনান্তে যদি করেন রাধাকান্ত করুণা গো—
চণ্ডীর ঐ ভরসা মনে দিবা রজনী॥"

চন্দননগরের বিচিত্র কাহিনী *

পোর্তুগীজদের ভারতে আসার প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ বণিকগণ এদেশে আসে। তারপর মোগল শাসনাধীন ভারতবর্ষে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, সুইডিশ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিকগণ দলে দলে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করে। ভারত-সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ফরাসীরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে। তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরস্পর সংঘর্ষের ফলে অনেক উত্থান-পতনের পর ইয়োরোপীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীগুলির মধ্যে ইংরেজ এবং ফরাসীরা প্রাধান্য লাভ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'...... দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পর ফরাসী অধিনায়ক দুপ্লেই ব্যবসায়ীর মুখোশ পরে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যনীতিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে সার্থক করে তোলবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের নজীর থেকে জানা যায় যে, তাঁর স্বদেশবাসীর সক্রিয় সমর্থনের অভাবে দুপ্লের সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজই পরবর্তীকালে প্রকৃতপক্ষে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগরে, তথা বাংলায় সর্বপ্রথম আসে। তদানীন্তন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুমতি অনুসারে চন্দননগরের উত্তরে তালডাঙ্গায় ফরাসী অধিনায়ক দুপ্লে ছোট একটি কুঠি স্থাপন করে। স্থানটিকে গড়বন্দি করার পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তনের ফলে ফরাসীরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অধিনায়ক দেলান্দ ঐ তালডাঙ্গায় ফিরে এসে আবার ব্যবসা-

*হুগলী জেলার ইতিহাসের জন্য অধ্যাপক মৃণাল ঘোষ কর্তৃক লিখিত।

কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তালডাঙগার দক্ষিণে রোড়াকিশনপুর, খলিসানি আর গোন্দলপাড়া, এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ফরাসীরা চন্দননগর শহর গড়ে তোলে। ঠিক এমনি করেই একদা তিনটি গ্রাম সুতানটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুরকে নিয়ে ইংরেজ কলিকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন করেছিল।

চন্দননগরের দক্ষিণপ্রান্তে গোন্দলপাড়া সংলগ্ন "ড্যানিস্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" কর্তৃক পরিত্যক্ত ভূখণ্ড দিনেমারডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে বরাবর পশ্চিম দিক দিয়ে একটি সরু লম্বা খাল কেটে চন্দননগরের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেকালের ইয়োরোপে 'ক্যাসেলে'র চারিদিকে যেমন খাল কাটা থাকত, চন্দননগরকে সুরক্ষিত করবার জন্য ফরাসীরা সেইরকম খালের দ্বারা তাদের সীমান্ত-রেখা নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। সে যুগের রাজনৈতিক আবর্তনে নবাবী আক্রমণ থেকে ফরাসীদের দুর্গ এবং চন্দননগরকে রক্ষা করবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার কথা চন্দননগরের গভর্নরকে লিখিত দুপ্লের ১৭৪৩ সালের ৪ঠা জুনের এক পত্রেও উল্লিখিত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের (২৩শে জুন ১৭৫৭) পর বাংলায় শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, সর্ববিষয়ে ইংরেজ সার্বভৌমত্ব লাভ করল। বাংলায় নবাবী শাসনের ছায়াটুকুও অল্পদিনের মধ্যে অপসারিত হল। সন্ধির পর থেকে বাংলার রাজনীতির মধ্যে ফরাসীদের অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র সুযোগ-সুবিধা রইল না। ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে চন্দননগর এক-সময় ইংরেজের করায়ত্ত হয়েছিল। ভাগীরথীতীরে ফরাসীদের ঘাঁটি চন্দননগরের গুরুত্ব সুচতুর ক্লাইভ বুঝেছিল বলেই যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে চন্দননগরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। চন্দননগরের অপূর্ব কারুকার্যময় নন্দদুলালের মন্দির ইংরেজের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজের কাছে একরকম নতিস্বীকার করেই কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা ছাড়া ফরাসীদের আর কোন গত্যন্তর রইল না।

বাংলাদেশে, হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরে ছোট একটি শহর এই চন্দননগর, কিন্তু এর ইতিহাস বিস্ময়কর এবং ঐতিহ্য অবিস্মরণীয়। যদি কেহ বলেন, হুগলী জেলার প্রাণকেন্দ্র চন্দননগর, তাহলে সেটা একটুও অত্যুক্তি হবে না। "ইতিহাসের নজীর থেকে" জানা যায় যে, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চন্দননগর বাংলার সমগ্র বৈদেশিক উপনিবেশের মধ্যে একদিন শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। শুধু হিমালয়ের অন্তরালে তুষারচ্ছন্ন তিব্বত, অজস্র গোলাপের সৌরভে আকুল বাসারার বাজারের সঙ্গে নয়, মহাচীন, পেগু, জেড্ডা, সুরাট মোবা, ইরান প্রভৃতি দেশগুলিরও সহিত সেদিন চন্দননগরের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। সেকালে কলিকাতা অপেক্ষা বড় ব্যবসাকেন্দ্র ছিল চন্দননগর। চন্দননগরকে কেহ বলা হত 'গ্রেনারি অফ দি ইস্ট'। অনুমান করা যায় আরো আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপনের বহু পূর্বে সপ্তগ্রামের বন্দরের মধ্য দিয়া চন্দননগরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত অন্যান্য দেশের সঙ্গে জলপথে। তখন সরস্বতী নদী মজে যায় নি, সপ্তগ্রামের বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ এশিয়ায় এবং ইয়োরোপের বহুস্থানে যাতায়াত করত।

ভবিতব্যের অমোঘ বিধানে আজ লুপ্ত হয়েছে ভারতে ইংরেজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজ

সাম্রাজ্যবাদ। আবার এমন একটা দিন ছিল যখন বিদেশী শাসন এবং শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলার মুক্তিকামী তরুণদল দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য তাদের কর্ম এবং সংগঠনকেন্দ্র গড়ে তুলল এই চন্দননগরে। স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে প্রথম যে বীর বঙ্গযুবক আত্মদান করেন, সেই কানাইলালের জন্ম এবং শিক্ষাদীক্ষা সব এই চন্দননগরে। এখান থেকেই তরুণ রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে রাসবিহারী-সুভাষচন্দ্রের মিলন এবং সম্মিলিত কর্মপন্থার কথা ভারতের মুক্তিসাধনার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবী মাখন ওরফে জীবন ঘোষাল স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর আহ্বানে জীবনদান করে গেলেন এই চন্দননগরে। আজ সারা ভারত জানে যে, বাংলার অগ্নিযুগের ঋত্বিক আচার্য মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সঙ্ঘের এক নিভৃত কক্ষে মহামানব শ্রীঅরবিন্দ বিভোর হয়েছিলেন সে কোন্ দিব্যজীবনের ধ্যানে।

যদি কোনোদিন চন্দননগরের পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হয়, সেখানে থাকবে ভূদেবচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রারম্ভে এখানে বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষকতার কথা, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গঙ্গাতীরে অবস্থান, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দননগরে অবসর বিনোদন, এখানে বড়বাজারের একটি বাড়িতে মধুসূদনের সনেট রচনা, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যকালে এবং পরিণত বয়সে চন্দননগরের সহিত সম্পর্কের কথা, এভারেস্ট আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদারের চন্দননগরে স্থায়ী বসবাসের কথা ইত্যাদি। ভবিতব্যের কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিতে গঙ্গাতীরের ছোট এই শহরটিতে অবস্থান করেছেন কিংবা বারম্বার শুভাগমন করেছেন বহু দেশবরেণ্য মনীষী যথা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রাজা রামমোহন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে। মহাত্মা গান্ধী এখানে শুভাগমনের পর থেকে সারাজীবন চন্দননগরের সুখদুঃখের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন।" বহু দেশ-বিশ্রুত-কীর্তি মনস্বীর অবস্থিতিধন্য এবং পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত চন্দননগরকে আবার চিরঅম্লান গৌরবের জয়মাল্য এবং যশের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেছেন স্বয়ং কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। চন্দননগর-কাহিনীর শেষ পর্বে সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিকথা আমরা নিবেদন করব।

সাম্প্রতিককালের 'চন্দ্রনগর' শীর্ষক একটি কবিতায় কবি সুধীর গুপ্ত লিখেছেন:

"চন্দ্রনগর নাম কে রাখিল ?
কাহারা প্রথমে বাঁধিল ডেরা ?

কবির এ-প্রশ্নের সঠিক সমাধান করা কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি। শহরটির নাম এখন চন্দননগর, চন্দ্রনগর আর বলা হয় না। চন্দননগরের পূর্বপ্রান্তে ভাগীরথী চন্দ্রকলার মত বেঁকে গেছে—এর থেকেই কি চন্দ্রনগর নামের উৎপত্তি ? শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একসময় চন্দননগরের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শোনা যায় নদী-

পথেই তখন বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ওদিকে সরস্বতী নদী আর এদিকে ভাগীরথী, দুটোই তখন তাঁদের 'ট্রেড-রুট' ছিল। এখানে এ'দের ঐতিহাসিক কীর্তি, বোড়াইচণ্ডীতলার সুপ্রাচীন তীর্থমন্দির আজো বিদ্যমান। ফরাসীরা যেমন একসময়ে তালডাঙ্গায় কুঠি স্থাপন করেছিল, হয়ত এখানেও একসময়ে চাঁদ সদাগরের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত ছিল। চাঁদ সদাগরের নগর, চাঁদের নগর থেকে চন্দ্রনগর নাম হয়েছিল এমন কথাও শোনা যায়। আবার মতান্তরে বলা হয়েছে প্রাচীনকালে এখান থেকে নাকি প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাঠ রপ্তানী হত। চন্দনকাঠ বিক্রয়ের এখানে একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। নদীয়ার ধর্মপ্রাণ রাজা রুদ্র হুগলী জেলার এই অঞ্চল থেকে চন্দনকাঠ সংগ্রহ করতেন। কেউ কেউ বলেন, এই [illegible] ব্যবসাকেন্দ্র থেকে চন্দননগর নাম হয়েছে।

চন্দ্রনগর, চন্দননগর—এসব নামের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, চন্দননগর হুগলী জেলার মধ্যে বহুকাল যাবত একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ফরাসী শাসনের আদিপর্বের চন্দননগরকে লুই বোনার, মোরান্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ নীলের চাষে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিল। আবার অতীতে নদীয়ার সঙ্গে চন্দননগরের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। কৃষ্ণনগরের কয়েকজন ব্যবসায়ী চন্দননগরের গঞ্জে চাউল ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যে এতই বিত্তশালী হয়ে ওঠেন যে, এখানেও সাড়ম্বরে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ-প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন। চন্দননগরের স্থানীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িগণও বিশেষ করে চাউলপটি, কাপড়েপটি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় সেই সময় থেকেই মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করেন। চন্দননগরের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই এখানকার লোকচিত্তকে স্বভাবতঃই জগদ্ধাত্রী পূজার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু একথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, জগদ্ধাত্রী পূজা যেমন জাঁকজমক আর সমারোহের সঙ্গে চন্দননগরে হয়, এমনটি আর কোথাও হয় না। ভারতের বিপ্লবতীর্থ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের [illegible] উদ্বোধনতীর্থ ভাগীরথীতীরের এই ঐতিহাসিক শহরটি জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু মানবের আগমনে হাসিতে, গানেতে, সুরেতে, উচ্ছলতাতে সারা বাংলার আনন্দতীর্থে পরিণত হয়।

যদিও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ও দেশসেবার ইতিহাসে চন্দননগর চিরদিনই এক বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে তথাপি "ধর্মসাধনা, কথকতা, নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, কোন দিক দিয়েই চন্দননগর কারো পিছনে পড়ে থাকে নি। কি ধর্ম, কি রাজনীতি, কি স্বাদেশিকতা, কি সমাজসংস্কার—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, যেদিক দিয়েই বাংলায় যখন যে প্লাবন এসেছে, তখনই চন্দননগর তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চিরদিনই সারা বাংলার সঙ্গে চন্দননগরের আত্মার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে ফরাসীদের পতনের পর, দীর্ঘকাল পরে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে চন্দননগর আবার এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ইংরেজ ভারত ছাড়বার পর ফরাসী-শাসিত চন্দননগর গণভোটের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে আপন মুক্তিসাধন করে।

এই গণভোটে শতকরা ৯৭টি ভোট ভারতভুক্তির পক্ষে ছিল। গণভোটের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর চন্দননগর মুক্তনগরীর মর্যাদা লাভ ক'রে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। চন্দননগরের মুক্তিসাধনার এই অভিনব দৃষ্টান্তের পর, ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী পণ্ডিচেরী এবং তৎসহ মাহে, কারিকল, ইয়ানন প্রভৃতি স্থানগুলির ভারতভুক্তি সম্ভবপর হয়।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক বর্বরতার হাত থেকে গোয়া, দমন, দিউ আজ মুক্ত। এদেশে ব্যবসা অপেক্ষা জলদস্যুগিরিতে পর্তুগিজগণ অধিকতর কুখ্যাত। তাদেরি বংশধরগণ সাড়ে বারশ বছরেরও অধিককাল পশ্চিম-ভারতের একাংশে এদেশের মানুষকে পরাধীনতায় পঙ্গু করে রেখেছিল। পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রতটের এই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ, কুশাসনে নিষ্পেষিত অধিবাসীদের মুক্তিসাধনায় চন্দননগরই সর্বপ্রথম অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯৫০ সালের ২রা মে চন্দননগরের 'ডি ফ্যাক্টো ট্রান্সফার' হয়। ভারত রাষ্ট্রে কার্যতঃ হস্তান্তরিত হবার সময় এ সংক্রান্ত সনদে ফরাসী পক্ষে তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী-ভারতের কমিশনারের প্রতিনিধি মঁসিয়ে তাইয়ার ও ভারতে পক্ষে নবনিযুক্ত শাসন-পরিচালক (অ্যাডমিনিস্ট্রেটার) শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৫১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের হাতে চন্দননগরের (আইনত হস্তান্তর) সম্পন্ন করা হয়। ভারত ও ফ্রান্সের চুক্তিপত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার হরজিৎ সিং মালিক এবং ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের মঁসিয়ে দে লা টুরনেল, নিজ নিজ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ভারতীয় ও ফরাসী পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর উহা কার্যে পরিণত করা হয়।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ডাঃ অমরনাথ ঝাঁয়ের নেতৃত্বে চন্দননগরে একটি কমিশন পাঠান। চন্দননগরবাসীর সহিত সাক্ষাৎ, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর ঝা-কমিশন চন্দননগরের বিপুল ঐতিহ্যের কথা কিছুটা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, নূতন পরিস্থিতিতে চন্দননগরকে হুগলী জেলার শুধু বিশিষ্ট একটি নগর হিসেবে গণ্য করা চলবে না। ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর এই চারটি থানা-সহ চন্দননগরকে নিয়ে হুগলী জেলার মধ্যে একটি নতুন মহকুমা সৃষ্ট করা হল। এখানে একটি নতুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন বলবৎ করা হয়েছে যার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এখানে কাউন্সিলারগণ-সহ মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং অল্ডারম্যান ইত্যাদি আছেন। এই নবসৃষ্ট মহকুমার আয়তন এখন ১৯৮.৫ বর্গমাইল (হুগলী জেলার আয়তনের শতকরা ১৬.৪ ভাগ)।

আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত চন্দননগর অনেক বিষয়ে এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। চন্দননগরের গভর্নমেন্ট কলেজে ডক্টরেট উপাধিধারী অধ্যাপকের সংখ্যা আজ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। চন্দননগররের আয়তনের তুলনায় বহুমুখী, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হুগলী জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানে বেসরকারী আর্ট স্কুল ও টেকনিক্যাল কলেজও আছে। দিল্লীর আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনীতে এ-পর্যন্ত চন্দননগরের শিশুরাই সারা ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক

পুরস্কার পেয়েছে। চন্দননগরের রাইফেল ক্লাবের সভ্যদের কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যগণই বাংলাদেশে ফুটবল খেলায় সর্বপ্রথম ট্রেডস কাপ বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার ফ্রেন্ডস ক্লাবই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন এবং প্রতিযোগিতার' আয়োজন, অনুষ্ঠানাদি করেন। রবীন্দ্র-রচনা ও আদর্শের অনুশীলনের, গবেষণার এবং প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য চন্দননগরের 'রবীন্দ্র-মানস' আজ দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। জেলার এই শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-অনুশীলন কেন্দ্র এবং ইহার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় বলেন :

> "এই জেলার মধ্যে ইহার অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায় না।...এই... গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী যাহা আছে এই জেলার মধ্যে তাহা আর অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ।"(১৬)

আচার্য মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সংঘ একদিন বাংলায় দেশপ্রেমিক এবং ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল। এই প্রবর্তক সংঘে অবস্থান এবং ধ্যানের পর শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রতীরে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন। প্রবর্তক সংঘ আপন মহিমায় চির-সমুজ্জ্বল। কিন্তু দেশবরেণ্য স্বনামধন্য মনীষী এবং চিন্তানায়কের অবস্থিতি-ধন্য চন্দননগরকে অতুলনীয় গৌরবদান করে গেছেন স্বয়ং কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। ১২৮৮ (মতান্তরে ১২৮৪) সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন। হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী ছোট এই শহরটির কোন্ দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে জীবনের প্রায় শেষপর্ব পর্যন্ত চন্দননগরে বারংবার টেনে এনেছে। প্রধানতঃ কবিগুরুর নিজের কথা নিবেদন করেই এখানে আমরা রবিতীর্থ চন্দননগর কাহিনী শেষ করছি।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পথে হঠাৎ মত পরিবর্তন করে, মাদ্রাজের সমুদ্রতীর থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে মুসৌরীর পর্বতশিখরে। সেখান থেকে সোজা চলে এলেন বাংলাদেশে তাঁর জ্যোতিদাদার আশ্রয়ে চন্দননগরে গোন্দলপাড়ার গঙ্গাতীরে। তখন সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোরান সাহেবের বাগানে ভাগীরথীতীরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় অবস্থান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখন কৈশোর আর যৌবনের স্বপ্নক্ষণ। তিনি বারংবার বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সুমধুর দিনগুলি কেটেছে চন্দননগরে গোন্দলপাড়ায় মোরান হাউসে। সেই অবিস্মরণীয় অনুভূতির কথা জীবনস্মৃতির 'গঙ্গাতীরে' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশ্বকবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছিন :

> "আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখন বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্র ফেলে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটি মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম, কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'গাঙ্গেয়' বলতেন। জীবনস্মৃতির একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ গঙ্গাতীরের মোরান হাউসের স্মৃতিকথায় সমুজ্জ্বল ঃ

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি!' এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেশন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি

১৩৩৪ সালে ২১শে বৈশাখ চন্দননগরে নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে কবিগুরু যে প্রতি-ভাষণ দিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে গোন্দলপাড়ার মোরান হাউসেরই অনবদ্য স্মৃতিকথা ঃ

"ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষি সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি বড় যত্নে তৈরী, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগডালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি।.........এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলুম ঃ

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।" (১৭)

কয়েক বৎসর পরে ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭) চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সেই ঐতিহাসিক বিদ্বজ্জনসমাগমে আবেগভরা কণ্ঠে চন্দননগরের মোরান হাউসের সুমধুর স্মৃতিকথা রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন তাঁর উদ্বোধনী অভিভাষণে ঃ

"আজকে আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময় এই সহরের একপ্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল। সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের একপ্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন.........আমার চিত্তের যথার্থ উদ্বোধন হ'ল সেইসময় — বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে। বিশ্বের সুরে সুর বাঁধবার উপলক্ষ পেলাম আমি তখন।.........তখনই আমার কবিজীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।" (১৮)

চন্দননগরে গোন্দলপাড়ার গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাগানের সুরম্য গৃহটির কথা রবীন্দ্র-মানসে ছিল চিরভাস্বর। ১২৯৯ কালে ২রা আষাঢ় বুধবার শিলাইদহ থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছেন ঃ

"এমন এক একটি দিন সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতলার ছাতের গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা......... এইরকম কতকগুলি ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।"(১৯)

১৯৩৫ সালে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে পাতাল বাড়ীতে তিনি কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

সে সময়কার কথা শ্রীমতী রাণী চন্দ কিছু লিখেছেন। (২০) সে বৎসর আষাঢ় মাসে চন্দননগরেই তাঁর একখানি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'বীথিকা' লিখতে শুরু করেন। এতদিন পরে লেখা বীথিকার অনেকগুলি কবিতার মধ্যে আবার মোরান হাউসের স্মৃতি অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্‌ভব। শান্তিনিকেতনে সেই ধারায় কবিতা চলিতেছে।" (২১)

চন্দননগরের মোরান হাউসের স্মৃতি বুঝি বা কবির অবচেতনলোকে চিরমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। গল্পগুচ্ছের দুটি গল্প "অধ্যাপক" এবং "আপদ"-এর মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের যখন কবিজীবনের ছেলেবেলার কাহিনী শোনালেন, সেখানেও সেই মোরান বাগানের কথা:

"তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হোলো মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা-দেওয়া উঁচু-নিচু ঘর, মার্বেল পাথরে বাঁধা মেঝে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। এইখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সবরমতী নদীর পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত।" (২২)

চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার স্মৃতি কবিচিত্তে চিরজাগ্রত ছিল বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে বসে কবি লিখলেন 'খাপছাড়া'। ১০৫টি কবিতা এবং আরো ২৪টি সংযোজন করে খাপছাড়ার কবিতাগুচ্ছ তিনি মনস্বী রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করলেন। আশ্চর্য এই যে, এতদিন পরে বীরভূমে বসে লেখা এই ১০৩টি কবিতার ভূমিকা হিসেবে যে কবিতাটি লিখলেন, সেখানেও চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার কথা:

"ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল যাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন
গোঁদলপাড়ায় এল মাধুকর।" (২৩)

চিরবিস্ময়কর রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কবির প্রাণের সুর, তাঁর লিরিকধর্মী সুর প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সন্ধ্যা-সঙ্গীতে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতে ২৩টি কবিতা আছে। এই কবিতাসমষ্টির মধ্যে 'বিষ ও সুধা' ব্যতীত অধিকাংশ কবিতাই চন্দননগরের মোরান হাউসে লিখিত। মোরান হাউসে অবস্থানের সময়টাকে কবি নিজে বলেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জীবনে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগ। চন্দননগরের এই কবি-ভবনটি সম্বন্ধে ইংরেজ লেখিকা মারজোরি সাইকস বলেন:

"It was beautiful place on the bank of the Ganges. He spent long hours watching the beauty of the river, the changing colours

of morning, noon, afternoon and sunset and at night the moon shining on the dark water.

In this happy home, among those beautiful scenes, he wrote the volume called Evening Songs. This book made him famous at once among the Bengali writers of the time." (২৪)

ফরাসী আমলে চন্দননগরের বিভিন্ন পল্লীর নির্বাচক সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বিবির হাট, ৬৬০, বোড় পশ্চিম ৮৯১, বোড় পূর্ব ১৩০৩, নাড়ুয়া, ৭৬০ গঞ্জ ১০০৪, খলিসানি ৮৮৩, লালবাগান ৮২৭, যুগীপুকুর ১০০০৬, হাটখোলা পশ্চিম ৫৯৬, হাট-খোলা পূর্ব ৬৯২, গোন্দলপাড়া ১৬৭৪, বারাসাত ১৩০৬।

বিভিন্ন দিক হইতে চন্দননগর মহকুমার সংখ্যাতাত্বিক তালিকা এইরূপ:

আয়তন: ১৯৮.৫ বর্গ মাইল (হুগলী জেলার আয়তনের শতকরা ১৬.৪ ভাগ)

লোকসংখ্যা: ৩,২২,৮৮৩ জন (হুগলী জেলার লোকসংখ্যার শতকরা ২০.১ ভাগ)

শহরের সংখ্যা: ৩—চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানি (এই শহরগুলির লোকসংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে)

ইউনিয়নের সংখ্যা: ২০ (হুগলী জেলায় মোট ইউনিয়নের শতকরা ১৫.৬ ভাগ)

থানার সংখ্যা: ৫—চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর

গ্রামের সংখ্যা: ৩৪৪ (হুগলী জেলায় মোট গ্রামের শতকরা ১৮ ভাগ)

জনবসতির ঘনতা: প্রতি বর্গমাইলে ১৬২২ জন

মোট বাড়ির সংখ্যা: ৩৭,৯২৪

ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্নমেন্ট ভারত সর-কারণ উক্ত স্থানগুলি হইতে তখন তাঁহাদের যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় কারকে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য এক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নির্বাহ করা সম্ভব হইত না। এই সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'স্টেটস্‌ম্যান্' পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য:

It is rumoured in Chandernagore that the French Government have decided to dispose of their possessions in India to the Indian Government at a reasonable price. The cost of administering French India is more than the revenue it yields.

সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাসু, নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনি ও বলরাম কাপালী. পাঁচালী গায়ক চিন্তামালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি এবং প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মদন মাষ্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্তী চন্দননগরের অধিবাসী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও কবি-সঙ্গীত রচয়িতা **নৃসিংহ রায়**—গোন্দল-পাড়ায় ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দীনাথ রায় ফরাসী সর-কারের সামরিক বিভাগে কার্য করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর অভিভাবকহীন হইয়া তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং দাঁড়াকবি দলের সৃষ্টিকর্তা সুবিখ্যাত কবিওয়ালা রঘুনাথের কবির দলে প্রবেশ করেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাসু উভয়ে মিলিয়া একটি কবির

দল সৃষ্টি করেন ও অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। দেওয়ান ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী তাঁহাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শ্রুতিমধুর গানে শ্লেষ এবং ব্যঙ্গোক্তি ছিল কিন্তু কোন অশ্লীলতা ছিল না। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক-গমন করেন। গানের ভণিতায় রাসু ও নৃসিংহ উভয়ের যুগ্ম নাম দৃষ্ট হয়।

॥ রাসু ও নৃসিংহ ॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন: "ইঁহাদের রচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুইজনের মধ্যে একব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহারা সখী সংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং সর্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর; ইঁহারা কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহাদের রচিত সখী-সংবাদ ও বিরহ নামক গান উদ্ধৃত হইল:

সখী সংবাদ—মহড়া

ইহাই ভাবি হে! গোবিন্দ সঘনে
আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে?

চিতেন

জগৎ সংসার ভুলাইতে পার
তোমার বঙ্কিম নয়নে।
ওহে! কুঁজী অবহেলে বসিয়ে বিরলে
তোমারে ভুলালে কি গুণে? ইত্যাদি

বিরহ—মহড়া

কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে
প্রীতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।

চিতেন

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানে:
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে
ইহার লাগিয়ে, এসেছি হেথা। ইত্যাদি

॥ চন্দননগরের চিত্রকলা ও গীতবাদ্য ॥

চিত্রকলা ॥ চিত্রবিদ্যায় খ্যাতিসম্পন্ন সুনিপুণ চিত্রকর চন্দননগরে অনেক জন্মগ্রহণ না করিলেও উল্লেখ করিবার মত কয়েকজনের অভাব নাই। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ্য:

এখানকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকর **বেণীমাধব পাল**। তিনি জাতিতে সূত্রধর ছিলেন। কখন কোন চিত্র-বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার সুন্দর এবং সুভাবের দেবদেবী বিষয়ক তৈলচিত্র অঙ্কনের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অঙ্কিত দেবদেবী বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী চন্দননগরে, কলিকাতায় ও নিকটবর্তী স্থানের অনেক অনেক ধনাঢ্যের ভবনে এখনও নূতনবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নৈসর্গিক ছবি আঁকিবার পারদর্শিতাও তাঁহার কম ছিল না। প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি অনেক দিন মারা গিয়াছেন। এখানকার উর্দ্দিবাজারে তাঁহার চিত্রশালা বাটীটি এখনও আছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় একশত দশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার পুত্র মতিলাল পালও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনিও প্রায় নব্বই বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন।

স্বর্গীয় **বসন্তকুমার মিত্র** এখানকার একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। তিনি একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং পুস্তক রচয়িতাও ছিলেন। চিত্রবিদ্যা লাভের জন্য তিনি কখনও বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও একজন বিজ্ঞান সম্মত চিত্রকর ছিলেন। পূর্বোক্ত বেণী পাল মহাশয়ের চিত্রশালাতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষালাভ হয়। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা ছিল। অল্প বয়সেই তাঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগের ও পারদর্শিতার কথা জানা যায়। তিনি জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, রংপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিট্সন্ বেল্ প্রভৃতি অনেক বড়লোকের তৈলচিত্র আঁকিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণ পদকাদি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র এখনও কলিকাতা হাইকোর্টে আছে।

বসন্তবাবু নৈসর্গিক ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্রও খুব আঁকিতে পারিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের গ্লাসগো শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত একখানি চিত্রই বাঙ্গলার মধ্যে একমাত্র পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল, যে তিনি এক পরিচিত মৃত ব্যক্তির একখানি যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফিতেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল।

আশুতোষ মিত্র—চিত্রবিদ্যায় ইঁহার অনুরাগ অল্প বয়স হইতেই ছিল। ইনি ৯।১০ বৎসর বয়সে প্রথম বেণী পাল মহাশয়ের কাছে শিক্ষার্থ যাইতেন। ইন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও সময় সময় শিক্ষা পাইতেন। মানুষের প্রতিকৃতির তৈলচিত্র ভালরূপ অঙ্কনের ক্ষমতা থাকিলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে জলের রংয়ে ও কালী-কলমে প্রতিকৃতি অঙ্কনই ইহার বিশেষত্ব। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোন লোককে দেখিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যথাযথ ছবি আঁকিবার ক্ষমতা ইঁহার মত অল্প লোকেরই দেখা যায়।

গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তিনি ড্রইংয়ের শিক্ষক ছিলেন, পরে পেন্সন পান। তিনিও স্মৃতি

হইতে ঠিকমত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেন এবং মৃত ব্যক্তির এরূপ ছবি আঁকিয়াছেন। আশুবাবু তাঁহার একত্রিংশৎ বৎসর বয়সে সামান্য সাংসারিক কারণে একবার কয়েক দিনের জন্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বধর্মে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের পর ৩৯ বৎসর বয়সে কিছু অভিনব প্রকারে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ, তাহাও তাঁহার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে বহুদিন শিক্ষকতা করিয়া পেন্সন পান। চিত্র বিদ্যায় ইনিও একজন পারদর্শী ব্যক্তি, কিন্তু ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের কাজেই সিদ্ধহস্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

পরেশনাথ সেন,—ইনি একজন উচ্চদরের চিত্রকর। প্রতিকৃতি, নৈসর্গিক ও অন্যান্য তৈলচিত্র অঙ্কনে তাঁহার সমকক্ষ এক্ষণে এখানে কেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত বহু সুন্দর চিত্র কলিকাতার ঠাকুর মহাশয়দের বাটিতে আছে। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাঁহার অঙ্কিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঊর্দু-শিক্ষক আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার সৈয়দ খাঁ বাহাদুরের একখানি ছবি আছে। উহা লর্ড কার্জনের আদেশ মত গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে তথায় রক্ষিত হয়। একসময় ছোট লাট স্যার জন উড্‌বরন কলিকাতা আর্টস্কুলের প্রদর্শনী হইতে পরেশবাবুর অনেকগুলি ছবি ক্রয় করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। পর বৎসর মহারাজা টিপারা-পুরস্কার ও বিশেষ বৃত্তি পান। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক পারিতোষিক ও পদক পাইয়াছেন। তিনি প্রথম ৩ বৎসর সরকারি আর্ট স্কুলে চাকুরি করিয়াছিলেন। পরে সে কার্য ত্যাগ করিয়া কতিপয় ইংরাজি বিদ্যালয়ে ও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বঙ্গ মহিলাকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ফটোগ্রাফিতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

দ্বিজপদ চৌধুরী—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বংশধর। ইনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ছিলেন। প্রকৃতি হইতে ও প্রতিকৃতি উভয় বিষয় অঙ্কনেই দক্ষ ছিলেন। উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ায় শেষে পাগলা গারদে তাহার মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রতিকৃতি ও অন্যান্য তৈলচিত্র অঙ্কনে ইঁহার ক্ষমতা আছে এবং ফটোগ্রাফিতেও ইনি সুদক্ষ। শেষোক্ত কার্যই অধিক করিয়া থাকেন। নিজ বাটীতেই তাঁহার ষ্টুডিও ছিল।

অনুকূলপ্রসাদ সরকার—প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি ও অন্যান্য তৈলচিত্র অঙ্কনে ইঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। ইনি প্রথম আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে রামপুর ষ্টেটে চিত্রকরের কার্য করেন। পূর্বে কলিকাতায় ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারের দৃশ্যপট অঙ্কনের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার আর্ট গ্যালারিতে ইঁহার অঙ্কিত চিত্র আছে।

বিনয়কুমার দত্ত—চিত্রাঙ্কন ইঁহার পেশা নহে, সখ করিয়া ছবি আঁকিয়া থাকেন। জলের রংয়ে নৈসর্গিক চিত্র অতি সুন্দররূপে ইনি অঙ্কিত করিতে পারেন। ইনি বি-এস্‌-সি পাশ করিয়া বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে কার্য করেন।

রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, তুলসীদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কতিপয় সখের চিত্রকর এবং আশুতোষ দাস, শরৎচন্দ্র ঘোষ, চিত্রশিল্পী আশুবাবুর পুত্র রাসবিহারী মিত্র ও সুধীরলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। ইঁহারা উচ্চাঙ্গের চিত্রকর না হইলেও চিত্রাঙ্কনে ক্ষমতাবিশিষ্ট।

রাজেন্দ্রবাবু ভিন্ন এক্ষণে আর যে সকল ফটোগ্রাফার আছেন তন্মধ্যে বিনোদবিহারী ভড়, গদাধর দত্ত, গৌরগোপাল কুণ্ডু ও দেবনারায়ণ কর্মকারের নাম উল্লেখযোগ্য। গদাধরবাবু তাঁহার কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ফরাসী ভারতের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র এবং অন্যত্র হইতে পদকাদি পাইয়াছেন। সিটি ফটোগ্রাফার্স নামে তাঁহার ষ্টুডিও ছিল। শরৎচন্দ্র ঘোষও একজন ভাল ফটোগ্রাফার ছিলেন।

গীতবাদ্য ॥ সঙ্গীতের চর্চা চন্দননগরে বহুকাল হইতেই শুনা যায়। পূর্বে এখানে অনেক ভাল ভাল গায়ক ও সঙ্গীত-রসজ্ঞের বাস ছিল। কতিপয় বঙ্গবিশ্রুত কবি ও যাত্রাওয়ালার এই স্থানে আবাস ছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গায়কদিগের মধ্যে **মধুবাবুর** (মধুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) নামই বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনা যায়। তিনি একজন দেশবিখ্যাত টপ্পা গায়ক ছিলেন। নিধুবাবুর ন্যায় মধুবাবুর টপ্পা এক সময়ে গায়ক সমাজে একটি প্রচলিত কথা ছিল। তিনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ সুললিত গান গাহিবার ক্ষমতা ছিল যে কথিত আছে একদিন স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বংশের জনৈক ভদ্রলোকের সহিত কোন তর্কের পর, তাঁহার কথায় মধুবাবু তাঁহার গানের দ্বারা একটি মৃগকে মুগ্ধ করিয়া সমবেত সকলকে আশ্চর্য করিয়াছিলেন। গোন্দলপাড়ায় তাঁহার বাসগৃহের ধ্বংশাবশেষ মাত্র এখন দেখা যায়।

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় যিনি মদন মাষ্টার নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, গীতবাদ্যে ও পালা রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথম একটি অবৈতনিক যাত্রার দল করিয়াছিলেন।

বসন্তলাল মিত্র চন্দননগরের একজন প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র। সঙ্গীত বিষয়ে উন্নতির জন্য তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তাঁহার উদ্যোগে রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগীতায় নকুড়চন্দ্র কর মহাশয়ের বাগবাজারস্থ উদ্যান ভবনে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার খাতনামা সাহিত্যিক সুরসিক স্বর্গীয় দীননাথ ধর মহাশয় ইহার একজন সহায়ক ছিলেন। উহা কয়েক বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়। পরে রাজারামবাবুর চেষ্টায় অন্যত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থসকলের অনুসন্ধান ও উদ্ধার সাধন বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মাদ্রাজ হইতে **"সঙ্গীত পারিজাত"** কাশ্মীর হইতে **"রত্নাকর"** নামক দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয় দ্বারা পুস্তক দুইখানি সম্পাদিত হয়। **"গান্ধর্ব সংহিতা"** নামে আর একখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। "নর্ত্তক নির্ণয়" নামক দেবনাগরি অক্ষরে হস্ত লিখিত একখানি

পুঁথি তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। **"বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ় রহস্য"** নামে তিনি আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার 'ভারত সংগীত সমাজের' একজন সভ্য ছিলেন এবং সংগীত মিত্রালয় সভার সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। কি চিত্র বিদ্যায় কি সংগীতে তিনি একজন যথার্থ বহুগুণসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন।

রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস ঠিক চন্দননগরের ভিতরে না হইলেও চন্দননগরই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। তিনিও একজন সংগীতবিদ্যা-বিশারদ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসন্তবাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তিনি সংগীত শিক্ষাকার্যেই বিশেষ রত থাকিতেন এবং গায়ক অপেক্ষা সংগীত শিক্ষক বলিয়াই তাঁহার নাম অধিক ছিল। চন্দননগরে তাঁহার কতিপয় শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লনাথ অধিকারী—ইনি রাজারামবাবুর প্রতিবেশী ও শিষ্য ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা কথক তমালচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের পুত্র। তিনিও এখানে একজন গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কতিপয় যুবকের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লবাবু 'চন্দননগর সংগীত সমাজ' নামক একটি সখের অপেরার দল গঠিত করিয়াছিলেন। অভিনয়েও ইহার কৃতিত্ব ছিল। গীতবাদ্যপ্রিয় যুবক সমাজে ইঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বলাইচরণ পাল নামক একজন উদীয়মান যুবক সংগীতে বেশ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন, তিনিও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

গোন্দলপাড়া নিবাসী **রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** একজন ভাল গায়ক ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত কথক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। টপ্পাগানে তাঁহার সমতুল্য তৎকালে এ প্রদেশে কেহ ছিল না। তিনি কথকতাও করিতেন। তাঁহার পুত্র অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন ভাল টপ্পা গায়ক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

রামেশ্বর ঘোষাল খেয়ালের একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। তিনিও যুবকদিগের সংগীত শিক্ষা দিতেন।

স্বর্গীয় বসন্তবাবুর পুত্র **মণিগোপাল মিত্র** একজন ভাল গায়ক বলিয়া খ্যাতিপন্ন হন। তাঁহার প্রধান বিষয় ধ্রুপদ। তিনি কতিপয় যুবককে গান শিখাইতেন।

এখানে গান বাজনার যখন একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তখন ভাল ভাল বাদকও যে অনেক আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শতাধিক বৎসর পূর্বে নিতাইদাসের কবির দলে মোহন নামে একজন ভাল ঢুলির নাম পাওয়া যায়। তৎপরে ঢোল বাদকদের মধ্যে মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র গুই, রামকুমার মাইতি ও সনাতনের নাম প্রসিদ্ধ। এই প্রথমোক্ত দুইজন মদন মাষ্টারের যাত্রার দল হইতে বাহির হইয়া যখন নিজেদের দল করেন তাহাতে ঢোল বাজাইতেন। বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডুগি তবলায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি মধুবাবুর সহিত সংগত করিতেন। পাখোয়াজ বাজিয়ের মধ্যে ঠাকুরদাস অধিকারী, দেবী

ঘোষ ও চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামই বিশেষরূপে শুনা যায়। পীতাম্বর সর্দার ও উহার শিষ্য গুণমণি কর্মকার বেহালায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। গুণমণি একজন খুব নামজাদা লৌহকার ছিলেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাল সেতারবাদক ছিলেন।

ইহা ছাড়া বসন্তবাবুর সহোদর শিবকৃষ্ণ মিত্র, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর গঙ্গাধর চৌধুরী ও কলিকাতার সুবিখ্যাত মৃদঙ্গবিশারদ দীননাথ হাজরার দৌহিত্র বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়দিগকে ভাল মৃদঙ্গবাদক বলিতে পারা যায়। তারিণীচরণ ভট্টাচার্য ও তাঁহার ভ্রাতা আদ্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ও ভাল বাদক। তারিণীবাবু ডুগি-তবলায় এবং আদ্যনাথবাবু হারমোনিয়মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (২৫)

॥ প্রবর্তক সঙ্ঘ ॥

হুগলী জেলার গৌরব প্রবর্তক সঙ্ঘ আজ বাংলা তথা নিখিল ভারতে সুপরিচিত। লোক-সেবায়তন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রবর্তক সঙ্ঘ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া নিষ্কাম সংগঠনমূলক কর্মবৈচিত্র্যে ও স্বাবলম্বনের সাধনায় প্রবর্তক সঙ্ঘকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠান একটি যুগোপযোগী সামগ্রিক ভাবের বিকাশ। এই ভাবের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা শ্রীমতিলাল রায়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এই রায় পরিবার চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত। মতিলালের পিতামহ গোলকচন্দ্র রায় যুক্তপ্রদেশের ময়নাপুর জেলা হইতে প্রথম বাংলায় আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। গোলক রায়ের পুত্র বিহারীলাল। বিহারীলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমতিলাল রায়।

তিনি ১৫ বৎসর বয়সে চুঁচুড়ার সমগোত্রীয় *হরিনারায়ণ সিংহের নবম বর্ষীয় কন্যা রাধারাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর একটিমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা তাঁর দাম্পত্য জীবনের পুনশ্চ মোড় পরিবর্তন করিয়া স্বল্পস্থায়ী প্রাকৃত ভোগ-জীবনের অবসান আনে। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন। সাধ্বী পত্নীও স্বেচ্ছায় সম্মতিদান করেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে আমরণ নারী জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া পতির ব্রত পূরণে সহায়তা করেন। যৌবনে যোগিনী সাজিয়া চিরতপস্বিনী এই নারী স্বামীর সহধর্মিণী-রূপে শুধু নিজের জীবন নয়, পতিদেবতার জীবনও পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পবিত্রতা ও সংযমের বিগ্রহরূপিণী মহাশক্তির আধার রাধারাণী দেবীর দিব্য মাতৃত্বের মহিমা একদল সর্বোৎসর্গীকৃত সন্তানগোষ্ঠীকে অপূর্যমান স্নেহে লালনপালনের মধ্য দিয়া মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া সঙ্ঘের জন্ম ও পুষ্টি দান করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

সঙ্ঘের তত্ত্ব আদর্শ ও লক্ষ্য

এই সঙ্ঘের সৃষ্টি কোন পূর্ব-পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। বুদ্ধির অপেক্ষা 'বোধ'-এর অনুগামী হইয়া সঙ্ঘের সৃজনধারা বিকশিত। সঙ্ঘের সাধনা আত্মসমর্পণ যোগ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহার এই যোগে। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়ের উপর সঙ্ঘের সাধনা

প্রতিষ্ঠিত। উহারই প্রতীক গুরু, মন্ত্র, প্রতিমা সাধনার আশ্রয়। প্রাচীন বৈদিক ভারতের যে ভাগবৎ জীবনবাদ বুদ্ধোত্তর যুগের ইহবিমুখ নৈষ্কর্ম ও নির্বাণবাদের আওতায় ম্লান হইয়া পড়ে, তাহাই পুনশ্চ পরাধীন ভারতের পৌরাণিক যুগে মোক্ষবাদে রূপান্তর লাভ করিয়া এ জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। এই ত্যাগ বৈরাগ্যের ও উৎসর্গের মুখ ফিরাইয়া এবং ধর্মবিষয়ক গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘ এক বীর্যবন্ত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও ভারতীয় মৌলিক দর্শনের উপর এ জাতির বনিয়াদ রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ। অন্তরে সর্বব্যাপক চৈতন্যময় বিশ্বাত্মার ভৌম সত্তার অনুভব এবং বাহিরে তাঁরই লীলাবৈচিত্র্য-দর্শন। এই পরিপূর্ণ ভাগবৎ চেতনার উপর সঙ্ঘের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং ভাগবৎ কেন্দ্রের আনুগত্য প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাধনা সঙ্ঘের সাধক-সাধিকাগণ করিয়া চলিয়াছে।

প্রবর্তক সঙ্ঘ এই সমুচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দীর্ঘদিন পথ চলিয়াছে; ইহা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। ধর্ম-জীবনের সর্বাঙ্গীন অখণ্ড প্রকাশ, তাই বিশুদ্ধ ভাগবৎ জীবনই ধর্মের মূর্তি। এইরূপ জীবন শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবন নয়, পরন্তু নিষ্কাম সমষ্টি-গত তথা জাতিগত জীবন। প্রবর্তক সঙ্ঘের অভিনবত্ব এইখানে যে, সঙ্ঘ কর্ম ও পরি-বেশকে পরিবর্জনপূর্বক জীবনকে নিষ্কর্ম ও পঙ্গু করিতে চাহে না। ত্যাগ কর্ম বা বস্তু নয়—কর্মফল বা কর্মাসক্তি এবং বিষয়-লিপ্ততা। সঙ্ঘজীবনে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম সাধনা। সঙ্ঘ সাধনা করিতে গিয়া যে বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভূতপূর্ব। সর্বপ্রকার ভোগক্ষেত্র হইতে দূরে পলাইয়া নয়, আকণ্ঠ ভোগ-উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও আত্মজীবনে নিষ্কাম, নিরাসক্তি ও ও অসংগ্রহের সাধনা করিয়া সঙ্ঘ-সভ্যেরা চলিয়াছে। শিক্ষা, অর্থ, ধর্ম, সমাজ—জাতীয় জীবন-বিকাশের সর্বক্ষেত্রেই সঙ্ঘ যে সৃষ্টির শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতের স্বকীয় জাতীয়তারই পুষ্টিবিধান করিতেছে। এইখানেই প্রবর্তক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য এবং এই সৃষ্টিকরী বিশিষ্টতা সঙ্ঘকে সমগ্র অতীত ও বর্তমানের ধর্ম-সংস্থাসমূহের অগ্রণী ও দিকদর্শক হিসাবে যুগচিহ্নিত করিয়াছে।

সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য: প্রেম ও ঐক্য মন্ত্রে সিদ্ধ জাতি গঠন। ভাগবৎ চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের সংহতি গঠন। এই আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান। স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র সত্ত্বেও উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষের এখানে সর্ববিষয়ে সমানাধিকার। সঙ্ঘে দাবী নাই, আছে সেবা ও সমর্পণ।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব প্রবর্তক সঙ্ঘেরই জন্মোৎসব বলা চলে এইজন্য যে, এই পুণ্য তিথিতেই প্রথম প্রবর্তক সঙ্ঘের বীজাঙ্কুর হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই উৎসব চন্দননগর সঙ্ঘের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের প্রচার, মূর্তিতে, প্রাচীর-চিত্রে ও লেখনীতে এবং মনীষিবর্গের বক্তৃতায় জাতীয়

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন-বিকাশের আলেখ্য দেশ ও দশের সামনে পরিবেশিত হইয়া থাকে। এই ধরনের শিক্ষাপ্রদ উৎসব ও প্রদর্শনীর প্রবর্তক, প্রবর্তক সংঘকে বলা যায়।

সঙ্ঘের স্বাবলম্বন সাধনার অত্যন্ত ক্ষুদ্রারম্ভ আজ বিচিত্র ও ব্যাপক অর্থ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় সঙ্ঘ-সন্তান ভিক্ষা বা দানের অর্থে দেশ-সেবা শ্রেয়ঃ না করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও শ্রমকে অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। প্রবর্তক পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম মুদ্রণ প্রেসের সৃষ্টি। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘগুরু ৯৲ সুদে একলক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন কিন্তু বৈষয়িক অনভিজ্ঞতার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণকৃত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু সঙ্ঘের খাঁটি বিশ্বাসের মানুষ যারা, তাদের শ্রম, শক্তি ও সহযোগিতায় সঙ্ঘ এই ঋণ মুক্ত হয়।

সঙ্ঘের এই অর্থ সাধনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা আসে বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ন-মেন্টের তরফ হইতে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই বিঘ্ন আশীর্বাদের মতই হয়। অলক্ষ্যে এক তৃতীয় শক্তি সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর চন্দননগর হইতে বৃহত্তর মহানগরী কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে যেন বাধ্য করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একমাত্র তৃতীয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় প্রবর্তক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। ব্যাঙ্ককে মধ্যমণি করিয়া অতঃপর বিবিধ ব্যবসার প্রসার ঘটে। এই সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যমকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত করিয়া বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘগত করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তক ট্রাস্ট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ সভ্যগণ কর্তৃক মনোনীত একটি ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক এই সব অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত। ইহার মূল কেন্দ্র-অফিস ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (বর্তমানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা।

সঙ্ঘের অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহঃ প্রবর্তক ট্রাস্ট লিমিটেড্, প্রবর্তক জুট মিলস্ লিমিটেড, প্রবর্তক ফার্ণিশার্স লিমিটেড, প্রবর্তক কমার্সিয়াল করপোরেশন লিঃ, প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিঃ, প্রবর্তক পাবলিশার্স, প্রবর্তক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রবর্তক কৃষি বিভাগ, প্রবর্তক খাদি বিভাগ, প্রবর্তক কুটির শিল্প বিভাগ, নব-সঙ্ঘ প্রেস, আর-ডি-জি (ক্যাবিনেট মেকার্স)। সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'প্রবর্তক 'ও সাপ্তাহিক 'নব-সঙ্ঘ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এখন প্রবর্তকের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ও নবসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।

॥ কার্তিক-গণেশ পূজা ॥

চন্দননগরে সরিষাপাড়া চৌমাথায় বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রায় শতাধিক বর্ষের পুরাতন কার্তিক-গণেশের একত্রে সার্বজনীন ভিত্তিতে পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কার্তিক-গণেশের এইরূপ একত্রে পূজা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও হয় না। কার্তিক মাসে এই পূজা হয় এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

॥ সংকেত সূত্র ॥

Hooghly Past and Present By Shumbhoo Chunder Dey
Calcutta Past and Present
৩ La Mission du Bengale Occidental, Vol I.
৪ History of the French in India.
৫ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রবর্তক, ফাল্গুন ১৩২৮)
৬ A Journal (1811 till the year 1825) By Maria Lady Nugent.
৭ Survey Map 1751-52.
৮ Heber's Journey through the Provinces of India.
৯ পুরাতন দলিল—হরিহর শেঠ (প্রদীপ, ভাদ্র ১৩১১)
১০ The Good old days of Honourable John Company.
১১ A Gazetteer of the world.
১২ প্রজাবন্ধু (২৩ ফাল্গুন ১২৮৯)
১৩ La Compagnic Faancaise des India.
১৪ কানাইলাল—মতিলাল রায় ও মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—সুধীরকুমার মিত্র
১৫ Adam's Report on Vernacular Education in Bengal.
১৬ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর—হরিহর শেঠ
১৭ বঙ্গবাণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণী
১৯ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রানী চন্দ
২১ রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২২ ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩ খাপছাড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ Story of Rabindranath Tagore By Marjorie Sykes.
২৫ চন্দননগরের চিত্রকলা ও গীতবাদ্য—হরিহর শেঠ (প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩১)
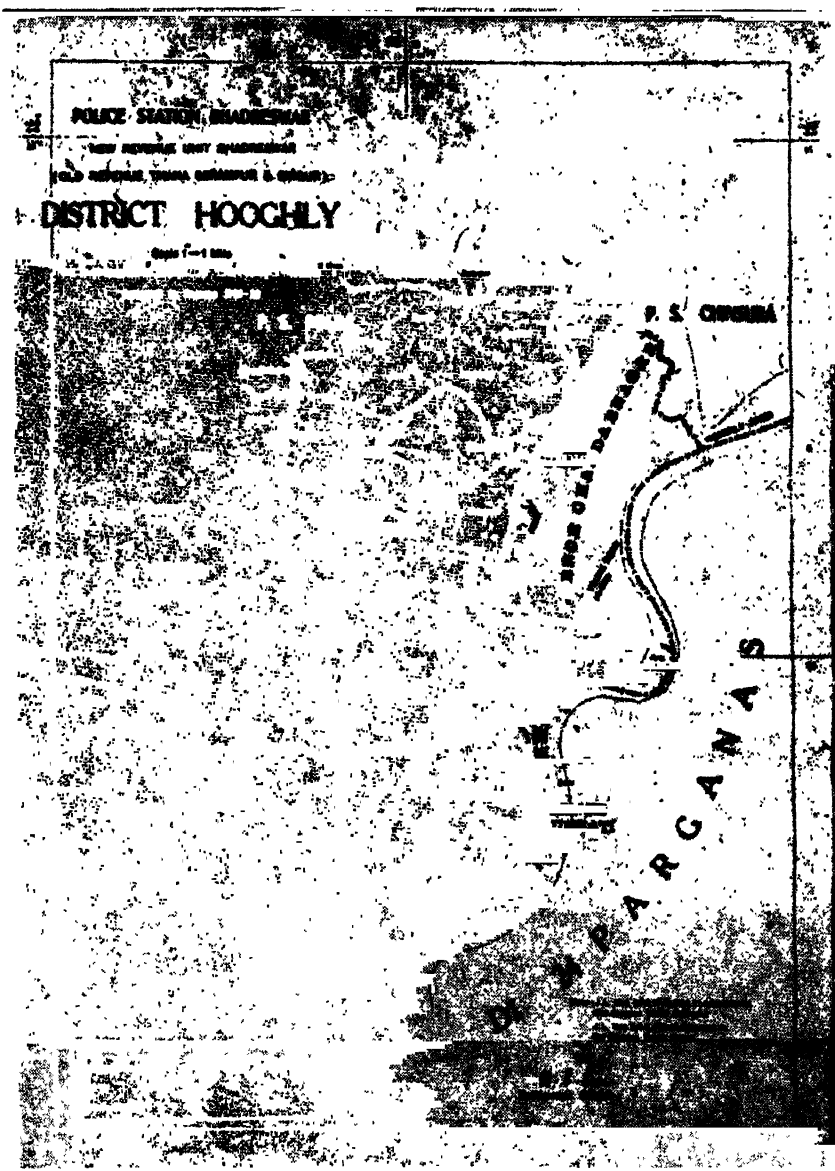
ভদ্রেশ্বর থানার সার্ভে-ম্যাপ

[১৯৩০-৩৩]

॥ ভদ্রেশ্বর ॥

শিল্পসমৃদ্ধ **ভদ্রেশ্বর** একটি প্রাচীন স্থান; ভদ্রেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ হইতে এই অঞ্চল ভদ্রেশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। 'বুদেসী' নামেও এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম উল্লিখিত আছে; ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; জনসাধারণের ধারণা যে, ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথ-দেবের ন্যায় স্বয়ম্ভু। এই স্থান কলিকাতা হইতে আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র শহর চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত। ইহা অক্ষাংশ ২২°৫৩´ **উত্তর** ও ৮৮·২১´ পূর্বে অবস্থিত। এই শহরের উত্তরে চন্দননগর দক্ষিণে চাঁপদানী, পূর্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে ইস্টার্ন রেলওয়ে লাইন। ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডু এই দুইটি স্টেশন শহরে আছে।

Bhadreswar is an old place, being mentioned in the poem of Bipra Das (1495 A. D.) and shown in the Pilot Chart of 1703 as Buddesy. (Hooghly District Gazetteers.)

সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা ও ব্যবসায়াদির জন্য এই স্থান অতীত কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অ্যাডম সাহেব ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানে দশটি চতুষ্পাঠী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার পুস্তক *A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*-এ নদীয়া, কাশী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার বিবরণ ও অধ্যাপকবৃন্দের নাম দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন : "ভদ্রেশ্বরে ৮টি ন্যায়-চতুষ্পাঠী আছে।"

কালনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বরের ন্যায় বড় গঞ্জ পূর্বে আর কোথাও ছিল না। ভদ্রেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের সকল ধান ও চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত। এ ছাড়া জায়গাটি পূর্বে পাটজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-কেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্বন্ধে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে:

In old days Bhadreswar was a great mart, serving Calcutta and the surrounding country within a radius of 20 miles.

ভদ্রেশ্বরের উত্তরে ফরাসী সীমানার যে গড় আছে, উহা পূর্বে ফরাসীদের অধিকারে না, ইংরাজদের অধিকারে ছিল। বর্তমান ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত কৃষ্ণপটি গ্রাম পূর্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ইংরাজ ও ফরাসীদের সীমানা বক্রভাবে ছিল বলিয়া, তাঁহারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে গড়টি সোজা করিয়া লন, ফলে কৃষ্ণপটি গ্রাম ইংরাজদের হইয়া যায়। এই কৃষ্ণপটি গ্রামে ফরাসীদের তেলেঙ্গী সৈন্য থাকিত বলিয়া এই অঞ্চল তেলেঙ্গীপাড়া বলিয়া প্রখ্যাত হয়; পরবর্তীকালে তেলেঙ্গীপাড়ার অপভ্রংশ হিসাবে এই পাড়া তেলেনীপাড়ায় পরিণত হয়।

ভদ্রেশ্বরের ইতিকথা ঘটনাবহুল। কলিকাতার আশেপাশে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বিদেশী বণিক সম্প্রদায় হুগলী জেলায় যে সব শহরের পত্তন করিয়াছিল, ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পল্লীর শান্ত ও নিস্তব্ধ পরিবেশ ইঙ্গ-ফরাসীর দ্বৈতভূমিকায় শিল্প মুখর অঞ্চলে রূপান্তরিত হয় এবং ব্যবসাজগতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈতভূমিকার সমন্বয়কেন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদের আগমন, জাতীয়তাবাদের উত্থান ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শ্রমশিল্প-বিধৃত অঞ্চলটি নিজস্ব ঐতিহ্যে গড়িয়া উঠে। বিদেশী উপনিবেশের স্কেচ ম্যাপ ১০৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

ভদ্রেশ্বর সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন যে দুরারোগ্য ব্যাধি ও মনস্কামনা পূরণের জন্য ভদ্রেশ্বরনাথের নিকট নারীগণই এই স্থানে অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকেন। শিবরাত্রি, বারুণি ও পৌষ-সংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

The shrine is largely frequented, chiefly by females,in the hope of obtaining cure from illness or the attainment of some cherished wish.

মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল ইউরোপীয় জাতি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসিয়াছিল, দিনেমারগণ তাহাদের অন্যতম। শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মাণ করিবার পূর্বে ফরাসী সীমানার গড়ের নিকট তাঁহারা একটি স্থান অধিকার করে। কালক্রমে ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত ব্যবসায় পাল্লা দিতে না পারায়, তাহারাও ভারতে বসবাস করা পরে বন্ধ করিয়া দেয়।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সনন্দ লইয়া জার্মান সম্রাটের অধীন বেলজিয়ামের কতকগুলি বণিক হুগলীর নিকটে বাঁকিবাজারে (ভাগীরথীর অপর পারে) একটি কুঠি স্থাপন করেন।

ভদ্রেশ্বরে দিনেমারগণ প্রথম কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান অদ্যাপি দিনেমারডাঙ্গা বলিয়া খ্যাত। জার্মানগণ "ইস্টার্ন জার্মান প্রসিয়ান কোম্পানী" নাম দিয়া এই দেশে যখন ব্যবসা করিতেন, তখন পূর্বোক্ত দিনেমারডাঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ করিয়া তাহারা অবস্থান করিত। চতুর ইংরাজ-বণিকগণের চক্রান্তে জার্মান ব্যবসায়িগণ নবাবের বিষ-নজরে পড়ায়, ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হন। জার্মান ও অস্ট্রিয়ান জাতি এই স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া পূর্বে ব্যবসায়াদি করিত।

অস্টেন্ড কোম্পানীর বণিকগণ অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা অল্পমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করিত বলিয়া তাহাদের ব্যবসা বাংলাদেশে খুব প্রসার লাভ করে। সেই-জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহারা যাহাতে আর সনন্দ না পান, তদ্বিষয়ে বহু প্রকার চেষ্টা করেন; কিন্তু চতুর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বাণিজ্য বাংলাদেশের মঙ্গল জানিয়া, অস্টেন্ড কোম্পানীকে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন

The Prussians established a factory a short distance south of Chandernagore. Their venture was short-lived, for they could not withstand the hostility of the other European Companies on whom, moreover, they were dependent for pilotage through the dangero shoals of the Hooghly river and by 1760 the Company was wound up. —History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule. L. S. S. O' Malley.

ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ একযোগে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ কামনায় কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ নিযুক্ত করেন এবং জার্মানদের একখানি মালবোঝাই জাহাজও তাঁহারা অধিকার করিয়া লন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পীর খাঁ কালোয়াৎ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন; তাঁহাকে ইউ-রোপীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ উৎকোচে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং তিনি রাজকীয় প্রধান বন্দর হুগলীর এত নিকটে অস্টেণ্ড কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণের এক অতিরঞ্জিত সংবাদ নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতে অস্টেণ্ড কোম্পানীর সহিত হুগলীর ফৌজ-দারের বিবাদের সূত্রপাত হয়। জার্মানগণ সেইজন্য গঙ্গায় নবাবের নৌকা যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়।

অস্টেণ্ড কোম্পানীকে সায়েস্তা করিবার জন্য নায়েব ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। মীরজাফর দুর্গ অধিকার অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাহাদের কুঠির সম্মুখে গড়বন্দী করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ফরাসিগণ এদিকে গোলা-বারুদ দিয়া অস্টেণ্ড কোম্পানীকে সাহায্য করিবার ভান করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন কিছুই করিল না, তখন খাদ্যাভাবে তাহারা মহাবিপদে পড়িল; বাহির হইবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাহারা ভিতর হইতে কামান চালাইতে লাগিল। দেশীয় সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে পালাইতে লাগিল; কিন্তু তেরজন জার্মান বণিক সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের অধ্যক্ষের হাতে গোলা লাগায়, তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া রাত্রে পলায়ন করেন এবং মীরজাফর তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া পরে তাহা ভূমিস্মাৎ করিয়া দেন। জার্মানদের বাংলাদেশে ব্যবসায় চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

॥ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ॥

তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ; বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় জিনিস। নয়টি চূড়াবিশিষ্ট এইরূপ বিরাট মন্দির একমাত্র মহানাদ ও বাক্‌সা ব্যতীত অন্যত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সংস্কারাভাবে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেবসেবা পালাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ সুচারুরূপে করিয়া থাকেন।

দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সৌভাগ্য-রবি উদিত হয়; এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে; তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

জমিদারী ব্যতীত দান, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু সৎকীর্তি তাঁহাদের ছিল। বহু চতুষ্পাঠী এই স্থানে ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কালক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন কমিয়া যাইলে, এই দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তখন এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অগ্রণী হন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ১২৪৬ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল:

"ইংরেজী পাঠশালা স্থাপন—জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি তেলেনীপাড়াস্থ ধনী জমিদার

মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইংরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন, ঐ বিদ্যালয়ের তাবব্যয় তাঁহারাই নির্বাহ করিবেন।"

॥ রসরাজ ধীরাজ ॥

তেলিনীপাড়ায় বর্ধমান মহারাজার গায়ক ধীরাজ বাস করিতেন। তাঁহার রচিত অসংখ্য গান আছে। সংগীতের সহিত রঙ্গরসে তাঁহার নিপুণতা অসাধারণ ছিল। একবার মশকের ডাকের অনুকৃতি করিয়া তিনি মহারাজার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পান। চন্দননগর স্টেশনের কাছে কালীদাস শেঠ প্রতিষ্ঠিত যে কালীমন্দির আছে, ঐ মন্দিরের কালীমূর্তি প্রথম তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আসল নাম ছিল বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপচাঁদ প্রদত্ত ধীরাজ উপাধিতেই ইনি পরিচিত ছিলেন। সেকালের বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন লঘু-গুরু ঘটনাবলীর উপর তাঁহার অসংখ্য গান আছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লইয়া তাঁহার গান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে রচিত হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন এবং তিনি ধীরাজকে খুব স্নেহ করিতেন।

মিস্ মেরী কার্পেন্টার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরপাড়া স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে ধীরাজ একটি গান রচনা করেন। উত্তরপাড়ায় গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পা ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্থানে গানটি উদ্ধৃত হইলঃ

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলেছে তোলাপাড়ী
এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে,
কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই সবাই দেখেছে।
এখন এসে কলকাতাতে (এবার)
বাঙ্গালিদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে,
বড়ই রগড় হ'ল পথে, এটকিনসন্ উড্রো
আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে
গাড়ী উলটে পল্লেন সাগর,
অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে॥

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভদ্রেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। "ব্রহ্ম সঙ্গীতাবলী" রচয়িতা কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস সেই আন্দোলনের অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহ রচিত গান ব্রাহ্মসমাজে এখনও গাওয়া হয়।

এই স্থানের মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় বংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত; মুখোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় ডাক্তার সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায় চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের দেওয়ান **আত্মারাম সরকার** এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পুত্র কলিকাতার ডেপুটি-ট্রেডার বনমালী সরকার ব্যবসায়াদি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার কুমারটুলির বাড়ি কলিকাতায় একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। বনমালী কিছুদিন পাটনার কমার্শিয়াল রেসি-ডেন্টের দেওয়ান পদে ছিলেন। তাঁহার কুমারটুলীর বাড়ি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণের বহু পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। আত্মারামের রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে আরও দুই পুত্র ছিল। অদ্যাপি তাহার বাড়ির বিষয় এই প্রবাদটি প্রচলিত আছেঃ

"গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি,
বনমালী সরকারের বাড়ি।"

জেলে এই স্থানের আদিম অধিবাসী। ভাগীরথী এই স্থান হইতে বাঁকিয়া যাওয়ায় গ্রামের তিন দিক দিয়াই ভাগীরথী প্রবাহিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্থান মৎস্য ধরিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া সুদূর অতীতকাল হইতে এই অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ বাস করিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে বহু অ-বাঙ্গালী মুসলমান সৈনিকের কার্য লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বর্তমানে গ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানগণ আংশিকভাবে এবং মধ্যভাগে মৎস্যজীবিগণ বাস করে।

॥ অবহেলিত রামসীতার মন্দির ॥

পাইকপাড়া অঞ্চলে এক অপূর্ব **রামসীতার** মন্দির আছে। এই মন্দিরটিরও নয়টি চূড়া আছে; কে যে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। পূর্বে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, কালক্রমে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় মন্দির হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ভাগীরথী সরিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবেশপথের উপরে কারুকার্যখচিত ইষ্টকে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত আছে। কালক্রমে যত্নাভাবে বহু ইষ্টক নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, সাধারণ ইষ্টকদ্বারা সেইগুলি পূরণ করা হইলেও, এখনও সহস্রাধিক ইষ্টকের উপর অঙ্কিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে একখানি ইষ্টকের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল, ইষ্টকখানির এক-চতুর্থাংশ ভাঙ্গিয়া যাইলেও শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া আছেন, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বালকগণ মন্দিরের চিত্রিত ইষ্টকগুলি খুলিয়া যে ভাবের খেলা করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই মন্দিরের কারুকার্যখচিত ইষ্টকগুলি যে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পূর্বে অ-বাঙ্গালী মোহান্তগণ এই মন্দিরের অধিকারী ছিলেন। এক মোহান্ত পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে নূতন মোহান্ত নির্বাচিত হইতেন। পরে স্থানীয় গোস্বামীগণ এই মন্দিরের উত্তরাধিকারী হন, বর্তমানে শ্রীমতি গিরিবালা দেবীর

এক ভগ্নীর পুত্র শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এই মন্দিরের সেবাকার্যে ব্রতী আছেন।

মন্দিরের মধ্য হইতে অষ্টধাতু নির্মিত রামসীতার মূর্তি বর্তমান গিরিবালা দেবীর গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রামসীতার মূর্তি দুইটি প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। গিরিবালার অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া প্রত্যহ বিগ্রহের সেবা পর্যন্ত এখন হয় না; আর মন্দিরের অবস্থার বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। বর্তমান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে এই প্রাচীন মন্দিরের সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। ভদ্রেশ্বরে চন্দননগরের ন্যায় দশখানি বিরাট জগদ্ধাত্রী প্রতিমার পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

এই স্থানে অন্নপূর্ণা গ্রন্থাগার, খেয়ালী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি হুগলী জেলার গৌরব বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। প্রতিবৎসর খেয়ালী-সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, সমালোচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী যোগদান করেন। এ খেয়ালী সঙ্ঘ হইতে 'আহুতি' নামক একখানি সাময়িকপত্র পূর্বে প্রকাশিত হইত।

এই স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও একটি মিল থাকায় জনসংখ্যা এই স্থানের খুব বেশী। এই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি, পোষ্ট অফিস, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। ভদ্রেশ্বর গভর্নমেন্ট কলোনী যুব সমাজের উদ্যম ও সংহতিতে একটি আদর্শ উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের "জনপদ বহুমুখী সমবায় সমিতি" একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া ভদ্রেশ্বর সারদা-পল্লী কন্যা বিদ্যাপীঠ ভদ্রেশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

॥ ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি ॥

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পৌর-সভার প্রথম সভাপতি হন চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। পৌরসভার আয়তন মাত্র আড়াই বর্গ-মাইল। ভদ্রেশ্বরে বৈদ্যুতিক আলো ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পৌরসভার সভাপতি অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সময়ে প্রথম হয়। এখন পৌর এলাকায় আলোর সংখ্যা প্রায় চারশত। মিউ-নিসিপ্যালিটি পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। এক নম্বর ওয়ার্ড ভদ্রেশ্বর, দুই নম্বর ওয়ার্ড গুরুটি বা গৌরহাটী, তিন নম্বর ওয়ার্ড তেলিনীপাড়া এবং চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড মানকুণ্ডু।

ভদ্রেশ্বরের মিল এলাকা ছাড়া অন্য স্থানগুলি খুব পরিষ্কার রাখা হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে অসুখের প্রাদুর্ভাব হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রধান রাস্তা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তার গা দিয়া যে সব শাখা রাস্তাগুলি আছে, সেইগুলি অপ্রশস্ত ও ধূলি-ধূসরিত। এখানকার রাস্তার মাইলেজ ১৩·৬৭ মাইল। ইহার মধ্যে ৯·৮৫ মাইল হইতেছে কাঁচা রাস্তা। কাঁচা রাস্তাগুলিকে চলার উপযোগী ও সুসংস্কৃত করিলে পথচারীরা উপকৃত হইবেন। এই সব রাস্তার দুধারে গভীর কাঁচা অপরিষ্কার নর্দামা পৌরসভার কলঙ্ক। পরিমার্জনের অভাবে নর্দামা হইতে দুর্গন্ধ ও জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার জন্য পেটের অসুখের প্রাদুর্ভাব এই স্থানে প্রায়ই হয়।

পৌরসভার নিজস্ব 'ওয়াটার-ওয়ার্কস' নাই বলিয়া মিল এলাকা ছাড়া সর্বত্রই জলাভাব আছে। ৮০টি নলকূপের সাহায্যে জলদানের ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণা

নিবারণের জন্য মিল কর্তৃপক্ষের পৌরসভাকে সহৃদয়তার সহিত সাহায্য করা কর্তব্য। পৌরসভার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক শিল্পসমৃদ্ধ শহরের ঐতিহ্য বজায় থাকিবে। পৌরসভার জনসংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে যে সমস্ত ব্যক্তি যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুশীলকুমার তাহাদের মধ্যে একজন। ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে (১২৯২ সালের আষাঢ় মাস) কোদিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে সুশীলকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম উষাঙ্গিনী দেবী ও পিতার নাম শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়। সুশীলকুমারের পিতা শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়াও কিরূপ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার দ্বারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হরিপদবাবু বি, এল পাশ করিয়া হুগলী কোর্টে ওকালতি করিতেন, কিন্তু যে কারণেই হউক ওকালতিতে তাহার বিশেষ পসার না হওয়ায় সুশীলকুমারের ধনীর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই; হরিপদবাবু অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ও পুত্রদের লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে সুশীলকুমার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে ভর্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে তিনি সরকারী বৃত্তি ও অনার্স সার্টিফিকেট পান। তন্মধ্যে 'অপথ্যালমিক সার্জারি' সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হইয়া সুশীলকুমার সুবর্ণ পদক পান। এল, এম, এস পরীক্ষায় পাশ করিবার পর মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসার হাসপাতালে কিছুদিন কার্য করেন, পরে কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালে চাকুরি পান। এই চাকুরি করিতে থাকা কালে মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয়ে প্রধান চিকিৎসকের পদ শূন্য হইলে মেয়ো হাসপাতাল হইতে মেডিকেল কলেজে প্রধান চিকিৎসক হইয়া আসেন। কিছুদিন পরে কলিকাতায় বেলগাছিয়া নামক স্থানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ সুশীলকুমারকে উক্ত কলেজে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন। এখন এই কলেজ 'আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ' নামে খ্যাত।

১৯১৯ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তদনন্তর বিলাতে যাইয়া তিনি 'মুরফিল্ড আই হসপিটাল-এ ভর্তি হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডি, ও পরীক্ষায় পাশ হন। 'ডি, ও' পরীক্ষা চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিলাতের সর্বোচ্চ পরীক্ষা; লন্ডনে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কোন আলাদা পরীক্ষা তখন ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা করিতে থাকেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সুশীলকুমার পুরাপুরিভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া দশের ও দেশের কার্যে

মনোনিয়োগ করেন। তিনি কলিকাতার টাউন স্কুলের সহকারী সভাপতি এবং বাংলা দেশে অন্ধতা নিবারণী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ইহা ভিন্ন গ্রামের তেলেনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গ্রামের অনাথ ভাণ্ডার, গ্রামের লাইব্রেরী (অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার) ও অন্যান্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য সমভাবে কাজ করিয়া এতগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সত্যই চিন্তার বিষয়।

গ্রামে ফিরিয়া যাও—এই বাক্যে তাঁহার আস্থা ছিল এবং দেশের মেরুদণ্ড সেই গ্রাম-সমূহের উন্নতি ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, একথা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চক্ষু চিকিৎসা সম্মেলনীতে তিনি ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন ও সেখান হইতে পরে ইউরোপের অন্তর্গত জুরিচ ভিনো ও ইউট্রেচট প্রভৃতি বড় বড় চক্ষু-চিকিৎসালয় সাম্প্রদায়িক অবিচারের প্রতিবাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৪১

সাম্প্রদয়িক অবিচারের প্রতিবাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৪১
খৃষ্টাব্দে তেলিনীপাড়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ন্যায় চক্ষু চিকিৎসক তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না।

ভদ্রেশ্বর থানার মধ্যে একটি **ইউনিয়ন বোর্ড** আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য গ্রামের সংখ্যা ১৬ এবং জনসংখ্যা গত আদমসুমারীর তালিকায় ১২ হাজার ৫ শত ৮৪ জন বলিয়া লিখিত আছে। বর্তমান জনসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপর। বিঘাটি ও খলিসানি এই দুইটি গ্রামের নামে ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ হইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে বেলকুলি, নবগ্রাম, বেজড়া, আলতারা, ধীতারা, পালাড়া, পাতুল-রাঘবপুর, গৌরাঙ্গ-পুর, দিগড়া-মল্লিকহাটি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বসবাস করেন। **পালাড়া** গ্রামে মহাবিপ্লবী **রাসবিহারী বসু** জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গ্রামে 'রাসবিহারী স্মৃতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হইয়াছে এবং এই বীরের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার পুণ্য পবিত্র জন্মস্থানে একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

পালাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে সুপ্রসিদ্ধ **পল্লীকবি রসিকচন্দ্র রায়** জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪৯ পৃষ্ঠায় সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরে সিঙ্গুর থানার মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইবে। তাঁহার জন্মস্থানে কবির স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

বেজড়া

বিঘাটি-খলিসানি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত বেজড়া গ্রাম প্রাচীনকালে ধনজনসম্পদে প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রাম চন্দননগর স্টেশন হইতে দেড় মাইল ও মানকুণ্ডু স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। বেজড়ার মিত্রবংশ বঙ্গদেশে বহুবিধ কারণে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এই বংশের **গৌরমোহন মিত্র** ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড মিন্টোর দেওয়ান ছিলেন এবং দানধ্যানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় ছিল বলিয়া

রাজপ্রতিনিধিগণও কলিকাতায় থাকিতেন। এইজন্য দেওয়ান গৌরমোহন মিত্র বাহাদুর কলিকাতা আহিরীটোলায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বসতি স্থাপন করেন। সরস্বতী নদীতে স্নানার্থিগণের সুবিধার জন্য তিনি প্রশস্ত একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। বেজড়া গ্রামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ ও তাঁহার রথ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রামে কৃষ্ণরায়ের মন্দির, রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ এখনও জীর্ণাবস্থায় বর্তমান আছে। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম রামধন দারহাট্টা রেশমকুঠির দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাস্তা নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত হন।

ক্ষীরোদগোপাল মিত্র

রামধনের পৌত্র ক্ষীরোদগোপাল বৃটিশ এডমিরেলটি ও জার্মান রণতরীসমূহের একমাত্র এজেন্ট ছিলেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় শ্রম ও ব্যবসাবুদ্ধিতে প্রভূত ধন অর্জন করেন এবং দান ও সৎকর্মে ব্যয় করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ন্যায় মিতাচারী, দাতা ও ধর্মাত্মা পুরুষ বর্তমানে বিরল। কালীঘাটে স্নানার্থিদের জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্নানের ঘাট ও তীর্থযাত্রী মৃতকল্পগণের জন্য 'মুমূর্ষু নিকেতন' তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। তাঁহার নামে কলিকাতায় ক্ষীরোদগোপাল মিত্র লেন ও কালীঘাটে ক্ষীরোদ মিত্র ঘাট লেন নামে দুইটি রাস্তা আছে। তাঁহার পিতা রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি শালিখায় রাজেন্দ্রশ্বর শিব নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় একটি ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করিয়া দেন। হাওড়াতে ক্ষীরোদ মিত্র ঠাকুরবাড়ী লেন নামেও একটি রাস্তা আছে। ২২শে জুলাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমারকৃষ্ণ মিত্র দেশজননীর অকৃত্রিম সেবক হিসাবে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় "স্বদেশী মেলার" প্রবর্তন করেন। নাট্যকলা ও সঙ্গীতাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ইউরোপ ভ্রমণকালে নাট্যকলার উন্নতি দেখিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "আর্ট থিয়েটার" স্থাপনে অন্যতম উদ্যোগী হন এবং নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধনকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই আর্ট থিয়েটার "কর্ণার্জুন" অভিনয় করিয়া বাংলার নাট্যজগতে যুগান্তর আনে। তাঁহার "জাগরণ" নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ আছে।

॥ গরুটি ॥

গৌরহাটী নামক স্থানটি চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান; ইহার উত্তরাংশ ফরাসী ও দক্ষিণাংশ ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে কেহ গিরটি, গিরোটা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোল্টের মানচিত্র বা জোসেফের সার্ভে মানচিত্রে এই স্থান 'ফ্রেঞ্চ গার্ডেন' বলিয়া উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য বোধহয় এই স্থানটি ফরাসগঞ্জ বলিয়া কথিত হইত। বর্তমানে ইহা গৌরহাটীর অপভ্রংশ গরুটি বলিয়া খ্যাত। সার্ভে-ম্যাপে এই অঞ্চলকে ফ্রেঞ্চ গৌরহাটী বলা হইয়াছে।

চন্দননগরের ফরাসী গভর্নর দুপ্লের একটি সুরম্য উদ্যানভবন এই স্থানে ছিল এবং তাঁহার নিমন্ত্রণে ক্লাইভ, ভিয়ারলেন্ট, হেস্টিংস, স্যার উইলিয়াম জোন্স, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এবং চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইউরোপীয় সৌখীন নরনারীগণ এই

স্থানে সম্মিলিত হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদ কেবল যে আনন্দ আড়ম্বরে মুখরিত থাকিত তাহা নহে; রাজ্য সংক্রান্ত গোপন পরামর্শাদির জন্য এই ভবন তৎকালে মিলনের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল।

গোরহাটী প্রাসাদের মধ্যে এরূপ একটি সুবৃহৎ হল ছিল, যাহার মধ্যে অনায়াসে এক-সঙ্গে শতাধিক নরনারী পান-ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছত্রিশ ফুট অর্থাৎ ত্রিতল অট্টালিকার মত ছিল এবং সুসজ্জিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, অকস্মাৎ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরের কোন সম্ভ্রান্ত পল্লী নিবাসের কথা মনে হইত। এই স্থানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি এই প্রাসাদকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রেভারেন্ড ডানিয়েল কুরি এই ভবনকে ইউরোপীয় ধরনের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্শম্যান সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজিদ সমূহ দর্শন করিয়া, দর্শকের মনে উহার পূর্ব গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এইরূপ দুঃখের নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্নরের ভগ্ন প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটির বাগান।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের বোল্টস্-এর মানচিত্রে এই সুরম্য উদ্যানভবন "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" ও জোসেফ সাহেবের "সার্ভে অফ দি হুগলী"তে "ওল্ড ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

বিশপ কুরি ভারত ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্র্যময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভসকল, বিবিধ কারুকার্য বিশিষ্ট পেডিমেন্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের স্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় 'মোরেটন কবরেট' নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র নিদর্শন। ফরাসী গভর্নর মঁসিয়ে শেভালিয়ে ইহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে, তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার পর বহু ইংরাজ কলিকাতা হইতে সিরাজদ্দৌলার ভয়ে "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন" নামক ভবনে যাইয়া বাস করেন। সেই সময় বাণিজ্যপোতের পণ্যদ্রব্যাদির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ ইয়ং উক্ত বাগানবাড়িতে বাস করিতেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে (প্লেট ১৯) গরুটির নীচে 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' অর্থাৎ সেনানিবাস ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। কোন্ সময় সৈন্য এই স্থান হইতে সরান হয় তাহা জানা যায় না। মানচিত্রের গরুটির বানান 'গেরেটি' বলিয়া লেখা আছে।

At Garetty the English had a Military fort, often containing a thousand or more men. (Hooghly District Gazetteers)

গোরহাটীর পূর্ব কথা, এবং কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা

অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ফরাসী গভর্নরের প্রাসাদের সহিত গৌরহাটীর ইতিহাস বিজড়িত। এতদ্ভিন্ন ক্লাইভের সময় বাংলার সৈন্যদলের অধিকাংশই, সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়। ষ্ট্যাভোরিনাস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরাজদিগের সহস্রাধিক সৈন্য থাকিতে পারে, এইরূপ একটি দুর্গ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে মিরজাফরের সহিত সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইভ এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন এই স্থান হইতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা পূর্বক পলাশী প্রাঙ্গণে জয় লাভ করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ২১ মার্চ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব হইতে 'বেঙ্গল আর্মি'র অর্ধেক সৈন্য 'গিরেটি' এবং অর্ধেক সৈন্য পাটনায় রাখার ব্যবস্থা হয়।

প্রাচীনকালে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল; ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাহা ভাঙিয়া ফেলা হয়। "মোং গরেটির বাগানের বড়নাচ ঘর অতি পুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে" বলিয়া একটি সংবাদ ৫ই আগষ্ট ১৮২০ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বর্তমানে গরুটির প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও বাগানের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বাধিকারী মহাশয় প্রায় শত বৎসর পূর্বেও 'গরুটির বাগ' দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন।

গৌরহাটি যক্ষ্মা হাসপাতাল

হুগলী জেলা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে গৌরহাটীতে ৫০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্বে গৌরহাটীতে অল-ইন্ডিয়া রেডিওর ট্রান্সমিটিং স্টেশন ছিল। উহা ২৪ পরগণায় স্থানান্তরিত হইলে উহার ২৪ বিঘা জমির উপর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না এই হাসপাতালের বহির্বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করেন। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ও সন্দেহজনক রোগীদের চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ খোলা হইয়াছে। শ্রীরামপুরে অবস্থিত সমিতির প্রধান কার্যালয়ে ৩৮০টি শয্যার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য এই হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। এইরূপ হাসপাতাল হুগলী জেলায় আর নাই।

॥ কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ॥

এই স্থানে প্রসিদ্ধ কবি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বসবাস করিতেন; তিনি জাতিতে পর্তুগীজ হইলেও এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে গরুটির এক বাগান বাড়ীতে বসবাস করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির নাম নিরুপমা। বঙ্গভাষায় অ্যান্টনী সাহেবের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি এক কবির দল করিয়া দ্রুত কবি গান রচয়িতা হিসাবে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেনঃ

The Kavi is sung between two parties relating to Sakti, Krishna and other mythical topics. Towards the first half of the nineteenth

century Haru Thakur, Ram Basu, Antony Feringee, Sadhu Roy and others were greatly popular. (Indian Stage, Vol. I)

বাঙ্গলাদেশে কবিগান বা কবির লড়াই প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সুরু হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কবিগান বা কবির লড়াই শ্রেণীর লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 'দাঁড়া কবি' নামে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ কোথাও কোথাও দেখা যায়। পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগানের প্রভূত প্রচলন হইয়াছিল এবং বিখ্যাত কবিগান রচয়িতা ও গায়কগণ তৎকালীন বঙ্গসমাজে যথোচিতরূপে সমাদৃতও হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একজন বৈদেশিক কবির আবির্ভাব বাঙ্গলার কবিওয়ালাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। সম্ভবতঃ হ্যান্সম্যান অ্যান্টনি-ই একমাত্র বিদেশী কবিওয়ালা, যিনি বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির সংবাহকরূপে এই দেশের জনসমাজে সমাদর লাভে সমর্থ হন।

অ্যান্টনি সাহেবের বিস্তারিত জীবনকাহিনী কালের প্রবাহে আর আমাদের আলস্য ও আত্মবিস্মৃতির ফলে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বহিরাগত এই বিদেশী ব্যবসা বা অন্য কোন কর্মোপলক্ষে প্রথমে চন্দননগরে বসবাস সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে ঋষি রাজনারায়ণ বসু "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ঃ

"অ্যান্টুনি ফরাসডাঙ্গার একজন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

রাজনারায়ণ বসু যদিও তাঁকে ফরাসী বলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কালের বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ, যেমন 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ', 'বঙ্গের কবিতা', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতির লেখকগণ অ্যান্টনি সাহেবকে পর্তুগীজ জাতীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অ্যান্টনি সাহেব ফরাসী বা পর্তুগীজ যাই হোন, তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যেসব ভাবাত্মক ও ভক্তিমূলক গান রচনা করিয়াছিলেন, সমকালীন কবিদের রচিত গানের তুলনায়, তা সত্যই দুর্লভ।

বিদেশী হইয়াও অ্যান্টনি সাহেব বাঙ্গলাদেশের গ্রাম্য অর্থাৎ চলতি ভাষা যেভাবে রপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সমসাময়িক ঠাকুর সিংহ নামে এক কবিওয়ালা ছিলেন। এক সভায় এই ঠাকুর সিংহ অ্যান্টনিকে আক্রমণ করিয়া গাইলেন ঃ—

"বলো হে এন্টনি, আমি একটি কথা শুনতে চাই,
এসে এদেশে, তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?"

তার জবাব দিয়াছিলেন অ্যান্টনি এইভাবে ঃ—

"এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হোয়ে ঠাকুর সিং-এর বোনের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি ॥"

আর একবার বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসু বলেন ঃ—

"সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালী।
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণ-কালি ॥

অ্যান্টনি সাহেব জবাব দিয়াছিলেনঃ

'খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই!
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

এসব ছাড়া দেবী দুর্গার প্রতি তাঁহার একটি গান, প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতই বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করিয়াছে। সেই গানটি এইঃ—

যদি দয়া করে তর মোরে এ ভবে মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী॥

শুধু মাত্র কবিওয়ালারূপেই যে অ্যান্টনি সাহেব বাংলা ও বাঙালীর জয়গান গাহিয়াছিলেন তাহা নয়. দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বাঙালীর নানা সামাজিক উৎসবেও তিনি সানন্দে যোগদান করিতেন। এই বাঙালী প্রীতির জন্য শেষ পর্যন্ত তাহাকে এক এক বাঙালী ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এই সহধর্মিণীর অনুরোধেই অ্যান্টনি সাহেব কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যান্টনি সাহেব ঐ অঞ্চলেই বসবাস সুরু করেন। কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী প্রতিষ্ঠিত এই কালীমূর্তি আজও 'ফিরিঙ্গী কালী' নামে বিখ্যাত।

কবি গানের আসরে অ্যান্টনী সাহেব মাথার টুপি ও কোট-প্যান্ট খুলিয়া, ধুতি পরিধান পূর্বক খালি গায়ে গান করিতেন; কিন্তু তাহাকে হারাইবার জন্য প্রায়ই তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথা আসরে বলা হইত। নিম্নে, একবার ভোলা ময়রা ও এণ্টনী সাহেবের কবির গানে, ভোলা ময়রা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল. তাহা উদ্ধৃত হইল। এই গান হালসী বাগানে হইয়াছিল এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি!
তোর কটা বাপ বল শুনি।
না বলতে পারলে দেখবি আজ, ভোলার কেমন শক্ত ঘানি॥
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা।
তোর মত হাবা-গোবা. আমি আর দেখিনি॥
পথে ঘাটে দেখিস যারে, বলিস বাপ অমনি তারে।
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি॥
শোন রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বামনী।

অ্যান্টনী সাহেব তাহার সামাজিক ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি একবার আসরে রাম বসুকে বলিয়াছিলেনঃ—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেত ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর মোরে, হে শিবে মাতঙ্গী॥"

অ্যান্টুনি ফিরিঙ্গির পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গি বাংলার নবাব সরফরাজের গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। আলীবর্দী খাঁর সহিত যুদ্ধে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গৌরহাটীতে সেওড়াফুলি রাজবংশের কোন ব্যক্তি 'হরগৌরীর' মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার সহিত একটি হাট বসান। উক্ত হাটের জন্য এই স্থান পরবর্তীকালে 'হর-গৌরীর হাট' নামে খ্যাত হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, হরগৌরীর হাট কালক্রমে 'গৌরীর হাট' ও তৎপরে লোকমুখে বিকৃত হইয়া 'গৌরহাটী' ও বহু লোকে পরে 'গরুটী' বলিয়াও অভিহিত করে। হরগৌরীর মন্দিরের কোন নিদর্শন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি যে, এইস্থানে পাটের কল স্থাপনের সময় উক্ত মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; কিন্তু এই জনশ্রুতি আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিনা।

গৌরহাটীর মিত্র বংশ একটি প্রাচীন বংশ. এই স্থানে বহু দিন হইতে তাঁহারা বসবাস করিতেছেন।

পূর্বে ভদ্রেশ্বর গরুটি চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে গঙ্গায় হাঙ্গরের খুব উৎপাত ছিল। এখন গঙ্গা মজিয়া যাওয়ায় আর হাঙ্গরের কথা বিশেষ শোনা যায় না। ১০৬ পৃষ্ঠায় গঙ্গায় হাঙ্গরের কথা ও দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণে কুমীরের বিষয় লিখিত আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে "ষ্টেটসম্যান" পত্রে ভদ্রেশ্বরে হাঙ্গরের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল:

SHARKS—Sharks (Hangors) in the River Hooghly have becomes a dread to the inhabitants of Chandernagore Bhadressur, and other-adjacent places.

কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের আদিবাস গরুটিতে ছিল। তাঁহার গৌরীবিলাস ও কঙ্কাবতীর অভিশাপ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৬ ও ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে। তন্মধ্যে ২ খানি কাঠ-খোদাই ও ৪ খানি লাইন এনগ্রেভিং। গ্রন্থমধ্যে কবি তাঁহার নাম-ধাম ও পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন:

গরিটি সমাজ ধাম গোপাল মুখুটি নাম তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন গৌরী গুণ করিল রচন॥

কবিকেশরী রামচন্দ্রের আরও চারখানি প্রাচীন পুস্তকের সন্ধান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়াছেন। উহাদের নাম নলদময়ন্তী, হরপার্বতী মঙ্গল, অক্রুর সংবাদ, ও মাধব মালতী। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের অব্যবহিত পূর্বেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ১৩৪০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নলদময়ন্তী গ্রন্থ শেষে কবি বলিতেছেন:

নল-দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ। কলির নাহিক ভয় পাপ বিমোচন॥

মাধব-মালতী পুস্তকখানি ১৯ চৈত্র ১২৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের শেষে রচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে:

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাট বদন। চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি যাতে শকনিরূপণ॥

এই পুস্তকখানি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে।

॥ চাঁপদানী ॥

রেনেলের মানচিত্রে ভাগীরথী তীরে ইউরোপীয় উপনিবেশসমূহ
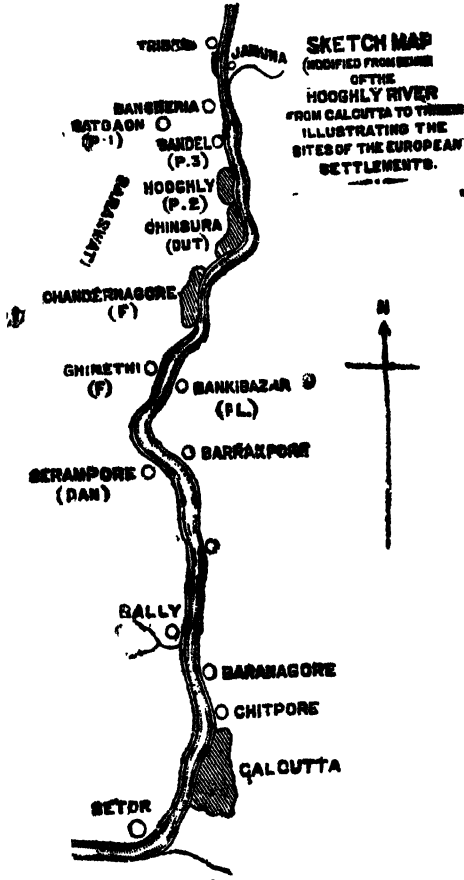
চাঁপদানী হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার একটি প্রাচীন স্থান। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র স্থানটি বৈদ্যবাটী ও গৌরহাটীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে।

চাঁপদানী বাংলার নবাব নাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুট যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাঁহার সুন্দরী যুবতী মিসেস সুসন্না হাচিন্সনের সহিত এই স্থানে বহু বর্ষ যাবত বাস করেন।

It uas granted by Mir-jafar, the Nawab Nazim of Bengal, to Colonel Coote, afterwards Sir Eyre Coote, Commander-in-Chief of India. (Bengal Past & Present).

কর্ণেল কুটকে মিরজাফর এই স্থান উপহার দেওয়ায়, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশেষভাবে আপত্তি করেন কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস স্যার ফিলিপের আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে হায়দর আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে মেদিনীপুরে প্রেরিত অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং চাঁপদানীতে আসিয়াছিলেন।

বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন চটকল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ডাকাতির জন্যও প্রাচীনকালে এই স্থান হুগলী জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। পাটশিল্প সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ১৫৯ পৃষ্ঠায় ও পাটকলের বিষয় ৫৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

The Jute Mill at Champdani is one of the oldest in the province having been built in 1872. (Hooghly District Gazeteers.)

॥ চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটি ॥

চাঁপদানী শিল্পসমৃদ্ধ নগর। এই স্থানের পৌরসভা ১লা অক্টোবর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আগে চাঁপদানী বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবাটী পৌরসভার পত্তন হয়। চাঁপদানী চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং ইহার আয়তন আড়াই বর্গ মাইল। পৌর সহরে চারটি বড় বড় জুট মিল থাকায় ইহার আর্থিক সচ্ছলতা উল্লেখ্য এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়িত হয় বলিয়া এই স্থানের শাখা-রাস্তাগুলি অন্যান্য পৌরসভা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। ভাগীরথী তীর বরাবর এই পৌর সহর অবস্থিত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড চাঁপদানীর প্রধান রাস্তা। চাঁপদানীর রাস্তার মোট মাইলেজ আঠার মাইল। ইহার মধ্যে মেটাল্ড রোড সাড়ে এগার মাইল। পাঁচ মাইল পিচের রাস্তা এবং দেড় মাইল কাঁচা রাস্তা। রাস্তাগুলি ধূলিধূসরিত নয়—ইহা পৌরসভার কৃতিত্বের পরিচায়ক। চাঁপদানী কলিকাতা হইতে উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং শিল্প-কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভাগীরথীতীরবর্তী এই সকল অঞ্চল শ্বেতাঙ্গ বণিকদের আবাসভূমি ছিল বলিয়া, তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সব সহরের পত্তন ও ক্রমিক উন্নতি হয়। বিদেশী বণিক ও শাসকগণের হাত বদল হওয়ায় এই স্থানে যে রূপবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল তাহার চিহ্নও এই সব জায়গায় বিদ্যমান আছে।

চাঁপদানী পৌরসহরে ৬১৮টি বিজলী বাতি জ্বলে। পৌরসভা অনেকগুলি অব্যবহার্য রাস্তা এবং পুকুরের পাড় দিয়া যেসব অপ্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কার করিয়াছেন। সেই সব অঞ্চলেও বিজলী বাতির ব্যবস্থা প্রসারিত হইলে সহরের আরো উন্নতি হইবে। পৌর এলাকায় শতাধিক নলকূপ আছে। ইহা ছাড়া পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপে বৈদ্যুতিক মোটরযোগে চালিত ওয়াটার ওয়ার্কসও দৈনিক এক লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকেন। পৌরসভা চাঁপদানীতে জল সরবরাহ করিবার জন্য কোন কর আদায় করেন না বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা বিনাকরে লব্ধ পানীয় জলের অপচয় করিয়া থাকে।

চাঁপদানীতে পৌরসভার নিজস্ব কোন বাজার নাই, কোন পার্ক নাই এবং শবদাহের কোন ঘাট নাই। ভদ্রেশ্বর বা বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থের ঘাটে শবের সৎকার করিবার জন্য শববাহকগণকে চার-পাঁচ মাইল হাঁটিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীভূত হইলে চাঁপদানী আদর্শ পৌরসহর বলিয়া পরিগণিত হইবে। চাঁপদানীর উত্তরে ভদ্রেশ্বর, দক্ষিণে বৈদ্যবাটী পূর্বে ইস্টার্ন রেলওয়ের লাইন এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। ইহার বর্তমান জনসংখ্যা ৪২ হাজার ২ শত ১ জন। জনসংখ্যার অন্যান্য হিসাব ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

চাঁপদানী পৌরসভার দুইটি নিজস্ব অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার বাৎসরিক পনের হাজার টাকা ব্যয় হয়। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজস্ব গৃহ আছে। চাঁপদানীর শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা মহামায়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯১ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গুরে বিদ্যালয়ের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করিয়া দেন।

॥ সিঙ্গুর ॥

সিঙ্গুর হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার অধীন একটি আধা-শহর হইলেও প্রাচীনকালে সরস্বতী তটে ইহা সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র একুশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখায় সিঙ্গুর নামে একটি স্টেশন আছে।

খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে মহারাজ সিংহবাহু সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিজয়সিংহ অবাধ্যতাদোষে পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হইলে তিনি সাতশত যুদ্ধকুশল অনুচর লইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন এবং তাম্রপর্ণি দ্বীপে অবতরণ করিয়া তথাকার অধিবাসি-গণকে পরাস্ত করেন ও লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন। এই সম্বন্ধে জি. সি. মেণ্ডিস 'আর্লি হিস্ট্রি অফ সিলোন' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

The landing of Vijaya with his seven hundred followers i generally regarded is the starting point of the history of Ceylon. Thi is not surprising as the 'Mahavansa' the chief source for the recons truction of the early history of this island, refer to this went as its first human settlement.

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।

বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের রাজা হইবার পর উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল নামে রূপান্তরিত হয়। "মদ্যার্যবংশ ভিক্ষু" নামক গ্রন্থ হইতে বিজয়সিংহের সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারা যায়; নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

"লঙ্কাদ্বীপে আগত প্রথম রাজকুমার যক্ষলোপকারী বিজয়বাহু বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্য-স্থিত রাঢ়দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; ইনি সিংহবংশীয় অনুরোধকুমার শাক্যবংশীয়। তাঁহাকে অনুরোধপুর দান করা হইয়াছিল।"

সিংহলের, পালী ভাষায় লিখিত 'মহাবংশ' নামক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, বঙ্গ-দেশীয় কোন এক রাজার সুপ্রদেবী নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল; যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার বিবাহ না হওয়ায়, তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পথিমধ্যে এক সার্থপতিকে দেখিয়া রাজকুমারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সার্থপতির ঔরসে ও সুপ্রদেবীর গর্ভে সিংহবাহু জন্মগ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং সার্থপতিকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক ও সিংহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশের অন্তর্গত শতযোজনব্যাপী এক অরণ্য পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সিংহপুর রাজ্য পালী 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে 'লাউরট্ট'

নামেও বর্ণিত আছে। সিংহরণ নদীর তীরে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল এবং আজও এই ক্ষীণা নদীর চিহ্ন সিঙ্গুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা হিসাবে সিংহবাহুর আসন তৎকালীন সামন্তরাজাদের অনেক উর্ধ্বে ছিল। কারণ তিনি কখনও কোন কালে কোন বাদশাহ বা সম্রাটের অধীন ছিলেন না। রাজা হিসাবে তিনি স্বয়ং একজন সম্রাটরূপেই তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন কারণ আশেপাশের সমস্ত রাজারা তাঁহাকেই কর দিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস সিংহপুর হইতে সিংহলে গমন করিয়া তত্রত্য রাজকবি কুমার দাসের রচিত শ্লোকের দুই পদ পূরণ করিয়া বারাঙ্গনাহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। নিম্নে শ্লোকটি উদ্ধার করিঃ

"সিয় তাঁবরা, সিয় তাঁবরা, সিয় সেবনী।
সিয় সসুরা নিদিন লেবাতন সেবনী॥"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকটির পাঠোদ্ধার করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, উহা যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙলা হয়, তাহা হইলে হুগলী জেলা সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে মহামূল্য মণি প্রসব করিয়াছিল বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিম্নে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার উদ্ধৃত হইলঃ

"ধন কোবরা তল নোতনা রোটন্ বনী।
মন দেদরাপণ গলবা গিয়ে সুবেণী॥"

সিংহপুরের নাম বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে; 'দীপবংশ' নামক গ্রন্থে "সিংহ-বাহুর পুত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয় সিংহ লাল প্রদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক স্থান হইতে অনুচরবর্গ সহ সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।"

সিংহপুরে ধর্মাদিত্য, ক্ষেমেশ্বর, হরিবর্মা প্রভৃতি কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রজসিংহের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে উক্ত মুদ্রাটি রক্ষিত আছে; মুদ্রাটি সিংহ-পুরের কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মুদ্রাটির মধ্যে সিংহের প্রতিমূর্তি আছে এবং 'ব্রজসিংহ' এই নামটি উপরে লিখিত আছে—অপর দিকে একটি ত্রিশূল অঙ্কিত আছে।

কালক্রমে সিংহপুর সিঙ্গুরে পরিণত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সিঙ্গুরের পশ্চিম দিকে রাজা হরিপাল রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে। সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়াই নির্দেশার্থে "সিঙ্গুরের পশ্চিমে" অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে।

"জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামং বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টব্যাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯।"

পরবর্তীকালে ঘটকগণের কুলজিতেও সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়: নিম্নে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'আদিশূর' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রাচীনকুল-পরিচয় বিষয়ে কবিতাটি লিখিত হইলঃ

"আকনাতে গেল ঘোষ, মাহিনাতে বসু।
বাড়শা রহিলা মিত্র, দুঃখ রহে কিছু॥
বালিতে রহিলা দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন, দেও চিত্রপুর॥
সিংহপুরে রয় সিংহ, হরিপুরে দাস।
পানিহাটি গত চন্দ্র, গুহ বঙ্গবাস॥"

বর্তমান সিংহবংশীয় কেহ সিঙ্গুরে বসবাস না করিলেও, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে, দশশালা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ যে বোর্ড হইতে জমিদারী ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

The principal purchasers of the lats sold on the Board were Dwarka Nath Singh of Singur, Chhaku Singh of Bhastara, the Mukherjies of Janai and Banerjies of Talinipara. Statistical Account of Bengal

পাঠান রাজত্বকালে সিঙ্গুরে বহু হিন্দুস্থানী আসিয়া বসবাস করেন; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেনাবিভাগে কার্য করিতেন এবং বৃত্তি স্বরূপ ভূমি ভোগ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বহু ভদ্র গৃহস্থ পশ্চিম হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা দানশীলতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। শতবৎসর পূর্বেও সিঙ্গুরের নবাব বাবুকে জানিত না বা তাহার নাম শুনে নাই, এইরূপ লোক বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল। নবাব বাবুর প্রকৃত নাম শ্রীনাথ রায়। বহুদিন হইতে ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই স্থানের ডাকাতে-কালীর নিকট প্রতি অমাবস্যায় নরবলি দেওয়া হইত। অদ্যাপি জঙ্গলাকীর্ণ বৃহৎ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে কালীমাতার ভীষণ মূর্তি বিরাজিতা আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকাতদের অনেক দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী আজও শোনা যায়। তৎকালীন দুর্ধর্ষ ডাকাত গগন সর্দারের নাম আজও হুগলীর লোক ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে। মল্লিকপুরের এই বিশাল কালীমূর্তির ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া দর্শকের প্রতি লোমকূপে কেবল শিহরণ জাগে না—সমস্ত দেহ-মন ত্রাসের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নর-বলি কেবল যে আমাদের এই দেশে প্রচলিত ছিল তাহা নহে. প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রথা ছিল। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে নরবলী হইত সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়ডোরাস বলেন ঃ মিশরের রাজা লোহিতকেশ লোকদিগকে ওসিরিস দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেন। মিশরের অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত রোমীয় সমাজেও বিজিত বন্দিগণকে হত্যা করিয়া রোমানরা আনন্দ উৎসব করিতেন। বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু রাজকীয় আইন দ্বারা এই প্রথা রোমীয় সমাজ হইতে রহিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রীক সমাজে ও এথেন্স নগরে এপেলো দেবতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী বলি দেওয়া হইত। সুতরাং বঙ্গদেশের কাপালিকগণই যে কেবল নরবলি দিত, তাহা যেন কেহ মনে না করেন।

ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর এবং হরিপাল প্রসিদ্ধ ছিল। এই ডাকাতি দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও, ইংরাজ সরকার কোন কূলকিনারা করিতে পারেন নাই। ইহা রোধ

করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি ডাকাতি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিষয় ২৯৬—৩১৯ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এইস্থানে আর পুনরায় লিখিত হইল না।

॥ সিঙ্গুর বাবুদের বংশ ॥

সিঙ্গুরের বাবুদের পূর্ব হইতেই ডাকাত-পোষক বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল; কেবল সিঙ্গুরের বাবুরা নহেন বাংলা দেশের বর্তমান বহু প্রসিদ্ধ বংশের পূর্বপুরুষগণ তৎকালে যে দস্যু ছিলেন, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন!" যাহা হউক সিঙ্গুরের বাবুদের বংশে নবাব বাবু ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া, সন্দেহে ঠগী দমনের বড় কর্তা ওয়াকোপ সাহেবের তিনি সুনজরে পড়িলেন এবং সেইজন্য হুগলী জেলে তাহাকে কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের সেরিনগাঁও নামক পল্লী হইতে নবাব বাবুর পূর্বপুরুষ গোপীনাথ ওয়ালী বঙ্গদেশে ব্যবসা করিতে আসেন এবং সিঙ্গুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহাতাব বাবুর বাড়ীতে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। গোপীনাথের পুত্র দ্বারিকানাথ ওয়াহী, সিঙ্গুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা; দান ও বিবিধ ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্বারিকানাথ সিঙ্গুরের নিকটে জলাঘাঠা নামক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সিঙ্গুরের সপ্ত-শিব-মন্দির ও অন্যান্য বহু দেবালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত দেবালয় আজও সিঙ্গুরে বিদ্যমান আছে।

দ্বারিকানাথের মাতুলবংশ অর্থাৎ মহাতাব বাবুর বংশের উপর, বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে বর্গী নিবারণের ভার তৎকালীন নবাব কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিল এবং সেই জন্য তাহাদের বহু লাঠিয়াল রাখিতে হইত। বহুবার এই স্থান হইতে তাহারা বর্গী বিতাড়ন করেন বলিয়া নবাব তাহাদিগকে "থানদার" উপাধি দেন। বর্তমানে এই বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইলেও, অদ্যাপি তাহাদের ভদ্রাসন "থানদার বাবুদের ভিটা" বলিয়া সিঙ্গুরে প্রসিদ্ধ।

দ্বারিকানাথের চতুর্থ পুত্র (ন' ছেলে) শ্রীনাথ রায় বাবুয়ানার জন্য 'নবাব বাবু' (ন' বাবু হইতে, নবাব বাবু) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল! তাঁহার জমিদারীর মধ্যে তিনি মেদিনীপুর মণ্ডলঘাট পরগণায়, প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ তৈয়ারী করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত বাঁধ 'নবাব বাবুদের বাঁধ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার সময়ে তারকেশ্বরে মোহান্ত স্থাপনের সূত্রপাত হয় এবং তিনি বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, তিলকদান পূর্বক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমললোচন গিরিকে, তারকেশ্বরের গদিতে বসান। বঙ্গদেশে বর্ধমানের মহারাজার পরেই তাহার স্থান ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি শাসন কার্য নির্বাহ করিতেন। বাৎসরিক প্রায় দশলক্ষ টাকা তাহার জমিদারির আয় ছিল। তাহার লাঠিয়াল ছিল এবং ইংরাজ সরকার সেইজন্য তাহাকে ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া আবদ্ধ রাখেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; তিনি হুগলী জেলেও মহা ধুমধামের সহিত

সর্বপ্রথম কালীপূজা করেন এবং পূজার প্রসাদ হুগলী জেলার সর্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার সাহেবরা পর্যন্ত কালীমাতার প্রসাদ খাইয়া বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে ইহাদের ভগ্নাবস্থা হইলেও গড়খাত সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, পুরাতন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বর্মণ বর্তমানে এই বংশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। তিনি হুগলী জেলার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

॥ ভৈরবচন্দ্র হালদার ॥

সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইস্থান প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দলের সঙ্গীত রচয়িতা ভৈরব হালদার বসবাস করিতেন এবং তিনি সিঙ্গুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গানগুলি অতি সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় রচিত হইত এবং ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোক তাহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইত। তিনি স্বয়ং গান করিতেন এবং তাহার কণ্ঠও অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার রচিত গানের কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে বাংলা ভাষায় ভৈরব হালদার কিরূপ রচনা করিতেন তাহাই দেখা যাইবে।

রাগিণী মঙ্গল বিভাগ—তাল কাওয়ালী

তোমার চরিত্র চিনতে পাওয়া ভার।
হও বরের মাসী, কণের পিসী, দেখি সেই প্রকার॥
দু পক্ষেতে এস যাও, সমানে দুকাটী বাজাও।
ভানুমতির খেলা দেখাও, একি চমৎকার॥
কখনও হও ধনকুবীর, কখনও পেঁড়োর ফকির।
কখনও হও যুধিষ্ঠির ধর্ম অবতার॥
বেড়াও তুমি যোগে যাগে, হাড়ে তোমার ভেল্কি লাগে।
মুখের চোটে ভুত ভাগে, কথায় হীরের ধার॥

॥ গোপাল উড়ে ॥

গোপাল জাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে করণ-কায়স্থ। তাঁহার পিতা মুকুন্দ বেগুনের ও আদার চাষ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেই সময় কলিকাতার বহুবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী রাধামোহন সরকার একটি সখের যাত্রার দল স্থাপন করেন, ইহাই বাংলা দেশের প্রথম সখের যাত্রা **'বিদ্যাসুন্দর'** অভিনয় বলিয়া খ্যাত। গোপালের ভাগ্যক্রমে একদিন মধ্যাহ্নে যখন তিনি চাঁপাকলা ফিরি করিতেছিলেন, তখন তাহার গলার স্বর শুনিয়া রাধামোহন তাহাকে দশ টাকা বেতনে যাত্রার দলে নিযুক্ত করেন। দলের ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্রের নিকট গান শিখিতে লাগিল এবং এক বৎসরের মধ্যে একজন গুণী হইয়া উঠিল এবং চালচলনে একজন বাঙ্গালী হইয়া গেল। দুই বৎসর পর শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে যাত্রার প্রথম আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়াছিল। তাঁহার গানে ও ভাবভঙ্গীতে দর্শকগণ মোহিত হইয়া গেল। গোপালের জয়-জয়কার হইল। এই যাত্রা

ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে রাধামোহনের দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিন রাত্রি অভিনয়ের পর রাধামোহন চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে দলের মৃত্যু হইল কিন্তু রহিল গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দরের পালা। গোপাল রাধামোহনের সকল আসবাবপত্র পাইল এবং নিজে এক দল গঠন করিল। গোপাল আসরে আসিয়া মধুর কণ্ঠে যখন গান ধরিত:

জয় দে গো মা কালী।
আদ্যাসনাতনী সর্বস্বরূপিণী, অচিন্ত্যাব্যক্ত করালী॥
দলবল যত যোগিনী সঙ্গে
মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি রঙ্গে
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলী।

তখন সকল দর্শকগণের প্রাণে শিহরণ হইত। গোপাল বিদ্যাসুন্দরের একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। ১২৩০ সালে ভৈরব হালদারকে দিয়া তিনি সহজ বাংলা ভাষায় গান রচনা করাইয়া নূতন বিদ্যাসুন্দর পালার সৃষ্টি করেন। দশ বৎসর ধরিয়া এই যাত্রা সারা বাংলা দেশের সকল বিশিষ্ট যাত্রার আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত "যাদু এমন কথা কেন বলিলি" গানের প্রথম দুই-তিন লাইন আজও রাখাল বালকগণ মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গাহিয়া থাকে:

"যাদু এমন কথা কেন বলিলি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন
এমন সময় আমায় জাগালি।"

ভৈরব হালদার সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ:

In Sakher Yatra none achieved so much success as Gopal Ooray. His fame spread from one end of Bengal to the other. He was invited almost from every quarter. The songs of his Vidya-Sunder Pala are still sung in Bengal. Gopal got songs composed in simple language by one Bhairab Haldar of Singur and got them also set to tune by him. With those songs he charmed his audience. The songs were so composed that they were greatly used for dancing. (The Indian Stage. Vol. I.)

ভৈরবচন্দ্র হালদার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মল্লিকপুর গ্রামে বাস করিতেন। ১১৯৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কার্যোপলক্ষে ১২১৫ সালে কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বেশ রচনাশক্তি ও বিশেষরূপ সুরজ্ঞান ছিল। তিনি নিমকির দারোগা ছিলেন, এবং সৌহার্দ্যসূত্রে ঝামাপুকুর নিবাসী দীননাথ মিত্রের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ও সিন্দুরেপটী নিবাসী কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধে, তিনি ১২৩০ সালে সালে বিদ্যা সুন্দর যাত্রাগানের প্রথম পালা রচনা করেন। কিছু দিন ঐ পালা সখের ভাবে গাইয়াছিলেন। তখন গোপাল উড়ে মালিনীর অভিনয় করিত। কালীঘাটে হালদারদিগের বাটীতে উক্ত পালার অভিনয়কালে গোপাল গোপনে কিছু টাকা গ্রহণ করে, ইহাতে উক্ত মিত্র ও মল্লিক মহাশয়েরা ভৈরব হালদার মহাশয়কে লাভের কিয়দংশ প্রদানের

এ অঙ্গীকারে বাধ্য করাইয়া গোপালকে পেসাদারী ভাবে ঐ পালা গাইতে অনুমতি দেন। হালদার মহাশয় ২য় ৩য় পালা ঐ সময়ে রচনা করিয়া দেওয়াতে গোপাল ঐ সমুদয় পালা কিছু দিন খুব ধুমধামের সহিত গাইয়াছিল, পরে কার্য্যোপলক্ষে হালদার মহাশয় বিদেশে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় কাশীনাথ ধোপা ঐ পালার দলের অধিকারী হইয়াছিল। কাশীনাথ বোলিয়াটা নিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্রের সহযোগে দলটি বজায় রাখিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রার দল হইতে ভোলানাথ দাসকে আপনাদের দল ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। কাশীনাথের লোকান্তর প্রাপ্তির পর উমেশ ও ভোলানাথ কর্তৃক দলটী সংরক্ষিত হয়। তখন রূপচাঁদ বৈষ্ণব মালিনীর অভিনেতা ছিল। রূপচাঁদের পরে মল্লিকপুর নিবাসী বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী উক্ত দলে মালিনীর অভিনয় কার্য বহুদিন অতি প্রশংসার সহিত নির্বাহ করেন। তদনন্তর উমেশ ও ভোলানাথের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ দুইটী দল হয়।

১৩২০ সালে গোপাল উড়ের আসল **বিদ্যাসুন্দর** যাত্রার একটি শোভন প্রামাণ্য সংস্করণ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। উহার মুখবন্ধে চুঁচুড়ার সুরসিক কবি দীননাথ ধর ভৈরবচন্দ্র হালদার সম্বন্ধে বিদ্যাসুন্দর পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

জেলা হুগলী সিঙ্গুর সন্নিকট মল্লিকপুর নিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র হালদার ১২৩০ সালে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান নাটকাকারে বাঁধিয়া দেন; তাহার পূর্বে ঐ যাত্রার কতকগুলি গান প্রচলিত ছিল, কিন্তু হালদার মহাশয়ের রচিত গানের মত সে সকলের তেমন প্রচলন ছিল না। হালদার মহাশয়ের গানের সুর সুমিষ্ট ও সহজ এবং ভাষা সরল, সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে ও গাইতে পারে, অধিকন্তু ঐ সকল গানের ভাষা খাঁটি বাঙগলা। অনেক গানে অনেক বাঙগলা প্রবাদ ও পৌরাণিক বিষয় ও আখ্যায়িকা জ্ঞাত হওয়া যায়। আসল বাঙগলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে ঐ সকল গানের ভাষা কথঞ্চিত সাহায্য করিতে পারে। বটতলার গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর গানের বইতে অনেক ভুল দৃষ্ট হয়, হালদার মহাশয়ের রচিত নাটকের খাতা হইতে উক্ত মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী অবিকল নকল করিয়া লন এবং যত্নে রক্ষা করেন। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক অনুসন্ধান, ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া নকল খানি উক্ত চক্রবর্তীর নিকট হইতে আনাইয়া সহজ সুরস সঙ্গীত ও কাব্য প্রিয় জনের চিত্ত বিনোদন জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। উক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী গোপাল উড়ের যাত্রায় মালিনী সাজিতেন।

ভাল জিনিষেরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। যে বঁটীতে তরকারী কুটা যায় তদ্দ্বারা নরহত্যাও হইতে পারে। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বিরোধী, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতার বিশেষ কারণ বুঝা যায় না; গন্ধর্ব ও স্বয়ম্বর বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। রাজা বীরসিংহ ও যুবরাজ সুন্দর ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যা-সুন্দর মধ্যে উক্ত দুই প্রকার বিবাহের একপ্রকার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল; ভৈরব হালদার যাত্রা গানের একজন সামান্য বাঁধনদার মাত্র ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন আসল বাঙগালা ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল, অপিচ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গানের বইখানি একখানি নাটকস্বরূপ। ভূপেন্দ্রবাবু তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া একটী ভাল কাজ করিলেন।

বর্তমানে সিঙ্গুর থানায় অন্তর্গত ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের নাম সিঙ্গুর, নসীবপুর, গোপালনগর, বলরামবাটী, আনন্দনগর ও বড়া। এই গ্রামগুলির মধ্যে বহু জমিদার বংশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির বসবাস আছে; তন্মধ্যে সিঙ্গুর ইউনিয়নের মধ্যে অপূর্বপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বড়া ইউনিয়নের মধ্যে স্বর্গীয় রায়-সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে পল্লীর উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, হাপসাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া বঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটের' সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, ছাপাখানার জন্য প্রথম কাঠের অক্ষর প্রস্তুতকারক পঞ্চানন কর্মকার 'রায়-রায়ন' (দিনেমার গভর্নর তাহাকে 'রায়-রায়ন' উপাধি দিয়াছিলেন), প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি রসিকচন্দ্র রায় অস্ত্রচিকিৎসায় সুনিপুণ রামপুরহাট রেলওয়ে হাসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কেদারনাথ মিত্র এবং ইষ্টবেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল একজামিনার রায় সাহেব ডাঃ প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতি সন্তান বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই জেলাকে ধন্য করিয়াছেন। সিঙ্গুরের নিকট দলুইগাছা গ্রামে মুন্সেফ নৃত্যগোপাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাহার কন্যা কবি **নগেন্দ্রবালা মিত্র মুস্তোফী সরস্বতী**। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৬২ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবালা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ সিঙ্গুরে জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুষোত্তমপুর হইতে দলুইগাছা পর্যন্ত সিঙ্গুর বাজার রোডের পার্শ্বেই হিমঘর, নূতন বাজার, থানা, জলকর অফিস, রেলস্টেশন, সিঙ্গুর বাজার, অর্ধ সাপ্তাহিক হাট, খাদ্যশস্যের পাইকারী ডিলারের গুদাম, উচ্চতর বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, ফুটবল ময়দান, রাইফেল ক্লাবের প্যাভিলিয়ান, বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয়, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, পাট উন্নয়ন অফিস, কালীমন্দির, সরকারী ৫০-শয্যার হাসপাতাল, যক্ষ্মা-চিকিৎসার ক্লিনিক, রাজ্য সরকারের হেল্থ স্কুল, বিশেষ শিশু চিকিৎসাভবন এবং সর্বোপরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া স্বাস্থ্যশিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান। উক্ত রাস্তা হইতেই উত্তরে খেয়ানদী পর্যন্ত প্রতিটি ৬ মাইল দীর্ঘ তিনটি রাস্তা এবং দক্ষিণে সিঙ্গুর-মশাট, সিঙ্গুর-গঙ্গাধরপুর ও সিঙ্গুর-বড়া নামে তিনটি জেলা বোর্ড রাস্তা বাহির হইয়াছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা এই অঞ্চলে প্রায়ই হয়। "যুগান্তর" পত্রে ৩০ জুন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যঃ

জমি লইয়া দু' ভায়ের দাঙ্গায় একজন নিহত

হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে দুই ভাই-এর মধ্যে একখণ্ড ভূমি লইয়া কলহের ফলে রবিবার সকালে এক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। উহাতে এক ভাই ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং তার তিন পুত্র গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তির নাম সুরেন্দ্রনাথ মান্না। পুলিস এই সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সিঙ্গুরের ডাক্তার **রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক** একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন; কারণ তিনিই

প্রসিদ্ধ কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা। রাজেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন এবং তৎকালে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রধান সৌসাদৃশ্য যে তাঁহারা যেমন অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেশের জন্য দুইজন কর্মবীর আশুতোষ ও সুরেন্দ্রনাথকে তাহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র ও ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নামে কলিকাতায় দুইটি রাজপথের নামকরণ হইয়াছে।

১৩৩৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের ভগ্নী শ্রীমতী গুণময়ী দেবী "রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের" ভিত্তি স্থাপন করেন এবং পর বৎসর ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) তারিখে বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর স্যার স্টান্‌লি জ্যাক্‌সন কর্তৃক এই হাসপাতালের উদ্বোধন হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের গাত্রে শ্বেতপ্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—সিংগুর, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২০০ **মৃত্যু**—কটক, ২রা আশ্বিন, ১৩০৪

যিনি ইচ্ছাপূর্বক নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র লোকের সাহায্যের জন্য নিতান্ত অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া দক্ষিণ কলিকাতা ও সিংগুর ও নানা স্থানের দরিদ্র রোগিগণের চিকিৎসার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—যাঁহার ভবানীপুরের বসতবাটীতে স্থানীয় ও সিংগুর অঞ্চলের এবং দূর-দূরান্তের নিঃস্ব রোগিগণ আশ্রয় ও চিকিৎসালাভ করিতেন, যিনি সর্বপ্রকারে লোক-সেবাকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং সিংগুর যাঁহার অতি প্রিয় ছিল তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তির জন্য ও মহৎ জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্য ঈশ্বরপ্রীতি কামনায় এই চিকিৎসা-মন্দির উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি, ৮ই ফাল্গুন, সন ১৩৩৮ সাল।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কার্যকালে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৌর-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙালীগণ সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া শহরের বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন আদর্শ পল্লীসেবক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই মহীয়সী মহিলার প্রেরণায় তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সিংগুরে

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে রাজেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মাতার নামানুসারে গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুদূর পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যাবতীয় সাজসরঞ্জামে সুজ্জিত এইরূপ সুরম্য হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া তিনি হুগলী জেলার যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন. লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। স্ত্রী-শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় ২০শে মার্চ ১৯৩৫ খৃঃ স্থাপন করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের শিক্ষার তিনি যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় তৎকালে গ্রামে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সিঙ্গুর মহামায়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া একটি উচ্চ বালকদের বিদ্যালয় বহুদিন হইতেই ছিল; তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে বহু উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি কলিকাতায় অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হন। কেওড়াতলা শ্মশানে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসৌধের উপর নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—	মৃত্যু
৯ ভাদ্র ১২৭৯ জন্মাষ্টমী	২৮ চৈত্র ১৩৪২ গুডফ্রাইডে
শ্রীরামপুর	ভবানীপুর

শত্রুমিত্র উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান জয়ী
তুমি দার্শনিক! ছিলে চিরদিন
সত্য ন্যায় নিষ্ঠাব্রতী উদার নির্ভীক।
মূঢ়ে শিক্ষা, আর্তে সেবা, দীনহীন জনে
হে বিশ্বপ্রেমিক! নিঃস্বার্থ গোপন দানে
ছিল তব অকিঞ্চন ছিল তব
অকপট স্মিত স্নিগ্ধ সৌজন্য মধুর।
যুগে যুগে আদর্শের পূজা করি নর
হে মহামানব! ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে
তোমাকেই করেছে অমর।

কর্মস্থল—আলিপুর কোর্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, লীগ অব নেশন, নিজ গ্রাম সিঙ্গুর ইত্যাদি।

সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্মিণী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি আদর্শ প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে তৎকালীন বাঙলার লাট-পত্নী লেডী রবার্ট রিড্ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। আমেরিকার রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের কর্তৃপক্ষ এবং বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট ইহার ব্যয় বহন করেন। সিঙ্গুরে "সুরেন্দ্রনাথ মডেল হেল্‌থ ইউনিট অ্যান্ড মেটার্নিটি ক্লিনিকের" ন্যায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, বার্মা ও সিংহল ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জির চেষ্টায় ইহা সিঙ্গুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিঙ্গুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্বগীয় মথুরানাথ বর্মন শত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা প্রাচীনতম বিদ্যালয়; অতঃপর ইহা বর্ধমান সিয়ারসোল রাজবংশের মতিলাল মালিয়ার অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইত বলিয়া মতিলাল মালিয়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্বে এই জমিদারবংশ এই গ্রামেই বাস করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীর শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা মহামায়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্য ভবন নির্মাণ করিয়া দেন; তদবধি ইহা "সিঙ্গুর মহামায়া ইনস্টিটিউশন" বলিয়া কথিত হইতেছে।

সিঙ্গুরে জৌনপুর নিবাসী বাবুলাল সাহু ১৯৭৭ সম্বতে একটি কালীবাড়ি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরগাত্রে দাতার ও তাঁহার স্ত্রীর নাম এবং নির্মাণের তারিখ হিন্দী ও বাঙ্গলায় ক্ষোদিত আছে। পূর্বে সিঙ্গুরে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। তন্মধ্যে সীতানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই স্থানের ঘোষ বংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশ এবং নসিবপুরের রায় বংশ ও গোপালনগরের মিত্র বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গুরে প্রাচীনকালে পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী সমাজের সমাবেশ ছিল বলিয়া এই স্থানে পূর্বে বহু টোল ছিল, দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষার্থীর সমাগমে সিঙ্গুর মুখরিত থাকিত। পণ্ডিত সমাজের মধ্যে ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের বিষয় আগেই বলা হইয়াছে। তিনি ১২০৪ সালে সিঙ্গুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন তাই বাঙ্গলার সুধী ও শিক্ষাবিদ্ সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করেন।

সিঙ্গুরের পলতাগড় অঞ্চলে পাথরের একটি প্রাচীন মনসা মূর্তি আছে। এটি ঠিক কতকালের প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় হুগলীর কোন এক স্থানে হয়তো এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর মূর্তিটি হারাইয়া যায়। আজ থেকে সত্তর বছর আগে ১২৯৯ সালে আবার তা পাওয়া যায় চালকেবাটীর মোড়ল পুকুরে। রঘুনন্দনের 'তিথ্যাদিতত্ত্বম'-এর টীকায় কাশীরাম বাচস্পতি এই মনসা দেবীর একটি ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-উদ্ধৃতি কোথাকার—তার কোনো উল্লেখ নেই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ধ্যানটি সংগ্রহ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে দেন। ধ্যানটি এই ঃ

"হেমাম্ভোজনিভাং লসম্বিষধরালঙ্কার সংশোভিতাম্ স্মেরাস্যাং পরিতো মহোরগগণৈঃ সংসেব্যমানাং সদা। দেবীমাস্তিকমাতরং শিশুসুতাং আসীন-তুঙ্গস্তনীং হস্তাম্ভোজযুগেন নাগযুগলং সংবিভ্রতিমাশ্রয়ে ॥"

বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, কালী মন্দির ও মনসামন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১১৩৮ বঙ্গাব্দে। বর্তমানে ২২২ বছর এর বয়স। এত প্রাচীন, অথচ কত সুন্দর এর অবস্থিতি। জরাজীর্ণ হইলেও, ভাস্কর্যের দিক থেকে এ-মন্দির বাঙ্গালীর কাছে আজও মহামূল্য সম্পদ। এর বিস্ময়কর অধিষ্ঠান বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির এক অপরূপ স্বাক্ষর।

শিয়ারসোলের মালিয়া উপাধিকারী রাজবংশ পূর্বে এই গ্রামে বাস করিতেন।

॥ বড়া ॥

সিঙ্গুর থানার মধ্যে বড়াগ্রামের **নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ২১শে ফাল্গুন ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষ কল্যাণচরণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার মধ্যে খলিসানী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইনি সমর্থ হন নাই এবং সরকারী কার্যে প্রবিষ্ট হন। স্বীয় অধ্যবসায় ও সকর্মকুশলতায় তিনি ব্রহ্ম সরকারের পূর্ত বিভাগে একটি উচ্চপদ অধিকার করিয়া 'রায়সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হন। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় পল্লী বড়া গ্রামে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে ১৭ই পৌষ ১৩৪০ সনে 'বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহার মাতা প্রসন্নময়ীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যে তাঁহার সারা জীবনের অর্জিত অর্থ, দেশের কল্যাণকামনায় অর্পণ করিয়া তিনি ১৩৪৫ সালে গতায়ু হন। **'মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত ভ্রমণ'** নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পল্লীকবি ও পাঁচালীকার **রসিকচন্দ্র রায়ের** নিবাস ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে তাঁহার পূর্ব নিবাস ছিল; কিন্তু তাঁহার পিতা হরিকমল রায় মাতামহের জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে বসবাস করেন। ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়। ১২৪৫ সালে "জীবন তারা" নামক প্রথম কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়; কিন্তু উক্ত পুস্তক আদিরসের মধ্যে অশ্লীলতা থাকায় সরকার হইতে উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর অশ্লীল অংশ পরিহার করিয়া ১২৫০ সালে নব্যজীবনতারা, ও ছয় খণ্ড পাঁচালী প্রকাশ করেন। ইহার পর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্ক দূত, দশম-মহাবিদ্যা, বৈষ্ণব মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ১২৯৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহরক্ষা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার নির্দেশেই বহু বিবাহ নিবারণকল্পে 'কুলীন কুলাচার' নামক কবিতা পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল:

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্বের অপূর্ব মান এখন কোথায়?"
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল,
পদ রে! তোমার তেজ সকলি ঘুচিল।
বিলাতী খেলাতী পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙ্গালী! কাঙ্গালী তোরে করেছে এবার
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান,
হতিস বিলাতী বরং পেতিস সম্মান।
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্
বাজুক কত না বাজে গদ্য জয়ঢাক।

॥ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ॥

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর (ওরফে গঙ্গাধর) বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একটি কারণে তাঁহর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর নিবাসী হরচন্দ্র রায়ের সহকারিতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা হইতে **"বাঙ্গাল গেজেটি"** নামক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে" ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কৌতূহলী পাঠক উহা দেখিতে পারেন।

এ ছাড়া তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষার ইংরাজী ব্যাকরণ ও ভারতচন্দ্রের **অন্নদামঙ্গল** প্রকাশ করেন। এই অন্নদামঙ্গলে ছয়খানি ছবি আছে, ছবির ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারী। ছবিগুলি লাইন-এনগ্রেভিং। ইহার আগে আর কোন সচিত্র বাংলা বই বোধ হয় এদেশে প্রকাশিত হয় নাই।

গঙ্গাকিশোর আরও কতকগুলি পুস্তকের রচয়িতা বা প্রকাশক ছিলেন। তন্মধ্যে যে কয়খানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ঃ শ্রীভগবদ্গীতা, দ্রব্যগুণভাষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, চাণক্য শ্লোক ও চিকিৎসার্ণব। **শ্রীভগবদ্গীতার** দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ ঃ

শ্রীশ্রীহরি | শ্রীভগবদ্গীতা | নমো ভগবতে বাসুদেবায় | অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূল গ্রন্থ। | [এবং] | গদ্যরচিত ভাষাঅর্থ সংগ্রহ | শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যেন প্রকাশিত। | বাঙ্গলা যন্ত্রে। | দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল | মোকাম বহরা | সন ১২৩১ সাল। | [পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬]

১২২৬ সালে বলাগড় নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার সংস্কৃত মূল গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতার পদ্যে রচিত অনুবাদও গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ রাম-মোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সম্পাদক ছিলেন। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার তাঁহার নামধাম এইভাবে দিয়াছেন ঃ

কোটি কোটি নতি স্তুতি করি কায়মনে,
কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে।
দ্বিজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্য বংশ জাত,
ভাগীরথী তীরে বেলগড়্যা গ্রামে স্থিত॥

গঙ্গাকিশোর রচিত **চিকিৎসার্ণব** পুস্তকের রচনার নিদর্শন প্রদত্ত হইল। এই গ্রন্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে আছে।

ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানা মতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ॥
বৈদ্যকের শাস্ত্রমতে পাচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ॥
সুরধনি তিরে ধাম ধন্য বহরা গ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজাদিন অতি॥
চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয় শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি॥
গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কুল দোষ ছাড়া নাহি মূল সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ॥
অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে
অন্ধকার ঘোরতরে করয়ে বিনাশ॥

১৮১৯-২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ৩য় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের নাম আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতমালার সপ্তম গ্রন্থে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বিষয় লিখিয়াছেন।

ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর রূপে মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার সমস্ত কাজকর্ম শিখিবার সুযোগ পান। শ্রীরামপুরে কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন। এবং কলিকাতায় একটি অফিস ও বইয়ের দোকান খোলেন ও "বাঙ্গাল গেজেটি" নামে বাঙ্গলী-প্রবর্তিত প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার পর হরচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্গালা গেজেটি যন্ত্রালয়" নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান। ইহার উল্লেখ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় আছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ জুন মাসের আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লং সহেবের বাঙ্গলা পুস্তকের তালিকায় গঙ্গাকিশোরের নাম গঙ্গাধর বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ দুই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। গঙ্গা-কিশোর সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য ৪২৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী পার-গোপালনগর গ্রামের মিত্রগণ সুবিখ্যাত। শশীভূষণ মিত্র কলিকাতা সহরে ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বটকৃষ্ণ ও ২য় পুত্র ধনকৃষ্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণও ব্যবসায়ী। ইহাদের পরোপকারিতা প্রসিদ্ধ। ইহারা পাঁচ ভ্রাতাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য ছিলেন এবং স্বগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন।

সিঙ্গুরের মাটিতে সেকালে বহু শিল্পী, গায়ক, পটুয়া ও লোককবি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু সামন্ত রাজাদের আমলে এমন কি মুসলিম শাসকদের আমলেও এই সমস্ত শিল্পী, পটুয়া, পল্লী-কবিদের মর্যাদা ছিল। তৎকালীন শাসকরাই তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদের মর্যাদা লোপ পায় বলিয়া পেটের দায়ে তাহারা নিজ ধর্মচ্যুত হইয়া অন্য পেশা গ্রহণ করে।

সিঙ্গুর থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
গোপালনগর	১২,৯৯০	৬,৬৭০	৬,৩২০
বলরামবাটী	১৬,৬১৯	৮,৫২১	৮,০৯৮
সিঙ্গুর	১৪,৯০২	৭,৯০৩	৬,৯৯৯
আনন্দনগর	১৬,১৬০	৮,৪৬৯	৭,৬৯১
নসিবপুর	১২,৬৭২	৬,৬২৬	৬,০৪৬
বড়া	১৭,৫৭২	৯,১৫৩	৮,৪১৯

॥ হরিপাল ॥

হরিপাল—ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানড়ার বীরত্ব কাহিনী মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কানড়ার সৌন্দর্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত থাকিলেও কানড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। ধর্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া কানড়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ভাটকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল বা হরিপাল আক্রমণ করিলে পুরবাসীসহ রাজা হরিপাল হইতে দূরে পলায়ন করেন। একমাত্র দাসী ধুমসীকে সঙ্গে লইয়া বীরবালা কানড়া রণসাজে সজ্জিত হইয়া গৌড় সেনাবাহিনীর সম্মুখবর্তী হইলেন। তাহার অপূর্ব রণসজ্জা দেখিয়া গৌড়াধিপতি ও তার সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করিলেন। তখন সম্মুখবর্তী বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্মপালকে সম্বোধন করিয়া কানড়া বলিলেন যে, তাহার একটি পণ আছে যে, যে ব্যক্তি তরবারির একচোটে একটি লৌহ নির্মিত গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তাহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। এই দুষ্কর কার্য স্বীয় শক্তির সাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া গৌড়েশ্বর গৌড় হইতে সেনাপতি লাউসেনকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ধর্মের বরপুত্র লাউসেন তরবারির একচোটে লৌহ গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা রাজপুত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রভু গৌড়েশ্বরের আদেশক্রমেই তিনি এই দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন। সুতরাং কানড়ার বরমাল্য ধর্মপালের কণ্ঠেই শোভা পাওয়া উচিত। কানড়া তাঁহার এই যুক্তি না শুনিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ পরে বিবৃত হইয়াছে।

মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বের পর হইতে পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশ বহু বিদেশী রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সেই জন্য উক্ত সময়ে বঙ্গদেশে কোন প্রকারের শান্তি ছিল না। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী বঙ্গদেশকে 'মাৎস্যন্যায়ের' সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে অরাজকতা বুঝায়। দেশে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তি চলিতেছিল বলিয়া শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। ধর্মপালের তাম্রশাসনেও তিনি যে অরাজকতা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন :

Bengal suffered from prolonged anarchy which become so intolerable that the people (C. A. D. 750) elected as their King Gopal of the race of the sea, in order to introduce settled Government. (The Oxford History of India.)

গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা; তিনি প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, এবং পাল রাজাদের গৌরব তাঁহার দ্বারাই সারা ভারতময় প্রচারিত হয়। সমগ্র উত্তর-ভারত তিনি জয় করেন এবং তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উত্তর-ভারতের নৃপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং মগধ বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমে তিনটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের পর দেবপাল এবং দেবপালের পর বিগ্রহপাল রাজা হন। বিগ্রহপাল বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন বলিয়া তাঁহার পুত্র নারায়ণ পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহীপাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সর্বত্র শ্রুত হইয়া থাকে।

পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত আছে; তাঁহারা ভূ-স্বামী বা ভুঁইয়া নামে জনসাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলায় রাজা কুলপাল সতীদেবীর বরে সেইরূপ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যে সময় পাল নৃপতিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই সময় পালবংশীয় কুলপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মহাবলবান' ও 'দেশপালক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল. জ্যেষ্ঠ হরিপাল এবং কনিষ্ঠ অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজ নামানুসারে হট্টবাপিযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তন্তুবায় ও সাঙ্গাই ব্রাহ্মণদিগের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি:

"সতীদেব্যা বরনৈব ভীমভুজবল পুত্রকঃ॥ ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিম তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালো অহিপালকৌ॥ ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামকসতিং কৃত।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গারি সংজ্ঞকেষু চ॥" ৬৮০

রাজা হরিপালের কানড়া নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য

গৌড়েশ্বর রাজা হরিপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজকুমারী বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে' লিখিয়াছেন ঃ

"হরিপাল রাজার কন্যা কানড়া পরমা সুন্দরী; বৃদ্ধ গৌড়াধিপ, হরিপালের নিকট তদীয় কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ রাজার হস্তে তরুণী সুন্দরী কন্যাকে প্রদান করিতে হরিপাল অনিচ্ছুক, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অসীম পরাক্রম স্মরণ করিয়া ভীত। রাজকুমারী কানড়ার প্ররোচনায় রাজা অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর দিলেন। গৌড়েশ্বরের সৈন্য হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিল এবং রাজকুমারী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে স্বয়ং চণ্ডীদেবী তদীয় ডাকিনী ধুমসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈন্য পরাজিত হয়।"

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' রাজকুমারী কানড়ার যুদ্ধের একটি বিবরণ আছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দুদলে করে হানাহানী ॥
রঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দভি বাজই
ঘর ঘোর গাজই দামা।
রাজপুত্র মজবুত যৈছন যমদূত
সমযুত বুঝে খানসামা ॥
ঘুড়ী পীঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয়
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥
করয়ে অর্জন ঘোরতর গর্জন
দুর্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি স্বর্পে ॥"

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের সহিত রাজকুমারী কানড়ার বিবাহ হয়। ধর্মমঙ্গলসমূহে ইঁহাদের বিবর লিখিত আছে। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক কিছু জানিবার উপায় নাই—কারণ এখানকার জলবায়ুর প্রভাবে এবং [illegible] জন্য প্রাচীন কীর্তিসমূহ অধিকাংশ স্থানেই মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে নিহিত আছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম এবং হুগলী জেলার মহানাদ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা গিয়াছে। কৈকালা গ্রামে প্রাপ্ত [illegible] মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার হুগলী তথা

সমগ্র বাংলার সহিত দাক্ষিণাত্যের যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল তাহা প্রমাণ হয়।

হরিপালের চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকখানি গ্রামের নাম হইতে শিলস্ ফ্রি কলেজের হেড মাষ্টার এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক কবি রাধামাধব মিত্র ১২৯৯ সালে 'তোমার কথা' নামক একটি কবিতায় এই স্থানে যে পূর্বে রাজধানী ছিল তাহা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত কবিতাটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইলঃ

"সমীপস্থ গ্রামের অভিধান
তাতে রাজধানী ছিল, সপ্রমান।
'বন্দীপুর' কারাগার বুঝা যায় ভাবে,
'হাতশেওলা' হাতীশাল লোকে অনুভবে।
'নইটি' যে নবহাট কে আর না কয়,
'চিত্রশাল' ছবিঘর অমূলক নয়।
রাজার নিশ্চয় ছিল, প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
তাইতো 'ভাণ্ডারহাটী' নাম হয় তার।
প্রতিষ্ঠিত ভগবতী দেবীর ভবন,
'ভগবতীপুর' নাম হয়েছে গ্রহণ।
ছিল বলি নৃপতির জামাতার-বাটী,
তাইতো হয়েছে নাম 'জামাই-বাটী'।
ছিল বলি নৃপতির বড় আম্রোদ্যান,
হইয়াছে 'আম্রোগেছে' সেতো অম্রখ্যান।
'জেজুরে' যে পূর্বে ছিল রাজার ভবন
লক্ষণেতে হ'লো প্রায় সংশয় ভঞ্জন।
রাজধানী ছিল বটে, বুঝা যায় ভাবে
বলিতে না পারা যায় কোন্ কালে কবে?"

রাজা হরিপালের রাজ্য ষোল ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত এবং ইহা সাতাশটি পটিতে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এক-একটি পটি এক-একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং পূর্বের বহু নামও বর্তমানে পরিবর্তিত হইয়াছে। কৌশিকী নদীতীরে অবস্থিত এই সুন্দর স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম ছিল। মাণিক গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন ঃ

"নগরের শোভা স্বর্গসম কিবা
দেখে মনে মোহ পায়।
শ্রীধর্ম চরণ, করিয়া স্মরণ,
দ্বিজ শ্রীমানিক গায়॥"

হরিপাল বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম; কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্টার্ন রেলওয়ের তারকেশ্বর লাইনে ইহা একটি প্রধান ষ্টেশন। ধর্মমঙ্গলসমূহে রাজা হরিপালের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, হরিপালে তাঁহার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন নাই।

হরিপাল নামক স্থান পূর্বোক্ত সাতাশটি পটির অন্যতম প্রধান পটি ছিল এবং ইহার পূর্ব নাম 'সিমুলাই' বলিয়া খ্যাত ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্র নির্মিত বস্ত্রের জন্য এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি হরিপালে বহু তন্তুবায় বাস করেন এবং এই স্থানের প্রস্তুত বস্ত্রাদি 'সিমুলাই কাপড়' বলিয়া বঙ্গের সর্বত্র পরিচিত। তৎকালে সিমুলাই যে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল, তাহা নিম্নোক্ত দুইটি পঙ্ক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবেঃ

"সাক্ষাৎ সোনার লঙ্কা সিমুল নগর।
ব্রাহ্মণ বেষ্টিত তায় যেমন সাগর॥"

হরিপালের ষোল ক্রোশব্যাপী রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি গড় ছিল—বাহির গড়, পাথর গড়, লোহার গড়, তামার গড় এবং ভিতর গড়। এই গড়গুলি বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বাহির গড় নামক স্থান অধুনা বাহিরগড়া নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত। এই গ্রামে বর্তমানে রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করেন। এই সম্বন্ধে ঘনরাম চক্রবর্তী যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে মাটি খুঁড়ে।
সভয় সকল লোকে ষোল ক্রোশ জুড়ে॥
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড় পার॥"

গৌড়ের রাজার সহিত রাজা হরিপালের যুদ্ধ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ

He (Emperor of Gauda) also sent Lau Sen to punish King Haripal who had refused the old Emperor's proposal to marry his young and beautiful daughter Kaneda. A battle ensued in which the army was led to the field by the lovely princess herself. The encounter between her and our hero was sharp and aniented, but she could not long withstand the superior skill aud heroism of Lau Sen and King Haripal was ultimately forced to submit Kaneda was, however, given in marriage to Lau Sen with the consent of the Emperor. (Bengali Language & Literature)

॥ রাজা হরিপাল প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবী ॥

হরিপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবীর মূর্তি অদ্যাপি এই গ্রামে বিদ্যমান আছে এবং ইহা বর্তমানে চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই স্থানে বহু নরবলি হইয়াছে। বিশালক্ষী দেবীর 'চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী' নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। বহুদিন পূর্বে এই স্থানে বহু চণ্ডাল রাজার সৈনিকের কার্য করিত। জনৈক চণ্ডাল দলপতি তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বর ও কন্যাকে লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার নিকট প্রণামী না থাকায় বর-কন্যাকে তথায় রাখিয়া সে প্রণামী আনিতে যায়; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কন্যাকে দেখিতে পায় না। অথচ দেবীর মুখে চেলীর কিয়দংশ ঝুলিতেছে দেখিতে পায়। চণ্ডাল ক্রন্দন করিতে করিতে

প্রার্থনা জানাইল—"মা কন্যাকে ফিরাইয়া দেন।" প্রত্যাদেশ হইল "আমি কন্যাকে খাইয়া ফেলিয়াছি—আজ হইতে আমাকে যেন চণ্ডালকন্যা-বিশালক্ষী বলিয়া অভিহিত করা হয়।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও হরিপাল একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজবলহাট হইতে এজেন্সী হরিপালে স্থানান্তরিত হয়। হরিপালে কোম্পানীর অধীনে একজন ইংরাজ 'রেসিডেন্ট' ও একজন ইংরাজ ডাক্তার থাকিতেন। ইহাদের কতকগুলি গোমস্তা ও সরকার সোনামুখী, কৈকালা, দ্বারহাট্টা প্রভৃতি স্থানে তাঁতীদিগকে দাদন দিয়া তসর, গরদ, ও নানাবিধ সুতার কাপড় বুনাইয়া লইত। হুগলীর কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই এজেন্সী পরিচালিত হইত; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলে এই এজেন্সীগুলি উঠিয়া যায় এবং ওয়াটসন কোম্পানী উহা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅশোক মিত্র ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক (হুগলী) গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

Cotton cloths are manufactured on hand-looms in considerable quantities in the neighbourhood, Haripal and Dwarhatta being centres of the industry.

হরিপাল ও তাহার পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলিতে বহু প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বিচারপতি হরিনাথ রায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র মৌলভী বজলাল করিম, নীলকমল মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের এই অঞ্চলে বাসস্থান। হরিপালের রায় বংশ ও ভড় বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রায় বংশের বহু কীর্তি অদ্যাপি এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী বামাচরণ ভড় হরিপালের মৃতকল্পা কৌশিকী নদীর সংস্কারের জন্য এক সময় ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ডেপুটি কালেক্টার নিত্যানন্দ ভড় ও তাহার পুত্র ব্যারিস্টার সতীশচন্দ্র ভড় এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ডিটেকটিভ বকাউল্লা সাহেবের নিবাসও হরিপালে ছিল।

ইহা ছাড়া ঘোষ, চৌধুরী ও গঙ্গোপাধ্যায় বংশেরও খ্যাতি আছে। নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিপালের ঘোষবংশ সম্ভূত। এখনও ঘোষপাড়ায় তাঁহার বাস্তুভিটা বিদ্যমান আছে। তাঁহার সম্বন্ধে ৪৫৩-৪৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে বেলুড় মঠে "গিরিশ-ভবন" হইয়াছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে টেকচাঁদ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধামাধব মিত্র, রসিকচন্দ্র রায়, বিপ্লবী দেবব্রত বসু, অতুল্য ঘোষ এবং বংশ-পরিচয়ের লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার হরিপাল থানার অধিবাসী ছিলেন।

হরিপালে গুরুদয়াল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস, থানা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই থানার অধীনে আটটি ইউনিয়ন বোর্ড বর্তমানে আছে; ইউনিয়ন বোর্ডগুলির নাম জেজুর, কৈকালা, ফরিদপুর, ইলিপুর, বন্দীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল ও নালিকুল। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামগুলি এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধ ও সম্পত্তিপন্ন লোকের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে এই অঞ্চলে দেখা দিবার পর হইতেই গ্রামগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর সময় এই স্থানে একটি সরকারী চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব বলিয়া উঠ

চিকিৎসালয় সরকার বাহাদুর বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা বোর্ডও এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া ছিলেন, কিন্তু অর্থের অনটন বলিয়া কিছুদিন পরে তাহা তুলিয়া দেন। হরিপালের কার্পাস-সূত্র নির্মিত বস্ত্র অদ্যাপি 'নিমলাই কাপড়' বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত। বর্তমানে বালির জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ। বালির ব্যবসা সম্বন্ধে ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

॥ রায় বংশ ॥

হরিপলের রায়বংশ পূর্বে দানধ্যান ও বিবিধ হিন্দুধর্মোক্ত ক্রিয়াকলাপাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শিবদাস মজুমদার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁহার সাত ছেলে ছিল বলিয়া তাঁহারা "সাতবাড়ির রায়" বলিয়া প্রখ্যাত। রায় বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ইউরোপীয় স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর নন্দদুলাল রায়, একজামিনার অফ মিলিটারী একাউন্টস যোগীন্দ্রনাথ রায়, ইনকামট্যাক্স অফিসার শৈলেন্দ্রপ্রসাদ রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শরৎচন্দ্রের রায়ের নাম উল্লেখ্য। বর্তমানে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় এই বংশের প্রবীনতম ব্যক্তি।

হরিপালে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত রায় বংশের **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মন্দিরগাত্রে কারুকার্যখচিত ইঁটে বহু দেবদেবীর লীলা কাহিনী অঙ্কিত আছে। মন্দির ১১৪৪ শকাব্দে মেরামত করা হয় বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইলে পরবর্তী-কালে উহা করোগেটের টিন দিয়া ছাউনি করায় মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের রাসমণ্ডটি স্থাপত্যশিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। বৃহৎ তোরণের মত ইহার সম্মুখভাগ এবং চারিদিকে চারটি গম্বুজ ও মধ্যে গম্বুজের উপর একটি বড় চূড়া ইহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। রাসমঞ্চের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ চাতালে অষ্টসখীর নামানু-সারে আটটি তুলসীমঞ্চে রোপিত তুলসীবৃক্ষ স্থানটিকে মধুময় করিয়াছে। প্রতিটি তুলসী-মঞ্চে সখীদের নাম খোদিত আছে। নামগুলি এই ঃ চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ললিতা ও বিশাখা। সংস্কার করিবার জন্য মন্দির ও রাসমঞ্চের জীর্ণাবস্থা হয় নাই বটে তবে প্লাস্টার করিবার সময় অনেক চিত্রের উপর বালি লেপিয়া উহার সৌন্দর্য নষ্ট করা হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চও আছে।

রায়েদের বুড়ো শিবের মন্দিরও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া আরও পাঁচটি শিবমন্দির বর্তমানে বিদ্যমান আছে ও দুইটি পড়িয়া গিয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ও ভড়েদের জোড়া শিবমন্দির ১৭৪৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। ভট্টাচার্যদের আনন্দদেবের মন্দির (বর্তমান সেবায়েত নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়) ও কালীমাতার মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। [illegible] এখন কোন প্রতিমা নাই, তামার ঘটে প্রত্যহ পূজা হয়। রায় বংশের কুলপুরোহিত শ্রীঅমিয়কুমার হড় ইহার সেবায়েত। হড়েদের কৌলিক উপাধি চট্টোপাধ্যায়। তারাচাঁদ হড় এই বংশের আদি পুরুষ। পাণ্ডিত্যে ও অমায়িকতার জন্য হড় বংশের পূর্বে খ্যাতি ছিল। [illegible] মন্দির ১১৪৯ সালে নির্মিত হয় বলিয়া দেখা যায়।

রায় বংশের দুর্গোৎসব কেবল প্রাচীন নয়, ইহাদের দুর্গা প্রতিমারও কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের দুর্গা প্রতিমার কার্তিক ও গণেশ উপরে থাকেন এবং তাঁহাদের নীচে থাকেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী। এক পক্ষকাল ধরিয়া দেবীর কল্প হয় এবং কলাবউ হয় তিনটি। বলি হয় নয়টি—চারটি ছাগল, একটি ভেড়া, একটি মহিষ, একটি আখ, একটি কুমড়া ও একটি লেবু। মহিষবলি দেখিতে পূজার সময় হরিপালে বহুলোকের সমাগম হয়।

হরিপাল বিবেকানন্দ সংসদ কর্তৃক ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে **হরিপাল মহাবিদ্যালয়** স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হরিপাল রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে পঞ্চাশ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহার সুরম্য ভবন নির্মিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার

হরিপালের কৈলাসচন্দ্র পাঠাগার হুগলী জেলার গৌরব। এই পাঠাগারের বিষয় শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ১৩৬০ সালের ২২শে বৈশাখ "দৈনিক বসুমতী" পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

বহুদিন সুপ্ত জাতি একদিন হঠাৎ পেল নবচেতনার বাণী—জোয়ার এলো জাতির জীবনে, দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তার সৃষ্টিপ্রয়াসী কর্মপ্রবাহ দুকূল ছাড়িয়ে। জাতীয় জীবনে জোয়ার-ভাটা এক ঐতিহাসিক সত্য। তেমনি জোয়ার এসেছিল বাঙ্গালীর জীবনে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। ১৯২১ সালের কথা সে। তারি ফলে গড়ে উঠতে লাগলো জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর বিদ্যায়তনগুলি। হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের মতো দু-চারটি ছাড়া সে সময়ে গড়ে-উঠা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারেনি। রাজরোষে ও অন্যান্য নানা কারণে। একটা জাতি যখন জাগে তখন সব দিক দিয়েই তার অগ্রগতি সমান তালে চলে। পরবর্তীকালে অনেক সময় কাজের আসল কারণ হারিয়ে যায়—আর চোখে পড়ে না। তেমনি হরিপাল কৈলাসচন্দ্র পাঠাগারের আরম্ভের ইতিহাসে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনই সব কথা নয়, জাগ্রত জাতির উদ্বুদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার এ একটা চিহ্ন—অবশ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলেও আসলে ওই এক কথাই রয়েছে।

হরিপাল হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। অসহযোগ আন্দোলনে ঐ গ্রাম কর্মীদের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে সমাবেশ হয়েছিল বহু কর্মীর, আজীবন দেশসেবক শ্রীধরানাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কাজ চলছিল এ জায়গায়। বিশেষ করে তাঁরি চেষ্টায় সে সময় গ্রামোন্নয়নের কাজও চলতে থাকে। সে সময়ে উন্নত কোন পাঠাগার ছিল না এ অঞ্চলে। কদাচিৎ দু-একজন উৎসাহী যুবক নিজের বৈঠকখানায় সামান্য বই যোগাড় করে বন্ধুবান্ধবদের পড়তে দিতেন ও তার পরিচয় দিতেন সাধারণ পাঠাগার বলে। আসলে এর ভাণটাই ছিল প্রকাণ্ড, সমাপ্তি ঘটতো শুধু পরিচয় দেওয়াতেই। এর থেকে একটা কথা বোঝা যায়, গ্রন্থাগারের অভাব সে অঞ্চলে অনুভূত হচ্ছিল আর সদিচ্ছাও ছিল লোকের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার। ঠিক এই রকম যখন অবস্থা সেই সময় এ

কাজে হাত দিলেন শ্রীধরানাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মীরা। আর স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া গেল। ধরানাথ ভট্টাচার্যের সহকর্মীদের ভেতর এ ব্যাপারে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের ভেতর শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোবর্ধন মল্লিকের নাম করা যায়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় যুবকদের চেষ্টাও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ চেষ্টাকে সত্যিকারের কার্যে পরিণত করেছেন হরিনাথ ভড় মহাশয়। তাঁর পিতা কৈলাসচন্দ্র ভড়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি শুধু যে গ্রন্থাগার ভবনের জায়গা দান করেছেন তাই নয়, বহু অর্থ ব্যয়ে পাঠাগারের নিজস্ব সুপ্রশস্ত ভবনও তিনিই নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। পাঠাগার ভবনটি গ্রামের মধ্যস্থলে জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর অবস্থিত। এর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ১৯২১ সালে ও ১৯২৩ সালে গৃহ নির্মাণকার্য শেষ হয়। পুস্তক সংগ্রহ ও বই লেন-দেন সেই সময় থেকেই চলতে থাকে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের নিকট পাঠাগার ভবন উন্মুক্ত হয় ১৯২৫ সালে ও ১৯২৬ সালের ১৭ই আগস্ট আইনমতে তা রেজিস্ট্রী করা হয়। আরম্ভে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন এ পাঠাগারকে। পুস্তক ও আসবাবপত্র দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ভেতর জিতেন্দ্রনাথ বসু, দ্বারিকানাথ সরকার, আশুতোষ দাস, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। পাঠাগারের প্রথম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাঁর ভাই সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী নিজেদের নিঃস্বার্থ সেবা ও সুপরিচালনায় পাঠাগারকে অল্পদিনের ভেতরেই বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। তারপর দেখতে দেখতে পাঠাগার এই অঞ্চলের কৃষ্টিমূলক আলাপ-আলোচনা ও কার্য কলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের মন্তব্যের কিয়দংশ তুলে দিলেই পাঠাগার ভবন ও পাঠাগারের অবস্থা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, "হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিবার জন্য হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রাম দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু কোন গ্রামের মধ্যে পাঠাগারের এইরূপ সুরম্য নিজস্ব ভবন আমার নয়নগোচর হয় নাই। পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থাগার দেখিয়া আমার নিজেরই এই ভবনে থাকিয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল। যাঁহারা গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই পাঠাগারে বসিয়া গবেষণা করিলে সুফললাভ করিবেন বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস। গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি সুনির্বাচিত।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পাঠাগারটিতে গ্রন্থ সংগ্রহ পরিমাণে যথেষ্ট ও সুনির্বাচিত বলিয়া বোধ হইল।... পল্লীগ্রামে এমন একটি পাঠাগার প্রায়ই দেখা যায় না।..." এর থেকেই হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠাগার সভ্যদের চাঁদার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে চললেও তারকেশ্বর এস্টেট থেকে বার্ষিক ৬০৲ টাকা, হরিপাল ইউনিয়ন বোর্ড থেকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা ও হুগলী জেলা বোর্ড থেকে বার্ষিক ২০৲ টাকা করে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। পাঠাগারের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৭৫ জন ও চাঁদা মাসিক ছয় আনা করে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য পাঠাগার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা ও বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা

হয়ে থাকে। পাঠাগারে বসে সাধারণের পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠাগারের বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা ৩২০০ খানা, কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই এ লাইব্রেরীতে রয়েছে। এর গ্রন্থ সংগ্রহ সুনির্বাচিত ও সত্যি ভালো, লাইব্রেরী যাঁরাই দেখেছেন, গ্রন্থ সংগ্রহের প্রশংসা করেছেন তাঁরাই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।"

॥ স্বামী জ্ঞানানন্দ ॥

তারাপীঠ ভৈরব নামক গ্রন্থে শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

হরিপালের (তারকেশ্বর লাইনে) অন্তর্গত গবাটি গ্রামে ১৩১৬ সালে এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশে এক শিশুর জন্ম হয়। ভাগ্য বিড়ম্বনায় পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিশুর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগে শিশুটি খুবই ক্ষুণ্ণ হয় ও পিতার অভাব অনুভব করে; সহসা এক রাত্রে শিশু স্বপ্ন দেখ্‌লো, বামদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন, "বাবা নেই বলে ভয় কি বাবা, আমি আছি।" শিশু অবস্থায় এই ঘটনায় বামদেব সম্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও ইহার গুরুত্ব বয়োবৃদ্ধির সংগে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটায়। জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরিয়া ইউনিয়নের ইউ, পি, বিদ্যালয় হতে ফেরবার পথে কোন এক মধ্যাহ্নে বালক এক বৃক্ষমূলে বসে আপন মনে ভাবছে, "বাড়ীতে দুধের সর চুরি করে খাই, বকুনি খাই আর বিদ্যালয়ে পড়া পারি না, মার খাই, কি করি, কোথায় যাই, বকুনি ও চোরের হাত কি করে এড়াই ? আমার কি কেউ নেই ?" সহসা বালক দেখলো সম্মুখে মাটি হতে শূন্য অবধি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং ধোঁয়ার মধ্য হতে শিশু অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন মূর্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "তুই শালা ভয় পাস কেন ? তোর কেউ নেই, আমি আছি।" সহসা এই দৃশ্যে বালক আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভয় পেল। পরে বামদেবের পট দেখে বালক স্বপ্নের তাৎপর্য জ্ঞাত হয়। যৌবনে ধর্মপিপাসা বৃদ্ধি পায় ও দৈবচক্রে যুবক পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যুবকের ১৩৩৩ সালে বিবাহ হয় কিন্তু ১৩৪১ সালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল তেলিখানা শ্মশানে সাধনায় মনোনিবেশ করেন ও প্রতি বৎসর বামদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করেন। উৎসবে প্রায় ১০।১২ হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইনি স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাস হইবার অব্যবহিত পরই হরিপালে সর্বপ্রথম দলিল রেজিষ্টারী পূর্বক সাতশত টাকা দিয়া জনৈক ভদ্রলোক বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। নিম্নে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

৭৫৫৲ দিয়া বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ॥ সম্প্রতি হরিপাল সাব রেজেষ্ট্রী অফিসে স্ত্রীকে ৭৫৫৲ টাকা দিয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া জনৈক ভদ্রলোক বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, যুবতী স্ত্রীও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্বশুর জামাতায় মোকদ্দমা চলিতেছিল। শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদে বিচারকের সম্মতি পাওয়া যায়। হরিপাল থানায় হিন্দুদের বিবাহ বিচ্ছেদের দলিল এই প্রথম সম্পাদিত হইল।

॥ দ্বারহাট্টা ॥

হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা দ্বারিকাচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। হরিপাল স্টেশনের চার মাইল দক্ষিণে গ্রামটি বর্তমান। হরিপাল-গজা-রাজবলহাট রাস্তায় এখন বাস চলাচল করিতেছে বলিয়া যাতায়াতের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাসের প্রধান রাস্তা হইতে এক মাইল পশ্চিমে কানাদামোদর নদীর তীরে দ্বারহাট্টা গ্রাম অবস্থিত। দ্বারহাট্টার বর্তমান জনসংখ্যা ১,৩৬৪ জন। পূর্বে এই গ্রামে ওলন্দাজ ও দিনেমারদের বাণিজ্যকুঠি ছিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত হয়। সদর দ্বারহাট্টা ও ক্ষীরপাই। দিনেমার শাষিত শ্রীরামপুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করিলে উহা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং দ্বারহাট্টা মহকুমা পরিবর্তন করিয়া শ্রীরামপুর মহকুমা করা হয়।

অতীতে দামোদরের মূল শাখা কানা দামোদরের খাতে প্রবাহিত হইত বলিয়া এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মাণের জন্য এই স্থানের খ্যাতি দেখিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারহাট্টায় একটি আড়ং অর্থাৎ কারখানা স্থাপন করেন। হরিপালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর এজেন্সী রাজবলহাট হইতে স্থানান্তরিত হয়। ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে কৈকালা, দ্বারহাট্টা, সোনামুখী প্রভৃতি গ্রামে তখন কোম্পানীর গোমস্তা ও সরকার তাঁতীদিগকে দাদন দিয়া তসর, গরদ ও নানাবিধ সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড় বুনাইয়া লইত এবং উহা বিদেশে রপ্তানী হইত। এই সম্বন্ধে বিবরণ ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে।

দ্বারহাট্টা গ্রামের নিকট কৌশিকী বিমলা ও দামোদর এই তিনটি নদীর অবস্থানের জন্য পূর্বে গ্রামের শোভা অপরূপ ছিল এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরাজদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত থাকায় বিশেষ অর্থশালী ছিল। একটি গ্রামে ত্রিশটি মন্দির তাহার অন্যতম নিদর্শন। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী এই গ্রামের অদূরে দ্বীপা গ্রামে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিবার জন্য বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি দ্বীপায় আছে। কথিত আছে, দামোদরের প্রবল স্রোতে গৌরগোপালের পূজার দ্রব্য ভাসিয়া যাওয়ায় কৃষ্ণানন্দ দামোদর নদকে অভিশাপ দেন যে, তুই আমার পূজার দ্রব্য ভাসাইয়া দিলি দেখিতে পাইলি না—তোর চক্ষু কানা হইয়া যাক। আর তুই এই স্থান হইতে সরিয়া যা। বলা বাহুল্য তদবধি দামোদর নদ ছয় মাইল দূরে চাপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া যায় ও দামোদর এই অঞ্চলে কানা দামোদর বলিয়া খ্যাত হয়।

দ্বারহাট্টা গ্রামে **দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির ও রাজরাজেশ্বর মন্দির** কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি। কিম্বদন্তী স্থানীয় একটি পুষ্করিণী হইতে সিংহরায় বংশের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীকে উত্তোলন করেন। তিনি দেবীর জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে একটি শৃগাল দেবীর বেদীর উপর প্রস্রাব করায় উক্ত মন্দির পরিত্যক্ত হয়। উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

পরে মোহিনীমোহন সিংহরায়ের পূর্বপুরুষ বর্তমান মন্দিরটি তৈয়ার করিয়া দেন। মন্দিরের গায়ে "শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮৬" এই তারিখ উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গায়ে ইটের অপূর্ব কারুকার্য একটি দর্শনীয় বস্তু। বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখভাগ পড়িয়া

গিয়াছে এবং দেবীও অন্যত্র স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্রে এই মন্দির সুশোভিত ছিল। একটি ইঁটের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। এই চিত্র হইতে সেকালের বাঙ্গালী শিল্পী কিরূপ দক্ষ ছিল তাহা জানিতে পারা যাইবে। মন্দিরের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও পাশে দেবীর পুষ্করিণী এখনও আছে।

দুর্গাপূজার সময় দ্বারিকাচণ্ডীর বলিদান হইবার পর চতুঃপার্শ্বস্থিত দশ-বারটি গ্রামের পূজার বলিদান হয়। এইরূপ নিয়ম বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

দ্বারহাট্টার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের মন্দির। অপূর্বমোহন সিংহরায় এই বিরাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের গায়ে একটি পাথরে মন্দির ১১৩৬ সালে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। ব্যবসায়াদি করিয়া সিংহরায় বংশ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এই অঞ্চলের বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং দানধ্যান, পূজাপার্বণ, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজরাজেশ্বর সিংহরায় বংশের কুলদেবতা—শালগ্রাম শিলা। এই বংশের প্রবীনতম ব্যক্তি ফকিরচন্দ্র সিংহরায় (বয়স ৯৬) বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট আকবরের রাজত্ব-কালে যোধপুর হইতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। মানসিংহের ভগ্নীর সহিত আকবরের বিবাহের পর মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ করিবার ভয়ে বহু ছত্রী সেই সময় জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙলা দেশে চলিয়া আসেন।

রাজরাজেশ্বরের টেরাকোটা একটি দর্শনীয় বস্তু। অসংখ্য চিত্র মন্দিরের শোভাবর্ধন করিয়াছে। রামরাবণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, ছাড়া মন্দিরের সম্মুখের দুইটি থামের একটিতে দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ও পোর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন বলিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া রায়-সরকার বংশের জোড়া শিব মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই শিব মন্দির শকাব্দ ১৭০০ সন এবং ১১৮৫ সালে নির্মিত বলিয়া লেখা আছে। এই স্থানটিকে চাঁদবাটি বলে।

দ্বারহাট্টার হাটতলার পশ্চিমে কানা দামোদরের তীরে কামদেবপুর গ্রামে জাগ্রত **মনসাদেবী** আছেন। মনসাদেবীর কাশীর ঔষধ লইবার জন্য দেবীর নিকট বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দ্বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাল পড়াশুনার জন্য খুব খ্যাতি আছে।

॥ সর্দার শংকর ॥

অধুনা বিস্মৃতপ্রায় সাংগঠনিক দেশপ্রেমিক শংকর চক্রবর্তী হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বারহাট্টার নিকটবর্তী **প্রসাদপুর** গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বাস করিতেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি বাংলাদেশের এক স্বাধীন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি **সর্দার শংকর** নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশে তখন যুদ্ধবিপর্যস্ত ও মোগল বিজেতাদের অধীন। কঠোর মোগলরাজ শাসনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ। শংকর তাঁহার সাহস, চরিত্র ও বুদ্ধিবলে ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ এবং অধিবাসীরা তাঁহাকে নিজেদের পরিত্রাণ-দাতা মনে করিত। সেই সময়ে কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীহরি গুহ "রাজা বিক্রমাদিত্য" উপাধি

ধারণ করিয়া যশোহরে নূতন রাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত। শংকরের প্রতিবেশী প্রসাদপুরের অধিবাসীরা এই নূতন রাজ্যে চলিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য শংকরের সমবয়সী এবং শংকরের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। শংকর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কেবলমাত্র মুখ্য পরামর্শদাতাই ছিলেন না, তিনি মোগলশক্তির সহিত প্রতিনিয়ত মহারাজাকে যুদ্ধ-কৌশলের নির্দেশ দিতেন।

শংকরের চিত্তাকর্ষক কাহিনী উপলব্ধি করিতে হইলে তদানীন্তন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহত কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ষোড়শ শতকের বাংলাদেশ দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন। দিল্লীশ্বর যদিও সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করিতেন তথাপি রাজ্যসমূহ শক্তিশালী হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হইত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রধানেরা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং প্রায়ই পর্তুগীজ আক্রমণকারী, জলদস্যু অথবা শীর্ষ ক্ষমতার অধিকারী মোগলদের সহিত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। এমনকি গভর্ণররা দিল্লীর দূরত্বের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ করিয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়াও ঘোষণা করিতেন।

দায়ুদ খাঁ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং দীর্ঘ সাত বর্ষব্যাপী যুদ্ধে বাংলার আফগান নেতৃবৃন্দকে মোগল শক্তির বিপক্ষে একত্র করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরাজিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইরূপে যুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশে বার জন ভূম্যধিকারী প্রাধান্য লাভ করেন এবং নিজেদের অধীনে তাঁহারা রাজ্য শাসন করিতেন। ইতিহাসে এই বারজন প্রধান নেতা বারভূঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ শ্রীপুরের দুই ভাই চাঁদ রায় ও কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য ইতিহাসে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহাদের এক উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয়িত হইলেও প্রজাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন দুইজন পর্তুগীজ মিসনারী ভারত ভ্রমণের পথে তথায় উপস্থিত হন তখন শ্রীপুরের কেদার রায় যশোহরের প্রতাপাদিত্য কেবলমাত্র সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনাই করেন নাই তাঁহারা তাহাদিগকে গীর্জা নির্মাণকল্পে জমি ও অর্থদান করেন এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী তাহাদের ধর্মান্তরিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বারভূঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যকেই তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য মোগল শক্তির সহিত কঠোরতম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনীকে বারবার পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মোগলশক্তিকে পরাজিত করিবার মূলে সর্দার শংকর এবং সূর্যকান্ত গুহের সামরিক কৌশলই প্রধান ছিল। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিজ লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজপুত সেনাপতি মানসিংহের হস্তে পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় দিল্লীর পথে বারাণসীতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রতাপ ধূমঘাট সুরক্ষিত নগরীতে নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ জলদস্যু রাডারিককে দমন করিয়া তাহাকে নিজ নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। শাসন ব্যাপারের সমস্ত ব্যবস্থাই শংকরের দক্ষ পরিচালনায় সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার পরই শংকর মোগলশক্তিকে পরাজিত করিবার জন্য দেশে গণ-উত্থানের কার্যে মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার কার্যকলাপ মোগলশক্তির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। চতুর শংকর রাজমহল পর্যন্ত গোপনে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন এবং এক ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন। রাজমহলের গভর্ণর শের শাহ ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য শংকরকে আদেশ করেন কিন্তু তিনি আদেশ অমান্য করায় গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু শংকর কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করেন। শেরশাহ শংকরকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এই নির্দেশ দিলে প্রতাপাদিত্য তাহা অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে শেরশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সংগ্রামে শেরশাহ কেবলমাত্র পরাজিত হইলেন না, পাটনা ও রাজমহল প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আসিল। শেরশাহের পরাজয়-বার্তা শুনিয়া সম্রাট আকবর একের পর এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াও প্রতাপকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তখন কলিকাতার উৎপত্তি হয় নাই কিন্তু বর্তমান কলিকাতার নিকটবর্তী বসিরহাট ও মাতলা প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ যুদ্ধের নিদর্শন আছে। প্রতাপের মৃত্যুতে শংকর ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করিয়া বর্তমান কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী বারাসাত নামক স্থানে চলিয়া যান।

শংকরের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন দক্ষিণ কলিকাতার একটি রাস্তার নামকরণ ও সর্দার শংকর রোড রাখিয়াছেন। এই রাস্তার একটি বাড়ির প্রাচীরে প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত রহিয়াছে:

The Councillors of the Corporation of Calcutta have been pleased to name this road to perpetuate the memory of Chakravarty Sanker (of Chattopadhy family of Prosadpur, Hooghly, subsequently settled at Baraset) who was the comrade and Chief Commander to the last glorious and mighty King of Bengal, Maharaja Pratapaditya Rai of Jessore (Dhoomghat) in the 16th Century.

গোপীনাথপুর গ্রামে পূর্বে বহু ব্যবসায়ী বাস করিত। এখন ইহা একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রাম দুইটি পটিতে বিভক্ত—পশ্চিম গোপীনাথপুর ও পূর্ব গোপীনাথপুর। পশ্চিম গোপীনাথপুরে পোষ্ট অফিস আছে, জনসংখ্যা ৭৭০ জন। পূর্ব গোপীনাথপুরের জনসংখ্যা ১,১৪৮ জন। গোপীনাথপুরে ১৬ই জুন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নগেন মাঝির একমাত্র পুত্র হারান মাঝির পার্শ্ববর্তী কুলপাই গ্রামে বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন চন্দ্রবোড়া নামক এক বিষধর সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। দুইদিন ওঝার চিকিৎসাধীনে থাকিবার পর মৃতদেহ বৈদ্যবাটী হাতিশালা মহাশ্মশানে আনা হয়। পাঁচ হাজার নরনারী ১৫ মাইল ব্যাপী পথের শোকযাত্রায় যোগদান করে। সাধারণ একজন কৃষকের মৃত্যুতে এই জনসমাগম কখনও হয় না। চিতায় তোলার পূর্বে মৃতদেহে উত্তাপ লক্ষিত হয় এবং শ্মশানে ডাক্তার ও ওঝা আসিয়া চিকিৎসা চালায়। সাময়িক চৈতন্য আসিবার পর সমস্ত চেষ্টা বিফল হয় ও হাজার হাজার অশ্রুসিক্ত নরনারীর সম্মুখে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। নববিবাহিতা পত্নী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে সকলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করে।

॥ স্বীপা ॥

স্বীপা নামক গ্রাম হরিপাল হইতে মাত্র চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য স্থান হইলেও, মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী এই স্থানে হরিনাম বিতরণ করিয়া এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারপূর্বক মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায়, বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অন্যতম পুণ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ পুরী হইতেই স্বীপা গ্রামের ইতিহাস আরম্ভ হয়। স্বীপার বর্তমান জনসংখ্যা ৫৮০ জন। গ্রামে পোস্ট অফিস আছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল এবং ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া কৌশিকী, বিমলা ও দামোদর নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া স্থানটিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইত এবং সেইজন্যই ইহার 'দ্বীপ' নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে 'দ্বীপ' নামটি 'স্বীপায়' পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা স্বীপগ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছেঃ

"ভাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥
স্বীপগ্রামে স্থিত কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাস নিশ্চিত॥"

কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কৃষ্ণানন্দ পুরী এই দ্বীপের জঙ্গলে আগমন করিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার একটি সুন্দর গৌরগোপাল বিগ্রহ প্রস্তুত করেন এবং উক্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া তিনি বিরহ যন্ত্রণা লাঘব করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, দামোদর নদের প্রবল স্রোতে তাঁহার পূজার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি দামোদরকে অভিশাপ দেন যে, আমার পূজার দ্রব্যাদি তুই ভাসাইয়া দিলি, দেখিতে পাইলি না; তোর চক্ষু কানা হইয়া যাক। তদবধি দামোদর 'কানা দামোদর' বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং এই স্থান হইতে বর্তমানে দামোদর নদও প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দামোদর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; কিন্তু ৭২-৭৮ পৃষ্ঠায় নদনদী প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর কিছু বলা হইল না। সহদেব চক্রবর্তীও তাহার 'ধর্মমঙ্গলে' লিখিয়া গিয়াছেনঃ

"বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

বস্তুতঃ দামোদর বর্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্বে যে খাতে প্রবাহিত হইত তাহা পাড়াম্বুয়া, সাহাবাজার, স্বীপা, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া হরিপালের উত্তর দিয়া পূর্বমুখে বন্দীপুরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্যই হরিপালে এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে আজও প্রচুর পরিমাণে বালি পাওয়া যায়। দামোদরের প্রাচীন খাতের মানচিত্র ৭৩ পৃষ্ঠায় আছে।

কৃষ্ণানন্দ পুরীর তিরোভাবের পর, হরিপালের সন্নিকট জ্যোত-সিন্দুর গ্রামের বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামক এক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বীপা গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর গৌরগোপাল বালগোপাল মূর্তির সেবাভার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বারহাট্টার জমিদারগণের সাহায্যে বনজঙ্গল কাটাইয়া তিনিই প্রথম এই গ্রামে স্থায়িভাবে বসতি করেন এবং পরবর্তীকালে

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব ঠাকুরকে স্বীপায় আনাইয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করেন। ইঁহাদের বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন এবং ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবাকার্য বিশেষ অনুরাগের সহিত নির্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে নিত্যানন্দ, রাধাবিনোদ ও রাধারানীর তিনটি বিগ্রহ আছে এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রার বার্ষিক মহোৎসবের সময় এই গ্রামে বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' ভক্তিকল্প বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণানন্দ পুরীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি ভক্তিকল্প বৃক্ষের নবমূলের একটি মূল ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্প বৃক্ষ রুইল সিঁচি ইচ্ছা পানি॥
শ্রী ঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্য মূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট জড় বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বাহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥"

স্বীপা গ্রামে পোস্ট অফিস আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৫৮০ জন। স্বীপা ও স্বারহাট্টা এই দুই গ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বীপা গ্রামের গিরীন্দ্রনাথ সাহা রাজ্য সরকারের শস্যোৎপাদন প্রতিযোগিতায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের আলু উৎপাদনে এক একর জমিতে ৫৮৯ মণ ২৫ সের ১৩ ছটাক আলু ফলাইয়া প্রথম পুরস্কার আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। ১৫১ পৃষ্ঠায় হুগলী জেলার কৃতি আলু চাষীগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

হরিপাল থানার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১। বাসুড়ি॥ স্বারহাট্টার নিকটবর্তী একটি গ্রাম; পিয়াসাড়া গ্রামের জমিদার বলাইদাস সরকার ১৫ই জুলাই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'বর্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীর সময় এই চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। কোন সময় ইহা বন্ধ হইয়া যায় তাহা বলিতে পারা যায় না।

২। বন্দীপুর॥ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নীলকমল মিত্র এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহামারীর সময় তিনি অর্ধেক এবং সরকার হইতে অর্ধেক ইহার ভার বহন করিতেন। মহামারীর পর তিনি স্বয়ং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা পরিচালনা করেন এবং পরে জেলা বোর্ডের হস্তে কিছু টাকা দিয়া তাহাদিগকে উহা পরিচালনের ভার দেন। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তাঁহার প্রদত্ত টাকা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় জেলা বোর্ড চিকিৎসালয় তুলিয়া দেন।
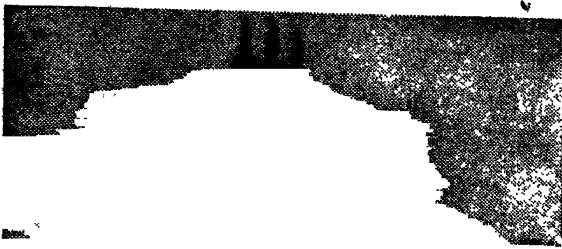
বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির—গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ১৪৪)

গুপ্তিপাড়ার রথ ((পৃষ্ঠা ১৪৬)

পাণ্ডুয়ার মসজিদ (পৃষ্ঠা ৮৮০)
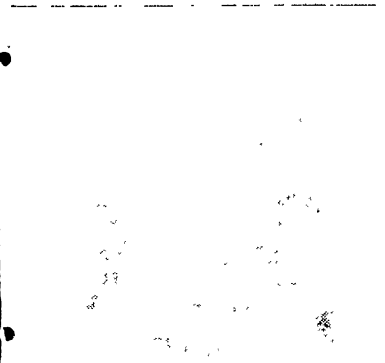
পাণ্ডুয়ার মিনার (পৃষ্ঠা ৮৮০)

বড় মসজিদ—ভুইমোহন (পৃঃ ৯০১)

পঞ্চরত্ন জোড়ামন্দির—বোড়াগাড়ি (পৃষ্ঠা ৯০৩)
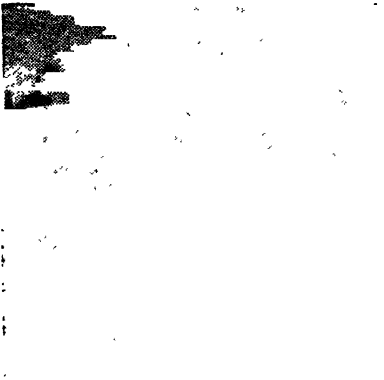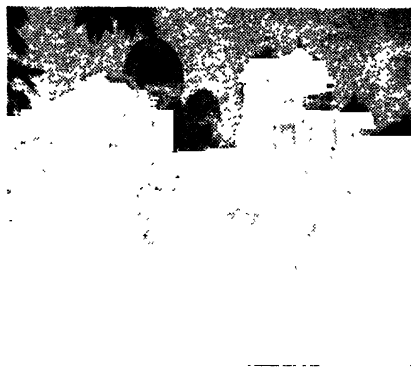
সাহাসুফির সমাধি (পৃষ্ঠা ৮৮৯)
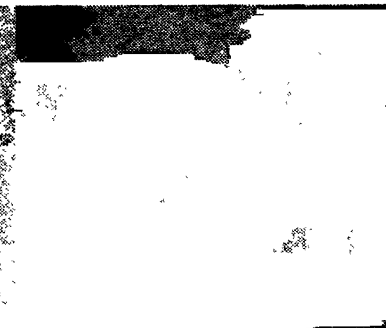
কোড়ে মসজিদ পাণ্ডুয়া (পৃষ্ঠা ৮৮১)
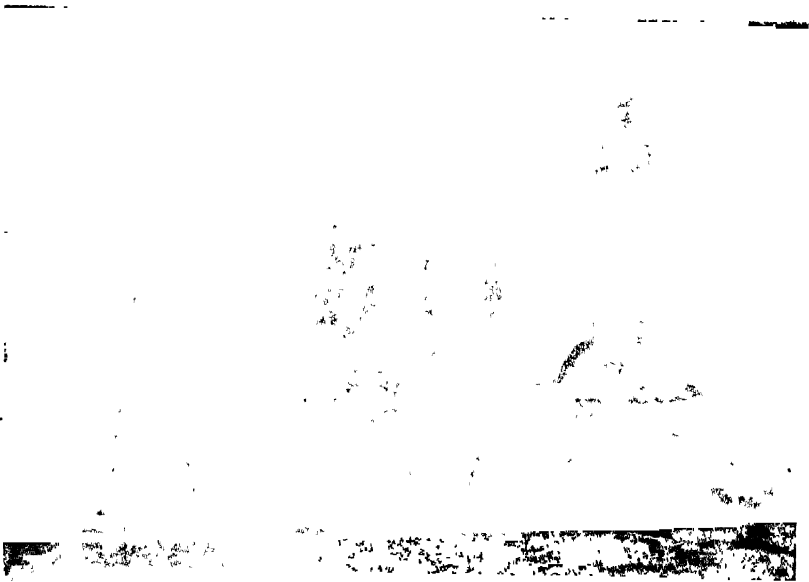
ত্রিখণ্ডিত সূর্যমূর্তি ও তাহার পশ্চাতে আরবি অক্ষরের প্রতিলিপি—পাণ্ডুয়া
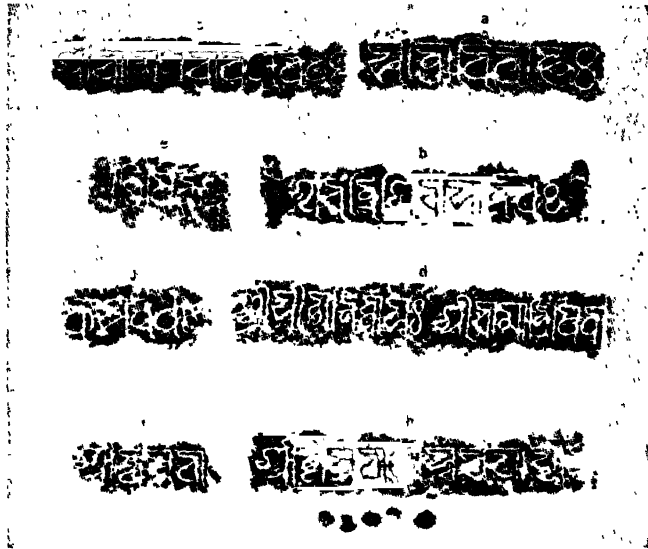
দরগায় প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপি (পৃষ্ঠা ৭৩৭)

জাফর খাঁ গাজীর সমাধি (পৃষ্ঠা ৭৭৬)
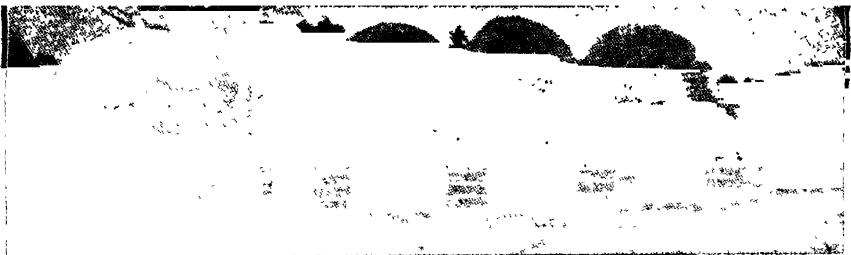
ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর দরগা (পৃষ্ঠা ৭৭৫)

১। বড়োদামান, ইনাথনগর (পৃঃ ৮০২); ২। শিবমন্দির, সোমসপুর (পৃঃ ৮০১); ৩। গোবিন্দজীউর মন্দির, বাকসা; ৪। কালীপ্রসন্ন সিংহের ঠাকুরদালান, বাকসা; ৫। গোপীনাথের মন্দির, বেলমড়ি (পৃঃ ৮০৫); ৬। রা[illegible] দোলমঞ্চ, আলা (পৃঃ ৮০২)।

গোপালের মা—আমনান (পৃষ্ঠা ৮৭৯

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ (পৃষ্ঠা ৯৭২)
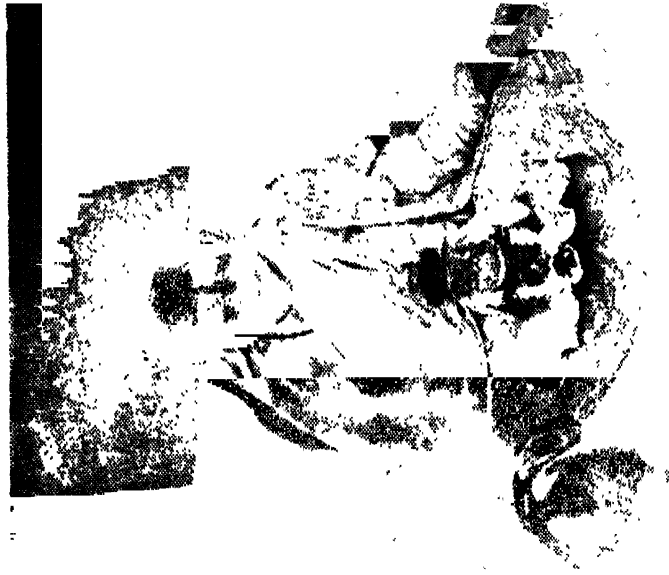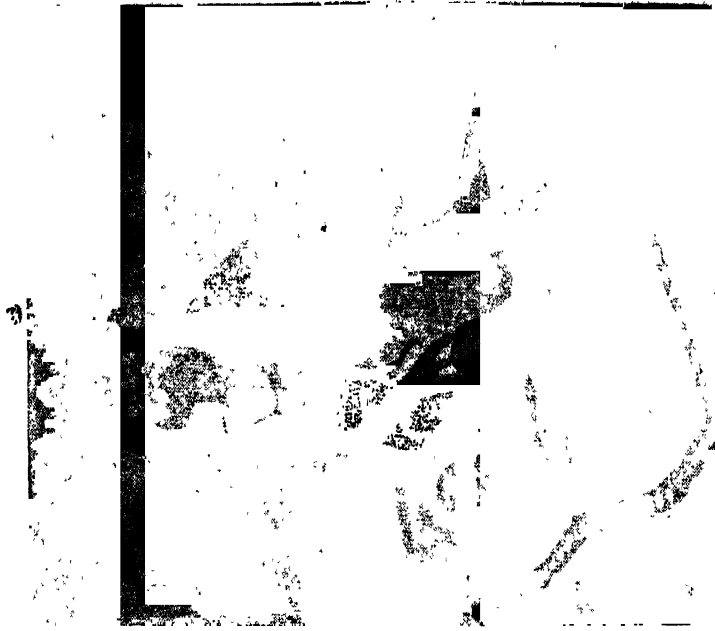
কানড়্ড় গ্রাম হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন (পৃষ্ঠা ৯০৭)
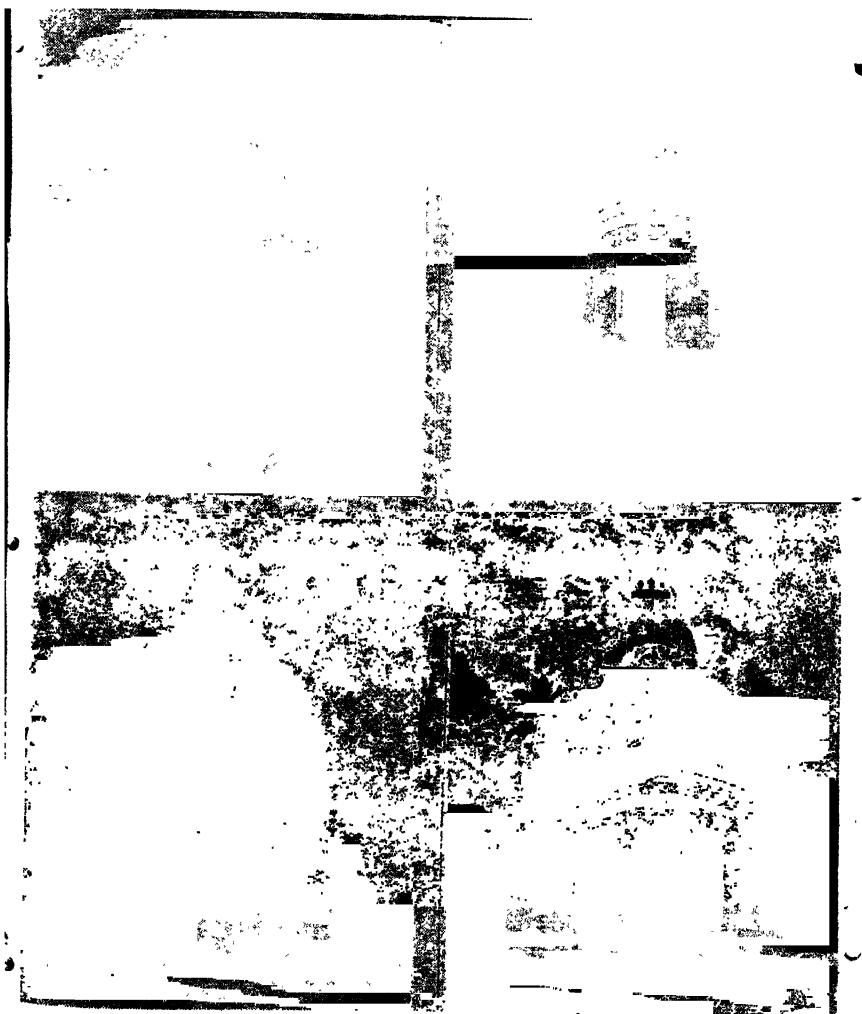
১। মদনগোপালের মন্দির, গোস্বামী-মালিপাড়া (পৃঃ ৮৪৯); ২। শিবমন্দির, গড়্লিটা;
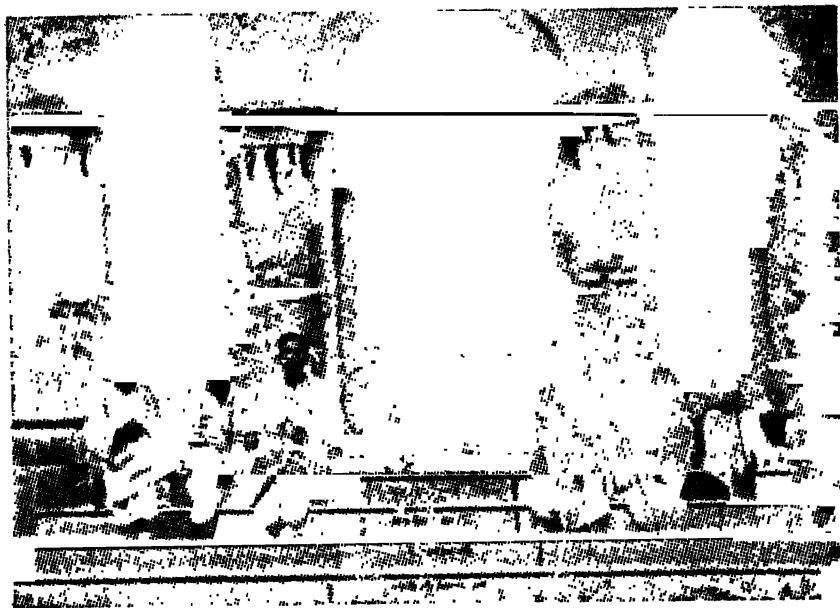
উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঠ—সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭২৮)
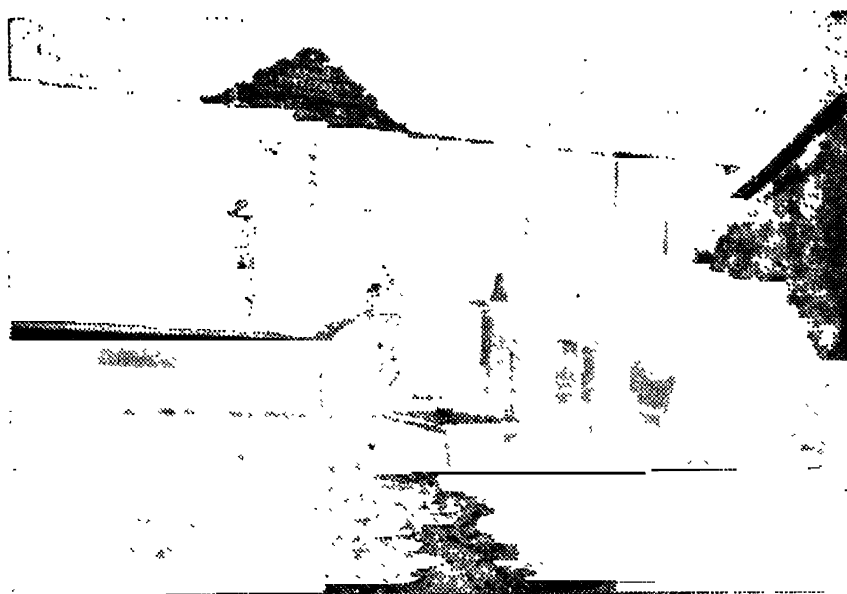
মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয় বড়া (পৃষ্ঠা ১০৭০)

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র (পৃষ্ঠা ১১০৫)

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

হীরালাল মুখোপাধ্যায়

বিপিনকৃষ্ণ রায়—দশঘরা (পৃষ্ঠা ৮২

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা ৫১৩)
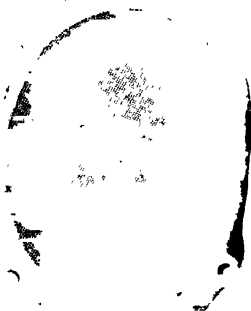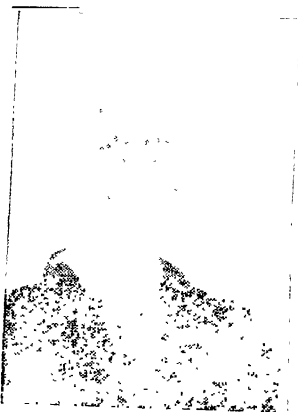
রাধাগোবিন্দজীউর রাসমঞ্চ—হরিপাল (পৃষ্ঠা ১০৭৯)
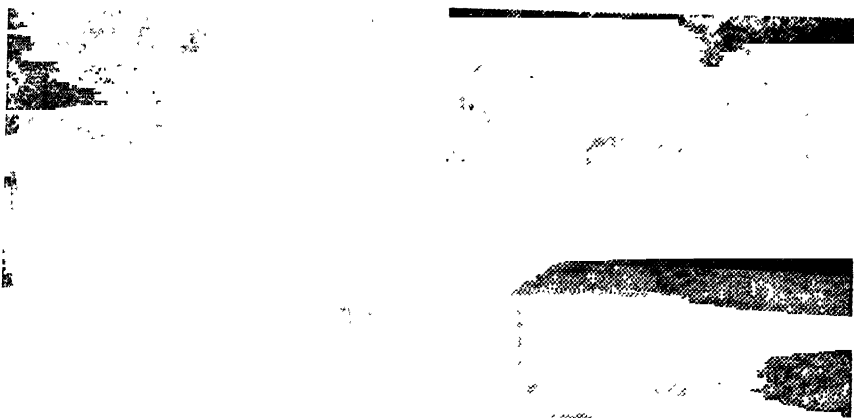
ষণ্ডেশ্বরজীউ—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬০৮)

কাজীমন ফকিরের সমাধি—মহানাদ (পৃষ্ঠা ৮৩১)
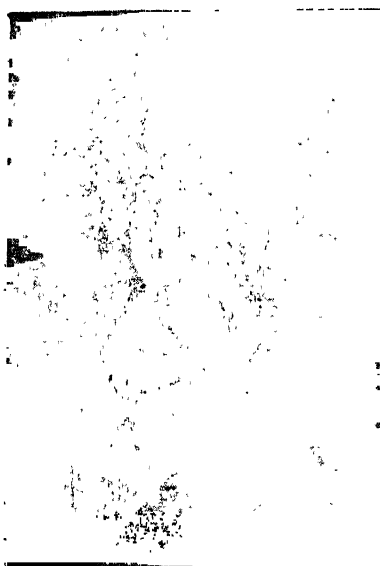
শিবচন্দ্র সোম—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬১৪)

কেদারনাথ সোম—চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৬১১)

রজনীকান্ত রায় (পৃষ্ঠা ৮২০)

স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ (পৃষ্ঠা ৯৪৭)
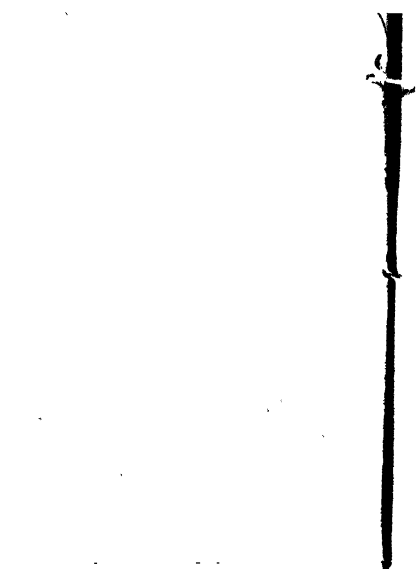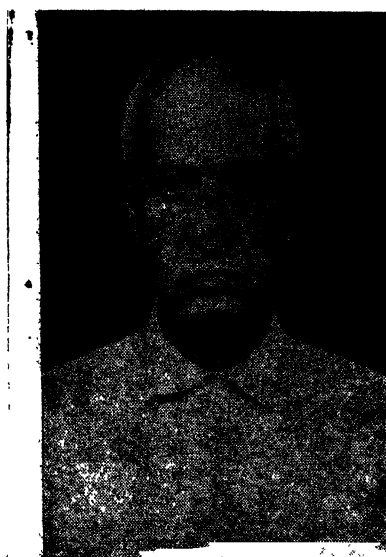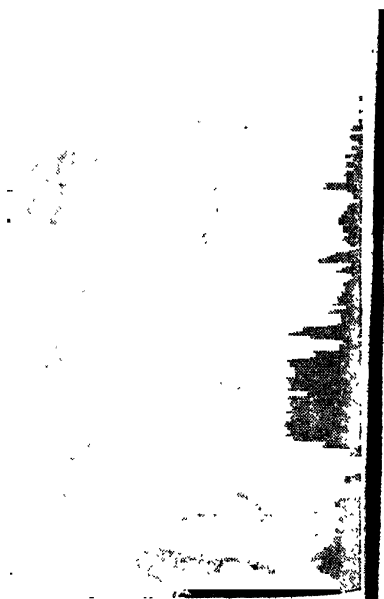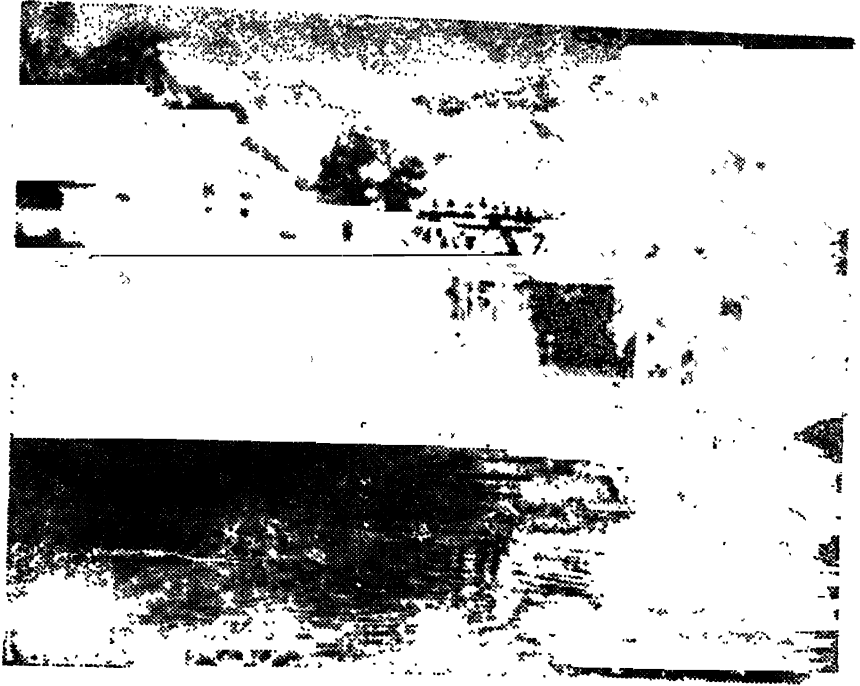
ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর দৃশ্য (পৃষ্ঠা ৭৭১)

রঘুনাথ দাসগোস্বামীর শ্রীপাঠ—কৃষ্ণপুর (পৃষ্ঠা ৭৬২)

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ
পরিদর্শন করিতেছেন (পৃষ্ঠা ১০১৪)

প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়—বড়া (পৃষ্ঠা ১০৭০)
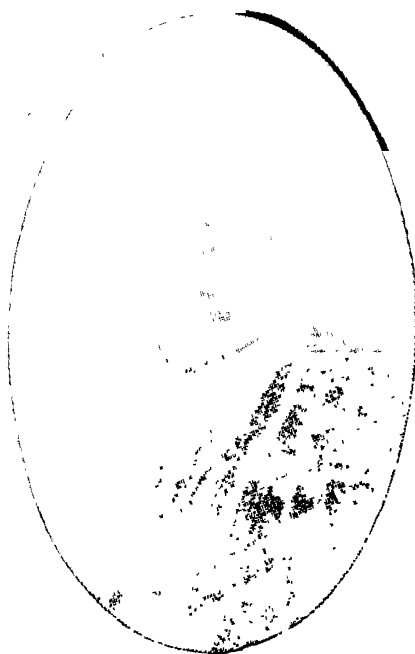
জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী (পৃষ্ঠা ১০১৬)

কিশোরীচাঁদ মিত্র (পৃষ্ঠা ১১০৪)

রাজা নৃসিংহ দেবরায় (পৃষ্ঠা ৭০৫)

রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায় (পৃষ্ঠা ৭১০)
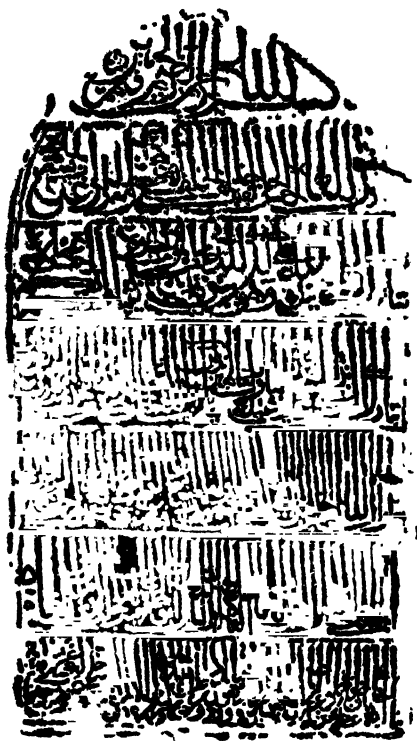
জাফর খাঁ গাজির দরগায় (ত্রিবেণী) আরবী শিলালিপি (পৃষ্ঠা ৭৭৫)

ভোলানাথ বসু

দীননাথ মুখোপাধ্যায়

সপ্তগ্রামের রূপান্তরিত হিন্দু মন্দির (পৃষ্ঠা ৭৩৮)

॥ বন্দীপুর ॥

বন্দীপুর হুগলীর একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার নামে পরগণা প্রচলিত; এখানে উচ্চ ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহু লোক ও জাতির বাস। বন্দীপুরের ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) জমিদারগণ একসময় বিখ্যাত ছিলেন। বন্দীপুর গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ "রায় বংশ"। এই বংশ রাজপুতানা হইতে প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া বন্দীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ রাণা লক্ষ্মণ সিংহের বংশধর। কুঞ্জলাল সিংহ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মেলনে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল সরস্বতী।

বর্তমানে চুঁচুড়া কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞান চৌধুরী মহাশয় এই বংশোদ্ভব। কলিকাতায় এই বংশের অনেক ব্যক্তি বাস করেন।

এই বংশের একজন মহাপুরুষ ⁺মধুসূদন সিংহ মহাশয় বন্দীপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। গত সেটেলমেণ্ট করার সময়ে এই সকল নিষ্কর সম্পত্তির বর্তমান মালিকরা যে তায়দাদ দাখিল করেন বা উল্লেখ করেন তাহাতে ⁺মধুসূদন সিংহ মহাশয়ের নাম 'মুদাফত' নামে লিখিত আছে। বন্দীপুরের ঘোষ ও মিত্র বংশ রায়বংশের দৌহিত্র হিসাবে বন্দীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী⁺গোপীজন বল্লভ জীউ। ইঁহার নিত্য সেবা ও জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও অন্যান্য উৎসব নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এই বংশ বহু প্রাচীনকাল হইতে শ্রীশ্রী⁺দুর্গা পূজারও প্রবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানেও এই পূজা চলিতেছে। অন্যান্য দেবতা ও বিগ্রহের মধ্যে ⁺গঙ্গাধর শিব আছেন। তাঁহারও নিয়মিত সেবা ও চড়ক পূজার সময় গাজন হইয়া থাকে। এই বংশের শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় সিঙ্গুর মহামায়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

বন্দীপুরের বাইতি জাতি মাদুরশিল্পে একসময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন তাহারা প্রায় নির্মূল হইয়াছে। বন্দীপুরের ঘোষেরাও বিখ্যাত। তাহাদের বার মাসে তের পার্বণ এখনও প্রচলিত আছে। বন্দীপুর হরিপাল রাজার আদি নিবাস ছিল বলিয়া কথিত হয়। পার্শ্বেই উক্ত রাজার চিত্রশালার জন্য প্রসিদ্ধ চিত্রশালি গ্রাম অবস্থিত।

বন্দীপুরের গৌরব ছিলেন **নীলকমল** মিত্র; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "এলাহাবাদ বা প্রয়াগ" নামক ইংরাজী গ্রন্থে নীলকমল সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বন্দীপুর অপেক্ষা এলাহাবাদে তাঁহরে প্রচুর কীর্তি রহিয়াছে। "দেবগণের মর্তে আগমন" গ্রন্থে তাঁহার ভূয়সী সুখ্যাতি এবং নীলকমল পার্কের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁহার জীবিত কালে যে কোন বাঙ্গালী ভারতের যে কোন স্থান হইতে এলাহাবাদে যাইতেন, তাহারাই মিত্র মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। তিনি মিলিটারীতে রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। তথায় তাঁহার নির্মিত "অ্যালফ্রেড পার্কের ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড"-এর ছবি রামানন্দবাবুর গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। তারকেশ্বর রেল লাইন নাই-এর ভিতর দিয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীলকমল মিত্র তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দীপুরের পার্শ্ব

দিয়া উক্ত রেলপথ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু অর্থব্যয়ে গ্রামে আসিয়া মাতার তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খ্যাতি আজও শোনা যায়। দেশে তাহার বিরাট অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। তাহাতে স্কুলের ছাত্রাবাস, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি রহিয়াছে। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কানানদী প্রবাহিতা। ইহার উপর দিয়া তিনি একটি লোহার পুল নির্মাণ করিয়া দেন। তাহা নীলকমল মিত্রের নামে আজও তাঁহার হিতৈষণার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রও কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। ইহার কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান কিরণচন্দ্র দের বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র মিত্রের পুত্র ফণী মিত্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্দীপুর হাই স্কুল নির্মাণকালে জমি ও ইষ্টক দান করিয়া স্কুল নির্মাণ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। নালিকুল ষ্টেশনের নিকট আলোকপন্থী পাঠাগারের নিজস্ব ভবন আছে। প্রজাপতি সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার বন্দীপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

বন্দীপুরে ধর্মঠাকুর শ্যাম রায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যাম রায় এবং বাঁকুড়ার যাত্রাসিদ্ধি রায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যাম রায়ের পূজারিরা জেলে জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যাম রায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন। এই স্থানে নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায়।

ডন সোসাইটির স্থাপয়িতা স্বদেশীযুগের অগ্নিমন্ত্রের সাধক ডন ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মোদক, কিঙ্করবাটী গ্রামের ধরণীধর কয়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নালিকুল গ্রামের মন্মথ রায় কর্মকার ব্যবসার দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পার্শ্ববর্তী গজা গ্রামের ভট্টাচার্য জমিদারগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাদের বিশাল জমিদারী মোহালের মধ্যে বন্দীপুরের নাম প্রজাদের মধ্যে আজও প্রচলিত। চিত্রশালার সিংহ বংশীয় কায়স্থগণও প্রসিদ্ধ। বন্দীপুরের নিকটেই বড়গাছিয়া গ্রাম। এই গ্রামের সিংহ বংশীয় কায়স্থগণ এক সময়ে জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের অতিথিশালায় নিত্য বহুদূর হইতে অতিথি সমাগম হইত; নানা দেবকীর্তি আজও এই স্থানে বিদ্যমান।

করালীচরণ বিদ্যালঙ্কার বন্দীপুরের স্বনামধন্য দশকর্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাসেশ্বর বিদ্যারত্ন প্রমুখ তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী ছিলেন। রাসেশ্বর কলিকাতা গৌরীবাড়ী লেনে অনেকগুলি ইষ্টক নির্মিত আবাস ভবন নির্মাণ করেন।* জ্যোতিষ চর্চা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

বন্দীপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশও প্রসিদ্ধ; এই বংশের রামনাথ চট্টোপাধ্যায় আলমবাজারে আসিয়া বাস করেন। আলমবাজারে ইঁহাদের বাড়ী "থামওয়ালা চাটুয্যেদের বাড়ী" বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ও পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি।

বড়গাছিয়া গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ নানা এষ্টেটের নায়েবী কার্য করিয়া একদা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী মুক্তহস্ত এবং শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সারদাপ্রসাদের পুত্র ভোলানাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ ও

হোমিওপ্যাথিক সমাচারের সম্পাদনা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার লিখিত "শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত" ও "শ্রীনিবাস আচার্য" তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ যখন যুগপৎ "ভক্তি" "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয় গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন বৈষ্ণব সমাজের সর্বস্থান হইতেই তিনি আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জীবনী লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই গ্রামের ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধ। ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা ইংরাজী অভিধান একদা প্রসিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীরামপুরে চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হন। তাঁহার পুত্র সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ ও উকিল মণীন্দ্রনাথও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সিংহ বংশের যোগেন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া আসিয়া সুখ্যাতির সহিত তাহাদের কলিকাতা আবাস ভবনে থাকিয়া চিকৎসা করিতেছিলেন। তিনি এম্ ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শশিভূষণ এল্-এম-এস ও মধ্যম ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার ছিলেন।

পার্শ্ববর্তী নওপাড়া গ্রামের ডাঃ সারদাচরণ দাস এল্ এম্ এফ, ধাত্রীবিদ্যায় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার দাদা কুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত ছিলেন। ইহারা মাহিষ্য জাতীয়।

এই স্থানে অবান্তর হইলেও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিযুক্ত-স্মৃতি চুঁচুড়া কাঁকশিয়ালীর মজুমদার বাটির *শ্যামনাথ মজুমদারের নাম আমরা উল্লেখ করিব। তাঁহার তত্ত্বকুসুম প্রভৃতি বহু উচ্চাঙ্গের কবিতা গ্রন্থ বসন্ত প্রভৃতি উপন্যাস একদা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজ আমলের প্রথমাংশে সার্ভে কার্যের সুবিধার জন্য নানা সুউচ্চ গম্বুজ নির্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বড়গাছিয়া গ্রামের পার্শ্বে ভোলাগ্রামে এইরূপ একটি ত্রিকোণমিতিক জরীপের সুউচ্চ গম্বুজ আজও বিদ্যমান। 'দেবগণের মর্তে আগমন' গ্রন্থে ভুলক্রমে উহাকে ভোলার গির্জা বলা হইয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন:

> **The only thing of interest near the line is the great Trigonometrical Survey tower at Bhola, which is within a few yards of the line on the north side, halfway between Singur and Nalikul station.**

এই স্থানে বড়গাছিয়া গ্রামের সীমানায় তারকেশ্বর সেওড়াফুলি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে বহু চটি বা যাত্রী নিবাসের কথা উল্লিখিত আছে। তারকেশ্বর রেলপথ নির্মিত হইবার পূর্বে এই সকল চটি লোক সমাগমে পূর্ণ থাকিত এবং বহু ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী বহনের জন্য এই স্থানে বিদ্যমান থাকিত। উহার বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে আছে। এক্ষণে তাহার চিহ্ন নাই।

অখিলচন্দ্র পালিত এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কুচবিহারে দারোগাগিরি করেন; মহারাজার আদেশে তথায় ব্যবহারজীবীর কার্য করিয়া যশস্বী হন। তিনি সুকবি সুলেখক ও বহুভাষাবিৎ ছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। সমসাময়িক বহু প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী, বাংলা মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের হৃদয় শাখা ১ম ২য় ভাগ, মেঘদূতের সুললিত পদ্যানুবাদ একদা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ আজও অমুদ্রিত রহিয়াছে।

॥ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তাহার স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দুই বৎসরের বড়, আচার্য স্যার ব্রজেন্দ্রলাল শীল ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাত্র এক বৎসরের ছোট ছিলেন। ইহাদের সকলেরই আজীবন বন্ধুপ্রীতি ছিল।

আনুমানিক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সতীশ মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সহিত পরিচিত হন; তখন মহারাজ তরুণ যুবক। এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিবেশের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। ইহারা সকলেই তাঁহার গুরুভাই ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের দলের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত সাহিত্য, উপনিষদ, গীতা ও হিন্দু দর্শনের আলোচনা হইত। এখানেই পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সহিত তাহার আন্তরিক সখ্য স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রচারকল্পে মাসিক পত্রিকা "ডন" প্রকাশ করা হয়। এই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণদেব ও ভারতের ধর্মমত প্রচার করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাংবাদিকতায় ও বিশ্ববাসীর নিকট ভারতের সাংস্কৃতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বিচারক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ও শ্রীমতিলাল ঘোষের সহিত পরিচিত হন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত দুইটি দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ কলিকাতার কলেজের তরুণ ছাত্রদিগকে স্বদেশভক্তি, আত্মত্যাগ, সর্বপ্রকার সমাজ-সেবা শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ কলেজ ছাত্রদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে বাঙলায় ভাষায় সাপ্তাহিক গীতা পাঠ ও আলোচনা। তখনকার মেট্রোপলিটান কলেজ অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের একটি ঘরে "ডন সোসাইটির" সভা হইত। বরং ইহাকে সভা না বলিয়া পাঠচক্র বলা যাইতে পারে। 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ সেনের উপর ছিল কলেজের পরিচালনার ভার।

'ডন সোসাইটির' সঙ্গে সঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পুরাতন মাসিক পত্রিকা 'ডনের'ই ইহা পরিবর্ধিত সংস্করণ; এই নূতন পত্রিকায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিচিত্র সংবাদ ও সমালোচনা এবং তৎকালীন সাহিত্য ও ভাষার সরস আলোচনা স্থান পাইল। ভারতের নানা নানা তথ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের পত্র প্রকাশ করিয়া 'ডন সোসাইটির' সদস্যদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত।

সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের তৈয়ারী ধুতি গেঞ্জী ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রয়ের জন্য স্বদেশী ভান্ডার খোলা হইল। সোসাইটির সদস্যদিগকে তত্ত্বাবধান ও জিনিষপত্র বিক্রয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তগণ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। সপ্তাহে দুইবার ক্লাস লওয়া হইত। চার বৎসর ধরিয়া সোসাইটির কাজ চলে। এই সময়ে কলিকাতার প্রায় ৫ শত তরুণ তাঁহার সংস্পর্শে আসে। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম ও বিভক্ত বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই তরুণেরা এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের গত যুগের আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অসাধারণ ত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার প্রথম পাঠ সমস্তই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার ও প্রফুল্লকুমার সরকারের নাম স্মর্তব্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 'ডন সোসাইটির' সহকর্মিগণ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ ও পরিচালনা করেন। বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে; সোসাইটির কর্মীরা জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়াইয়া দিয়া নেতা হইয়া উঠিলেন।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মীরাই আবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এই আন্দেলেনের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে পরিণত হইয়াছে। ন্যাশনাল কলেজের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় আর প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর 'ডন সোসাইটি' বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু সোসাইটির মুখপত্র পূর্বেকার ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রথম ন্যাশনাল কলেজ ও বঙ্গীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টরসের্র কাজ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হইতে ভারতের ইতিহাসে গান্ধীযুগের সূত্রপাত। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যুগে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকজন কর্মী গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠেন। তিনিও রচনার মধ্য দিয়া গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া বাহিরের লোক তাহার কোন সংবাদ রাখে নাই। বাঙ্গলার বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম স্রষ্টা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

॥ জেজুর ॥

জেজুর হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল কসবা এবং জনশ্রুতি আছে যে, ১০৫০ সালে গোবিন্দরাম মিত্র এই গ্রামের জেজুর নামকরণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই গ্রাম নাগর নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। বর্তমানে যে-স্থানে জেজুরের শ্মশান অবস্থিত, তথায় রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ অচ্যুতকুমার মিত্র কয়েক বৎসর পূর্বে শ্মশানের নিকটে একটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কার করেন। তাঁহার অভিমত এই যে, জেজুর পূর্বে একটি নগর ছিল। শ্মশানটিকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বর্তমানে 'নাগর-গাছি' বলেন। অধুনা জেজুর গ্রামের উত্তরে 'মোগলপুর' ও 'ময়নাপাতা' নামক দুইখানি গ্রাম, পশ্চিমে 'নৃসিংহ আড্ডি রোড' নামক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা; দক্ষিণে 'নারায়ণপুর' ও 'মাল্লাপাড়া' এবং পূর্বে 'বন্দীপুর' নামক গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া কানা নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। 'নাগর-গাছি' নামক শ্মশানের উত্তরে 'রানীয়া' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার চারিপাশে সুন্দর ফুলের বাগান এবং বহু বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া প্রকাশ। বর্তমানে ঘাটগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও, তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। কিংবদন্তী এইরূপ যে, রাজার মহিষীগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম রাণীয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার কালে উহা হইতে বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি বাহির হয়। পূর্বে নগরটি শৈব প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড় আসিয়া যুদ্ধে 'নাগর' রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে তাঁহার রাজধানীর সমুদয় দেব-দেবীর মূর্তি রাণীয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেন। বর্তমানে এই গ্রামের মধ্যে একটি খুব বড় মাঠ দেখা যায়; উহাকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 'গড়ের মাঠ' বলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজার এইস্থানে 'গড়' ছিল। 'নাগর' রাজার পূর্ব সমৃদ্ধির বহু পরিচয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। ডঃ মিত্র আবিস্কৃত মূর্তিটি শ্রীধরজীউর মন্দিরে রক্ষিত আছে।

জেজুরের পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমূহের নামকরণ 'নাগর' রাজার সূত্র হইতে হইয়াছে বলিয়া গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস। যেমন, বন্দীগণকে যে স্থানে রাখা হইত, তাহার নাম 'বন্দীপুর', রাজার ধনদৌলত যেখানে থাকিত, তাহার নাম ভাণ্ডারহাটি প্রভৃতি। এ-সমস্ত কথার সত্যতা নিশ্চয় করিয়া বলা একপ্রকার-অসম্ভব, তবে বহু পুরাকাল হইতে এই সমস্ত লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। 'নাগর' রাজার বহুপরে, কুচপালের নবাব বংশের এক নবাবও এখানে থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাকে সকলে মোগল-শা বলিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাঁহার নাম হইতে জেজুরের পার্শ্বে 'মোগলপুর' গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

জেজুরে বহু দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে হাটতলার কালীমন্দির ও শিবমন্দির প্রাচীনতম দেবস্থান। ঘোষ বংশের ও বসু বংশের দুর্গাপূজার ঠাকুর দালান একটি দর্শনীয় বস্তু। বসুবংশের ঠাকুরদালান এখন করবংশের দখলিভুক্ত। উহার অর্ধাংশ পড়িয়া গিয়াছে। মিত্রবংশের শ্রীধরজীউর মন্দির ও [illegible] মন্দিরের অবস্থাও ভগ্নপ্রায় শ্রীধরজীউ জাগ্রত দেবতা বলিয়া কথিত। একবার মাখনলাল মিত্রের চেষ্টায় শ্রীধরের

ও হীরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেষ্টায় লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের কিছু সংস্কার করা হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভবনে কুলদেবতা আছেন। দেবদেউলগুলি সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

জেজুরের ঘোষ, বসু এবং মিত্রবংশ প্রসিদ্ধ; ঘোষ বংশে **গোপাল ঘোষ ও যুগল ঘোষ** হিন্দু ধর্মোক্ত ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া খুব সুনাম অর্জন করেন। মিত্রবংশে বিশ্বম্ভর মিত্রও অনুরূপ কার্য করিয়া যশস্বী হন। এই বংশে জয়রাম মিত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নামানুসারে কলিকাতায় "জয় মিত্র ষ্ট্রীট" বলিয়া একটি রাস্তা আছে। এতদ্ভিন্ন কবি রাধামাধব মিত্র* এবং আশুতোষ মিত্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বসু এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রিয়ব্রত বসুও এই অঞ্চলে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'ডক্টর' উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুতকুমার মিত্র জেজুরে জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ "জেজুরের মিত্র বংশ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গ্রামের ঘোষাল বংশও খুব প্রাচীন বংশ বলিয়া খ্যাত। বসু বংশে প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম হয়। ঘোষ বংশে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম পি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষের চেষ্টায় জেজুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠাগার ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের যাবতীয় মঙ্গলকর্মে তিনি অগ্রণী হন বলিয়া সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

জেজুরের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান **জেজুর হরিসভা ও জেজুর অবৈতনিক নাট্যসমাজ**। ১২৮০ সালে জেজুরের হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিন ধরিয়া সমারোহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যসমাজ ১৩০০ সালে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রা এবং থিয়েটার উভয়ের অভিনয় প্রতি বৎসর হয়। অভিনয়ে ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, মনসা ঘোষাল, হরি ঘোষ, প্রবোধ মিত্র, সুরেশ মিত্র, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও অনিল ঘোষাল সুনাম অর্জন করেন। সংগীতে ও নৃত্যাদি পরিচালনায় কড়ি হাড়ির কৃতিত্ব সর্বাধিক ছিল। পরিচালনা ও প্রয়োগ ব্যাপারে অতুল্য ঘোষ ও পরে হীরেন্দ্র মিত্রের নামও উল্লেখ্য। নাট্যসমাজের নিজস্ব দৃশ্যপট ও পোশাকাদি আছে। বর্তমানে পুণ্যব্রত বসু ও শান্তিময় ঘোষের প্রতি বৎসর যাহাতে অভিনয় হয় সেই বিষয়ে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

জেজুরে পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত **রামাচরণ উপাধ্যায়** উহা পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে পুণ্যব্রত বসু, কিরণময় ঘোষ ও শান্তিময় ঘোষের চেষ্টায় গ্রামে **উচ্চ বিদ্যালয়** এবং বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্য ভবনাদি নির্মিত হইয়াছে। বিভাবতী ঘোষের চেষ্টায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জেজুরে **মহিলা সমিতি** স্থাপিত হইয়াছে এবং সমিতির কার্যাবলী সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। মহিলা সমিতির উদ্যোগে জেজুরের **সেবাভবন** ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ প্রসূতি সদন গ্রামাঞ্চলের গৌরব। ১৭ই আগস্ট ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সেবাভবনে মান্নাপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ দের একটি পৌত্র হয়। জন্মের পরই শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটিকে দেখিতে একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। শিশুটির একটি মাথা, দুইটি

*রাধামাধবের কাব্যগ্রন্থমালা—সুধীরকুমার মিত্র, বঙ্গশ্রী ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

পিঠ, দুইটি চক্ষু, চারটি কান, একটি গলা, একটি মুখ ও দুইটি নাক ছিল বলিয়া উহা সেবাভবনে সংরক্ষিত হইয়াছে।

জেজুরে **ইউনিয়ন বোর্ড** স্থাপিত হইলে নন্দলাল মিত্র বোর্ডের প্রথম সভাপতি হন। তাঁহার চেষ্টায় জেজুরে পোস্ট অফিস ও হরিপাল হইতে ময়নাপোতা পর্যন্ত চার মাইল রাস্তা এবং কানা নদীর উপর যানবাহন চলাচলের জন্য গোপালচন্দ্র মিত্রের ব্যয়ে যে সেতু নির্মিত হয় তাহা সম্পন্ন হয়। গোপাল মিত্র তাঁহার পুরোহিত ঘোষাল বংশের কুলদেবতার মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দেন। বোর্ডের সভাপতি হিসাবে পরবর্তীকালে বসন্তকুমার মিত্র, প্রিয়ব্রত বসু, হরিমাধব মিত্র ও কিরণময় ঘোষ পল্লীর উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জেজুরে **কংগ্রেস কমিটি** স্থাপিত হয়। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন সুধীরকুমার মিত্র ও সম্পাদক হন ডাঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হরিপালের ডাঃ আশুতোষ দাসের প্রবর্তিত কল্যাণ সঙ্ঘের একটি শাখা বহু বৎসর যাবৎ জেজুরে জনসেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণের কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে গোপনে কার্য করিয়াছিল। কল্যাণ সঙ্ঘ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে জেজুর হইতে কংগ্রেস অফিস উঠিয়া যায়।

॥ আশুতোষ মিত্র ॥

আশুতোষ মিত্র জেজুরের আর এক মহান পুরুষ। বিস্তৃত খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা যদিও তিনি লাভ করেন নাই, তথাপি জেজুর তথা হুগলীর মানুষের মানসমন্দিরে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। ভাবময় বিলাসস্বপ্নের জড়ত্ব হইতে তিনি জন্মাবধিই মুক্ত। সর্ববিধ সংস্কারমুক্তির কর্তা হিসাবে সাধারণ মানুষের তিনি বান্ধব।

৬ই বৈশাখ ১২৭৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধারমণ মিত্র। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল উজ্জ্বল। গভীর মানবিকতার সুরে তাঁর জীবন ছিল চিহ্নিত। সাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তা আজও গ্রামবাসীর স্মরণে আছে। বাল্যে মাতৃবিয়োগের জন্য দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন সুরু হইলেও গতিধর্মে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। গ্রামের প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেশের জন্য তাঁর প্রবল অনুরাগ যদিও অন্যান্য অনেকের মতো দূর-প্রসারিত হয় নাই তথাপি শতাধিক ব্যক্তিকে জীবিকার সন্ধান দিয়া আশুতোষ স্বমহিমায় ভাস্বর।

তৎকালীন বিষ্ণুপ্রিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আশুতোষ মিত্রের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইত। সহজে গুণ, ভাগ করিবার নিয়ম সম্পর্কে "রেডিরেকনার" নামে প্রথম গ্রন্থ আজ তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদাস সিংহের কন্যা। একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের লেখক। এবং পৌত্র পলাশ মিত্র তরুণ সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত।

যে সময়ে গ্রামের বহু বাসভবন ধ্বংসের মুখে সে-সময় তিনি পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থে '**বিশ্বম্ভর ধাম**' নির্মাণ করেন। কালীঘাটে ১৩৫০ সালের ২২শে ভাদ্র ২নং কালী লেনে তাঁহার মৃত্যু হয়। **আশুতোষ মিত্রের জীবনী** গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে।

॥ দেবব্রত বসু ॥

যে বৈপ্লবিক পাঞ্চজন্যের শঙ্খধ্বনিতে বাংলার বিপ্লব যুগের শুভাগমন ঘোষিত হইয়াছিল, দেবব্রত বসু তৎকালীন সেই 'যুগান্তর' পত্রিকায় (বিপ্লবীদের মুখপত্র) 'ষোগাক্ষ্যাপা' নামে লিখিতেন। সে যুগে তাঁহার লেখায় সমগ্র বাংলা দেশে দেশাত্মবোধের এক উন্মাদনা আনিয়াছিল। আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তখন তাঁহার নাম হয় প্রজ্ঞানন্দ। সন্ন্যাস আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

দেবব্রত বসু সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও লেখক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অপ্রকাশিত রচনা এখানে দেওয়া হইল ঃ

দেবব্রতের বাড়ী ছিল হুগলী জিলায় জেজুর গ্রামে। তাঁহার পিতা কর্মব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া গ্রে স্ট্রীটে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার কাকা বঙ্কুবাবু দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। দেবব্রতরাও ব্রাহ্মমতে অনুরাগী ছিলেন; তবে ঠিক দীক্ষিত ছিলেন কি না আমি বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজের এক অনুষ্ঠানে তিনি গান গাহিয়াছিলেন। ইহার পর আরও অনেক ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আমি গান গাহিতে দেখিয়াছি।

ইহার পর ১৯০৩ সালে বিপ্লবী আখড়ায় (ব্যায়ামগারে) তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে আমার ভাব হয়। তিনি তখন বি এ পাশ করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঐ ব্যায়ামাগার উঠিয়া যায়। এই সময়ে তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় কাজকর্ম চালাইতেন। তিনি যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমন বুদ্ধিমানও ছিলেন। মন্মথ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। সেখানে আমাদের পাঠচক্র (Study Circle) ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, সখারাম গনেশ দেউস্কর প্রভৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া বক্তৃতা করিতেন। ইহার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

বিপিনচন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজে দেবব্রত কিছুদিন সাব-এডিটরের কাজ করেন। এই সময়ে অর্থকষ্টে তাঁহার দিন চলিতেছিল, আমি তাহা জানিতাম।

এই সময়ে পি মিত্র বা প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। মফস্বল শাখাসমিতি হইতে কেহ কলিকাতায় আসিলে প্রথমে তাহাকে দেবব্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইত। পরে প্রয়োজন হইলে দেবব্রতই তাহাকে মিত্র মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতেন অথবা অন্য কাহাকেও দিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

১০৮নং আপার সার্কুলার রোডে যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবী কেন্দ্রের কাজ চলিতেছিল, আমি একদিন সংবাদ শুনিয়া সেখানে যাই। আমি তখন ব্রাহ্ম মিশনারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। কারণ, প্রবীণদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজ উদ্ধার না হইলে স্বাধীনতা আসিবে না। ইহা ১৯০২ সালের কথা। পরে আমার এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হয় এবং আমি বিপ্লবী দলভুক্ত হই।

ক্রমে আমাদের ইচ্ছা হইল যে, একটা কাগজ বাহির করি। আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং বারীন্দ্রকুমার এই মতাবলম্বী ছিলাম। সখারামবাবুর নিকট প্রস্তাব করিলে

তিনিও সম্মত হইলেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমার সম্পাদনায় 'যুগান্তর' বাহির হইল। শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর উপন্যাস হইতে আমিই এই নাম দেই।

দেবব্রতবাবু 'যোগক্ষ্যাপা' ছদ্মনামে নিয়মিতভাবে যুগান্তরে লিখিতেন। পরে তিনি মনোরঞ্জন গুহের 'নবশক্তি' কাগজেও লেখকরূপে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট শুনিয়াছি, যুগান্তরের কর্মীরাই দৈনিক নবশক্তি কাগজ পরিচালনা করিতেন। এই বাড়ীরই একটা ঘর ভাড়া করিয়া শ্রীঅরবিন্দ থাকিতেন। বোমার মামলা সম্পর্কে ১৯০৮ সালের ২রা মে এখানেই তিনি গ্রেপ্তার হন। দুই একদিন পরে দেবব্রতকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেবব্রত এক বৎসর আলিপুর জেলে ছিলেন। ইহার পর মুক্তি পাইয়া বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হন। তাঁহার নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। সন্ন্যাসী অবস্থায় তিনি 'ভারতের সাধনা' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

এক তরুণ বিপ্লবী কর্মী হরিশ ঘোষ সন্ন্যাসী অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —আপনি বৈপ্লবিক সাধনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে গেলেন কেন? তিনি উত্তর দেন— "পুলিশ যখন ঐ দিকের কাজ করতে দিলে না, আমি অন্য দিকে দেশের কাজ করছি।" সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে খোঁজখবর লইতেন। তাঁহার ভগিনী সুধীরাও বৈপ্লবিক কার্যে অনুরাগী ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি আমাদের সাহায্য করিতেন। সুধীরা রেল দুর্ঘটনায় মারা যান।

দেবব্রতের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু যথার্থ সুযোগ ও সুবিধা না পাওয়ায় উহা যথার্থরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্ভবত ১৯০৪ সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই ছিলেন কেন্দ্র। এক সময়ে পার্টীর দ্বিতীয় পংক্তির নেতৃবৃন্দের খেয়াল হইল, গেরুয়া পরিয়া প্রচারে বাহির হইতে হইবে। দেবব্রত ও তাঁহার ভগিনী সুধীরা অগ্রণী হইলেন। তাঁহারা এইভাবে কটক ও পুরী পর্যন্ত যান। কটকে তাঁহারা ধীরেন চৌধুরীর গৃহে উঠেন এবং তাঁহাকে দলভুক্ত করেন। ক্রমে ধীরেনবাবু কটক শাখার নেতা হন। নব্য ভারতে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধীরেনবাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তখনও যুগান্তর বাহির হয় নাই।

জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাস করিয়া ধ্যান-ধারণার দিকে দেবব্রতের মতি যায় এবং উহারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

দেবব্রত শুধু সুকণ্ঠ ছিলেন না, সঙ্গীত রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একবার রঘুনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি বিপ্লব প্রচার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা যাইতেছিলেন। রাত্রিকাল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহারা গঙ্গার মধ্য দিয়া স্টীমারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই এই সময়ে উল্লসিত। দেবব্রত স্বরচিত গান ধরিলেন :

দে মা আসি।
সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল আর কত স'বে

অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
দে মা আসি।
আদিতে যেরূপে গো মা আর্যভূমে দাঁড়ালি,
দাঁড়া গো মা বাধাবিঘ্ন নাশিতে মা করালী,
নিজ সত্য রাখিবারে ডাকি মা আজ তোরে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
গাণ্ডীব রচেছিলি যে হাতে মা অতীতে
শৃঙ্খল কিঙ্কিণী আজি বাজে গো মা সে হাতে
সন্তানের শিরাতে শোণিত এক বিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
গুরু গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে,
মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে,
কাল-ই ঐ রণ মাঝে নব যুগে নব সাজে
বাজিবে রুধির পূত ভারতে পশি।
দে মা আসি।

গাহিতে গাহিতে দেবব্রতের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেশকে তিনি এরূপ একান্তভাবেই ভালবাসিয়াছিলেন।

দেবব্রতর আর একটি গান বহুল প্রচারিত, কিন্তু অনেকেই জানে না যে, উহা দেবব্রতের রচনা। সম্ভবত উহা অন্য নামেও চলিয়া থাকিবে।

এস কে কেঁদেছ নীরবে ?
মায় মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে ?
নিজের ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মার যাতনা কেবল
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে ?
জান না যে মূঢ় জননী তোমার
পুরাকাল হতে কি শক্তি আধার
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার
নয়নে বিজলী খেলিবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত
মৃত্যু নির্যাতন দৈব বজ্রাঘাত
খণ্ড খণ্ড হয়ে মার মুখ চেয়ে
এসে কে মরিবে মারিবে ?

দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিরূপ নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন, এই সমস্ত সঙ্গীত তাহার প্রমাণ। দেবব্রত বসুর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম প্রিয়ব্রত বসু। তিনি জেজুর গ্রামের উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং নৃসিংহ আড্ডি রোড হইতে জেজুর হাটতলা পর্যন্ত রাস্তা তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় সম্ভব হয়। তাঁহার এক পুত্র পুণ্যব্রত বসু কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সলিসিটর। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রামের সর্ববিধ মঙ্গলকর্মে অগ্রণী হন। দেবব্রত বাবুর ভগ্নীর নাম সুধীরা বসু। তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা প্রসঙ্গে নির্ঝরিণী সরকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

॥ সুধীরা বসু ॥

সুধীরা দিদি তখনকার অগ্নিযুগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ছোট বোন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সিস্‌টার ক্রিশ্চিয়ানা দেবব্রতবাবুর বন্ধুস্থানীয়া ছিলেন, সুধীরা দিদি তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সুধীরা দিদি এত পবিত্র, এমন কোমল-স্বভাবা ও ভালবাসাময় ছিলেন যে, এমন আর আমি কখনও দেখিনি, যাকে শাসন করা দরকার তাকেও তিনি শাসন করতে পারতেন না, তাঁর বয়স তখন খুবই কম ছিল, আমাদের চেয়ে কয়েক বৎসরের মাত্র বড় ছিলেন। তিনি যেন সত্যসত্যই আমাদের বড়বোনের স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর উপর আমাদের ভালবাসা ও মান-অভিমানের অন্ত ছিল না। নিবেদিতার স্মৃতির সঙ্গে সুধীরা দিদির স্মৃতি এমনভাবে জড়িত যে, একজনকে স্মরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে অপরের কথা মনে এসে পড়ে।

নিবেদিতা আসার পর আমাদের স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সকল বিষয়ে সিস্‌টার অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কোন সামান্য দুর্বলতাও সহ্য করতে পরেতেন না, তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে এতটুকু ত্রুটি, অলসতা, ফাঁকি লুকাবার যো নাই, এমন কি সুধীরা দিদি, সিস্‌টার ক্রিশ্চয়ানা পর্যন্ত কেহই তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতেন না। ভাববিলাসিতা সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না, সামান্য এতটুকু জিনিসও তিনি নষ্ট করা পছন্দ করতেন না, সুতা, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি যাতে আমরা এতটুকু নষ্ট না করি সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সুধীরা দিদি একদিন সিস্‌টার ক্রিশ্চিয়ানাকে বলেছিলেন, আমরা সেই সন্ন্যাসিনী, এত ছোট ছোট বিষয়ে আসক্তি থাকা কি ভাল? সিস্‌টার ক্রিশ্চিয়ানা কোনদিন গল্পচ্ছলে এই কথা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে সিস্‌টার বলেছিলেন, এরকম মনোভাবের কখনও প্রশ্রয় দেবে না।

সিস্‌টার নিবেদিতার আসার অল্প দিনের মধ্যেই সিস্‌টার ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকাতে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে সুধীরা দিদির কাছে বিদায় নেওয়ার সময় সুধীরা দিদি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরে সুধীরা দিদি নিবেদিতার ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। একদিন আমাদের কাছে সিস্‌টারের কথা বলতে বলতে নারকেলের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছিলন, উপরের কঠোরতা ভেদ করলে যে কি অসীম স্নেহ পারাবার, সেই অমৃতের আস্বাদন একবার পেলে আর ভোলা যায় না।' পরবর্তী কালে নিবেদিতার সাধনার ধন

বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার সুধীরা দিদিকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। সিস্টারের আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি জীবন সমর্পণ করেছিলেন।

॥ বলদবাঁধ ॥

জেজুর ইউনিয়নের মধ্যে **বলদবাঁধের ঘোষবংশ** একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশে **তারকনাথ ঘোষ** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করায় হেয়ার সাহেব তাঁহাকে তাঁহার বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ কর্তৃক হেয়ার সাহেবের যে তৈলচিত্র স্থাপিত হয় তারকনাথ সেই চিত্রে স্থান পাইয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন ঃ

দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি।
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক রবি॥

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ থাকবস্তার ডেপুটি-কলেক্টরের পদ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারকনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন এবং চতুর্থ পুত্র গোপীনাথ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ কলিকাতায় ঝামাপুকুরে বসবাস করেন।

কৈকালা

হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত কৈকালা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই স্থানের বসু বংশ ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে বহু পণ্ডিতের এই গ্রামে বাস ছিল। স্বর্গীয় **চন্দ্রনাথ বসু** এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কৈকালা তাঁতের জন্য এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বেশ কিছু **তাঁতের কাপড়** এইস্থানে প্রস্তুত হয়। কৈকালায় ইউনিয়ন বোর্ড, পোষ্ট অফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। পূর্বে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে উহা উঠিয়া গিয়াছে। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

॥ চন্দ্রনাথ বসু ॥

চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার আত্মজীবনীতে কৈকালা গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধির বিষয় লিখিয়াছিলেন। নিম্নে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺কাশীনাথ বসু। ধর্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল। পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই। হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম, এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াতাম। স্কুল কলেজের ছুটী হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটী ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম, তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি

সে গ্রামও দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্যজীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।

কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারিশত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই একরকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ, ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্যসুখে কেহই বঞ্চিত ছিল না। কৈকালার মিহি মোটা বিস্তর কাপড় বয়ন হইত—সে বস্ত্রের বড় আদর ছিল, খুব নাম ছিল, খুব কাট্‌তি ছিল। কৈকালায় প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল। কৈকালা গ্রামে কুড়ি-পঁচিশখানা পূজা হইত। কিন্তু কৈকালা আজ ম্যালিরিয়ায় প্রায় জনশূন্য। গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন চলিয়া গিয়াছে গ্রামে গৃহ অতি অল্পই আছে। তন্তুবায় দুই-দশজন মাত্র আছে তাহারা এখনও কাপড় বুনিতেছে। হাওড়ার হাটে তাহাদের কাপড়ের আদর এখনও আছে। কিন্তু দুই দশজন বই নয়, তাও ম্যালিরিয়ায় মৃতবৎ; কয়খানা কাপড়ই বা তাহারা বুনিবে, কয়টা টাকাই বা পাইবে, সমস্ত গ্রামে এখন একখানি মাত্র পূজা হয়—তাহাতেও ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কুড়ি পঁচিশটির অধিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। বাগ্দী দুলে সব মরিয়া গিয়াছে—তারকেশ্বর রেলরাস্তা নির্মাণার্থ অন্য স্থান হইতে আনীত কুলীমজুর কোল সাঁওতাল তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্য শূকরাদি হিংস্র জন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালিরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোনার কৈকালায় যাই নাই।

সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪৫৭ পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কৈকালায় তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ৫নং রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্রদের নাম হরনাথ বসু ও প্রকাশনাথ বসু।

তাঁহার অন্যতম পৌত্র মহেন্দ্রনাথ বসু দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার "কান্তিক প্রেস" ক্রয় করেন। এই প্রেস হইতে এক সময় বহু পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত। মহেন্দ্রবাবুর সহায়তায় বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের পুস্তকাদি প্রকাশ করেন।

কৈকালার বসুবংশে প্রিয়নাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসার দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং "মেডল্যান্ড বসু এন্ড কোং" নামক অফিস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন এবং বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি গ্রামে করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র যতীন্দ্রনাথ বসু পিতার অফিস যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনিও স্বগ্রাম কৈকালার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অজিতকুমার বর্তমানে তাঁহাদের পৈত্রিক ব্যবসাদি পরিচালনা করেন।

॥ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্ত্তি ॥

কৈকালা হইতে একটি দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্ত্তি ১৩৬৮ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার আলোকচিত্র গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। মূর্তিটি আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের সহিত দাক্ষিণাত্যের যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, এবং সে যোগাযোগ যে বাঙালীর ধর্মীয় চিন্তাধারার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহার একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রমাণটি হইল পাল-যুগের একটি শিল্পশ্রীমণ্ডিত মূর্তি—দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু দত্তাত্রেয়। হরিপাল থানার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন নদী (বর্তমানে খাল) কৌশিকীর তীরে কৈকালা গ্রাম হইতে সম্প্রতি ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের গবেষক শ্রীমৃণালকান্তি পাল।

দুই ফুট ১০ ইঞ্চি উঁচু ও ১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া এই মূর্তির দুইপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিচিত্র দেহভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা। উপরে পশ্চাদপটে ক্ষোদিত আছে ব্রহ্মা ও শিবের দুইটি ক্ষুদ্রাকার উপবিষ্ট মূর্তি। সমগ্র মূর্তিটির কমনীয় শিল্পশৈলী, অগ্নিশিখার মতো ক্রমসূচ্যগ্র পশ্চাদপট এবং মণ্ডনশিল্পের আধিক্য। ইহার তারিখ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ইঙ্গিত করে।

এই প্রথম বাংলাদেশের ধর্মসাধনায় ত্রিমূর্তি কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল। এ পর্যন্ত যে অগণিত বিষ্ণুমূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিতেই বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি একসঙ্গে নাই। এই দিক দিয়া কৈকালার মূর্তিটি অনন্যসাধারণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিমূর্তি কল্পনা (দত্তাত্রেয় রূপ) প্রধানতঃ দক্ষিণ-ভারতেরই বিশেষত্ব। পশ্চিম-ভারতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার বাহিরে বাদামী, হালেবিড ও আজমীড়ে দত্তাত্রেয় মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মধ্য-ভারতের কলচুরিদের মধ্যেওএই রূপকল্পনা প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতেই এই ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়।

দত্তাত্রেয় বিষ্ণুরই এক অবতার। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ কৌশিক ঋষি অনিমাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নীর প্রচেষ্টায় বিপদোত্তীর্ণ হন। পুণ্যবতী নারী কৌশিকী দেবতাগণের নিকট বর লাভ করেন যে, ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার গর্ভে জন্মলাভ করিবেন এবং দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হইবেন। দত্তাত্রেয় মূর্তিতে তিনজনকেই একসঙ্গে দেখানো হয়। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিশেষ বিশেষ দেবতাকে ছোট বা বড় করিয়া দেখান হইয়া থাকে। কৈকালার দত্তাত্রেয় মূর্তিতেও যে এইরূপ ঘটিয়াছিল (এখানে বিষ্ণুকে বড় করা হইয়াছে) তাহা অনুমান করা যায়, এবং কৌশিকী নদীর নামের সহিত পুরাণোক্ত কাহিনীর যে সংযোগ আছে তাহা সুনিশ্চিত।

আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রী ডি পি ঘোষ মনে করেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলী অঞ্চলে দত্তাত্রেয় পূজার বহুল প্রচলন হইয়াছিল এবং কৈকালা গ্রামে একটি দত্তাত্রেয় মন্দির থাকাও অসম্ভব নহে। মূর্তিটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নূতন দিকের সূচনা করিতেছে। কৌশিকী উপত্যকার অনুসন্ধান কার্য চালাইলে এক প্রাচীন আবাসভূমির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ইহা সংগ্রহ করিতে স্থানীয় শিক্ষক শ্রীঅজিতকুমার সরকার বিশেষ সাহায্য করেন।

কৈকালা-রাধানগর কানানদী রাস্তা ॥ হরিপাল তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালি থানার মধ্য দিয়া "কৈকালা-রাধানগর-কানানদী রোড" নামক যে ১০ মাইল রাস্তাটি গিয়াছে, তাহা বহু দিন হইতে অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। উক্ত রাস্তাটি দুই পাকা রাস্তাকে যোগ করিয়াছে—উত্তরে চুঁচুড়া তারকেশ্বর পাকা রাস্তার কানানদী গ্রামে এবং দক্ষিণে বৈদ্যবাটী তারকেশ্বর পাকা রাস্তার কৈকালা গ্রামে। উক্ত রাস্তাটি পাকা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন কেননা প্রায় ৩০।৪০ খানি গ্রাম উক্ত রাস্তার উপর নির্ভরশীল। ইহার পার্শ্বে চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে—মহেশপুর, চাঁদপুর, ধামাইটিকর এবং সালালপুর এবং একটি জুনিয়র হাই স্কুল আছে। রাস্তাটি চাষীপ্রধান গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেইজন্য চাষের মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইলে গরুরগাড়ী করিয়া উত্তরে কানানদী এবং দক্ষিণে কৈকালা আসিতে হয়। এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ বহু লোককে যাতায়াত করিতে হয়। রাস্তাটিকে ফীডার রোড বলা চলে। অবিলম্বে যাহাতে কৈকালা হইতে রাধানগর পর্যন্ত রাস্তাটি (৩ মাইল) (পূর্বতন লোকাল বোর্ডের রাস্তা) পাকা হয়, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।

॥ কলাছড়া ॥

জেজুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। সুলতান গাছার জমিদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে পূর্বে এই গ্রামের নাম 'মধুয়াবাটী' ছিল, পরে ইহা শুভিপুর বলিয়া খ্যাত হয়। বর্তমানে ইহা কলাছড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের রজব আলী সরকার ১২৭৬ সালে মেডিক্যাল কলেজের যাবতীয় কন্ট্রাক্ট লইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার পুত্র মৌলভী আবদুল গণি সরকার ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া দেন। গ্রামের উন্নতিকল্পে পুষ্করিণী খনন, তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। কলাছড়ায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৩২৮ জন।

॥ পানসেওলা ॥

জেজুর ইউনিয়নের মধ্যে পানসেওলা পূর্বে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। হরিপাল স্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে বসু, মিত্র ও সিংহরায় বংশের বহু প্রাচীন কীর্তি আজও বিদ্যমান আছে। মিত্রবংশে টেঁকচাঁদ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের জন্ম হয়। টেঁকচাঁদ ঠাকুরের আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস **"আলালের ঘরের দুলাল"** রচনা করেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বেথুন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক থিওজফিক্যাল সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **কিশোরীচাঁদ মিত্র** তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং

তাঁহার চেষ্টায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

॥ সারদাচরণ মিত্র ॥

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজের পদপ্রাপ্ত হন। বিচারাসনে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং হরিপাল গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যও তাঁহার উদ্যম স্মরণযোগ্য। গ্রামে তাঁহার বিরাট ভবন এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্তকুমার মিত্র আইনজীবী হইলেও জেজুর ইউনিয়ন বোর্ডের বহু বৎসর সভাপতি থাকিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শরৎকুমার কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাডভোকেট ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সারদাচরণ কলিকাতায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন বর্তমানে উহা "সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউসন" নামে পরিচিত। সারদাচরণের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বৈদ্যবাটীতে "সারদাচরণ মিউজিয়ম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পানসেওলা গ্রামে প্রাচীনকালে বহু মন্দিরাদি ছিল। এখনও ভগ্নাবস্থায় কয়েকটি বর্তমান আছে। বসুবংশের শিবমন্দির ও কালীমন্দির এবং সিংহরায় বংশের ছয়টি শিব-মন্দির তাঁহাদের বংশের পূর্ব স্মৃতির এখনও পরিচয় দিতেছে। বসুবংশের প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার ভগ্নাবস্থা দেখিলে মনে দুঃখ হয়। এই গ্রামের ঘোষাল বংশের অম্বিকাচরণ ঘোষালের স্মরণার্থে তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাটের নিকট ১৩২৫ সালে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন।

পানসেওলার নিকট বাসুদেবপুর গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। সন্তানাদি হইয়া যাহাদের বাঁচে না, তাহারা এই দেবতার নিকট মানত করিবার জন্য সমাগত হন ও ঔষধ লইয়া যান। বাসুদেবপুরে পোষ্ট অফিস আছে। গ্রামের জনসংখ্যা ৭০৩ জন। হুগলী জেলার বহুস্থানে পঞ্চানন প্রতিপত্তিশালী গ্রাম্য দেবতারূপে পুজিত হন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গ্রাম-দেবতা কেন যে অন্তর্ধান করিলেন তাহা অনু-সন্ধানের যোগ্য। এই সকল দেবতা এক সময় বাঙ্গালী সংস্কৃতির উৎস ছিল। ইঁহাদের উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রসারের ধারাবাহিক কাহিনী যতদিন না রচিত হইবে ততদিন বঙ্গ সংস্কৃতির বহু মূল্যবান ঐশ্বর্য ও উপকরণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে। পঞ্চাননের ধ্যান ঃ

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং
পদ্মাসনস্থং দ্বিভুজং নানালঙ্কারভূষিতম্
প্রলম্ব বাহুসুবলং পট্টযজ্ঞোপবীতকং
শিরে পিঙ্গ জটাভারং শিশুগ্রীবারিমর্দনং
বামহস্তে শিশু ধরং দক্ষ হস্তে ত্রিশূলকং

গো মৃগবাহনম্ চৈব বেষ্টিতং মণিমণ্ডলং
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা চ শোভিতং রক্ত লোচনং
উগ্র তেজোময়ং রুদ্রং ব্রহ্মাষ্টিং চ তপস্বীনং
ধ্যায়েৎ পঞ্চাননং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্।

॥ ইলিপুর ॥

ইলিপুর গ্রাম হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখন ইহা একটি নগণ্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামের নামে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি বিদ্যালয় আছে। পূর্বে এই অঞ্চলে খুব নীলের চাষ হইত। এখানে ধান, পাট, আলু ও অন্যান্য শাক-সব্জী এখন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে এই স্থানের অনেক গ্রাম উজাড় হইয়া যায় এবং সেই জন্য বহুলোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইলিপুর গ্রামের জনসংখ্যা ৯৫৩ জন।

বর্তমানে ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিতে ইলিপুর গ্রাম একটি দ্বীপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ৮।৯ বৎসর পূর্বে জমিতে সেচের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই গ্রামের উত্তর ও পূর্বপার্শ্ব দিয়া ডি ভি সি-র যে খাল খনন করা হইয়াছিল, উহা নাকি দূরবর্তী গ্রামের মাঠে জল সরবরাহের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হইতেছে। তজ্জন্য ইলিপুর গ্রামের পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া নাকি নূতন খাল খনন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জমি দখলের জন্য হুগলী জেলা সমাহর্তা উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছেন। নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী (১১ই জুন ১৯৬৩) নূতন খালের জন্য জমির দখল লওয়া হইয়াছে। অনুপযোগী খালটি যথারীতি বজায় থাকিবে। চাষীরা উহা বুঝাইয়া চাষের জমিতে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহার ফলে এই গ্রামের অনেক চাষীর প্রায় ভূমিহীন কৃষি মজুরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

বসতিহীন গ্রাম॥ হরিপাল থানার মধ্যে দুইটি বসতিহীন গ্রাম আছে। একটি গ্রাম বাসুড়ি ও দ্বীপার মধ্যস্থলে অবস্থিত **ভূপতিপুর** আর একটি নালিকুলের নিকট শ্রীপতিপুরের পার্শ্বে **কুমিরগাড়ি** গ্রাম। জনশ্রুতি একসময়ে এই দুইটি গ্রামে মড়ক লাগিয়া সমস্ত লোক মরিয়া যায় বলিয়া ভয়ে কেহ আর এই গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করে নাই।

হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
জেজুর	১০,২৩৮	৫,১৮৩	৫,০৫৫
ফরিদপুর	৭,৭২১	৩,৮৮৩	৩,৮৩৮
বন্দীপুর	১০,৬৭৫	৫,৪৬৯	৫,২০৬
কৈকালা	৮,৩৬৫	৪,৩৭৫	৩,৯৯০
দ্বারহাট্টা-গোপীনাথপুর	১১,৭৩৯	৫,৯১৩	৫,৮২৬
হরিপাল	১২,৮৪১	৬,৫৯২	৬,২৪৯
নালিকুল	১১,৮৯১	৬,০০৩	৫,৫৮[illegible]
ইলিপুর	৯,৬৯৮	৪,৯২৮	৪,৭৭০

॥ অতুল্য ঘোষ ॥

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা স্বনামধন্য অতুল্য ঘোষ হুগলী জেলার জেজুরের ঘোষ বংশ সম্ভূত। পিতার নাম কার্তিকচন্দ্র ঘোষ। পিতামহ গোপালচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার আদি স্টিভেডোরদের মধ্যে অন্যতম। ব্যবসায়ে তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, তেমনি দান-ধ্যান করিয়া যশস্বী হন। দোল, দুর্গোৎসব, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে ঘোষ বংশে ভুরিভোজনের কথা আজও তাই গ্রামে গল্পচ্ছলে লোকে বলিয়া থাকে। অতুল্যবাবুর মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাঁহার নিকট হইতে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকটি পাইয়াছেন। অতুল্য ঘোষের পরিচালনায় শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত পত্র, নির্মোক ও নির্ণয় নামক সাময়িক পত্র এক সময় হুগলীতে খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কংগ্রেসের মুখপত্র দৈনিক জনসেবক পত্রেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

অসহযোগ আন্দোলনে অতুল্য ঘোষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও বিভিন্ন সময়ে দশ বৎসরের অধিক কাল কারাগৃহে বাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিলেও জেলে থাকাকালীন তিনি ইতিহাস অর্থনীতি, সমাজনীতি বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি পাঠ করেন এবং রাজনীতিতে তাঁহারে সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানের জন্য স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের কর্ণধার হন। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বহু কার্য করিয়া সমগ্র ভারতে কগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ও সাংগঠনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সহিত তিনি পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করেন বলিয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি নির্বাচিত হন। কল্যাণী কংগ্রেসেও তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বর্ধমান হইতে অতুল্য ঘোষ মহাশয় ভারতীয় পার্লামেন্টেরও সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি সর্বসাধারণের কাছে 'অতুল্য-দা' বলিয়া খ্যাত। গান্ধীজীর তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ধর্ম সম্বন্ধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী। তাঁহার 'অহিংসা ও গান্ধী' ও 'নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি পত্র শ্রীসুকুমার দত্ত 'পত্রালী' নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন।

ভারতের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাঁহার ধীশক্তি ও কার্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। বাল্যে যাত্রা, থিয়েটার ও কীর্তনের প্রতি তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা সহকারে দেশমাতৃকার সেবার জন্য তিনি প্রশংসা খ্যাতি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এত অধিক অর্থ সাধারণের নিকট হইতে কখনও সংগৃহীত হয় নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাদের কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

তারকেশ্বর থানার সার্ভে-ম্যাপ

[১৯৩০-৩৩]

॥ তারকেশ্বর ॥

তারকেশ্বর শৈব-তীর্থ বলিয়া বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র পুণ্যস্থান; চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত ২২° ৫৩' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ২' পূর্বে অবস্থিত। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭/৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতেও তারকেশ্বরের কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; রেনেলের ১৭৭৯—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তবে ১৮৩০—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গদেশের যে জরীপ করাইয়াছিলেন, তাহাতে **'তারেশ্বর'** নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে। উহাই আধুনিক **দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ তারকেশ্বর।** মঠ প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট না হইলেও, উত্তর ভারতের শৈবসম্প্রদায় প্রধানতঃ দশনামী শৈবগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার অধিনায়ক হন মোহান্ত। 'মোহ' যাঁদের 'অন্ত' হইয়াছে—তাঁরাই মোহান্ত অথবা সংস্কৃত 'মহৎ' এই মূল শব্দ হইতেও মোহান্ত কথাটি আসিতে পারে। উত্তরভারতে যেমন মোহান্ত দক্ষিণভারতে তেমনি ইঁহারা মঠাধিপ, মঠাধিশ, আচার্য বলিয়া পরিচিত। এই দশনামী শৈবমঠ বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান নয়। ইহা অবাঙ্গালীদের আরোপিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত "তারকেশ্বর বন্দনা" পুঁথিতেও তারেশ্বরের নাম উল্লিখিত আছে দেখা যায়।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈন মত খণ্ডন করিবার জন্য পরিভ্রমণ করেন এবং বেদান্ত প্রচারের জন্য শৃঙ্গগিরিতে 'শৃঙ্গগিরি মঠ', দ্বারকায় 'সারদা মঠ', শ্রীক্ষেত্রে 'গোবর্ধন মঠ' এবং বদরিকাশ্রমে 'যোশী মঠ' স্থাপন করেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যবর্গ তাঁহার আদেশে ভারতের সর্বত্র পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করিয়া শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারের জন্য নানা স্থানে প্রবর্তিত করেন. শঙ্করাচার্যের প্রধান চারজন শিষ্য পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর ও তোটক। এই চারজন মঠাচার্যের দশজন শিষ্য হইতে পরবর্তীকালে দশনামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই দশটির নাম তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই দশটি নামের তাৎপর্য আছে এবং শঙ্করাচার্যের সময় তাঁহার উদার ভাবের জন্য দশনামীরা সম্প্রদায়বিভক্ত হন নাই। জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাসাশ্রমকে কলুষিত করিয়া ফেলে। কৌতূহলী পাঠক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত ***"The Throne Transcendental Wisdom" By K. R. Venkataraman.*** গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানিতে পারিবেন।

শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে উপনিষদসমুদ্র মন্থন করিয়া জীবকে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সন্ধান দেন। তাঁহার বাণী ঃ হে জীব, যাহা দ্বৈত তাহা দুঃখ, তুমি অদ্বৈত ব্রহ্ম, তুমি অমৃতের সন্তান—তোমার ব্যাধি নাই, তোমার মরণ নাই, তোমার জরা নাই—তুমি ও পরমাত্মা অভিন্ন। তুমি সৎ—তুমি চিরকাল আছ, চিরকাল থাকিবে, তোমার অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হইবে

না। তুমি চিৎ—তুমি জড় নহ, তুমি চৈতন্যময়, চৈতন্যই তোমার স্বরূপ। তুমি আনন্দ—তোমার দুঃখ নাই, তুমি সুখময়, সুখপ্রচুরতা তোমার কখনও ব্যাহত হওয়ার নহে।

মহালিঙ্গার্চন গ্রন্থে বঙ্গদেশের শৈবতীর্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ
বীরভুমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকরো নদীতটে॥
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যানেশ্বর এবহি।
নকুলেশ্বরঃ কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী হুগলী-বর্ধমানের সংযোগস্থলে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন; তাঁল্লখিত চণ্ডীকাব্যে বঙ্গদেশের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, এমন কি দামুন্যায় চক্রাদিত্য শিবের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তারকেশ্বরের বিষয় উক্ত চণ্ডীতে কোন উল্লেখ নাই। তাই পণ্ডিতগণ কালীঘাটের নকুলেশ্বরের ন্যায় তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বর প্রকটিত না হইলেও উক্ত স্থানেই তিনি ছিলেন, কিন্তু স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া উহা সর্বসাধারণের অগোচরে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে নাথধর্ম্ম নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আজ প্রায় অবলুপ্ত। তারকনাথ নামটিতে 'নাথ' থাকা সত্ত্বেও ইহা শিবের সাধারণ নাম নয়। তারকনাথের পার্শ্বেই লোকনাথ আছেন। অদূরে মহানাদে জটেশ্বরনাথ। সুতরাং 'নাথ'যুক্ত দেবতাগণ মূলত নাথদের, না জৈনদের, না বৌদ্ধদের দেবতার অবশেষের অস্তিত্ব তাহা আজ আর ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। বাঙ্গলার বাহিরেও বিশ্বেশ্বর 'বিশ্বনাথ' এবং রামেশ্বর 'রামনাথ' বলিয়া কথিত হন।

॥ রাজা বিষ্ণুদাস ॥

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জেলা জৌনপুরের ডোভী পরগণার গোমতী তীরস্থ হরিহরপুর নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ভুস্বামী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকারপূর্বক প্রায় পাঁচশত অনুচর ও কান্যকুব্জ হইতে একশত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের নিকট রামনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তর লোকজন অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া স্থানীয় হরিপালের অধিবাসীবৃন্দ উহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া বিশেষ ভয় পায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবাব সমক্ষে রাজা বিষ্ণুদাস সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার কথা যে সত্য, তাহা দিব্য প্রমাণার্থে তৎকালীন প্রথামত হস্তমধ্যে জ্বলন্ত লোহ শাবল ধারণপূর্বক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশে বাসের অনুমতি প্রদান করেন এবং বর্তমান তারকেশ্বরের তিন মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে বসবাসের জন্য প্রায় দে[illegible] হাজার বিঘা জমি প্রদান করেন। ইহা ১৭১০-১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

এই সম্বন্ধে "লিস্ট অফ অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল" গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

The supremacy of the Mahomedans, who invaded having deprived his residence of safety and comfort the Raja came away and took up his abode in a jungle two miles from Tarakeswar, the side of village Ramnagar or Balagar in Thana Haripal. 500 peoples of his own caste and 100 Brahmins of Kanuj came and settled with him but the inhabitants of the neighbourhood who suspected them of being robbers informed the Nawab of Bengal at Murshidadad of the arrival of person in the locality ; they were sent for and the Raja presented himself before the Nawab and declared that they were perfectly harmless people who wanted only some land to settle. The tradition says that as a proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least. His success in thus passing through the ordeal of fire not only led to his acquital but also procured for him from the Nawab a grant of 500 bighas of land in Bahirgora.

রাজা বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাজা বিষ্ণুদাসের স্বদেশে (নবাব সাদৎ আলির) মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া বঙ্গদেশে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বাস করিবার কারণ কি? এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিংহ-রায় মহাশয়ের অভিমত যে, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত সংঘর্ষের জন্যই রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন। আমরাও তাঁহার অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান হরিনাথ রায়ের সহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্মার্থ সংক্ষেপে এই ঃ

অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেনারস প্রভৃতি বিরানব্বইটি পরগণা তাঁহার বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাহার উপর অর্পণ করেন। রোস্তম আলী অলস ও রাজকার্যে অপটু ছিলেন বলিয়া, নবাব তাহাকে অপসৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারাম সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।* তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করাইয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের অধীনতা অস্বীকারপূর্বক স্বাধীন হইলেন এবং তাহার রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কাশীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিলেন। অতঃপর রাজা বলবন্ত সিংহ স্থানীয় সর্দারগণকে স্ববশে আনিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে ডোভী পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় এবং কথিত আছে যে, হিয়াতী সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে নিহত করেন এবং তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজা বলবন্ত সিংহের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু ডোভীর রঘুবংশীয়দের পরাজিত করিতে না পারিয়া তিনি পানীয় জলের কূপমধ্যে বিষ দিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন এবং হরিপালের নিকটবর্তী রামনগরে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ডোভী রেলওয়ে স্টেশন হইতে হরিহরপুর গ্রাম মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং অদ্যাপি হরিহরপুরে 'সতীকূপ' রহিয়াছে; রাজা বিষ্ণুদাসের জ্ঞাতিগণ বিবাহকালে উক্ত কূপের তটে ভোজন করিয়া অতীতে যাহারা বিষমিশ্রিত জল

* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মল্লিখিত তীর্থ-সপ্তক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

পান করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করে এবং বর্তমানে এইরূপ ভোজন তাহাদের বিবাহের কুলাচাররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

॥ ভারামল্ল ॥

যাহা হউক রাজা বিষ্ণুদাস রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভারমল্ল নামে এক সংসার ত্যাগী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি জঙ্গলে যোগ সাধনা করিতেন। রাজার গড়ে-ভাটা গ্রামের মুকুন্দরাম ঘোষ নামক একজন গো-রক্ষক ছিল এবং রাজবাটীর যাবতীয় গাভীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কয়েকটি গাভী গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শিলাস্তম্ভের উপর তাহাদের বাঁট হইতে দুগ্ধ শূন্য করিয়া ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দরাম গাভীদিগের শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ দেওয়ার বিষয় রাজার ভ্রাতা ভারামল্লকে জ্ঞাপন করিলে, তিনিও উক্ত স্থানে যাইয়া গাভীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিতে পান যে, এক শিলার মস্তকে গাভিগণ বাঁটের দুধ ঢালিয়া দিতেছে। সরকারী গ্রন্থে এবং তারকনাথ মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ্য:

It is said that while temporarily residing in the woods of Tarakeswar, then known by the name of Jote Savaram, he observed that several kine entered deep into the jungle with udders full of milk but returned with empty ones. Anxious to discover the same, one day followed a kine and saw it discharging its milk at a stone having a hole on the surface. (List of Ancient Monuments in Bengal)

একদা কপিলা যায় চরিবারে বন।
তার পিছে পিছে করে মুকুন্দ গমন॥
কপিলা ক্রমেতে যায় বনের ভিতর।
ধীরে ধীরে উপনীত যেখানে পাথর॥
আড়ালে মুকুন্দ থাকি করে দরশন।
পাথরের কাছে করে কপিলা গমন॥
বাঁট হৈতে দুগ্ধ ধারা পাথর উপরে।
কপিলা ফেলিছে তাহা অনগলি ধারে॥
বুঝিল মুকুন্দ ইহা, পাথর ত নয়।
নিশ্চয় অনাদি লিঙ্গ শিব দয়াময়॥

দেবাদিদেব তারকনাথ-শিব সয়ম্ভুলিঙ্গ। অবিভক্ত বাঙ্গলায়, একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের ন্যায় শৈবতীর্থ আর নাই। বর্তমান মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত পূর্বে উহা গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। উহার চতুর্দিকের নিম্নভূমি নল ও খাগড়ায় পূর্ণ ছিল এবং উচ্চ ভূভাগ সিংহল দ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। এই দ্বীপের অরণ্য মধ্যে পাষাণময় দেবাদিদেব তারকনাথ বিরাজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ এই শিবলিঙ্গকে সামান্য পাথর জ্ঞানে উহার উপর ধান ঝাড়িত। বহু বৎসর যাবত এইরূপ ধান ভানিবার জন্য শিবলিঙ্গের উপরে একটি গর্ত্ত হইয়া যায়। এই গর্ত্ত আজও তারকনাথের মাথায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বর-বন্দনায় উক্ত আছে:

চৌদিকে জঙ্গল জলা গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি রম্য বন॥

তারকেশ্বরের মন্দির

ভারামল্ল রাজা বিষ্ণুদাসকে উক্ত শিলার সম্বন্ধে বলিলে তিনি রামনগরে উহাকে তুলিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করেন এবং একদিন পঞ্চাশ হাত খনন করিয়া উহার মূল প্রাপ্ত না হওয়ায় খননকার্য পরদিনের জন্য স্থগিত থাকে। সেই রাত্রে রাজা ভারামল্ল স্বপ্নে দেখিলেন যে, তারকনাথ যেন তাহাকে বলিতেছেন যে, আমি তারকেশ্বর শিব, কেহ আমাকে তুলিতে পারিবে না; কারণ গয়া গঙ্গা কাশী পর্যন্ত আমার প্রসার আছে। তুমি আমায় তুলিবার চেষ্টা করিও না, বরং এই স্থানেই আমার মন্দির তারকেশ্বরের মন্দির বলিয়া নির্মাণ করিয়া দাও॥ অতঃপর উভয় ভ্রাতা তারকেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন, পরবর্তীকালে মন্দির ভগ্ন হইলে বর্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করিয়া দেন।

এই সম্বন্ধে সহদেব গোস্বামী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখিয়াছেনঃ

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি॥
অকারণ দুঃখ পায়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়॥

ভারামল্ল দেবতার সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি অর্পণ করেন এবং মুকুন্দরাম ঘোষের উপর যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত হয়। মায়াগিরি তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত; অনেকে ভারামল্লকে প্রথম মোহান্ত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে যোগ সাধনা করিতেন বলিয়া মুকুন্দের উপর দেবসেবা এবং মন্দির পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মুকুন্দরাম ইহার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভৌতিক দেহ মন্দিরের পূর্বদিকে সমাহিত করা হয়। মুকুন্দ ঘোষ হইতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ এবং মুকুন্দ ঘোষই তাঁহার প্রথম সেবক। ভারামল্লের জীবদ্দশাতেই মুকুন্দ গতায়ু হন এবং নূতন মোহান্ত তাঁহার নির্দেশানুসারে নিযুক্ত হন॥ ভারামল্ল প্রথম মোহান্ত হইলে, মুকুন্দের দেহরক্ষার পর তিনিই মোহান্ত থাকিতেন; নূতন মোহান্তের কোন প্রয়োজন হইত না। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেনঃ

Vishnu Das had a brother who having given up all worldy things, wandered about as a beggar near Vishnu Das's Palace.

তারকেশ্বরের আবির্ভাব সংবাদ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হইল এবং বঙ্গের নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ জোত-সভারাম নামক স্থানে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত এবং শতসহস্র নরনারী এই স্থানে 'হত্যা' দিয়া দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বঙ্গবাসী ইহার নামে ভীত হইয়া থাকেন। প্রাচীনকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং যাত্রিগণকে বৈদ্যবাটী হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইত বলিয়া

বৈদ্যবাটীতে একটি বাংলো নির্মিত হয় এবং ইহাই বঙ্গের অন্যতম প্রাচীনতম বাংলো। কলিকাতা হইতে তারকেশ্বরের দূরত্ব মাত্র ছত্রিশ মাইল; এই পথ হাঁটিয়া যাইবার সময় বহু যাত্রী পূর্বে দুর্দান্ত দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত নূতন রেলপথ স্বর্গীয় নীলকমল মিত্রের চেষ্টায় নির্মিত হওয়ায় যাত্রিগণের দুঃখের লাঘব হইয়াছে। ১০৮৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিষয় লেখা হইয়াছে।

বাবা তারকনাথের নিকট বিভিন্ন কামনায় 'ধর্ণা' দিয়া ভক্তগণ সিদ্ধিলাভ করেন তাহার অসংখ্য বিবরণ তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত 'পুণ্যভূমি' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তারকেশ্বরের অর্ধমাইল দূরে ভঞ্জিপুর গ্রামে তারকেশ্বর মঠের অন্তর্ভুক্ত কালীমাতার একটি মন্দির আছে। বাবা তারকনাথ অনেক সময় ভক্তগণকে অভিপ্রেত ফললাভের জন্য এই কালী মন্দিরে পাঠাইয়া দেন বলিয়া শুনা যায়।

তারকেশ্বরের দুঃসাধ্য রোগীর আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে:

As time went on the temple fell into decay and over it the present one was built at the expense of the Burdwan Raja. People of all classes excepting the Mahomedans have from the very earliest days of the temple resorted to it for the cure of their diseases and lay prostrate before the devine image with a view to die of starvation at his feet if no remedy is suggested to them.

তারকেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে "দুধপুকুরে" যে যাহা মনে করিয়া স্নান করিবে, তাহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া খ্যাত। মুকুন্দের মৃত্যুর পর জগন্নাথ গিরি তারকেশ্বরের দেবসেবক পদে নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, রামনগরে অনাদি লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। চন্দ্রনাথও শৈবতীর্থ, তথায় যাইবার পূর্বে তিনি এই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবসেবক পদে নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে তাহাকে তারকেশ্বরে থাকিতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধের কথামত তিনি এই স্থানে থাকিয়া যান এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় মুকুন্দরাম দেহরক্ষা করেন। অতঃপর ভারামল্লের নির্দেশানুযায়ী তিনি দেব সেবক নিযুক্ত হন। তিনিই তারকেশ্বরে মোহান্তদের পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম পূজার প্রবর্তন করেন। তারকনাথের মন্দিরের নিকটেই অপর একটি মন্দিরে চতুর্ভুজা কালী বিরাজিতা আছেন। এই কালী মন্দিরের উঠানের পশ্চিম দিকে কয়েকজন পূর্বতন মোহান্তের সমাধি আছে। তারকনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ, নাটমন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় প্রত্যহ বহু নরনারী 'ধর্ণা' দেন।

হুগলী জেলার শেয়াখালার অন্তর্গত পাতুল-সন্ধিপুর নিবাসী গোবর্ধন রক্ষিত বর্তমান তারকেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। বর্ধমানের মহারাজা নির্মিত মন্দির ছোট বলিয়া যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইত; গোবর্ধন রক্ষিত ছোট মন্দিরের উপর বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দুইটি মন্দিরই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমানের মহারাজার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে চিন্তামণি দে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির নির্মাণ

করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেন 'সিদ্ধপুকুরের' ঘাট বাঁধাইয়া দেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত চিন্তামণি দে, তারকেশ্বরের বাজার এবং রাস্তাঘাট পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। বর্তমানে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি ধর্মশালা তারকেশ্বরে নির্মাণ করিয়াছেন। গোবর্ধন রক্ষিতের বিষয় ১১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বলাগড়ের রাজা স্বাধীন ছিলেন; কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত করেন। এই সম্বন্ধে পেটারসন সাহেব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন :

He (Kirti Chandra Rai) also seized the estates of the Raja at Balagar situated near the celebrated Shrine of Tarakeswar in Hooghly. (Burdwan District Gazetteer By J. C. K. Paterson.)

রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত তারকেশ্বরের সেবার জন্য ছাড়পত্রটি তারকেশ্বরের মোহান্তের প্রসিদ্ধ মামলার পেপার-বুক হইতে শ্রীজহরলাল বসু, তাঁহার "বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে" প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ছাড়পত্রটি এই :

"শ্রীশ্রীরাম"

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রীতারকেশ্বর ঠাকুর চরণ যুগলেষু—

দেবদত্ত জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোংশমস, ভঞ্জপুর, জমি শালিশুনা হর্দ্দা মহদুদ দোড় জাত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে— সেবাং শ্রীযুট মায়াগিরি ধুম্রপান মোহস্তীকে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রীসেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি। ইতি সন ৭৮৫ সাল, ১০ই চৈত্র।

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়"

রাজা ভারামল্ল প্রদত্ত মঠের যে দানপত্র পাওয়া যায় এবং তারকেশ্বর মোহান্তের মামলার সময় যাহা আদালতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার 'সন ৭৮৫' তারিখটি যে জাল তারিখ তাহা কোর্টে প্রমাণিত হয়। আসল তারিখ "সম্বত ১৭৮৫" "১" অক্ষরটি তুলিয়া দিয়া সম্বতকে সন করা হয় বলিয়া কোর্টে প্রমাণ হয়। সুতরাং ১৭৮৫ সম্বত বা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে **তারকেশ্বরের মঠ** প্রতিষ্ঠিত হয়। মায়াগিরির পূর্বেও যে তারকেশ্বরের কথা জনসাধারণ জানিত তাহা সুনিশ্চিত। মন্দিরে একটি পাথরে **'শকাব্দ ১৫৪৩'** লেখা আছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন : "ভারামল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুদাসই প্রথম বালিগড়ি পরগণার জমিদার ছিলেন, তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজা বিষ্ণুদাসের অভ্যুদয়কালে খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পড়ে। বিষ্ণুদাসকে কিছুতেই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরে টানিয়া আনা যায় না। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, 'তারকেশ্বরের প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি রাজা বিষ্ণুদাস প্রদত্ত নহে, তাঁহার ভ্রাতা ভারামল্ল প্রদত্ত। অনুমান হয়, রাজা বিষ্ণুদাসের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসিভক্ত ভারামল্ল কিছুকাল জমিদার ছিলেন এবং সেই সময়েই 'তারকেশ্বর মায়াগিরিকে প্রদত্ত করিয়াছিলেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাসের 'শিবায়ণ' কাব্যে তারকেশ্বরের

নাম আছে। এর অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে দীনেশবাবু বলেন: "ভুরশীটের রাজা নরনারায়ণ রায় কবির প্রপৌত্র বাসুদেব রায়কে মহত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেক্টরীর ৪৩০৫৮নং তায়দাদ)। উক্ত বাসুদেব ১১৫৯ সালে জীবিত ছিলেন না। অপরদিকে রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২—১১১৮ সাল। সুতরাং বাসুদেবের প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের প্রথম অভ্যুদয়কাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পরে যাইবে না। কবির বাসস্থান আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রাম। তাঁহার পক্ষে তারকেশ্বরের প্রথম আবিষ্কারবার্তা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তখনও তারকেশ্বর 'পর্বত-গহ্বরে' জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। পরে ভারামল্ল মায়াগিরির সময়ে ঐ পর্বত গহ্বরই লোকপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থে পরিণত হয়। সুতরাং মায়াগিরির পূর্বেও তারকেশ্বরের অস্তিত্ব শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত ছিল না।"

॥ শৈব মঠ ॥

দশনামী সন্ন্যাসীগণ বাঙলাদেশের নানাস্থানে বিশেষ করিয়া হুগলী, হাওড়া মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় যে সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার বিবরণ "তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। দশনামীদের শৈবমঠের বিবরণ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য:

স্থাপিত প্রধান গদী শ্রীতারকেশ্বরে।
মল্লের ভূভাগ রাজ্য খণ্ড খণ্ড করে॥
দ্বিতীয় বড়াশী মঠ গঙ্গার সাগরে।
২৪-পরগণা ভুক্ত হাতিয়ার গড়ে॥
তৃতীয় মঠের নাম আমডাঙ্গা নাম।
চতুর্থ হইল মঠ কৃষ্ণবাটী স্থান॥
পঞ্চম স্থাপিত মঠ নাম বর্ধমান।
ভুবনেশ্বর শিবনাম সর্বশক্তিমান॥
হংসেশ্বর শিব নামে ষষ্ঠ মঠ হয়।
রায়না মঠের নাম সপ্তম নিশ্চয়॥
অষ্টম মঠের নাম বিহিত আমড়ায়।
নবম স্থাপন মঠ হয় লেলুয়ায়॥
দশম হইল মঠ নাম বৈদ্যবাটী।
গঙ্গাতট সন্নিকট কালী পরিপাটী॥
একাদশ মঠ হয় খামারপাড়া গ্রামে।
দ্বাদশ মঠের নাম চাঁইপাট ধামে॥
গড় ভবানীপুরে মঠ হয় সুবিহিত।
ভারামল্ল রায় করে ত্রয়োদশ ভুক্ত॥
অতঃপর হয় মঠ গুমগড় নামে।
চতুর্দশ সংখ্যা করে রেঞ্জাপাড়া গ্রামে॥
পঞ্চদশ হয় মঠ নয়নগর গ্রাম।

ষোড়শ সন্তোষপুরে মঠ হয় ধাম ॥
আর এক মঠ হয় মল্লের বিধান।
চেতুয়া গ্রামেতে হয় মঠের আস্থান ॥
কাঁথি মহকুমা স্থানে পঞ্চবদনধাম।
মঠের স্থাপন হয় বালুযুক্ত গ্রাম ॥
ক্রমান্বয়ে দেশভেদে হইল স্থাপিত।
উড্র-বঙ্গদেশে হয় সন্ন্যাসী ব্যাপৃত ॥

তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত মায়াগিরির ৫৬৫ জন চেলা ছিল। সম্বত ৮৫৫ সালে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন বলিয়া ভট্টগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও উহা ঠিক নয়। তিনি কুড়ি বৎসর যাবত মোহান্ত ছিলেন। কিম্বদন্তী যে, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে গিয়া অন্তর্ধান হইয়া যান। শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে থাকিয়াও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই।

তারকেশ্বরের মোহান্তদের সঠিক পারম্পরিক তালিকা পাওয়া যায় না। অনেকে আবার অস্থায়ীভাবে মোহান্ত হইতেন দেখা যায়। সেকালে মূল মোহান্ত ছাড়া বিবিধ দেবমন্দিরের পূজাদির অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকেও জনসাধারণ মোহান্ত বলিত। শ্রীমন্ত গিরি নামক ঐরূপ কোন সন্ন্যাসীর ফাঁসির বিষয় সেকালের সংবাদপত্রে দু-একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সমাচার দর্পণ' পত্রের দুইটি সংবাদ এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

তারকেশ্বরের মোহান্তের পুণ্য প্রকাশ—শুনা গেল যে তারকেশ্বর নিবাসী শ্রীমন্ত গিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম কর্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র [১২৩০] শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে, তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ-বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে। (১৬ই চৈত্র ১২৩০)

ফাঁসি—পূর্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে, তারকেশ্বরের শ্রীমন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে জিলা হুগলীর [illegible] তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু সুক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপ পূর্বক ফাঁসি হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রিতানুসারে তাহার ফাঁসি হইয়া কর্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। (২৮শে ভাদ্র ১২৩১)

॥ এলোকেশীর কাহিনী ॥

ইহার পর মোহান্ত মাধব গিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার [illegible] অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন; তাহার কারাবাসকালে, তদীয় শিষ্য শ্যাম গিরি তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কারাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোহান্তের গদীতে পুনরায় বসিতে চেষ্টা

করিলে, শ্যাম গিরি আপত্তি করেন এবং উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়গণও মাধব গিরির মোহান্ত হওয়াতে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি মোহান্তের গদি লইয়া মামলা করেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনকালে আদালতে বলেন, "যেহেতু আমি দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেইহেতু আমার পরনারী গমনে কোন বাধা নাই, আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এইজন্য আমার মোহান্তপদে পুনরায় বসিতে কোন বাধা নাই।" এই মামলায় মাধব গিরি জয়ী হন।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন ঃ তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটি পল্লীগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নবীনের আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায়, স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস খরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে, দ্বিতীয় পক্ষে যে স্ত্রীর পানিগ্রহণ করে, সেই স্ত্রীর সহিত মোহান্তের বিশেষ ভালবাসা ছিল। মোহান্ত একদিন যুবতী এলোকেশীকে দেখিয়া উন্মত্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দূতীর কাজে নিযুক্ত করে। ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে 'রাজার শ্বশুর হবে, মোহান্ত বিষয় করিয়া দেবে' ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া মেয়েটিকে মোহান্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেয়। স্ত্রী পুরুষের পরামর্শ স্থির হইলে, বিমাতা মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔষধ খাওয়াইতে লইয়া যায়। মোহান্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ানোর ছলে মাদক দ্রব্য সেবনে অচৈতন্য করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে। পরে নানারূপ সোনারূপার গহণা পাইয়া এলোকেশীর মন ক্রমশঃ মোহান্তের প্রতি অনুরক্ত হয়। সে সর্বক্ষণ মোহান্তের ভবনে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইল, নবীনের কানেও সেই কথা কিছু কিছু উঠিল। নবীন সন্দিগ্ধচিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে, এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় তাহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে নবীনের ইচ্ছা হইল না; সে বলিল "এলোকেশী, তুমি আমায় যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষমা করিলাম, চল তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া পাল্কি বেহারার অনুসন্ধান করিতে যায়। মোহান্ত দেখিল, এলোকেশী হাত ছাড়া হইতেছে; সে ছিনাইয়া লইবার জন্য ঘাটিতে ঘাটিতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল যে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া দুর্ঘট, মোহান্ত এতকাল ভোগ দখল করিয়া, এখনও এলোকেশীকে ছাড়িতে চায় না, তখন উভয়কেই নিরাশ করি। এই স্থির করিয়া সে স্ত্রীকে আঁশবঁটিতে কাটিয়া পুলিশে গিয়া উপস্থিত হইল। দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে বহু পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের কত ধনী লোকে অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে মোহান্ত ধরা পড়িল। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়ি দিয়া জেলঘানিতে জুতে খাটি সরিষার তৈল বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মোহান্ত মাধব গিরির আচরণের কথা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণ্যতীর্থে কুলবধূর সতীত্বনাশের পরও বঙ্গবাসী লম্পট মোহান্তকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে এই ব্যাপার লইয়া বহু নাটক উপন্যাস এবং গান রচিত হয়। নিম্নে একটি গান উদ্ধৃত হইল ঃ

"মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
ঐ তেল তৈয়ার হচ্ছে, হুগলীর জেলখানায়॥
যার পতি বিদেশে
তেল নিলে সে এক শিশে,
তেলের গুণে, মনের টানে,
পতি তার ঘরে ফিরে আসে॥

মোহান্ত মাধব গিরি ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত কুমরুল গ্রামে এলোকেশী নামক এক সুন্দরী যুবতীর সতীত্ব নাশের অপরাধে ধৃত হন এবং কারাবাস করেন। এলোকেশী তাহার স্বামী নবীনচন্দ্রকে মোহান্তের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, নবীন তাহাকে মোহান্তের কামানলে আহুতি না দিয়া স্বহস্তে একখানি আঁশবটি দিয়া হত্যা পূর্বক থানায় যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। বিচারে মোহান্তের জেল এবং নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পরে নবীনকে খালাস করিয়া দেওয়া হয়। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় মিলিটারী অরফ্যান প্রেসে চাকুরী করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তিনি হুগলীর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মোহান্ত মাধব গিরির বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কলিকাতা 'বেঙ্গল থিয়েটারে' ইস্-মোহান্তের-এ-কী-কাণ্ড নামক একখানি নাটক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে অভিনয় হয় ও বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মোহান্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং বেঙ্গল থিয়েটারও এই অভিনয়ের দ্বারা বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। এই নাটকের সাফল্য দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' এলোকেশীর ঘটনা সম্বলিত 'আমি তো উন্মাদিনী' নামক একখানি নাটিকা অভিনয় হয় এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু এলোকেশীর পিতা নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় সুষ্ঠু অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন। কুমরুলের মধ্যে এলোকেশীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

॥ তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ ॥

তারকেশ্বরের মোহান্তগণ দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরূপে দেবসেবা করিবেন ইহাই ভারামল্ল নির্দ্দেশ দিয়া যান। তাহারা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে পারিবেন না এবং মোহান্ত গতাসু হইলে, তাহার প্রধান শিষ্য মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাই চিরাচরিত প্রথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মোহান্ত সন্ন্যাসধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ত্রী সংসর্গের দ্বারা কদাচারে নিযুক্ত হইয়া উক্ত পদের অমর্যাদা করেন। ধর্মের আবরণে মোহান্তগণ যে অধর্মের খেলা খেলিতেন, দরিদ্র প্রজাগণ সে অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন দিন সাহসী হয় নাই। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী

সর্বপ্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহৃত হন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় দ্বিগুণ উৎসাহে ইহা লইয়া আন্দোলন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তারকেশ্বরের যাবতীয় ব্যাপার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। পরে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া আদালত হইতে সিদ্ধান্ত হয় এবং মোহান্তের 'গদি' তাহাদের শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রথার বিলোপসাধন হয়।

সত্যাগ্রহীগণ প্রত্যহ কিভাবে কারাবরণ করিত, তাহার সংবাদ ও সত্যাগ্রহীর জেলে মৃত্যু বিষয়ক একটি সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা [৩০ জুলাই ১৯২৪] হইতে উদ্ধৃত হইল ঃ

তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ॥ ২৯শে জুলাই ১৬ জন সত্যাগ্রহী লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করাতে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীর শোচনীয় মৃত্যু॥ কৃষ্ণনগর জেলে সত্যাগ্রহী বন্দী পরিতোষ কুণ্ডু নিউমোনিয়া রোগে গত ২৮শে জুলাই মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মোহান্ত সতীশ গিরির সময়ে, তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনাচারী মোহান্তকে বিদূরিত করিবার জন্য সর্বপ্রথম স্বামী বিশ্বানন্দ এবং পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য আন্দোলন করেন। তারকেশ্বর মন্দির দেশবাসীর সম্পত্তি, মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সুতরাং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যাগ্রহ করা স্থির হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট কংগ্রেস যাহাতে সত্যাগ্রহের যাবতীয় ভার গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে আবেদন করেন। তারকেশ্বরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ উক্ত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৩৩১ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের উপর কংগ্রেসের পক্ষে যাবতীয় ভার প্রদান করা হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন প্রভৃতি শতসহস্র যুবক তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল হইতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চারিমাস যাবৎ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিবার পর পরিশেষে মোহান্ত সতীশ গিরি গদিতে বসেন। ধরণীধর সিংহরায় প্রমুখ সাতজন ব্যক্তি তখন মোহান্তের বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থিত করেন; কিন্তু মোহান্তের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজী হন নাই। শ্রীপতি হাজরা ও উমাপদ মোদক সর্বাগ্রে মোহান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এবং শ্রী তীর্থবাসী সিংহরায়ের নিকট হইতে মোহান্ত তাহার স্ত্রীকে চান বলিয়া তিনিও সাক্ষ্য দেন। পরিশেষে সত্যের জয় হয় এবং তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেশবাসীর হস্তে আসে।

হুগলীর জেলাজজ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মোহান্তের যোগ্যতা দেখিয়া দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রমকে প্রথম মোহান্ত নিযুক্ত করেন। সম্পত্তি পরিচালনের জন্য পরিচালক সমিতি যে ব্যবস্থা করিবেন মোহান্ত তাহাই মানিয়া লইবেন

এবং মোহান্তের পরিচালনায় প্রজাবর্গের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়; তাহা হইলে পরিচালন সমিতি যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা নূতন মোহান্তও নিয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া হুগলীর জেলা জজ কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়।

গিরি উপাধিধারী পশ্চিমদেশীয় মোহান্ত সম্প্রদায় তারকেশ্বর হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এখন মোহান্তের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ নবপর্যায়ের প্রথম বাঙ্গালী সন্ন্যাসী মোহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অধ্যাত্ম সাধনা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য **শ্রীমদ্দণ্ডীস্বামী হৃষিকেশ আশ্রমকে** মোহান্ত পদ দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সুপরিচালনায় এই স্থানের সকল অনাচার দূরীভূত হইয়া ইহা একটি আদর্শ তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ১৩৪০ সালে তিনি ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সতের বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নেন এবং আঠার বছর বয়সে ১৩৫৮ সালের চৈত্র মাসে তিনি মোহান্ত হন। তারকেশ্বরে এত অল্পবয়সে পূর্বে কেহ মোহান্ত হন নাই। জজ রেবতি চট্টোপাধ্যায় ইহা অনুমোদন করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস বাঁকুড়া।

জগন্নাথ আশ্রম ১৩০১ সালের কার্তিক মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতা কামাখ্যায় এক সাধুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার তৃতীয় পুত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন। সেই সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে এবং তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও জপতপে আত্মনিয়োগ করেন। বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁহার একাধিক গ্রন্থ আছে। প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কৃত শিক্ষার সমুন্নতি বিধানার্থে মোহান্ত থাকাকালে ১৩৪৫ সালে তিনি এক **সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়** স্থাপন করেন। তারকেশ্বরের মোহান্ত পদ তাঁহার শিষ্যকে দিয়া তিনি ১৩৩৪ সালে তদপ্রতিষ্ঠিত কাঁকো শঙ্কর মঠে যান। এই মঠে সাধু মহাত্মাগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন ও তথায় কত যে যাগ যজ্ঞ ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজায় সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব-কল্যাণার্থে কাঁকো শঙ্কর মঠে "বিষ্ণুমহাযজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানে আবাসিক একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। আরা ও বালিয়া জেলায় সতীশ গিরি বহু সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখিয়া যান। তথায় সতীশ গিরি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রমের চেষ্টায় তাঁহার যে সব বেনামী সম্পত্তি ছিল তাহা উদ্ধার হয়।

ভারামল্ল তারকনাথের সেবার জন্য যে বৃহৎ জমিদারী দিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সরকার কর্তৃক জমিদারী লইবার আগে পর্যন্ত দুই লক্ষ টাকা ছিল। প্রণামী হইতে বৎসরে লক্ষাধিক টাকার উপর আয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত তারকেশ্বরের রাস্তাঘাটের বা ষ্টেশন হইতে মন্দির পর্যন্ত দুই পার্শ্বের কুটিরগুলির কোন উন্নতি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের যে অবস্থা ছিল, আজও ঠিক সেইরূপই আছে। দেবতার সেবার জন্য পূর্বে আট-দশ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় হইত, বর্তমানে উক্ত ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সংস্কৃত টোল এবং হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়। পল্লীসংস্কার দেশবন্ধুর শেষ জীবনের কামনা ছিল, কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়ায়, তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তারকেশ্বরে বৈদ্যুতিক আলো হইয়াছে কিন্তু রাস্তাঘাটের উন্নতি হয় নাই বলিয়া শীঘ্রই এই স্থানে

ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে পৌর সভা স্থাপিত হইবে বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন।

প্রত্যহ তারকেশ্বরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের থাকিবার এখন আর কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে ধর্মশালা ও বহু যাত্রীনিবাস আছে এবং মোহান্ত মহারাজও তাঁহার ভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মোহান্তের অমায়িক ব্যবহার সকল তীর্থস্থানের অধ্যক্ষগণের অনুকরণযোগ্য। তারকেশ্বরে হিন্দুস্থানীদের তিনটি ধর্মশালা, মান্দ্রাজীদের শেঠির ধর্মশালা ও ১৩৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিড়লা অতিথিশালা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত অতিথিশালা মাননীয় অতিথিগণের থাকিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে তারকেশ্বরে শিবরাত্রি ও গাজন মেলায় লোক-সমাগম প্রচুর তো হয়ই পরন্তু সারা বছর ধরিয়া শুধু কলিকাতা ও মফঃস্বলই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু-সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমন হইয়া থাকে। এই যাত্রী আগমনের মধ্যে তারকেশ্বর মাহাত্ম্য সম্পর্কে হিন্দুদের আগ্রহ যে কত প্রবল এবং বিশ্বাস যে কত গভীর তা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অলৌকিক কাহিনী এবং নানা ধরনের কিম্বদন্তী এই সব বিশ্বাসের মূল কারণ কাজেই শৈবতীর্থে এই দুইটি মেলায় যে বিরাট লোকসমাগম হইবে ইহা স্বাভাবিক।

॥ চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ॥

পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে প্রতি বৎসর **চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে** পাঁচদিনব্যাপী মূল অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই ট্রেণে, বাসে, পদব্রজে শিবব্রতধারী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে এবং ১লা বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। তারকেশ্বরের **গাজন-উৎসব** বাঙ্গলা দেশের সর্বাপেক্ষা বড় গাজন উৎসব। এই মহোৎসবে তারকেশ্বরের গোপের কাহিনী ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙ্গলার নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ইহা যে দশনামী শৈবদের দান নয় এবং মোহান্তদের আচারভুক্তও নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মেলা সুরু হয় ২০শে চৈত্র। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে **দখ্নো মেলা** আখ্যা দিয়াছে। মেদিনীপুর, হাওড়া, বাগনান, আমতা শ্যামপুর, থানাকুল, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানের কৃচ্ছ্রব্রতধারী ভক্তের দল, গৈরিক ধারণ করিয়া বাঁকে করিয়া পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিয়া তীর্থধামে উপস্থিত হইয়া পূজা দেয়। চৈত্র মাস ৩১ দিনে হইলে মেলা ২১শে চৈত্র হয়।

২৪শে চৈত্র হইতে আরম্ভ হয় **"পুর্বে মেলা।"** এই সময়টা খুলনা, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার (ডায়মণ্ডহারবার বাদে) লোকেরা পূজা দিতে আসে।

২৬শে চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্বে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিনটিকে বলে **মহাবিষ্যি** অর্থাৎ মহাহবিষ্যি। উপবাসী ব্রতধারীরা সেই দিন দিনান্তে হবিষান্ন আহার করে।

২৭শে চৈত্র **ফল উৎসব।** এই দিন ফল ছোড়া কাটা ঝাঁপ - রামনগরের গাজন হইয়া থাকে। গাজন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ২৫২-২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

২৮শে চৈত্র **নীল।** এই উপলক্ষে মন্দিরে শিবের বিবাহ বার্ষিকী পালিত হয়। "বাবা" ঐইদিন মাথায় টোপর ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য জামাই সাজেন। মন্দিরে সেইদিন দলে দলে ভক্তেরা নীলের বাড়ি পালায়। বাদ্যভাণ্ড, আতসবাজিতে সমস্ত উৎসব ক্ষেত্রটি

এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে। নীলাবতীর বিবাহোপলক্ষে এইদিন হাতীসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। চড়কের সময় মুকুন্দ ঘোষের দৌহিত্র বংশ গাজনের মূল সন্ন্যাসী হন।

২৯শে চৈত্র। চড়ক উৎসবের ঝাঁপ খেলা হইয়া থাকে। এই দিন কাঁটা-ঝাঁপ একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর নৃত্য হয়।

৩০শে চৈত্র গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ ও ব্রত সমাপন।

এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানের প্রত্যহই মন্দিরে পূজা, অর্চনা, মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডী করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ, বাবার মাথায় গঙ্গাজল "বর্ষণ প্রভৃতি থাকার প্রতিপালিত হয়।"

ব্রতধারণের ও নিয়ম পালনের ধরা ধাধা কোনও রীতি অধুনা প্রচলিত না থাকিলেও সাধারণতঃ একমাস, ঊনত্রিশ দিন, বা আরো অল্প দিনের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত গ্রহন করা হয়। ব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তখন এই মন্ত্র শ্রবণপূর্বক গৈরিক ধারণ করেন ঃ

"আত্ম গোত্রং পরিত্যজ্যং শিব গোত্রে প্রবিশতু"

গৈরিক ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ এক গোত্র হইয়া যান। আত্মিক সমন্বয় সাধনের ইহা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তখন এখানে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। আবার ব্রত উদযাপনের শেষে শিবগোত্র পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত স্বীয় গোত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। ওম্যালী সাহেব গেজেটিয়ারে কেবল শূদ্রগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের রমজানের ন্যায় এক মাস দিবাভাগে উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর আহারাদি করেন বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। সর্ববর্ণের নরনারী এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না। এখনও বহু মুসলমান রোগমুক্তির জন্য ধর্ণা দেন এবং তাহাদের থাকিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

এই মেলা ও জনসমাবেশকে কেন্দ্র করিয়া কৃষি মেলা, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, লোক-সঙ্গীত ও নাটকের আসর অনায়াসেই বসানো যায়। নানারূপ সরকারী তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে বুঝানোর এইরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। গণ-সংযোগের এই সুন্দর সুযোগটি হারানো কখনও উচিত নয়।

ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ তারকেশ্বরধাম শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে অগণিত তীর্থযাত্রীদের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। সুদূর পল্লীবাংলার প্রতিটি জেলা হইতেই হাজার হাজার পুণ্যলোভাতুর নরনারী শিবক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে ব্রত উদ্‌যাপন করেন। দোকানপাটের ভীড় এবং বহু লোকের আনাগোনায় এখানকার নাগরিক জীবন কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। মেলা দুইদিন ধরিয়া চলে। মেলার সময় তারকেশ্বর এষ্টেট কর্তৃক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

এই যে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা লইয়া হয়তো মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ নরনারীর মতে তারকনাথ কলির জাগ্রত দেবতা। এই দেবতা কলিযুগে 'পাপী-তাপী উদ্ধারিতে তারকেশ্বর নাম' লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তারকনাথের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাপদগ্ধ মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য বহুপ্রচলিত এই গানগুলিও যে তাহাদের মনে প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে তাহার কিয়দংশ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধার করিলেই পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

"তারকনাথের চরণে যার মতি না জন্মিল।
নিশ্চয় জানিবে তার বিধি বাম হইল॥
একবার বাবার নাম করে যেই জন।
সর্বপাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন॥

তারকনাথ কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই বলা হইয়াছেঃ

"বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর।
কলিযুগে জীব তরাতে নাম তারকেশ্বর॥

তারকনাথ সর্বত্যাগী শংকর—ভোলানাথ। ভক্তের জন্য তিনি কৈলাসধামও পরিত্যাগ করিতে পারেন তাই বলা হয় ঃ

"বাবা শ্মশানে থাকে গায়ে ভস্ম যে মাখে।
দিবানিশি নয়ন মুদে রাম বলে ডাকে॥
ভক্তের জন্য কৈলাস শূন্য করে থাকেন সর্বক্ষণ।
তারকব্রহ্ম তারকনাথে ডাকলে আমার মন॥"

তারকনাথ আশুতোষ। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেনঃ

"ভক্তিভাবে দিবে মোরে এক বিল্বদল।
অন্তিমকালে চরণ-কমলে পাইবে স্থল॥"

কিন্তু ঠাকুরের এই উপদেশ কেই বা মানে? শুধু একটি বেলপাতা ও একটুখানি গঙ্গাজল দিলে কি ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়? সেইজন্য তাহারা সর্বত্যাগী ঐ শিবের মাথায় টাকা-পয়সা, সোনা-দানার বোঝা চাপাইয়া দিয়া হৃদয়ের কামনা-বাসনা পূরণ করিবার জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করে।

তারকেশ্বরে দোলোৎসব॥ স্মরণাতীত কাল হইতে তারকনাথের ধামে বিশেষ উৎসবের মধ্যে ল[illegible] জীউর দোলযাত্রা উৎসব এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। দোলের পূর্বদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় বিধিমতে চাঁচড় উৎসবও তারকেশ্বরের এক আকর্ষণীয় বস্তু। মন্দির হইতে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত সাহাপুরের চাঁচড়তলা হইতে মন্দির পর্যন্ত ছড়া দেওয়া হয়, তারপর তারকনাথের ও লক্ষ্মীনারায়ণজীউর সন্ধ্যারতি শেষ হইলে স্থানীয় গোপগণ পূর্বপ্রধানুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ কীর্তন বাদ্যভাণ্ড ও নানাবিধ জয়ধ্বনি সহকারে বাবা তারকনাথের মন্দিরে লইয়া আসে। এই হরিহর-মিলনের অপূর্ব দৃশ্য একটি দেখিবার জিনীষ। মন্দিরে পূজার পর লক্ষ্ম[illegible]জীউ পূর্ববৎ গোপস্কন্ধে সাহাপুরের চাঁচড়তলায় যান এবং এবং তথায় পূজা ও হোম যজ্ঞাদির পর চিরপ্রথানুযায়ী চাঁচড়গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিশিখার লেলিহান রূপ দেখিবার জন্য বহু লোকের হয়। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে পূজার পর এস্টেটের দোলমঞ্চে বিগ্রহ দোলনায় তোলা হয় এ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে আবীর ও রঙ-এর দ্বারা সমস্ত তারকেশ্বরকে লাল করিয়া দেয় মোহান্ত মহারাজের বাড়ির সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দোলমঞ্চ আছে। এবং বাড়ির মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর বিগ্রহ একটি দর্শনীয় বস্তু।

শ্রাবণোৎসব॥ তারকেশ্বরে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়

তিথি অনুসারে কোন কোন বৎসর আষাঢ় মাসের শেষ সোমবার হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। প্রতি সোমবার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা শেওড়াফুলি হইতে পদব্রজে গঙ্গাজল লইয়া বাবা তারকনাথের অর্চনা করিয়া থাকেন।

ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ ॥ তারকেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে ১৯ বৈশাখ ১৩৬৪ সালে মোহান্ত শ্রীমদদণ্ডী হৃষিকেশ আশ্রম ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। উহাতে লিখিত আছে ঃ

তারকেশ্বরো বিজয়তে
বাবা তারকনাথজীউর আদি মন্দির নির্মিতা
ও আদি সম্পত্তি দাতা ভক্তপ্রবর রাজা
ভারামল্ল স্মৃতিস্তম্ভ
স্থাপিত অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৪

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি লিখিত "তারকেশ্বরের মঠ ও সাধু ভারামল্ল" নামক পুস্তকে অনেক ঘটনা লিখিত আছে।

॥ তারকেশ্বর বন্দনা ॥

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে দ্বিজ সহদেব রচিত "তারকেশ্বর বন্দনা"* নামক একটি হস্তলিখিত পুঁথি আছে গ্রন্থশেষে ইহা ১২৪৪ সালে রচিত বলিয়া লেখা আছে। **দ্বিজ সহদেব** তারকেশ্বরের নিকট নন্দনবাটী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তিনি সেই পুঁথিতে লিখিয়াছেন। তাঁহার উক্তি ঃ

গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা।
নিবাসী নন্দনবাটী বালগড়ে পরগণা ॥

তারকেশ্বর সম্বন্ধে প্রাচীন কোন ভাল গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেই হিসাবে এই পুঁথিটি তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। লেখকের রচনার নিদর্শন এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উদ্ধারযোগ্য ঃ

বন্দিব বনের মধ্যে খেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলুখাগড়া বেনার বসতি॥
চৌদিকে জঙ্গল জলা গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি রম্য বন॥
কপিলা দিছেন দুগ্ধ একচিত্ত হইয়্যা।
দেখিল মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়া॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তীকা খুলিয়া দেখে অপূর্ব পাথর॥
মর্দ্ধখানে তারকেশ্বর চৌদিগেতে জোলা।

* A descripti ve Catalogue of the Vernacular Maunscripts in the Collections of The Royal Asiatic Society of Bengal—Vol. IX. By Haraprasad Shastri.

ভক্তগণ পূজা দেয় ঢালা ফুলের মালা॥
বালিগড়ে পরগণা তার বিলেতে বিস্বাম।
পাতকী তরাতে প্রভু তারেশ্বর নাম॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিস সালে।
বিম্বর্ধ বসেছিল শ্রীফলের মূলে॥

॥ তারকেশ্বরের মৃৎশিল্প ॥

তারকেশ্বরে প্রত্যহ ভারতের নানা অঞ্চল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তীর্থযাত্রীরা পুণ্য লাভের আশায় আসেন এবং প্রথা হিসাবে এইসব যাত্রীরা প্রত্যেকেই বাবা তারকনাথের উপর গঙ্গাজল ঢালেন। এই গঙ্গাজল ঢালিবার জন্য ঘটের মত একপ্রকার মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয়। তারকেশ্বরের কুম্ভকারগণ এই মৃৎপাত্র শিল্পের শিল্পী এবং কুটিরশিল্প হিসাবেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই ঘট ছাড়া কুম্ভকারগণ মাটির গেলাস ও ধুনুচিও তৈয়ারী করে।

তারকেশ্বরে কুম্ভকারের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও তাহারা সারা বছর ধরিয়া পরিবারের সকল লোকের সহায়তায় এই কাজে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া উৎপাদন যাহা হয় তাহাতে চাহিদা মোটামুটি মিটিয়া যায়। ইহা তৈয়ারী করা খুব জটিল ব্যাপার না হইলেও ইহাতে নৈপুণ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ এই শিল্পের উপযুক্ত বেলেমাটি ও এ'টেল মাটি একত্রে মিশাইয়া বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষভাবে মাটির পাট করিতে হয়। তীর্থযাত্রীদের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তীর্থযাত্রী সমাগমের তারতম্যের উপর এই শিল্পের বাজার নির্ভর করে। মাটির ঘটের দিক হইতে তারকেশ্বরের কুম্ভকারদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে শেওড়াফুলির কুম্ভকারগণ। প্রথা হিসাবে তীর্থযাত্রীরা অনেকে শেওড়াফুলির গঙ্গায় স্নান করিয়া সেখান হইতেই মাটির ঘটে গঙ্গাজল ভরিয়া পদব্রজে তারকেশ্বরে যায়। তারকেশ্বরের মৃৎশিল্পীরা তাহাদের প্রস্তুত ঘট স্থানীয় পাণ্ডাদের নিকট পাইকারী হারে সরবরাহ করে। খুচরা বিক্রয় তাহারা করে না। ইহারা পাণ্ডাদের নিকট হইতে জিনিস বিক্রয় হইলে তবে দাম পায়। ফলে ইহাদিগকে টাকা আদায় করিবার জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারকেশ্বরের এই কুটিরশিল্পটি সংরক্ষিত করিবার জন্য সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র খুলিলে কুম্ভকারদের অসুবিধা ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় এবং তাহাদের লাভের পরিমাণও বেশী হয়।

তারকেশ্বরে হিমঘর

পশ্চিমবঙ্গের গুদামঘর কর্পোরেশন বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তারকেশ্বরে হিমঘর নির্মাণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে ইহাই বৃহত্তম হিমঘর। ভারতের পণ্যসংরক্ষণের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কারণ এ পর্যন্ত আর কোন পণ্যসংরক্ষণ [illegible] ভারতের কোন জায়গায় এরূপ হিমঘর নির্মাণ করিতে পারেন নাই।

সহজে পচনশীল পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ ঐসব পণ্য সংরক্ষণের ফলে উৎপাদকগণ বেশি লাভ পান। তাঁহারা সুপরিকল্পিতভাবে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া মরসুমের সময় যে প্রচুর পণ্য বাড়তি থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা

জমা করিয়া রাখিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে সবচেয়ে বেশি গোলআলু জন্মে। এই অঞ্চলের চাষীদিগের সুবিধার্থে কর্পোরেশন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রত্যেকটি হিমঘরে ৫০০ টন আলু রাখিবার উপযোগী ২টি হিমঘর সংস্থাপনের মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহারা ১৩২০ টন আলু রাখিবার উপযোগী একটি হিমঘর নির্মাণ করিয়া লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

আলু চাষীদের লাভ

হিমঘর হুগলী অঞ্চলের আলু চাষীদের পক্ষে খুব লাভের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া আলুচাষিগণের জন্য তাহা হইয়াছে। হিমঘরে আলু খুব ভাল বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ পায়, প্রথম বৎসরে হিমঘরে যত আলু রাখা হইয়াছিল তাহার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি আলু হুগলী জেলার চাষীদের। মোট ৭৭৮ জন লোক হিমঘরে আলু রাখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র নয় জন ব্যবসায়ী, বাকি সব চাষী। হুগলী জেলার কৃতি আলুচাষিগণের তালিকা ১৫১-১৫৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

পাট, ধান প্রভৃতি অন্যান্য কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এই হিমঘরের নিকটে আর একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

গোবর্ধন রক্ষিত ॥ ১০৯৮ সালে তাম্বুলীবংশে বর্ধমানের অন্তর্গত কর্জুমা গ্রামে গোবর্ধন জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন এই দরিদ্রের সন্তান বার বৎসর বয়সে এক আত্মীয়ের কারবারে সামান্য বেতনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি সন্ধীপুর গ্রামে স্বয়ং সুপারীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়া এই গ্রামে বাস করেন এবং ব্যবসায়ে সততা ও সাধুতার জন্য প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। সন্ধীপুর গ্রামে পূর্বে তাঁহার একটি অতিথিশালা ছিল। বাবা তারক-নাথের স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি তারকনাথের মন্দির নির্মাণ ও দুইটি পুস্করিণী খনন করিয়া দেন। ইহা ছাড়া হুগলী ও বর্ধমান জেলায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি বহু পুস্করিণী খনন করাইয়া দেন। যে জন্য বর্ধমানের মহারাজাকে একবার তাঁহাকে অর্থ-দণ্ড দিতে হইয়াছিল। তারকেশ্বরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে মল্লাসিমলা পর্যন্ত তিনি একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন। উহা এখন রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়া কথিত। তাঁহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তির জন্মে তাম্বুলী সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল বলিয়া আজও কোন স্থানে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার স্বজাতিগণ গোবর্ধনের নাম উচ্চারণ করিয়া তবে যাত্রা করে। ১১৮৭ সালে এই মাহাত্মা পরলোকগমন করেন। তাঁহার চার পুত্রের নাম রামনিধি, কালিচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম। শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত এই বংশের সন্তান।

চন্দননগর মহকুমায় একটিমাত্র কলেজ আছে। সম্প্রতি হরিপালে একটি কলেজ করি-বার জন্য সকলে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তারকেশ্বরে কলেজ করিবার জন্য ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এস্টেট কমিটির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তৎকালীন স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা উহা কার্যকরী হয় নাই। এই অঞ্চলের ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সত্বর তারকেশ্বর এস্টেট কর্তৃক একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত।

তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভবন তারকেশ্বর এস্টেট হইতে নির্মিত হয় এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবন বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। শ্রীজগন্নাথ আশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় তারকেশ্বর এস্টেট পরিচালিত একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান।

সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র রূপে তারকেশ্বর চতুষ্পাঠিও এষ্টেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহাতে কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং জগন্নাথ আশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন স্মৃতি, বেদান্ত, সাংখ্য ও মীমাংসা পড়িবার সুব্যবস্থা আছে। এই দুইটিই আবাসিক শিক্ষালয়। এষ্টেট কর্তৃক এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করা হয়।

তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সময় বৈদ্যপুর নিবাসী রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃত্যর্থে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ইহা ছাড়া জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কয়েকটি টিউবওয়েল নির্মাণ করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি পাথরে এই কথাগুলি আছেঃ

The Tarakeswar High English School
Established 1925
during the administration of
Amulya Chandra Bhaduri M. A.
Receiver Tarakeswar Estate
Built in1927.

॥ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব ॥

তারকেশ্বর মঠে বৈশাখ মাসে জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যদেবের আবির্ভাব উৎসব প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

শঙ্করাচার্যের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে তাহা ১১০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। জহরলাল নেহেরু লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিনি প্রকট ছিলেন। কাহারও মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু বাঙ্গালোর হইতে মিঃ বি, ভি, রমণ শঙ্করাচার্যের যে কুষ্ঠির ছক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি '২৫ মার্চ খৃষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দের মধ্যাহ্নে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন' বলিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং এই মতে তাঁহার জন্মকাল প্রায় সাত আট শত বৎসর পিছাইয়া যায়। এই মহাপুরুষের সঠিক জন্ম কোন শতাব্দীতে হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। তাঁহার উক্তি উল্লেখ্যঃ

Born on 25th March 44 B. C. at about noon. (Notable Horoscopes By B. V. Raman.)

তারকেশ্বরের **ইউনিয়ন ক্লাব** একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহার নিজস্ব ভবন আছে। তারকেশ্বর এস্টেটের সাহায্যে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় সারস্বত সম্মেলনের মূল প্রতিষ্ঠানও তারকেশ্বর মঠে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সত্যাগ্রহের পর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া যে মামলা হয় উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এক লক্ষ টাকা দান করেন। পরে তারকেশ্বর এষ্টেট দেবোত্তর ও পাবলিক

এনডাউমেণ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয়।* এখন মোহান্ত মহারাজের সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। দৈনন্দিন কার্য সমস্ত মোহান্তই করেন এবং তাঁহার নির্দেশে এই বিরাট এষ্টেট পরিচালিত হইতেছে।

তারকেশ্বর এষ্টেটের দেবোত্তর জমিদারীর অধীনে পূর্বে তারকেশ্বর, সাহাপুর, ভাটা ও নস্করপুর মৌজার কিয়দংশ ছিল। ১৩৬২ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী দখল বা মধ্যস্বত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে উক্ত মৌজাগুলি সরাসরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। তারকেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির বিনিময়ে এখন সরকার হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাওয়া যায়।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর মামলায় বাদী হিসাবে মামলা পরিচালনা করেন। প্রধানতঃ তাঁহার কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তারকেশ্বর এস্টেট দেবোত্তর ও পাবলিক এনডাউমেন্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তিনি অসাধারণ মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি তারকেশ্বর এস্টেট ম্যানেজিং কমিটির বহু বৎসর সদস্য ছিলেন। ২১শে শ্রাবণ ১৩৬৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গড়বাটী নিবাসী রঞ্জনলাল সিংহরায় তারকেশ্বর মোকদ্দমার অন্যতম বাদী এখনও জীবিত আছেন।

হরিনাম প্রদায়িনী সভা ১৩৬০ সালে তারকেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিজস্ব মনোরম ভবনে প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণের পূজা ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। ৫ই আশ্বিন ১৩৬৫ সালে হরিনাম প্রদায়িনী সভার ধর্মীয় পাঠাগার তারকেশ্বরের মোহান্ত হৃষিকেশ আশ্রম উদ্বোধন করেন। এইরূপ ধর্মীয় পাঠাগার গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

তারকনাথের মন্দিরে একটি পাথরে '**শুভমস্তু শকাব্দ ১৫৪৩**' বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের মধ্যে বাবা তারকনাথের পূর্বদিকে বাসুদেবের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। বাবা তারকনাথের পূজার সহিত প্রত্যহ তাঁহারও সাড়ম্বরে পূজা হয়।

তারকনাথের মন্দিরের উত্তরে দামোদর শিলা আছেন। উহার মন্দিরকে [illegible] মন্দির বলে। উক্ত মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আছে। উহা লোকনাথ অঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত মন্দির হইতে পাওয়া যায়। উহারও প্রত্যহ পূজা হয়। ধর্মযাত্রীর জন্য এই মন্দিরের সামনে হরিলাল বসাক 'ষোড়শীবালা বসাকের স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি চাঁদনি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তারকনাথের মন্দিরের পূর্বদিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। সরকার ১৩৬২ সালে জমিদারী লইবার পর বাবা তারকনাথের সম্পত্তির বিনিময়ে তাঁহার পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৭৫ হাজার টাকা নির্দিষ্ট বৃত্তি সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়।

চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় বাবা তারকনাথের প্রথম পুরোহিত হন। তিনি অন্ধ ছিলেন, বাবার আদেশে তিনি দুধপুকুরে স্নান করিয়া পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান।

* ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত তারকেশ্বর মামলা বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল হইতে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত 'পেপার-বুক' কলিকাতা হাইকোর্টে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন নৌকা ও হাঁড়ি আবিষ্কার

তারকেশ্বর থানার অধীন বালীগড়ি গ্রামে ১৩৬৮ সালে মাটি খনন কালে প্রায় ২২ ফুট নীচে ১টি দুই হাত চওড়া ঊনিশ হাত লম্বা নৌকা ও ১টি ঢাকাযুক্ত হাঁড়ি পাওয়া গিয়াছে। হাঁড়িটি নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু নৌকাখানি কোদালের ঘায়ে টুকরা টুকরা হইয়া যায়। এই প্রত্নদ্রব্যগুলি মুসলমান আমলের বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। উক্ত দ্রব্যগুলি মালিকের নিকট আছে।

॥ মোহান্তদের কুরসিনামা ॥

তারকেশ্বরের মোহান্তদের পারম্পরিক তালিকা সঠিক পাওয়া যায় না। মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি লিখিত 'তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে মোহান্তদের নিম্নোক্ত কুরসিনামা আছে। তিনি লিখিয়াছেনঃ প্রাচীন বেতাল বংশীয় বহি অপ্রাপ্ত হেতু মোহান্তগণের পরম্পরায় কুরসিনামা যাহা চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে প্রাচীন ভট্টগ্রন্থে তারকেশ্বর মোহান্তগণের কুরসিনামা যথাযথ ছিল না, যাহা ছিল তাহা ভুল ছিল। নিম্নে নামের ফিরিস্তী দেওয়া যায়। এক্ষণে ভট্টদের বহি প্রাপ্ত হওনের পর বুঝা যায় যে, যাহা পূর্বে ইংরাজি ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ। তাহার শুদ্ধির জন্য ধারাবাহিক কুরসিনামা দেওয়া গেল। যুদ্ধের সময় যাহাদের স্থিতিকাল পাওয়া যায় নাই এবং অস্থায়ীভাবে যাঁহারা মোহান্ত ছিলেন (মোহান্ত কার্য নির্বাহের জন্য) তাহারা সামান্য দিন ছিলেন, তাহাদেরও নাম দেওয়া হইল।

ইংরাজি ইতিহাসে প্রাপ্ত মোহান্তদের নাম (অশুদ্ধ)

১। ধুম্রপান গিরি; ২। কমলনাথ গিরি; ৩। মুক্তেশ্বর গিরি; ৪। যোগেশ্বর গিরি; ৫। গৌরনাথ গিরি; ৬। নির্মলনাথ গিরি; ৭। শিবনাথ গিরি; ৮। সমুদ্রনাথ গিরি; ৯। বিলাস গিরি; ১০। অরুণাচল গিরি; ১১। বলভদ্র গিরি; ১২। প্রসাদ গিরি; ১৩। জগন্নাথ গিরি; ১৪। পরশুরাম গিরি; ১৫। মোহনচন্দ্র গিরি; ১৬। রঘুচন্দ্র গিরি; ১৭। মাধবচন্দ্র গিরি; ১৮। শ্যামচন্দ্র গিরি; ১৯। সতীশচন্দ্র গিরি।

অস্থায়ী মোহান্ত—১। শিবনাথ গিরি; ২। মাহেন্দ্রনাথ গিরি; ৩। বিলাস গিরি; ৪। জগন্নাথ গিরি; ৫। শ্যামচন্দ্র গিরি।

ভট্টগ্রন্থে প্রাপ্ত মোহান্তদের নাম (শুদ্ধ)

১। মায়াগিরি ধুম্রপান; ২। কমলনাথ গিরি; ৩। বালগিরি বালখণ্ডী; ৪। অমরনাথ গিরি; ৫। কেশবনাথ গিরি; ৬। গোলাপ গিরি; ৭। জওয়াহীরনাথ গিরি; ৮। রাজেন্দ্রনাথ গিরি; ৯। সুরতনাথ গিরি; ১০। কুমুদনাথ গিরি; ১১। বালকৃষ্ণ গিরি; ১২। গৌরনাথ গিরি; ১৩। নির্মলনাথ গিরি; ১৪। মুক্তেশ্বরনাথ গিরি; ১৫। বলভদ্রনাথ গিরি; ১৬। বীরভদ্রনাথ গিরি; ১৭। মহেন্দ্রনাথ গিরি; ১৮। সমুদ্রনাথ গিরি; ১৯। অরুণাচল গিরি; ২০। প্রসাদ গিরি; ২১। পরসুরাম গিরি; ২২। মোহনচন্দ্র গিরি; ২৩। রঘুচন্দ্র গিরি; ২৪। মাধবচন্দ্র গিরি; ২৫। সতীশচন্দ্র গিরি (১২৯৯ সালে ইনি মোহান্ত হন)।

মোহান্তদের যে কুরসিনামা "তারকেশ্বর-শিবতত্ত্ব" গ্রন্থে কবিতাকারে লিখিত আছে, তাহার অংশবিশেষ পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল।

বিংশতি বরষ হয় মায়াগিরি স্থিতি।
রায়ভট্ট গ্রন্থ করে এরূপ উক্তি॥
সম্বৎ ৮৫৫ বর্ষে দৈববশে।
বঙ্গভূমে আগমন ধর্মের উদ্দেশে॥
তৎপরে কমলাগিরি করে মঠে স্থিতি।
ষষ্ঠি বর্ষ ধর্মকর্ম যোগে সদা মতি॥
কমলের অবসরে বর্ষ সাতাইশ।
বালাগিরি শ্রীমোহান্ত শিবদ্বার দেশ॥
ক্রমেতে অমরনাথ মঠে তারেশ্বরে।
মোহান্ত সংপ্রাপ্ত হয় কেশব তৎপরে॥
অশীতি বরষকাল অমরের স্থিতি।
কেশব সত্তর বর্ষ রাজ্য করে ইতি॥
গোলাপ ৯০ বর্ষ শ্রীমোহান্ত হয়।
জওয়াহীর এইরূপ ৩৫ নিশ্চয়॥
রাজেন্দ্র নামক গিরি ৩০ বর্ষ সীমা।
মোহান্ত হইয়ে মঠে রাখে গুণ ক্ষমা॥
তৎপরে সুরত নামে গিরির উদয়।
সূর্যসম ক্ষয়োদয় ক্রমবিপর্যয়॥
৪০ বরষ কাল মঠে শ্রীমোহান্ত।
ন্যূনাধিক হইবেক সাধক বৃত্তান্ত॥
দ্বিতীয় কুমদ নামে গিরি মঠে হয়।
দশম সংখ্যক এই মোহান্ত নিশ্চয়॥
ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ করে স্থিতি।
কালচক্র ঘূর্ণমানে স্বাধীন সমাপ্তি॥
পাঠান প্রেরিত হয় কালধর্ম বলে।
ধর্মের দুর্দশা তদা অধর্ম কবলে॥
পাণ্ডুয়া নামক গ্রাম হয় আক্রমণ।
পাঠান দুর্জয় হয় সন্ন্যাসী পতন॥
সপ্তগ্রাম সুনির্মূলে পাঠানের হস্তে।
দেবালয় সাধুমঠ ধ্বংস যুদ্ধক্ষেত্রে॥
তারেশ্বর মন্দিরের অবস্থা তখন।
বর্ণনীয় নাহি হয় এরূপ ঘটন॥
ধর্মের ধিৎকার দিয়া যদা সাধুদল।
দেশান্তরে পলায়িত হোয়ে নিরাকুল॥
দেবালয় বনভূমি সম সেই কালে।
সংস্কার মার্জনাশূন্য নাহি দীপ জ্বলে॥
নাহি হয় প্রাভাতিক মঙ্গল আরতি।
ঘড়ি ঘণ্টা বাদ্য শব্দে শূন্য শিব ক্ষিতি॥
বিল্বপত্র গঙ্গোদকে শিবের পূজন।
নাহি হয় সেই কালে শৃঙ্গার শোভন॥
সান্ধ্য আরত্রিক বিধি শূন্য দেবালয়ে।
ভোগ পূজা নিত্যকর্ম লোপ কাল পেয়ে॥
এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যখন।
ব্যবসায়ী সন্ন্যাসীর অত্র আগমন॥
ধর্মমঠ নষ্ট ভ্রষ্ট বিপন্ন দশায়।
দেখিয়া সকলে তদা করে হায় হায়॥
প্রতিকার চেষ্টা পায় সকলে মিলিয়া।
মুর্শিদার নবাবের সকাশেতে গিয়া॥
এইরূপে জ্ঞাত যদা নবাব সম্রাট।
বালিগড়ী বনভূমি সংপ্রাপ্ত আদিষ্ট॥
সন্ন্যাসীর মনোভীষ্ট হইল পূরণ।
তারেশ্বর মন্দিরের হয় সংস্করণ॥
কালিকা শক্তি মন্দির নির্মাণে যত্ন তৎপর
মোহন ধার্মিকবর অর্থের নিয়োগ করে।
এদিকে নাট্য মন্দির তারেশ্বর পুরঃস্বর
গদিঘর স্থিরতর সম্পন্ন মোহন করে॥
সাহাপুরে জলাশয় প্রকাণ্ড খনন হয়
মোহনের অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠা শাস্ত্র উপরে।
ইত্যাদি কার্যসমূহ করে চিন্তা অহরহ
তৎকালে অপর কেহ এতাদৃশ নাহি করে
এইরূপে বহুদিন অতীত করে জীবন
উন্নতি করে সাধন মোহন নামক গিরি।
বহু চেলা তদা করে চেলা মধ্যে বন্ধু করে
মোহন্তী কার্য উপরে অভিষিক্ত অধিকারী॥

॥ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ॥

হুগলীর অন্যতম সুসন্তান সিতিপলাশী নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ সিংহ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূপালের 'ইন্ডিয়ান মিডল্যান্ড রেলওয়ে' প্রোজেক্টের ভারপ্রাপ্ত হন। সেই সময় দেশে আসিবার সময় তারকেশ্বরে একরাত্রি তাঁহাকে বিশ্রামাগারে কাটাইতে হইয়াছিল। কারণ বৃষ্টি হওয়ায় কর্দমাক্ত পথে অন্ধকারে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া সেই রাত্রে তাঁহার বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় নাই। মশার কামড়জনিত অনিদ্রা হইতে সেই রাত্রেই তারকেশ্বর হইতে একটি লঘু রেলওয়ে স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসে এবং বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় শ্রম ও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি 'হোপ' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক অমৃতলাল রায় ও শ্রীরামচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ভারতে প্রথম স্বদেশী রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তারকেশ্বরে ইহার প্রধান কার্যালয় হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন এই রেলওয়ে লাইন খুলিবার প্রস্তাবক অন্নদাপ্রসাদ রায় ও এজেন্ট অমৃতলাল রায়ের স্বাক্ষরে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল তাহার দশম অনুচ্ছেদটি নিম্নে উদ্ধারযোগ্য ঃ

রেলওয়ে বিস্তারের পক্ষে আমাদের দেশের লোকের এই প্রথম উদ্যম। বিলাতের লোকে টাকা তুলিয়া এখানে আসিয়া রেলওয়ে করিয়া অনেক লাভ করিতেছেন। আমরা যদি টাকা তুলিয়া আমাদের দেশে রেলওয়ে করি, তহা হইলে আমাদেরও ঐরূপ লাভ হইতে পারে। এতদ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও দেশের অর্থ বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা প্রস্তাবিত রেলওয়ের অংশ কিনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ৬৫নং অখিল মিস্ত্রীর লেনে 'হোপ' নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়ের নিকট আবেদন করিবেন।

ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র মহলে ইহা তখন একটি আলোচনার বিষয় হয়। কয়েকখানি ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র ও একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালিত 'সঞ্জীবনী' এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও ইংরাজ পরিচালিত "ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ" পত্রে এই পরিকল্পনা-কারীকে উৎসাহিত করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করেনঃ

> We are pleased to hear that Baboo A. P. Roy's project for forming a native company to construct right feeder lines of Railway in Bengal, connecting prosperous districts with the main arterial lines, is receiving a fair amount of support, from his fellow countrymen. Some apprehension seems to be entertained that the Government will refuse sanction to the scheme. We cannot believe there is any ground for such a fear. Instead of snubbing the promoters, we should fancy the Government would rather welcome their efforts, and give the project every encouragement in its power.

বাঙ্গলা দেশের যে সব গন্যমান্য ব্যক্তি এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়া প্রথমে শেয়ার কিনিয়া সাহায্য করেন তাহাদের মধ্যে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (৬০০ শেয়ার), নন্দলাল গোস্বামী (৫০০ শেয়ার), চন্ডীলাল সিংহ (৫০০ শেয়ার), ঈশানচন্দ্র মিত্র (২৫০ শেয়ার). কানাইলাল খাঁন (২৫০ শেয়ার), এবং ব্রহ্মনাথ সেন (১৫৭ শেয়ার),

মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হুগলী জেলা বোর্ড ও বি, পি, রেলওয়ের সহিত একটি চুক্তি করেন। দশটাকা করিয়া আশি হাজার শেয়ারের মধ্যে একাত্তর হাজার শেয়ার একবৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যায়। উদ্যোক্তাগণ ছাড়া ব্রিহুত স্টেট রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার রায়বাহাদুর রামগতি মুখোপাধ্যায় (২৫০ শেয়ার), নগেন্দ্রনাথ বসু (৫০০ শেয়ার) এবং চক্রধরপুরের কণ্টাক্টর কেশবলাল (১৮০ শেয়ার) পরে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বসুয়ার শ্রীরাম বসু, ভাস্তাড়ার যজ্ঞেশ্বর সিংহ এবং চকদীঘির বিধুভূষণ সিংহরায় এই প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারকেশ্বর হইতে বসুয়া পর্যন্ত এই বার মাইল পথে প্রথম স্বদেশী রেলগাড়ি চলে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ৩২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ বসুয়া হইতে মগরা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোম্পানীর তারকেশ্বর-মগরা শাখার ২রা এপ্রিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধন করেন। এই লাইন করিতে কানা নদী, কানা দামোদর, ঘিয়ানদী ও কুন্তীনদীর উপর চারটি পুল নির্মাণ করিতে হয়। প্রথম তিনটি নদীর উপরে চল্লিশ ফুট লম্বা ও কুন্তী নদীর উপর আশিফুট লম্বা সেতু নির্মিত হয়। এই লাইন নির্মাণ করিতে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রথমে তিন খানি ইঞ্জিন ও ষাট খানি বগি লইয়া প্রত্যহ ৬ বার গাড়ি যাতায়াত করিত। প্রতি মাইল লাইন তৈয়ারী করিতে গড়ে ২৯ হাজার টাকা করিয়া খরচা পড়িয়াছিল। ৭ই এপ্রিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" পত্রে এই রেলওয়ের উদ্বোধনের সংবাদটি উল্লেখ্য ঃ

On Tuesday last the 2nd instant before a large and respectable gathering the Lieutenant Governor formally declared open the Tarakeswar Magra line of the Bengal Provincial Railway Company, the first railway in India which has been entirely financed and constructed by the sole agency of the natives of this country……

The railway was constructed by Babu Annada Prosad Roy, a passed student of the Rurki Thomson Civil Engineering College, and a young Engineer of exceptionally high abilities who with Mr. Amrita Lall Roy of 'Hope' projected and planned the line. We are much pained to notice that while encomiums were lavished in the Lieutenant Gevernor's speech, on the occassion of the opening ceremony on Rai Ram Gati Mukherjee Bahadur who did next to nothing in constructing the line, the name of Babu Annada Prosad Roy who not only planned but really constructed the first native railway was not even incidently mentioned. (Indian Messenger)

এই কোম্পানী বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর একটি গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুগলী জেলার ৩৩ মাইল জুড়িয়া এই রেলপথ বিস্তৃত থাকিলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আশানুরূপ লাভ হয় না বলিয়া কর্তৃপক্ষ এই রেলপথটি বন্ধ করিয়া দেন। ইহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সদর মহকুমার অধিবাসিদের ন্যূনতম ব্যয়ে অল্পসময়ের মধ্যে মালপত্র সরবরাহের ও যাতায়াতের যে খুব দুরাবস্থা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। সরকার এই

রেলওয়েকে জাতীয়করণ করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্মৃতির স্মারক হিসাবে ইহাকে সংরক্ষিত করিলে একটি ভাল কাজ করিতেন। কারণ ভারতে ভারতবাসী কর্তৃক ইহা ছাড়া যখন আর কোন রেলপথ হয় নাই। অগম্য স্থানে নূতন করিয়া যখন লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে, তখন একটি স্থায়ী চালু লাইনকে বন্ধ করিয়া দিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ যে বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই তাহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্ভব হইলে এখনও এই স্থানে পূর্বোক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে নূতন ব্রডগেজ লাইন দিয়া পুনরায় আর একটি রেলওয়ে করা উচিত। অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায়ের বিষয় সিতিপলাশীর মধ্যে লিখিত আছে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা **অমৃতলাল রায়** ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গরিফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন রায় হুগলী কলেজের ছাত্র এবং সেকালের সিনিয়ার স্কলারসিপ প্রাপ্ত ছিলেন। অমৃতলাল প্রবেশিকা ও এল, এ, পাস করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন এবং সেই সময় বার্লো কোম্পানীর বেনিয়ান গুপ্তিপাড়ার উমানারায়ণ সেনের কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অমৃতলালের ভাগিনী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা যান। তথা হইতে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা চলিয়া যান। তথায় "সান" পত্রিকায় ভারতে খৃষ্টান মিসনারীদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পঁচিশ ডলার পারিশ্রমিক পান। ইহার পর তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভারতের সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিয়া সুনাম অর্জন করেন। আমেরিকা থাকাকালীন কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরোধে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে **"হোপ"** নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা তাঁহার খুব ভাল লাগে এবং তিনিও তাঁহার সহিত এজেন্ট হিসাবে যোগ দেন। তাই তাঁহার কাগজের কলিকাতা কার্যালয়ে বহু বৎসর এই রেলওয়ের কলিকাতা অফিস ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় (১১ ডিসেম্বর ১৯৫৫) তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিয়াছেন।

॥ তারকেশ্বর-আরামবাগ রেলওয়ে ॥

তারকেশ্বর হইতে আরামবাগের দূরত্ব মাত্র চৌদ্দ-পনের মাইলের বেশী নয়। আরামবাগ অঞ্চলে রেলপথের কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তারকেশ্বর হইতে এই স্বল্প দূরত্ববিশিষ্ট স্থানটিতে রেলপথের অভাবে দরিদ্র ব্যক্তিগণকে যে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। যাতায়াতের অব্যবস্থায় আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তরস্থ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। নূতন কিছু পিচের রাস্তা বা দু-একটি ভাল সেতু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহাদের মোটরগাড়ি নাই, তাঁহাদের পদদ্বয়ের সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সুতরাং তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ করিলে দরিদ্র জনসাধারণের যে সব সুবিধা হইবে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। শাসন বিভাগীয় প্রয়োজনে মহকুমা সদর হইতে হুগলী জেলা সদরে অবস্থিত জেলা

হেডকোয়ার্টার্স, বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার অফিস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিদ্যালয়, জেলা বোর্ড অফিস, জেলা হাসপাতাল ও তারকেশ্বর তীর্থে আসিবার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। তারকেশ্বর-আরামবাগ রেলপথ পরিকল্পনা ও তারকেশ্বর-আরামবাগের দূরত্ব এইস্থানে প্রকাশিত হইল।
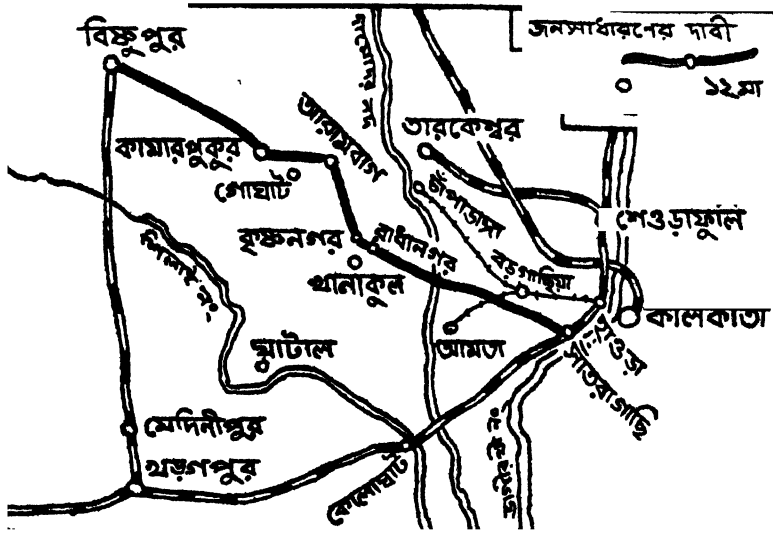
তারকেশ্বর-আরামবাগের দূরত্ব ও রেলপথ পরিকল্পনা

২। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারকল্পে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হরিপাল, চুঁচুড়া প্রভৃতি কলেজগুলিতে ঐ অঞ্চলের ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধা হইবে।

৩। ধনিয়াখালি, ব্যাণ্ডেল, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী চাঁপদানি, শ্রীরামপুর, বালী, বেলুড়, লিলুয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হইবে।

৪। কালকা, সিমলা, রূপার প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানীকৃত আলুবীজ এই বিরাট অঞ্চলের কৃষিজীবীদের সস্তায় সরবরাহের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

৫। আরামবাগ মহকুমার পল্লীঅঞ্চল হইতে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য পাট, আলু, গুড় ইত্যাদি কলিকাতা অঞ্চলে সরবরাহের সুবিধা হইবে।

৬। ঐ বিস্তীর্ণ অনুন্নত অঞ্চলের জনসাধারণ অল্প সময়ে, অল্পব্যয়ে কলিকাতা অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারিবে।

৭। রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর প্রভৃতি জাতীয়-তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিবার সকলের বিশেষ সুবিধা হইবে।

মোটকথা, এই নূতন রেলপথ নির্মিত হইলে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল হইতে কাঁচাফসল, অর্থকরীফসল ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ লক্ষ মানুষের সুবিধায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। অন্ততঃ

ঐ অঞ্চলের দশ লক্ষ লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক যাতায়াত কষ্ট লাঘব হইবে। জগৎপুর-ধর্মপোতা রাস্তা তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। এই রাস্তাই হইল এখন ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে আরামবাগ সহরের যোগাযোগের পথ। এই রাস্তার কাছাকাছি কোন রেলওয়ে ষ্টেশন থাকিলে ট্রেণ হইতে নামিয়া ঘাটাল যাইবারও বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব সাম্প্রতিক কালের নয়। ইতিপূর্বে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পিত বিষ্ণুপুর-সাঁতরাগাছি রেলপথ বিস্তারের কথা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ টুলোক 'সার্ভে' করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ইহাতে মোট খরচ হইবে ১,৮১,০৩,১০২৲ টাকা এবং টুলোক-রিপোর্ট অনুযায়ী সমস্ত খরচ বাদ দিয়া ইহা হইতে লাভ হইবে বৎসরে ১০,৮৭৫৮০৲ টাকা। বর্তমানে খরচ বাড়িলেও লাভও বাড়িবে। এই রেলপথ সম্বন্ধে ৩২৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

চাঁপাডাঙ্গা তারকেশ্বর থানার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। কলিকাতা হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য এই স্থানে খুব ভাল হয়। ধান, চাল, পাট, আলু, শাকসব্জী ও তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের ইহা শেষ ষ্টেশন। এই গ্রামে উচ্চবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পোষ্ট অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হরিসভা আছে। গ্রামের স্থায়ী লোক-সংখ্যা ৩,৯০৮ জন বলিয়া আদমসুমারির তালিকায় লেখা থাকিলেও এখন এই স্থানের জনসংখ্যা দশ হাজারের উপর। চাপাডাঙ্গার কাছে দামোদর নদের উপর **"বিদ্যাসাগর সেতু"** নির্মিত হওয়ায় এখন আরামবাগ যাইবার খুব সুবিধা হইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সেতুর উদ্বোধন করেন। চাঁপাডাঙ্গা ও পুড়শুড়ার মধ্যবর্তী স্থানে, যেখানে অহল্যাবাঈ রোড দামোদর নদের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, সেই স্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই সেতু নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময় বর্ষাবিক্ষুব্ধ রাত্রিকালে উত্তাল তরঙ্গসমাকুল দামোদর সন্তরণ করিয়া অচলা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতৃ-ভক্তির পুণ্য প্রতীকস্বরূপ এই সেতুর "বিদ্যাসাগর সেতু" নামকরণ হইয়াছে।

তারকেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের জনসংখ্যা

নাম	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
তারকেশ্বর	১৭,৮৭৮	৯,৪০৮	৮,৪৪০
ভালপুর	১২,৫৩৩	৬,৫৪০	৫,৯৯৩
বালিগড়ি	৮,৩০৯	৪,৩৩১	৩,৯৭৮
রামনগর	১০,৪০৪	৫,২৪৫	৫,১৫৯
চাঁপাডাঙ্গা	১৩,০৩৬	৭,০২৩	৬,০১৩

॥ হ্রগলী জেলার প্রাচীন মন্দির ॥

সারা পশ্চিমবঙ্গে কত মন্দির আছে তাহা বর্তমান লেখকের জানা নাই, তবে হুগলী জেলার দুহাজার গ্রামে ৪৭৮টি ছোট বড় মাঝারি রকমের যে সব মন্দির আছে সেগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে বলিয়া সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল।

বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটিকে দেখিতে হইলে এইসব প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখা আবশ্যক। হুগলীতে খুব প্রাচীন মন্দির না থাকিলেও, এই সব মন্দির দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, হুগলী জেলার গ্রামগুলি এক সময় কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল।

পাথর এ দেশে দুর্লভ বলিয়া হুগলী জেলাতে পাথরের মন্দির এক রকম নাই বলিলেই চলে। সাধারণত ইঁটের দ্বারাই হুগলী জেলার সমস্ত মন্দির নির্মিত। ইঁটের আয়ু খুব বেশী দিন নয় বলিয়া খুব প্রাচীন মন্দির এখানে নাই।

হুগলীতে চালা মন্দির, রত্ন মন্দির ও বাংলা মন্দির অনেকগুলি আছে। চালা মন্দির আবার দুশ্রেণীর, চৌচালা ও আটচালা। গ্রামের খোড়োঘরের অনুকরণে নির্মিত মন্দিরকে চালা মন্দির বলে। বাংলা মন্দিরও দুশ্রেণীর—এক বাংলা ও জোড়া-বাংলা। সেনেটের **বিশালাক্ষী মন্দির** ও গুপ্তিপাড়ার **শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির** জোড়বাংলা মন্দিরের সুন্দর নিদর্শন।

বাঁশবেড়িয়াতে রাণী শঙ্করী প্রতিষ্ঠিত তেরচুড়া বিশিষ্ট রথ সদৃশ **হংসেশ্বরী মন্দির** বাংলাদেশে স্থাপত্যশিল্পে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মন্দির পাথর ও ইঁট দিয়া তৈরি। এই ধরণের মন্দির কেবল হুগলী জেলায় নয়, সারা বাংলা দেশে আর নাই। হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশে **অনন্তদেবের মন্দিরও** একটি সুবিখ্যাত দেবালয়। এই মন্দির ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের গায়ে পো ইঁটের উপর দেবদেবীর অনেক মূর্তি খোদিত আছে। বাঙ্গালী শিল্পী তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব স্বাক্ষর এই সব মন্দিরে রাখিয়া গিয়াছেন। এই ধরণের বিরাট মন্দির হুগলী জেলায় আর যে স্থানে আছে, তার মধ্যে বল্লভপুরে **বল্লভজীউর মন্দির**, গুড়াপে ও চন্দননগরে **নন্দদুলালের মন্দির**, আঁটপুরে **রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির**, খানাকুলে **রাধাবল্লভজীউর মন্দির** ও গুপ্তিপাড়ায় [illegible] **মন্দির** উল্লেখযোগ্য। এই সব মন্দিরগাত্রের অপরূপ কারুকার্য অতি সুন্দর। অলঙ্কারবহুল পোড়ামাটির প্রতিকৃতি, চিত্রফলক প্রভৃতি মন্দিরে বর্তমান আছে। কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এই ধরণের মন্দির রাজবলহাট, হরিপাল, বৈঁচি প্রভৃতি স্থানে অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের দ্বারা যেভাবে সমাচ্ছন্ন ও লোনা লাগিয়া যেভাবে ইঁটগুলি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে এই সব মন্দিরের শিল্পকাজগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে প্রাচীন শিল্পকলার এই সব সুন্দর নিদর্শন শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

শিবমন্দিরের সংখ্যাই হুগলী জেলায় সর্বাধিক। **তারকেশ্বরে** জাগ্রত বাবা তারকনাথের মন্দিরের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু একসঙ্গে দ্বাদশ শিব মন্দির, ঠিক দক্ষিণেশ্বরের অনুরূপ, হুগলী জেলার একাধিক স্থানে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য : **বাক্সা, কোন্নগর, গোপীনগর, মাকালপুর ও বেলমুড়ি।** এ ছাড়া সিঙ্গুরের **সপ্তশিব মন্দির** ও **সোমসপুর, খানাকুল, জনাই, রাজবলহাট ভান্ডারহাটি, পানসেওলা, হরিপাল, কাঁকড়াকুলি,** ও **ভান্ডাড়া** গ্রামের জোড়া শিব মন্দিরও দ্রষ্টব্য। বাকসা গ্রামের **রঘুনাথের নবরত্ন মন্দির**

হুগলীর একটি দর্শনীয় মন্দির বলিয়া হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন। কিন্তু এই মন্দিরে কারুকার্য খচিত ইঁটের চিত্রগুলি সম্প্রতি সংস্কারের সময় চুন-বালি দিয়া ঢাকিয়া সাদা করিয়া একবারে নষ্ট করা হইয়াছে। **রাজবলহাট, গোপীনগর** ও **আলা** গ্রামে এই রূপ মন্দিরের শিল্পসম্ভার নষ্ট করা হইয়াছে। চন্দননগরের **দশভুজা মন্দিরও** দর্শনযোগ্য।

থানাকুলে কানা দারকেশ্বর নদীর তীরে শ্মশান-ভূমিতে নির্মিত প্রসিদ্ধ **ঘণ্টেশ্বর** শিবে বিশাল মন্দির উল্লেখযোগ্য। শ্মশানে এইরূপ মন্দির হুগলীর আর কোথাও দেখা যায় না।

হুগলী জেলায় রত্নমন্দির অসংখ্য আছে। মহানাদের ন'চুড়া বেষ্ঠিত **ব্রহ্মময়ী দেবী**র বিরাট মন্দির ১২৩৬ সালে নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালিকা দেবী ও চারকোণে চারটি শিবলিঙ্গ ও তিনতলার সুবৃহৎ চুড়ায় হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণের **অন্নপূর্ণার মন্দিরও** ঠিক এই ধরণের বলা যায়। বহু শিখরযুক্ত রত্নমন্দির প্রধানত **পঞ্চরত্ন** ও নবরত্ন এই দুশ্রেণীতে বিভক্ত। বর্গাকা নক্শার ভিত্তিতে নির্মিত এই ধরণের মন্দিরের কার্নিশ বক্রাকৃতি হয়। নবরত্ন মন্দির দ্বিতল হয়। একতলার চারকোণে চারটি শিখর ও দোতলার মূল শিখরকে ঘিরে থাকে আর চারটি ছোট ছোট শিখর।

কাঁকড়াকুলির **সীতারাম** ও **লক্ষ্মীজনার্দনের** নবরত্ন মন্দির এবং **সোমড়ার পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরদ্বয়** স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানের দাবী রাখে। মন্দিরের গৃহ চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট। এই গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়াছে। **দিগসুই, ক্ষীরকুণ্ডু** ও **গোপীনগর** গ্রামের নবরত্ন মন্দির এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমড়া ও ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামের অষ্টকোণাকৃতি **আটচালা ও বোলচালা মন্দির** হুগলীতে আর কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীপুরে **গোবিন্দজীউর** একচুড় বিশিষ্ট মন্দির ও তাহার সামনে দুর্গা দালানের মত প্রশস্ত চাতাল একটি দর্শনীয় বস্তু। অভিনবাকৃতি মন্দিরের একটিমাত্র নিদর্শন মহানাদের একচুড় বিশিষ্ট সুউচ্চ **লালজীউর মন্দির**। এরকম মনুমেণ্টের মতন মন্দির হুগলীর আর কোথাও নাই। ১৭৭৩ শকাব্দে মন্দিরটি তৈরি হইলেও, ভূমিকম্পে এই মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে বলিয়া বিগ্রহকে পর্যন্ত অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে।

মাহেশের **জগন্নাথের মন্দির** ও মহানাদের **জটেশ্বরনাথের মন্দির** দেখিতে প্রায় একই রকম। এই রেখ-দেউল মন্দিরের গঠনরীতি সুষমা ও সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হুগলী জেলার মন্দিরগুলি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র অবিভক্ত বাংলাদেশের যাবতীয় মন্দিরগুলির মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। মন্দির নির্মাণ-শৈলীর এত বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাবেশ বাংলা দেশে অন্য কোথাও আর দেখা যায় না। চত্বর বা অঙ্গন, ভিত্তি এবং মন্দিরতল (Floor), বিগ্রহ স্থাপনা, প্রাচীর অলঙ্করণ ও ছাদ এবং চুড়া নির্মাণে হুগলী জেলার মন্দিরগুলি মন্দির-শিল্প-কলার অপূর্ব নিদর্শন।

আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, সংস্কৃতি ও সাধনার যথার্থ ঐতিহ্য ও ধারাটি সম্যক অনুধাবন করিতে হইলে গ্রাম-বাংলার এই মন্দিরগুলি দেখিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না।